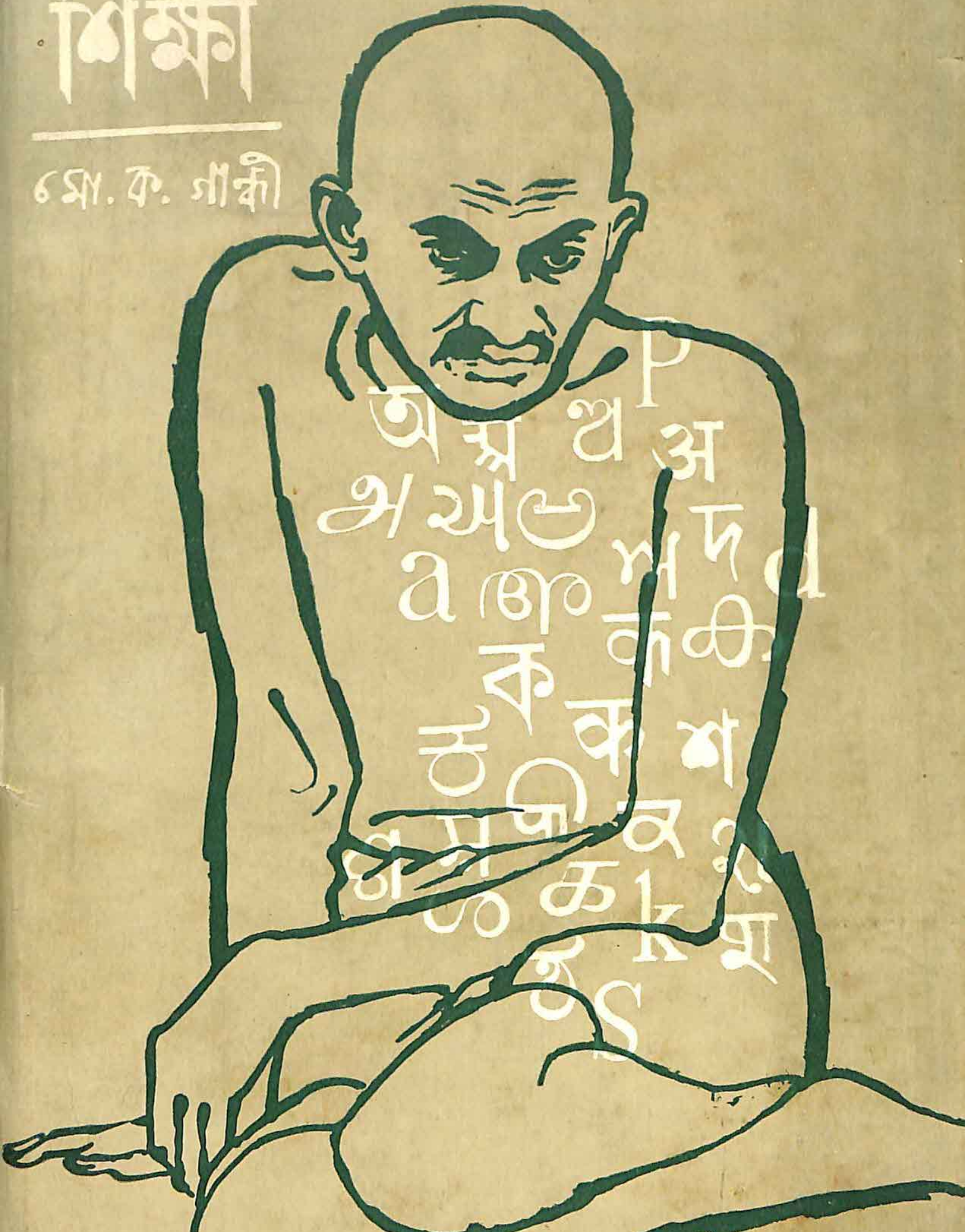
শিক্ষা

মো. ক. গান্ধী



মহাত্মা গান্ধী

শিক্ষা

শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সংকলক ও অনুবাদক

গান্ধীশতবর্ষ প্রকাশন

১৯৬৬-৬৯

ওরিএন্ট্ বুক কোম্পানি

কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২, ১৯৬৬ : গান্ধীশতবর্ষ প্রারম্ভ
দাম : ১৫ টাকা
নবজীবন ট্রাস্টের অনুমতিক্রমে অনুবাদ

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট. কলিকাতা ১২
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমন্মথনাথ পান কর্তৃক কে. এম. প্রেস
১।১ দীনবন্ধু লেন. কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত



প্রার্থনারত গান্ধীজী

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু। শান্তিনিকেতন, ১৯৫৪

পাঠকদের প্রতি

আমার রচনার অভিনিবিষ্ট পাঠক ও এর প্রতি আগ্রহশীল ব্যক্তিদের আমি জানিয়ে দিতে চাই যে আমার বক্তব্য সঙ্গতিপূর্ণ মনে হক—এ নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই। সত্যের সন্ধানে আমার যাত্রাপথে আমি বহু ভাবধারা বর্জন করেছি এবং নূতন অনেক কিছু শিখেছি। আমি বয়োবৃদ্ধ হলেও আমার এমন মনে হয় না যে আমার অভ্যন্তরীণ বিকাশ বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা আমার এই দেহের বিনষ্টি হলেই বিকাশের পরিসমাপ্তি ঘটবে। আমি যে বিষয়ে মাথা ঘামাই তা হল প্রতি মুহূর্তে সত্য, আমার ঈশ্বরের আদেশ পালনে আমার প্রস্তুতি। তাই আমার দুটি রচনায় কেউ যদি কোন অসঙ্গতি খুঁজে পান আর তারপরও যদি আমার মস্তিষ্কের সুস্থতায় তাঁর আস্থা থাকে তাহলে তাঁর কর্তব্য হবে একই বিষয়ের দুটি রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিকটিকে বেছে নেওয়া।

মো. ক. গান্ধী

হরিজন, ২৯-৪-১৯৩৩

ভূমিকা

মহাত্মা গান্ধী তাঁর গঠনকর্মপন্থার মধ্যে শিক্ষাকে সকলের চেয়ে বড় স্থান দিয়েছিলেন। বনিয়াদী শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, যদিও আমার গঠনকর্মতালিকায় আমি বনিয়াদী শিক্ষার নাম সকলের পরে করেছি, তাহলেও এর স্থান সকলের আগে। বনিয়াদী শিক্ষা এখন শিশু, এখনও তার দাঁত বেরোয় নাই। এ যখন বড় হবে এবং এর যখন দাঁত বেরোবে, তখন সে আর সব কাজকে গ্রাস করে ফেলবে। গান্ধীজী আশা করেছিলেন, কালক্রমে সকল-রকম গঠনকর্মই বনিয়াদী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, তখন আর আলাদা করে কোন কাজ করার দরকার হবে না, বনিয়াদী শিক্ষার কাজ করলেই সব কাজ করা হবে। এই শিক্ষার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে একটা নীরব সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত হবে, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন।

অন্যান্য মহাপুরুষের মত গান্ধীজীও একজন শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক। সারা জীবন ধরে তিনি তাঁর কথা ও কাজের ভিতর দিয়ে লোকশিক্ষা দিয়েছেন। এই পরোক্ষ শিক্ষা ছাড়াও তিনি তাঁর কর্মজীবনের সুরু থেকেই প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার কথা বলেছেন এবং সুযোগ হলেই শিক্ষার কাজও করেছেন। শিক্ষার সম্বন্ধে তাঁর এই সমস্ত উক্তিই অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁর শিক্ষার কাজও শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

তাহলেও শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল যখন তিনি বনিয়াদী শিক্ষার কথা বললেন। দেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়েছে। কংগ্রেসের উপর দেশশাসনের ভার পড়েছে। দেশের কোটি কোটি অশিক্ষিত ছেলেমেয়েকে কেমন করে শিক্ষা দেওয়া যায়, সেই হয়েছে চিন্তা। প্রচলিত শিক্ষা জাতিগঠনের

উপযোগী নয়। তার উপরে, এত ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দেবার উপযুক্ত অর্থও নাই। সমস্যার সমাধান করলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি বললেন, কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দিতে হবে। প্রথম থেকেই ছেলে সমাজের কল্যাণকর কোন একটা উৎপাদনাত্মক কাজ করবে এবং সেই কাজকে অবলম্বন করে তার শিক্ষা হবে। তার ফলে তার শিক্ষাও ভাল হবে, এবং এই কাজ থেকে যে আয় হবে তা থেকে তার শিক্ষার খরচও চলবে।

যদিও একটা সাময়িক প্রয়োজনকে উপলক্ষ করে গান্ধীজী এই শিক্ষার কথা বললেন তাহলেও এর উপযোগিতা একটা বিশেষ দেশ-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর পিছনে যে দার্শনিক তত্ত্ব আছে তা দেশকালের অতীত এবং সেইজন্য এই শিক্ষা সকল দেশ এবং সকল কালের পক্ষেই সত্য। তা যদি না হত তাহলে দেশের তাৎকালিক প্রয়োজন সাধনের দিক থেকে এর উপযোগিতা যত বেশিই হক না কেন গান্ধীজী কখনই তাঁর দেশবাসীকে এই শিক্ষার কথা বলতেন না। গান্ধীজীর কাছে সমষ্টির কল্যাণ ও ব্যষ্টির কল্যাণের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। সমষ্টির কল্যাণ যাতে হবে না, ব্যষ্টির কল্যাণ তা থেকে কখনই হতে পারে না, এই তাঁর বিশ্বাস।

এই শিক্ষা-দর্শন গান্ধীজীর জীবন-দর্শনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। গান্ধীজীর কাছে প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। এই ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশই ব্যক্তিজীবনের লক্ষ্য। স্বাধীনতা ছাড়া এই বিকাশ সম্ভব নয়। সমাজে প্রত্যেকটি ব্যক্তির নিজের নির্বাচিত পথে নিজের বিকাশ সাধনের জন্য অবাধ স্বাধীনতা থাকবে। এই স্বাধীনতা সেই সমাজেই সম্ভব যে সমাজের নিজের স্বাধীনতা আছে। এর জন্য চাই স্বাবলম্বী সমাজ। যে সমাজ আপনার চেষ্টায় আপনার ভিতর থেকে তার প্রাথমিক প্রয়োজন নির্বাহ করতে পারে না, যাকে তার অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষার জন্য

অপরের উপর নির্ভর করতে হয়, সে সমাজ কখনও স্বাধীন হতে পারে না। এরই জন্য গান্ধীজী স্বশাসিত স্বনির্ভর পল্লী-সমাজের কল্পনা করেছেন। এই সমাজ বাইরের কোন শক্তির দ্বারা শাসিত হবে না, এর শাসনব্যবস্থা এর নিজেরই হাতে থাকবে। এই সব পল্লী-সমাজ যে নিজের নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকবে তা নয়। এরা নিজেদের বৃহত্তর প্রয়োজনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। তবে সে মিলন হবে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রসূত। এই সমাজের নীতি হবে, সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ নয়, সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ, সর্বোদয়।

এই সর্বোদয়-সমাজের শিক্ষাব্যবস্থাকেও স্বাবলম্বী হতে হবে। এই সমাজের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যয় তাদের শিক্ষার দ্বারাই নির্বাহিত হবে। এই শিক্ষা হবে উৎপাদনাত্মক কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা। প্রাথমিক স্তরে এরই নাম বনিয়াদী শিক্ষা। পরবর্তী কালে গান্ধীজী এই শিক্ষাকে সর্ব স্তরে ব্যাপ্ত করে দিতে চেয়েছিলেন এবং এর নাম দিয়েছিলেন নূতন শিক্ষা। মানুষের জীবনে শিক্ষার আরম্ভও নাই, শিক্ষার শেষও নাই। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে, এমন কি জন্মের পূর্ব থেকেই, তার শিক্ষা সুরু হয় এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই শিক্ষা চলতে থাকে। আর, এই শিক্ষা হয় তার জীবনেরই ভিতর দিয়ে।

শিক্ষার অর্থ লেখাপড়া নয়। গান্ধীজী বলেছেন, লেখাপড়া শিক্ষা নয়, শিক্ষার উপায় মাত্র এবং একমাত্র উপায়ও নয়, পাঁচটার মধ্যে একটা উপায়। শিক্ষা মানুষের শরীর, মন এবং চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। গান্ধীজী তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই বিকাশই চেয়েছিলেন। তাঁর মতে এই বিকাশের জন্য এইরকমের শিক্ষাই আবশ্যক। এইরকমের শিক্ষা ছাড়া এই বিকাশ হতেও পারে না। এই শিক্ষায় মানুষের ব্যক্তিগত বিকাশ যেমন হয় তার সামাজিক

বিকাশও তেমনই হয়। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন এবং সামাজিক জীবনের মধ্যে যে বিরোধ কখনও কখনও দেখা যায়, এই শিক্ষার ফলে সে বিরোধ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়। মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবন এবং সামাজিক জীবনকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে দেখতে শেখে, ব্যক্তির মধ্যে সমাজকে এবং সমাজের মধ্যে ব্যক্তিকে দেখতে পায়। সাম্য এবং সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত যে সমাজ আজ দেশে দেশে মানুষ কামনা করছে এই শিক্ষা মানুষকে তারই যোগ্য নাগরিক করে গড়ে তোলে। মানুষ বিশ্বনাগরিকত্বের শিক্ষা লাভ করে। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে আজ যে মারামারি হানাহানি চলছে তা দূর করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় এই শিক্ষা।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করবার ক্ষেত্রে ভারতের একটা বিশেষ সুবিধা আছে। এ সুবিধা আর কোন দেশের নাই। ভারত সমগ্র পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। মানুষে মানুষে এত বৈচিত্র্য—ভাষায়, ধর্মে, মানসিকতায়, জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে—পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। ভারতের সকলকে একত্র মিলিয়ে নিয়ে পারস্পরিক বিশ্বাস ও প্রেমের ভিত্তিতে একটা সাম্যাশ্রিত সমাজ যদি আমরা গঠন করতে পারি তাহলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে আমরা অনেকখানি এগিয়ে যাব। আমাদের এই প্রচেষ্টা পৃথিবীর সম্মুখে একটা নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সকলকে এই কাজে অনুপ্রাণিত করবে। প্রয়োজন হলে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা সক্রিয়ভাবে সাহায্যও করতে পারব। ভারতের স্বাধীনতা সার্থক হবে। গান্ধীজী ভারতের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র পৃথিবীর জন্য। ভারত স্বাধীন হয়ে নিজের ভোগবিলাসে মত্ত হবে না, বিশ্বের কল্যাণের জন্য আপনার সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করবে, এই ছিল তাঁর কামনা। গান্ধীজীর সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।

গান্ধীজী এই শিক্ষার কথা বলেছিলেন ১৯৩৭ সালে। সে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। দেশ স্বাধীন হয়েছে, সেও প্রায় কুড়ি বৎসর হল। গান্ধীজী প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতিকে আমরা আমাদের জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি বলে গ্রহণ করেছি। কিন্তু এই শিক্ষার ভিতর দিয়ে নূতন সমাজ গঠনের কাজ বেশিদূর এগোয় নাই। নানা দিক থেকে নানা বাধা এসে আমাদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। সকলের চেয়ে বেশি বাধা এসেছে আমাদের মন থেকে। বাইরের বাধা তত বড় নয়, ভিতরের বাধাই বড় বাধা। ভিতরের বাধা দূর হলে বাইরের বাধা দূর হতে সময় লাগে না। গান্ধীজী যে সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন সে তো সমাজ-বিপ্লব। তাকে স্বীকার করে নেওয়া সহজ নয়। আমাদের আজন্মসঞ্চিত সংস্কার সেখানে বাধার সৃষ্টি করবে, এতে বিস্মিত হবার কিছু নাই। কিন্তু আজই হক আর দুদিন পরেই হক, একে স্বীকার আমাদের করতেই হবে। এ ছাড়া আর কোন পথ নাই। পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার দিন শেষ হয়েছে॥ চারিদিকে সর্বত্রই মানুষ নূতন সমাজ-চেতনায় সচেতন হয়ে উঠছে প্রেমের পথে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব না হলে হিংসার পথে তারা এই পরিবর্তন সাধনের জন্য চেষ্টা করবে। তাতে কাজ কিছু হবে না, উপরন্তু নূতন জটিলতার সৃষ্টি হবে। এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হিংসার পথে হতে পারে না। গান্ধীজীর নির্দেশিত পথই এর একমাত্র পথ। গান্ধী-শতবার্ষিকীর সূচনায় এই কথাটা আমাদের নূতন করে চিন্তা করার প্রয়োজন হয়েছে।

এই দিক থেকে এই বইখানি প্রকাশের চেষ্টা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। শ্রীমান্ শৈলেশ অনেক যত্নসহকারে গান্ধীজীর রচনাবলী থেকে তাঁর শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্ত লেখাগুলি সংগ্রহ করে বাঙলায় অনুবাদ করেছে এবং গ্রন্থাকারে সুবিন্যস্তভাবে সেগুলি বাঙালী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করেছে। শ্রীমান্ প্রহ্লাদ

উদ্যোগী হয়ে এই পুস্তক প্রকাশের ভার গ্রহণ করেছে। তারা দুজনেই আমার স্নেহভাজন। তাদের দুজনকেই আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাদের এই মহৎ প্রচেষ্টা সার্থক হক, গান্ধী-শতবার্ষিকী পালনের প্রাক্‌কালে এই সযত্নরচিত গ্রন্থখানি অনুরাগী পাঠকের কাছে গান্ধীজীর শিক্ষাচিন্তা নূতন করে তুলে ধরে তাঁদের নূতন কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করুক এই কামনা করছি।

শিক্ষা-নিকেতন, বর্ধমান — বিজয়কুমার ভট্টাচার্য

অনুবাদকের নিবেদন

বর্তমান গ্রন্থটি গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শের একটি পূর্ণাঙ্গ সঙ্কলন। শিক্ষা সম্বন্ধে গান্ধীজী যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন বা লিখেছেন এই গ্রন্থের সতেরটি অধ্যায়ে তার সন্নিবেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। গান্ধীজী কেবল ব্যাপক অর্থেই শিক্ষাব্রতী ছিলেন না, তাঁর জীবনীর সঙ্গে পরিচিত পাঠক মাত্রেই জানেন যে বিশিষ্ট অর্থেও তিনি ছিলেন শিক্ষাব্রতী। তাই আশা করা যায় যে শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে চিন্তাকারী বাঙালী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিবিধ দিক সম্বন্ধে জাতির জনকের অভিমত জেনে উপকৃত হবেন।

বর্তমান গ্রন্থের রচনাগুলি সঙ্কলিত হয়েছে নবজীবন ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত গান্ধীজীর কয়েকটি পুস্তক থেকে। এগুলি হল "টুআর্ডস নিউ এডুকেশন", "বেসিক এডুকেশন", "দি প্রবলেমস অফ এডুকেশন" ও "ট্রু এডুকেশন"।

গান্ধী-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সূচনা হল এ বৎসরের দোসরা অক্টোবর থেকে এবং ১৯৬৯ সনের দোসরা অক্টোবর দেশে বিদেশে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বব্যাপী গান্ধী-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সূচনার এই শুভ লগ্নে বাঙলায় গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শের এই পূর্ণাঙ্গ সঙ্কলন প্রকাশের সর্বাধিক কৃতিত্ব গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক মহাশয়ের। গান্ধী-দর্শনের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম নিষ্ঠার কারণেই তিনি এ ব্যাপারে উদ্যোগী হন। তিনি নিজে গান্ধীজীর সেবাগ্রামের ছাত্র। তাঁর সক্রিয় উৎসাহ ব্যতিরেকে এ প্রচেষ্টায় আমি ব্রতী হতামই না। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বিজয়দা বাঙলা দেশে গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শকে রূপায়িত করার ব্যাপারে অগ্রণী। তিনি তাঁর শতবিধ কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও যে এই গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকা লিখে দেওয়ার সময় করতে পেরেছেন তার একমাত্র কারণ আমার প্রতি তাঁর স্নেহদৃষ্টি।

এঁদের উভয়ের সঙ্গেই আমার সাধারণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সম্বন্ধ নয়। তাই কেবল তাঁদের ঋণ স্বীকার করেই ক্ষান্ত হলাম।

গান্ধীশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গান্ধীজীর শিক্ষা-সম্বন্ধীয় বিচারধারা হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার পথে বর্তমান সঙ্কলনখানি কিয়ৎ পরিমাণে সহায়তা করতে পারলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বিবেচনা করব।

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

শিক্ষা

প্রথম অধ্যায়ঃ বর্তমান শিক্ষার অপূর্ণতা

১

চারুচর্চামূলক শিক্ষা

শিক্ষা বলতে সাধারণতঃ অক্ষর-জ্ঞান বুঝায়। শিশুদের লিখতে পড়তে এবং অঙ্ক কষতে শেখানর নাম হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। কৃষক সৎভাবে তার অন্ন রোজগার করে। পৃথিবী সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান তার আছে। পিতা, মাতা, পত্নী, নিজ সন্তান-সন্ততি এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা উচিত, এ বিষয়ে তার সম্যক্ ধারণা থাকে। নৈতিক বিধানাবলী সে উপলব্ধি করতে পারে ও তার অনুসরণও করে। তবে নিজের নাম লেখার ক্ষমতা তার নেই। তাকে অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন করে আর নূতন কী লাভ হবে? তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কি এতে তিল মাত্র বৃদ্ধি পাবে? আপনারা কি চান যে সে তার পর্ণকুটীর বা নিজ বিধিলিপির প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে উঠুক? আপনাদের এ জাতীয় অভিপ্রায় থাকলেও কৃষক-সমাজের এবম্বিধ শিক্ষার প্রয়োজন নেই। পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রবাহে প্রবাহিত হইবার কারণ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, জনসাধারণকে এই জাতীয় শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।

এবার উচ্চশিক্ষার কথা আলোচনা করা যাক। আমি ভূগোল, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, বীজগণিত, জ্যামিতি ইত্যাদি শিখেছিলাম। কিন্তু ফল হল কী? এতে আমার নিজের বা আমার সঙ্গী-সাথীদের কোন্ উপকারটা হয়েছে? অধ্যাপক হাক্সলে শিক্ষার সংজ্ঞা নির্ধারণ-প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"আমার মতে চিৎপ্রকর্ষমূলক (liberal) শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের

নিম্নলিখিত যোগত্যাবলী থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ যুবাবস্থা থেকেই তার শরীর এভাবে গঠিত হবে যে তার শরীর যেন নিজ ইচ্ছার পরম অনুগত দাস হয় এবং দেহযন্ত্র হিসাবে যেসব কাজ করার সাধ্য তার আছে, তা যেন সানন্দে সে করে। চিৎপ্রকর্ষমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি হবে স্বচ্ছ এবং ধীরস্থির। তার মনের যুক্তিবাদ তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটাবে এবং জীবন সুব্যবস্থিতভাবে চলবে।... প্রকৃতির মৌলিক সত্যের জ্ঞান তার হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় থাকবে।... সুকুমার বিবেকের আজ্ঞাবহ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির কাছে তার ষড়্ ইন্দ্রিয় নতি স্বীকার করবে।...সকল প্রকার নীচতাকে ঘৃণা করার শিক্ষা তার হয়েছে এবং অপরকে সে নিজের মতই শ্রদ্ধা করতে অভ্যস্ত। আমার মতে অপর কেউ নয়, এই জাতীয় ব্যক্তিই সত্যকার চিৎপ্রকর্ষমূলক শিক্ষা পেয়েছে বলতে হবে। কারণ সে প্রকৃতির সঙ্গে সমরস। এই জাতীয় ব্যক্তি প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সদুপযোগ করবে এবং প্রকৃতিও তার সদ্ব্যবহার করবে।”

এরই নাম যদি সত্যকার শিক্ষা হয়, তাহলে আমাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে হয় যে ইতঃপূর্বে আমি যেসব বিজ্ঞানের উল্লেখ করেছি, তার জ্ঞান থাকার জন্য কদাপি আমার ইন্দ্রিয়গ্রামকে নিয়ন্ত্রণে আনয়ন কার্যে সহায়তা হয় নি। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষা—যারই কথা বলুন না কেন, মূল ব্যাপারের সঙ্গে কারও সম্বন্ধ নেই। এর দ্বারা আমরা মানুষ হবার জন্য সহায়তা পাই না। আমাদের কর্তব্য সম্পাদনে এ সহায়ক হয় না।

এক মুহূর্তের জন্যও আমি একথা বিশ্বাস করি না যে এই সব উচ্চ বা নিম্ন শিক্ষার অভাবে আমার জীবন বিফল হত। আর এ কথাও আমি মানি না যে কথা বলছি বলেই আমি সেবা করছি। তবে হ্যাঁ, সেবাকার্য করার অভীপ্সা আমার আছে এবং এই কামনার পরিপূর্তির জন্য আমি যে শিক্ষা পেয়েছি তার উপযোগ করছি এবং এই শিক্ষার সদুপযোগ যদি আমি করে থাকতে পারি,

তবুও এর সুফল দেশের কোটি কোটি জনগণ বিন্দুমাত্র পায় নি। এর কার্যকরিতা শুধু আমাদের মত লোকেদের কাছে। আর এতেই আমার বক্তব্যের যথার্থতা সপ্রমাণ হয়। আপনি এবং আমি, অর্থাৎ আমরা উভয়েই মূলতঃ মিথ্যা শিক্ষার বিষময়ী প্রভাবের ঘূর্ণাবর্তে পড়েছিলাম। আমার দাবী হচ্ছে এই যে, আমি এ শিক্ষার কু-প্রভাব থেকে মুক্ত হতে সমর্থ হয়েছি এবং আপনাদেরকে আমার অভিজ্ঞতা-লব্ধ ফল বিতরণ করছি ও এই ভাবে বর্তমান শিক্ষার গলিত রূপ আপনাদের দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরছি।

তা ছাড়া আমি এমন কথা বলি নি যে অক্ষর-জ্ঞান সর্বথা নিন্দনীয়। আমি শুধু এই কথাই বলতে চেয়েছি যে একেই যেন আমরা দেবতা-জ্ঞানে পূজা করতে না লেগে যাই। অক্ষর-জ্ঞান আমাদের কামধেনু নয়। উপযুক্ত স্থানে এর প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে এবং আমরা নিজেদের কাণ্ডজ্ঞান পুনরুজ্জীবিত করে নীতিবোধকে দৃঢ়মূল করতে পারলে অক্ষর-জ্ঞান স্বীয় গরিমায় যথাযোগ্য স্থান পাবে। আর তারপর আমাদের ঐ শিক্ষা পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকলে আমরা এর সদ্ব্যবহার করতে পারব। অলঙ্কারের মত তখন হয়ত এ আমাদের অঙ্গে সুন্দরভাবে মানিয়ে যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয়তা নেই। আমাদের দেশের প্রাচীন গুরুগৃহ-পদ্ধতিই যথেষ্ট। সে পদ্ধতিতে চরিত্র-গঠনকে প্রথম স্থান দেওয়া হয় এবং এরই নাম হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। এই ভিত্তিভূমির উপর রচিত সৌধই স্থায়ী হবে।

হিন্দ্ স্বরাজ (১৯০৮), অষ্টাদশ অধ্যায়

২

বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি

আজ পর্যন্ত যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি তার দ্বারা আমাদের কি কোন কল্যাণ হয়েছে? যদি হয়ে থাকে তাহলে তা কি এর জন্য

আমরা যে পরিমাণ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করেছি তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? শিক্ষার অর্থ সম্বন্ধে কদাচিৎ চিন্তা করা হয় এবং এর উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তো আরও কম চিন্তা করা হয়। অধিকাংশ লোকের কাছেই শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সরকারী চাকুরীর জন্য যোগ্যতা অর্জন করা। সাধারণতঃ বিভিন্ন শিল্প ব্যবসায়ে নিযুক্ত লোকেরা শিক্ষা পাবার পরই নিজ পারম্পারিক বৃত্তি ও পেশা বর্জন করেন। তারপর তাঁরা চাকুরী খুঁজতে থাকেন। কারণ শিক্ষিত হবার পর তাঁদের মনে ধারণা জন্মায় যে চাকুরী করলে নিজ সম্প্রদায়ের অপর সকলের কাছে তাঁদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আমাদের বিদ্যালয়সমূহে রাজমিস্ত্রি কর্মকার সূত্রধর দর্জি মুচি প্রভৃতি অনেক রকম বৃত্তি অবলম্বনকারী পরিবারের ছাত্র আছে। কিন্তু শিক্ষা পাবার পর নিজ নিজ পরম্পরাগত বৃত্তির মান উন্নত করে আরও ভালভাবে সেই পেশা চালানর পরিবর্তে তারা নিজেদের কাজকে হীন জ্ঞান করে ছেড়ে দেয় ও কেরানীর চাকুরী পাওয়াকে মর্যাদাকর মনে করে। ছাত্রদের অভিভাবকদের মনেও এই অলীক মর্যাদাজ্ঞান ক্রিয়াশীল।...

শিক্ষা স্বয়ং কোন লক্ষ্য নয়—শিক্ষা একটি বিশেষ লক্ষ্য-সিদ্ধির সাধন। আদর্শ চরিত্র সৃষ্টির সহায়ক শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই কেবল যথার্থ শিক্ষার আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কেউ আজ এমন কথা বলতে পারেন না যে আমাদের বিদ্যালয়সমূহে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা পূর্বোক্ত লক্ষ্যসাধনে সক্ষম। পক্ষান্তরে এমন বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যেখানে বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে আসার ফলে তরুণ-তরুণীরা তাদের চরিত্রের সদ্গুণাবলী হারিয়েছে। জনৈক নিরপেক্ষ ইংরেজ লেখক একবার বলেছিলেন বিদ্যালয় ও ছাত্রের বাড়ীর মধ্যে যতদিন না সমন্বয় সাধিত হচ্ছে ছাত্ররা ততদিন দুইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে। বিদ্যালয়ে তারা যা শেখে তার সঙ্গে বাড়ীর শিক্ষার কোন সম্বন্ধ নেই। বিদ্যালয়ের জীবন গৃহের জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ায় পাঠ্য-

পুস্তকের মাধ্যমে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা মেকী উপদেশে পর্যবসিত হয়। এ সব উপদেশ লোকসমাজে বিতরণ করার জন্য, আচরণের জন্য নয়। আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে এইসব জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই। বিদ্যালয়ে যা শেখান হয় সে সম্বন্ধে অভিভাবকেরা অজ্ঞ এবং এ অজ্ঞতা দূর করার ইচ্ছাও তাঁদের মধ্যে নেই। পড়াশুনার জন্য যে পরিশ্রম করতে হয় তাকে অপ্রয়োজনীয় মেহেনত মনে করা হয়—বাৎসরিক পরীক্ষার খাতিরে যা না করলেই নয়। একবার পরীক্ষা চুকে গেলে যত শীঘ্র সম্ভব শেখা বিষয় ভুলে যাওয়াই হল রেওয়াজ। কোন কোন ইংরেজ সমালোচক আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে আমরা পাশ্চাত্য পদ্ধতির নিছক অনুকরণকারী এবং এ অভিযোগ অসত্য নয়। সমালোচকদের মধ্যে একজন আমাদের ব্লটিং কাগজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে ব্লটিং কাগজ যেমন অতিরিক্ত কালিটুকু চুষে নেয় আমরাও তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতার ঝড়তি-পড়তিটুকু অর্থাৎ কেবল খারাপ অংশই গ্রহণ করে থাকি। আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সমালোচনা বহুলাংশে সত্য।

"সমালোচক", অক্টোবর, ১৯১৬

৩

অক্ষর-জ্ঞান সম্বন্ধে

শুধু লিখতে পড়তে শেখাকেই আমি কখনও চরম মোক্ষ জ্ঞান করি নি। আমার অভিজ্ঞতার ফলে আমি সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি যে শুধু সাক্ষরতা মানবের নৈতিক স্তরকে তিলমাত্র উন্নত করে না এবং চরিত্র-গঠন এক পৃথক বস্তু। আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে যে সরকারী বিদ্যালয়গুলি আমাদের অমানুষ করে ফেলেছে এবং এর ফলে আমরা অসহায় ও অপদার্থ হয়ে পড়েছি। এর প্রভাবে আমরা অতৃপ্ত স্বভাবের হয়ে গেছি এবং এই অসন্তোষ দূরীকরণের কোন

পন্থা নির্দেশ না করার জন্য আমরা নৈরাশ্যবাদের শিকার হয়েছি। এ শিক্ষার অভিসন্ধি পূর্ণ হয়েছে। আমাদের জাতি কেরানী ও দোভাষীর জাতি হয়েছে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৬-১৯২১

৪

অক্ষর-জ্ঞানের মূল্যায়ণ

অক্ষর-জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। লিখতে পড়তে শেখা প্রয়োজন। তবে এই-ই সব নয়। অক্ষর-জ্ঞান কোন অন্তিম লক্ষ্য নয়। এ হল লক্ষ্যে পৌঁছাবার একটি সাধন। কারও হয়ত বোধশক্তি আছে অক্ষর-জ্ঞান নেই, তাতেই বা কিসের ক্ষতি? পৃথিবীর অনেক ধর্মগুরু ও সংস্কারকের অক্ষর-জ্ঞান ছিল না। খ্রীস্ট ও মহম্মদ লিখতে পড়তে জানতেন না। বুয়দের প্রেসিডেণ্ট ক্রূগার সাহেব এত সামান্য লেখা-পড়া জানতেন যে অনেক কষ্টে তিনি তাঁর নাম সই করতেন। আফগানিস্তানের ভূতপূর্ব আমীরেরও একই অবস্থা ছিল। কিন্তু এঁরা সকলেই অসীম বোধশক্তির অধিকারী ছিলেন।

কেউ কেউ অবশ্য বলতে পারেন যে আমি অসাধারণ মানুষদের উদাহরণ দিচ্ছি। একথা ঠিক। তবে এইসব উদাহরণ থেকে একথা প্রমাণ হয় যে অক্ষর-জ্ঞান ছাড়া চলা মোটেই অসম্ভব নয়। এমন কি আজও পৃথিবীর বহুসংখ্যক মানুষ নিরক্ষর, তবে তাদের যে বোধশক্তি নেই তা নয়। প্রত্যুত জীবনধারণের জন্য আমাদের এই সব নিরক্ষর মানুষের উপরই নির্ভর করতে হয়।

নবজীবন, ১৫-১-১৯২২

৫

বরোদার শিক্ষা-প্রগতি

প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, প্রচলিত শিক্ষা জনসাধারণের প্রয়োজন-পূর্তিতে সক্ষম কি না। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতই বরোদাও

মূলতঃ কৃষক-অধ্যুষিত রাজ্য। এই শিক্ষায় এইসব কৃষকদের সন্তান-সন্ততিরা কি উন্নত ধরণের কৃষিজীবী হতে পারে? যে শিক্ষা তারা পায়, তার সহায়তায় কি তাদের নৈতিক ও ভৌতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়? বাস্তব ফল পরিদৃষ্ট হবার জন্য পঞ্চাশ বৎসর বেশ দীর্ঘ সময় বলতে হবে। আমি বেশ জানি যে আমার প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনক হবে না। বরোদার কৃষক-কুলের অবস্থা তাদের অন্য অঞ্চলের ভ্রাতৃবর্গ অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেয়ঃ নয়। স্বাভাবিক অবস্থাতেই তারা মন্বন্তরের সময়ের মত অসহায়। তাদের গ্রামগুলির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মানদণ্ড ভারতের অন্যান্য অংশের মতই প্রাগৈতিহাসিক যুগের সঙ্গে তুলনীয়। নিজ বস্ত্র উৎপাদন করার মহত্ত্ব সম্বন্ধে পর্যন্ত তারা সচেতন নয়। বরোদায় ভারতের উর্বরতম অংশগুলির কয়েকটি বিদ্যমান। এখান থেকে কাঁচা তূলা রপ্তানী হওয়া উচিত নয়। সহজেই এ রাজ্য সমৃদ্ধিশালী কৃষক-কুলের বাসভূমি এক স্বরাট অঞ্চলে পরিণত হতে পারে। কিন্তু এ রাজ্যে দারিদ্র্য ও অধোগতির জ্বলন্ত নিদর্শন বিদেশী বস্ত্রের স্তূপ উদ্ধত শিখর হয়ে উঠেছে। মাদক দ্রব্য পরিহারের ব্যাপারেও এখানকার অধিবাসীরা অগ্রসর নন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থা বোধহয় আরও শোচনীয়। ইংলণ্ডের মতই বরোদায় শিক্ষা-খাতে ব্যয়িত অর্থের অধিকাংশ আসে মাদক দ্রব্য বিক্রয়ের পাপ অর্থে পরিপুষ্ট রাজকোষ থেকে। শিক্ষা বিস্তার সত্ত্বেও পান-দোষে "কালিপারাজের" ছাত্রদের উচ্ছন্নে যেতে হয়। এ সবের কারণ হচ্ছে এই যে বরোদায় শিক্ষা-ব্যবস্থা ব্রিটিশ পদ্ধতির ন্যাক্কারজনক অনুকরণ। উচ্চ শিক্ষা আমাদেরকে স্বদেশে বিদেশী করে দেয় এবং বস্তুতঃ ভবিষ্যৎ জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার কোন কার্যকরিতা থাকে না বলে তা প্রত্যুত নিষ্ফল হয়। এর ভিতর মৌলিকতা বা স্বাভাবিক ভাব—কিছুই নেই।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-১-১৯২৬

৬

মেকলের স্বপ্ন

জনৈক বন্ধু "মেকলের জীবনচরিত ও চিঠিপত্র" নামক গ্রন্থ থেকে আমার কাছে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটুকু পাঠিয়েছেন ঃ

"১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ই মার্চ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক স্থির করেন যে 'ব্রিটিশ সরকারের মহান্ উদ্দেশ্য হবে ভারতবর্ষের স্থানীয় অধিবাসীদের ভিতর ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসার ঘটান।' কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশান থেকে অবসরপ্রাপ্ত দুইজন প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ এবং কয়েকজন ইংরেজ ও ভারতীয় নূতন সদস্যকে এর জন্য নিয়োগ করা হল। এই মণ্ডলীর সভাপতি হলেন মেকলে। যে রকম উদ্যম ও অভিনিবেশ সহকারে মেকলে এই কাজ করেন তাতে অভ্রান্ত ভাবে বোঝা যায় যে নূতন কাজ তাঁর মনঃপুত হয়েছিল।"

"মেকলে বলেছিলেন, 'আমাদের ইংরাজী বিদ্যালয়গুলি চমৎকার ভাবে প্রগতি করছে। যত ছাত্র এ শিক্ষা পেতে চায় তাদের সবাইকে এ সুযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে—কোন কোন ক্ষেত্রে তো অসম্ভব মনে হচ্ছে। হুগলী শহরে চৌদ্দশত ছেলে ইংরাজী শিখছে। হিন্দুদের উপর এই শিক্ষার আশ্চর্য পরিণাম হচ্ছে। ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন হিন্দুর আর নিজ-ধর্মের প্রতি যথার্থ অনুরক্তি থাকছে না। কেউ কেউ যদিও নিছক প্রথা হিসাবে এখনও হিন্দুধর্ম আচরণ করছে অধিকাংশই কিন্তু শুদ্ধ একেশ্বরবাদী হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ তো খ্রীস্টান ধর্ম অবলম্বন করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনা যদি চালিয়ে যাওয়া যায় তাহলে আজ থেকে ত্রিশ বছর পর বাঙলা দেশের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ভিতর আর একজনও পৌত্তলিকতাবাদী থাকবে না। ধর্মান্তরিত করার জন্য কোনরকম পরিশ্রম না করে, কারও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যে তিলমাত্র বাধা সৃষ্টি না করে, নিছক জ্ঞান ও

মননশক্তির অনুশীলন দ্বারাই এরকম করা সম্ভবপর হবে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় আমি উল্লাস বোধ করছি।' "

ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজ ধর্মবিশ্বাস বিসর্জন দেবেন— মেকলের এই স্বপ্ন সফল হয়েছে কি না আমি জানি না। তবে আমরা একথাও জানি যে তাঁর আর একটি স্বপ্ন ছিল তা হল ভারতবর্ষের ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাধ্যমে ইংরেজ শাসকদের কেরানী ও তার আনুসঙ্গিক অন্যান্য কর্মচারী সরবরাহ করা। মেকলের সে স্বপ্ন আশাতীত ভাবে সফল হয়েছে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-৩-১৯২৮

৭

প্রবেশিকায় উত্তীর্ণদের সংখ্যাধিক্য

জনৈক পত্রলেখক লিখেছেন ঃ

"বোম্বাই প্রদেশে গত বৎসর ৯,০০০ ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছিল। এ বৎসর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪,০০০। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫৬,০০০ হবে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে এদের অর্ধেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাহলে বোম্বাই প্রদেশে ৭,০০০ এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ২৮,০০০ ছাত্র এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে ঃ এই ২৮,০০০ ছাত্রের জন্য চাকুরী খালি আছে কি ? তা যদি না থাকে তাহলে নিজেদের জীবিকা অর্জনের জন্য এরা কি করবে ? বিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায় এইসব ছাত্রদের খরচ এমন ভাবে বৃদ্ধি পায় যে পড়াশুনা শেষ করার পর তাদের পক্ষে অল্প-স্বল্প আয়ে নিজেদের খরচ চালান অসম্ভব মনে হয়। তাদের চশমা কলার নেকটাই থিয়েটার সিনেমা কাব্য উপন্যাস ওষুধ সুগন্ধী তেল চিরুণী বুরুশ ইত্যাদি সব কিছু চাই। সুতরাং তাদের নিজ আয়ের বেশ একটা অংশ এইসব অবান্তর জিনিস কেনার জন্য খরচ করতে হয়। মাসে বিশ তিরিশ

টাকা মাইনের চাকুরীতে এসব হবে কোথা থেকে? এ সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত। নচেৎ আর দশ বছরের মধ্যে ব্যাপার এমন গুরুতর হয়ে উঠবে যে আপনার শ্রেষ্ঠতম নিদানেও আর কোন কাজ হবে না। আর স্বভাবতই এরা রাজস্ব বা রেলওয়ে বিভাগের মত যেখানে দু পয়সা উপরি আছে সেখানে চাকুরী খুঁজবে।"

প্রশ্নকর্তা অতীব সমীচীন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।....সরকারী ডিগ্রী পাবার অথবা পরীক্ষায় পাশ করার মোহ আমাদের মধ্যে দাস মনোভাবের সৃষ্টি করে এবং এর ফলে দাসত্ব-বন্ধন দৃঢ়তর হয়। এইজন্যই আমি সরকারী বিদ্যানিকেতন বর্জন করার কর্তব্যের উপর জোর দিয়েছি। কিন্তু এই সম্মোহনপাশ থেকে ছাত্রদের মুক্ত করবে কে? সরকারী ডিগ্রী বা সার্টিফিকেট না পেলে কি করে সে চাকুরী জোগাড় করবে এবং সর্বোপরি ঘুস ইত্যাদি বেআইনী রোজগারের পথ খুলে যাবে? আমাদের ছাত্রসমাজ যতদিন না শরীর-শ্রমকে অভিনন্দন জানাতে শিখছে এবং যতদিন না একথা বুঝছে যে দৈহিক শ্রম করার শক্তি চারুচর্চামূলক শিক্ষার চেয়ে অধিকতর মূল্যবান, ততদিন তারা এই মোহের শৃঙ্খলবন্ধন চূর্ণ করতে সক্ষম হবে না। চরখার উপর আমি যে এত গুরুত্ব দিয়ে থাকি তার অন্যতম কারণ হল এই। চরখা হল শরীর-শ্রমের আদর্শকে স্বীকার করার প্রতীক।... দেশের জনসাধারণ চরখাকে গ্রহণ করলে শরীর-শ্রম ও স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্য তাদের জীবনে স্বতঃই যথোপযুক্ত মর্যাদা পাবে। একথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে চরখার দ্বারাই সকলকে নিজ জীবিকা অর্জন করতে হবে। তবে একথা অবশ্যই বলব যে কোন-না-কোন রকমের উৎপাদক শ্রমের দ্বারা সকলে নিজ নিজ অন্ন উপার্জন করবে। পাশ্চাত্য জীবন-যাত্রা-পদ্ধতি এবং পশ্চিমাগত দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করার সম্বন্ধে বলব যে এর জন্য শিক্ষালয়ের পরিবেশ দায়ী। কদাচিৎ কোন ছাত্র এই ব্যাধির হাত থেকে পরিত্রাণ পায়

নবজীবন, ২৬-৮-১৯২৮

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে

...ইংরাজীকে নিজের মাতৃভাষার মত শেখার জন্য আমাদের যুবকদের যত সময় ও উদ্যম ব্যয় হচ্ছে তার কথা চিন্তা কর। কত বছর সময় ও কী পরিমাণ মূল্যবান উদ্যম জাতির অপচয়িত হচ্ছে সহজ অঙ্কের সাহায্যে তার হিসাব কর।

অথচ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ এ সবই হচ্ছে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় আজ হিন্দু-সংস্কৃতির জীবন্ত প্রতিমূর্তিরূপে প্রশংসিত। বেতন দিয়ে এবং অন্যান্য যেভাবে সম্ভব মালব্যজী সেরা শিক্ষক ও অধ্যাপকদের এখানে আকর্ষণ করেছেন। তবে এর চেয়ে বেশী মালব্যজীর পক্ষে করা সম্ভবপর ছিল না। এ তাঁর দোষ নয়। হিন্দি কিন্তু এখানে ইংরাজীর স্থলাভিষিক্ত হয় নি। শিক্ষকরা তাঁদের পরিবেশেরই সৃষ্টি এবং ছাত্ররা তাঁদের কাছ থেকে যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট। অথচ তাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। অনেক সময় তারা সামান্য কারণে ধর্মঘট এবং এমন কি প্রয়োপবেশনও করে থাকে। তাহলে তারা কেন সর্বভারতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পাবার জন্য দাবী জানাবে না? শুনেছি এখানে অন্ধ্রের আড়াই শ' জন ছাত্র আছে। তারা স্যার রাধাকৃষ্ণণ-এর কাছে গিয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অন্ধ্র বিভাগ খোলার দাবী জানাতে পারে। তারা যদি সর্বভারতীয় ভাষা শিখতে না-ই চায় তবে তেলেগুর মাধ্যমে শিক্ষা পাবার অধিকার দাবী করতে পারে।

জাপানে কি হয়েছে এ তোমরা জান। জাপানকে অবশ্য আমি খুব একটা মহৎ দেশ বলে মনে করি না। তবে সাফল্য সহকারে পাশ্চাত্য দেশগুলির আধিপত্যস্পৃহার সঙ্গে টক্কর দেওয়ায় জাপানকে এসিয়ার এক মহান দেশ বলে মনে করা হয়। জাপানের শিক্ষালয়-সমূহের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী জাপানী ভাষায় শিক্ষালাভ করে, ইংরাজীর মাধ্যমে নয়। জাপানীদের লিপি কঠিন; কিন্তু তা বলে কেউ

সে লিপি শেখা ছেড়ে দেন নি এবং তাঁরা নিজেদের লিপি বর্জন করে রোমান লিপিও গ্রহণ করেন নি। জাপানীরা অবশ্য ইংরাজী বা অন্যান্য বিদেশী ভাষা শেখা বয়কট করেন নি। তাঁরা নিজেদের উদ্যমের সাশ্রয় করেছেন। সে দেশে যাঁরা বিদেশী ভাষা শেখেন তাঁদের উদ্দেশ্য হল পশ্চিমের বিশিষ্ট জ্ঞান দ্বারা জাপানের চিন্তাধারা ও জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করা। পশ্চিমের যতটুকু গ্রহণযোগ্য, তাঁরা জাপানীতে তার অনুবাদ করেন। কারণ জাপানের যুবসম্প্রদায়ের মন সতেজ ও সজাগ। এইভাবে প্রাপ্ত জ্ঞান এক জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়েছে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা সরকারী দপ্তরের কেরানী উকিল ব্যারিস্টার বিচারক ইত্যাদি হবার ঊর্ধ্বে যায় না। এর ফলে আমাদের যে প্রথাকে হৃষ্টচিত্তে ধ্বংস করা উচিত আমরা তার অসহায় বশম্বদে পরিণত হই। আর এত করেও আমরা ভাল ইংরাজী শিখতে পারি নি। ইংরাজী শিক্ষিত লোকেদের কাছ থেকে আমি অগনিত চিঠি পেয়ে থাকি এবং এদের মধ্যে অনেকের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী আছে। কিন্তু তাঁদের ইংরাজীতে মারাত্মক রকমের ভুলের ছড়াছড়ি। এর কারণ খুবই সহজ। সমাজে মালব্যজী ও রাধাকৃষ্ণণ-এর সংখ্যা বিরল। তাঁরা যা পেরেছেন দেশের হাজার হাজার লোকের পক্ষে তা পারা সম্ভবপর নয়।

আর একটি বিষয়ের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ইচ্ছা হচ্ছে। আজ সকালে এমন একটি দৃশ্য দেখেছি, যা অন্ততঃ এখানে আশা করিনি। সকালে ছাত্রদের বসন্ত পঞ্চমীর শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল এবং তারা মালব্যজীর মৌন আশীর্বাদ নেবার পর তাঁর বাসগৃহের সামনে দিয়ে কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছিল। কিন্তু যেভাবে তারা হাঁটছিল তা দেখে মনে হয় না যে আদৌ তারা কোন রকমের শরীরচর্চার শিক্ষা পেয়েছে। পা মিলিয়ে বুক চিতিয়ে সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীর মত চলার পরিবর্তে তারা এলোমেলো ও শিথিল ভাবে চলছিল।

....প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা নিজস্ব ঐতিহ্য থাকে, থাকে এক বিশিষ্ট চারিত্র্যধর্ম। উদাহরণ স্বরূপ অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি পশ্চিমের হুবহু অনুকরণ। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অপ্রয়োজনীয় বহিরঙ্গ ধার করে আমরা এই আত্ম-গরিমায় ডগমগ হয়ে উঠি যে আমরা এ দেশে সজীব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছি। দেশের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন কি এখানে দেখা যায়...তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কি তোমরা আলিগড়ের যুবকদের আকর্ষণ করতে পেরেছ? তাদের সঙ্গে কি একাত্ম হতে পেরেছ? আমার মতে এইটা তোমাদের বিশেষ কাজ, তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অবদান হওয়া উচিত।...আমি চাই যে তোমরা অগ্রণী হয়ে মুসলমানদের এখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাও এবং তোমাদের সামনে বাড়ান হাতকে তাঁরা যদি প্রত্যাখ্যান করেন তার জন্য ক্ষুব্ধ হয়ো না। তোমরা এক মহান্ সভ্যতার প্রতিনিধি। লোকমান্য তিলকের মতে এ সভ্যতা ১০,০০০ হাজার বছরের প্রাচীন এবং পরবর্তী অনেক পণ্ডিতের মতে এ আরও পুরাতন। এই সভ্যতার বিশেষ অবদান হল বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন, তথাকথিত শত্রুদের মিত্রে রূপান্তরিত করা। পূতসলিলা ভাগীরথীর মত আমাদের সভ্যতাও বহু বহিরাগত ধারাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু-সংস্কৃতি ও হিন্দু-সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করার প্রয়াস পেয়েছে বলে আমার প্রার্থনা এই যে বিশ্ববিদ্যালয় যেন অন্যান্য সংস্কৃতির যা কিছু ভাল তাকে নিজের কাছে আমন্ত্রণ জানায় ও তাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে। এইভাবে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় যেন সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতির আদর্শ হয়ে ওঠে। এই হবে এখানকার বৈশিষ্ট্য। তোমাদের এইভাবে গড়ে তুলতে ইংরাজী কোন সাহায্য করতে পারবে না। আমাদের প্রাচীন জ্ঞান—আমাদের ধর্মগ্রন্থ-সমূহের শিক্ষা যথোচিত ভাবে পেলে তোমরা এইভাবে গড়ে উঠবে।

…তোমরা প্রাসাদোপম ছাত্রাবাসে থাক। কিন্তু একান্ত অনাড়ম্বর ও বাহুল্যবর্জিত অবস্থায় যে ছোট্ট ঘরটিতে পণ্ডিতজী (মদনমোহন মালব্য) থাকেন তার দিকে তোমরা দৃষ্টি দাও। তাঁর ঘরে ঢুকলে দেখবে যে সেখানে কোন সাজগোজের বালাই নেই, আসবাবও নামমাত্র। তোমরা যারা তাঁর উত্তরাধিকারী হবে নিজেদের জীবনকে তাঁর আদর্শে গড়ে তোলার চেষ্টা কর। তোমাদের অনেকেই দরিদ্র পিতামাতার সন্তান। ভুলে যেও না যে তোমাদের দরিদ্রকুলের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে এবং তাই আয়েস ও বিলাসের জীবন আমাদের দেশের দারিদ্র্যের সঙ্গে খাপ খায় না। মালব্যজীর মত তোমরা যেন অনাড়ম্বর সরল জীবন ও মহান্ চিন্তাধারার বাহন হও।

হরিজন, ১-২-১৯৪২

৯

পাঠান্তে কিংকর্তব্যম্

একটি ছাত্র যথোচিত গুরুত্ব সহকারে প্রশ্ন করেছে: "পড়াশুনা শেষ হলে আমি কি করব?"

আজ আমরা পরপদানত জাতি এবং আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়েছে শাসকদের সুবিধার্থে। কিন্তু চরম স্বার্থপর ব্যক্তিও যেমন যাদের শোষণ করতে চায় তাদের কিছু না কিছু লোভ দেখায়, তেমনি আমাদের শাসকবর্গও তাঁদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ দিতে প্রলুব্ধ করার জন্য একাধিক প্রলোভন আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে আসছেন। তাছাড়া প্রতিটি সরকারী ব্যক্তিই একরকম নন। এঁদের ভিতর এমন অনেক উদারপন্থী আছেন যাঁরা শিক্ষা-সমস্যাকে গুণাগুণের ভিত্তিতে বিচার করেন। সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বর্তমান ধারাতে কিছু ভালও আছে। তবে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে কারণেই হক প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির দুরুপযোগ

হচ্ছে। অর্থাৎ একে অর্থ ও মানমর্যাদা প্রাপ্তির সাধন বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

"সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে" অর্থাৎ যা মুক্ত করে তার নাম বিদ্যা—এই যে প্রাচীন প্রবাদ, এ সেকালের মত আজও সত্য। এখানে শিক্ষার অর্থ শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞান নয় বা মুক্তি বলতে শুধু পারলৌকিক মোক্ষ বোঝায় না। মানব-সমাজের সেবার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় শিক্ষার নামই জ্ঞান এবং মুক্তির অর্থ হচ্ছে এমন কি ইহজাগতিক যাবতীয় বন্ধনপাশ ছিন্ন করা। বন্ধন হয় দু রকমের। প্রথমতঃ বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া দাসত্ব-বন্ধন এবং দ্বিতীয়তঃ নিজের মনগড়া প্রয়োজনের জালে আবদ্ধ হওয়া। এই লক্ষ্যাভিমুখী অভিযানে চলার পথে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তাই হচ্ছে সত্যকার অধ্যয়ন।

বিদেশী শাসকবর্গ রচিত শিক্ষা-ব্যবস্থা শুধুই জাতির স্বার্থহানি করবে এ কথা বুঝতে পেরে কংগ্রেস অন্যান্য কার্যক্রমের সঙ্গে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দেই যাবতীয় শিক্ষায়তন বয়কট করার কর্মসূচী গ্রহণ করে। তবে মনে হয় সে যুগ পার হয়ে গেছে। সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অনুরূপ পদ্ধতিতে পরিচালিত বিদ্যায়তনে প্রবেশ লাভ করার আকাঙ্ক্ষা ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার চেয়ে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। বর্তমান শিক্ষার এই মোহিনী রূপ পরিদৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমার বিশ্বাস যে সত্যকার শিক্ষার ব্যাখ্যা পূর্বোক্ত ধরনে।

যে ছাত্র আমার শিক্ষাদর্শের প্রতি নকল টানে নিজের পড়াশুনা ছেড়ে দেবে, পরে সে অনুতাপ করতে বাধ্য হবে। আমি তাই আরও নিরাপদ ব্যবস্থা অবলম্বন করার সুপারিশ করি। যে প্রতিষ্ঠানে সে শিক্ষা গ্রহণ করছে সেখানে থাকতে থাকতেই সে মৎকথিত সেবার আদর্শ গ্রহণ করুক এবং অর্থোপার্জনের বাসনা থেকে নিবৃত্ত হয়ে ঐ আদর্শের পরিপূর্তির জন্য নিজ জ্ঞান নিয়োগ

করুক। তাছাড়া অবসরকালে এই আদর্শ অনুযায়ী কাজ করে সে বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির অপূর্ণতা দূর করতে পারবে। তাই যতটা পারে সে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবে।

হরিজন, ১০-৩-১৯৪৬

১০
ইংরাজী শিক্ষা

লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে ইংরাজীনবীশ করার চেষ্টার অর্থ তাদের দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ করা। মেকলে যে শিক্ষা-পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেন, তা আমাদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। আমি অবশ্য এ কথা বলতে চাইনা যে কোন অভিসন্ধি-প্রণোদিত হয়ে তিনি এরূপ করেছিলেন; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁর কার্যের পরিণাম এই রকম হয়। আমরা যে হোমরুল প্রাপ্তির কথাও এক বিদেশী ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত করছি—একি নিতান্ত পরিতাপের বিষয় নয়?

এ ছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, ইউরোপীয়রা যে শিক্ষা-প্রথা বাতিল করে দিয়েছে আমরা তাকেই অভিনব আখ্যা দিয়ে এদেশে প্রবর্তন করছি। ও দেশের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন। আর আমরা অজ্ঞের ন্যায় তাঁদের দ্বারা বাতিল করা প্রথা আঁকড়ে আছি। প্রতিটি অঞ্চলের আত্মোন্নতির জন্য তাঁরা সচেষ্ট। ওয়েল্‌স্ ইংলণ্ডের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ, তবু ওয়েল্‌স্-বাসীদের ভিতর ওয়েলিস্ ভাষা পুনঃ প্রবর্তনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। ওয়েল্‌সের শিশুরা যাতে ওয়েলিস্ ভাষায় কথাবার্তা বলে তার জন্য ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ মহাশয় বিরাট আন্দোলন করছেন। আর আমাদের দশা কি? পরস্পরকে আমরা ভুল ইংরাজীতে চিঠিপত্র লিখি এবং আমাদের দেশের

এম. এ. পাশ ব্যক্তিরাও এ দোষ মুক্ত নন। আমাদের দেশের মনীষীরা স্বীয় মনীষার অভিব্যক্তি ইংরাজীর মাধ্যমে করেন। আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের কার্যকলাপ চলে ইংরাজীতে। ইংরাজী এদেশের সেরা সংবাদপত্রসমূহের রচনার বাহন। দীর্ঘদিন যাবত যদি এই ব্যবস্থা চলে তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, উত্তরকাল এর জন্য আমাদের ধিক্কার ও অভিশাপ দেবে।

আমরা যেন বিস্মৃত না হই যে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা জাতিকে পর-শাসনপাশে আবদ্ধ করেছি। ছলনা চাতুরী এবং অত্যাচারের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়রা এদেশবাসীকে প্রতারণা করতে ও তাদের ভিতর আতঙ্কের বন্যা বওয়াতে পশ্চাৎপদ হন নি। আজ যদি আমরা দেশবাসীর জন্য কিছু করে থাকি, তবে তাঁদের কাছে আমাদের যে ঋণ তার একাংশ পরিশোধ করছি ছাড়া আর কিছু নয়।

এটা কি একটা পরিতাপের বিষয় নয় যে ন্যায় বিচারের জন্য ন্যায়াধীশের কাছে উপস্থিত হলে আমাকে নিজ দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত করার জন্য ইংরাজীর শরণ নিতে হবে? এটা কি পরিতাপের বিষয় নয় যে ব্যারিস্টার হলে আমার আর নিজ মাতৃভাষায় কথা বলার উপায় থাকবে না এবং তৃতীয় একজন এসে আমার-ই মাতৃভাষাকে আমার জন্য ইংরাজীতে অনুবাদ করে দেবেন? এসব কি চূড়ান্ত বাতুলতার লক্ষণ নয়? এ কি দাসত্বের নিদর্শন নয়? এর জন্য ইংরেজদের দোষ দেব, না নিজেদের অপরাধী সাব্যস্ত করব? আমরা এইসব ইংরাজীনবীশ ভারতীয়দের দলই এদেশকে পরাধীন করে রেখেছি। এ পাপের দায়ভাগী ইংরেজ নয়, আমরা।

আমি প্রথমেই আপনাকে জানিয়েছি যে আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি হ্যাঁ এবং না বলব। হ্যাঁ কেন বলেছি, তা এ যাবৎ ব্যাখ্যা করেছি। এবার না বলার কারণ বলব।

সভ্যতা-ব্যাধি দ্বারা আমরা এমন তীব্রভাবে আক্রান্ত যে

আমাদের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা অসম্ভব। ইতোমধ্যে যাঁরা ইংরাজী শিখেছেন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাঁরা এর সদুপযোগ করবেন। ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশা করার কালে এবং আমাদের যে সব দেশবাসীর সঙ্গে ইংরাজী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব নয়, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সময় এবং স্বয়ং ইংরেজদের নিজ সভ্যতার প্রতি কতটা বিতৃষ্ণা এসেছে জানার জন্য আমরা ইংরাজী শিখতে পারি বা এর প্রয়োগ করতে পারি। ইংরাজী শিক্ষিতরা নিজ সন্তান-সন্ততিদের মাতৃভাষার মাধ্যমে নীতি শিক্ষা দেবেন এবং তাদের অন্য কোন একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দেবেন। তবে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা ইংরাজী শিক্ষা করতে পারে। কিন্তু তাদের অন্তিম লক্ষ্য হবে এর প্রয়োজনীয়তার সমাপ্তিকরণ। এর দ্বারা অর্থোপার্জনের কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হতে হবে। এইরূপ সীমিত মাত্রায় ইংরাজী শিক্ষা করার পরও আমরা এর মাধ্যমে কি শিখব আর শিখব না, তা স্থির করতে হবে।

হিন্দ্ স্বরাজ (১৯০৮), অষ্টাদশ অধ্যায়

১১

কেরাণী সৃষ্টির শিক্ষা

মাদ্রাজ তথা সমগ্র ভারতের ছাত্রগণ! তোমরা কি এমন এক শিক্ষা গ্রহণ করছ যা তোমাদের পূর্বোক্ত মহান্ আদর্শ সাধনে সহায়তা দেবে এবং তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণরাজির বিকাশ ঘটাবে, না তোমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শুধু সরকারী কর্মচারী ও সওদাগরী অফিসের কেরাণী সৃষ্টি করার যন্ত্রস্বরূপ? সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকুরী সংগ্রহ করাই কি শুধু তোমাদের শিক্ষার লক্ষ্য? এই যদি তোমাদের শিক্ষার আদর্শ হয় এবং একে যদি তোমরা নিজ জীবনের আদর্শরূপে বরণ করে থাক, তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে

কবির (রবীন্দ্রনাথ : সম্পাদক) মনশ্চক্ষুর সম্মুখে যে কল্পনা ছিল, তা কোন দিনই বাস্তবে পরিণত হবে না। তোমরা হয়ত শুনেছ বা আমার রচনাবলী দ্বারা অবগত হয়েছ যে আমি আধুনিক সভ্যতার প্রবল বিরোধী। ইউরোপে যা চলেছে, আমি তার প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তোমরা যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হও যে বর্তমান সভ্যতার পদভারে ইউরোপ ত্রাহি রব ছাড়ছে, তাহলে সেই সভ্যতাকে আমাদের মাতৃভূমিতে আমদানী করার আগে তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বজদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। তবে আমাকে কেউ কেউ একথাও বলেন যে আমাদের শাসকরা এই সভ্যতা এ দেশে আমদানী করার ফলে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। এ সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ কোরো না। এক মুহূর্তের জন্যও আমি একথা মনে করি না যে নিজেরা দীক্ষিত হতে না চাইলে আমাদের শাসকরা সে সভ্যতাকে আমাদের দেশে প্রবর্তন করতে পারেন এবং যদি ধরে নেওয়া যায় যে আমাদের শাসকরা এই সভ্যতাকে আমার সম্মুখে পেশ করলেন, তাহলেও আমি বলব যে আমাদের ভিতর এমন শক্তি আছে, যার বলে শাসকদের বাতিল না করেও আমরা সে সভ্যতাকে বাতিল করতে পারি।

স্পিচেস এণ্ড রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী, ৩১২, ৩১৩ ; ২৭-৪-১৫

১২

ইংরাজী শিক্ষা প্রসঙ্গে

আমার সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, যে ভাবে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তাতে ইংরাজী শিক্ষিত ভারতবাসীরা পুরুষত্বহীন হয়ে পড়েছেন। এই শিক্ষা-পদ্ধতি ভারতীয় ছাত্রদের স্নায়বিক কর্মোদ্যমকে ভীষণভাবে ভারগ্রস্ত করেছে এবং আমাদের নকলনবীশে পরিণত করেছে। মাতৃভাষাকে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে

নির্বাসন দেওয়া ব্রিটিশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অধ্যায়। প্রধানতঃ ইংরাজীতে চিন্তা করা ও ইংরাজীর মাধ্যমে নিজ ভাব প্রকাশ করা-রূপী অসুবিধার ভিতর দিয়ে যদি শুরু করতে না হত, তবে রামমোহন রায় আরও উচ্চ-কোটির সমাজ-সংস্কারক হতেন এবং লোকমান্য তিলকের মনীষা আরও গভীর হত। জনসাধারণের উপর এই দুই মনীষীর প্রভাব অবশ্য ব্যাপক ছিল; কিন্তু তাঁরা যদি আর একটু কম অস্বাভাবিক পরিবেশের ভিতর মানুষ হতেন, তবে এ প্রভাব আরও কত সুদূরপ্রসারী হত। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এঁরা উভয়েই সুসমৃদ্ধ ইংরাজী সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে বহু রত্ন আহরণ করে নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করেছিলেন। কিন্তু এ সব তো তাঁদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই তাঁদের কাছে সহজলভ্য হওয়া উচিত ছিল। কোন দেশ দলে দলে অনুকরণকারী সৃষ্টি করে এক মহান্ জাতিতে পরিণত হতে পারে না। ইংরাজীতে যদি বাইবেলের প্রামাণ্য অনুবাদ না থাকত, তাহলে ইংরাজ জাতির কি অবস্থা হত কল্পনা করুন। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে চৈতন্য, কবীর, নানক, গুরুগোবিন্দ সিংহ, শিবাজী এবং প্রতাপ ইত্যাদি রামমোহন বা তিলক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আমি জানি যে এ জাতীয় তুলনা অপ্রীতিকর ব্যাপার। নিজ নিজ ক্ষেত্রে সকলেই মহান্। কিন্তু এঁদের প্রভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পূর্বোক্ত পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষদের তুলনায় জনসাধারণের ভিতর রামমোহন বা তিলকের প্রভাব অপেক্ষাকৃত ক্ষণস্থায়ী ও অগভীর। অবশ্য রামমোহন বা তিলককে যে বাধা-বিপত্তি জয় করতে হয়েছিল, তার কথা চিন্তা করলে বলতে হবে যে তাঁরা অসীম প্রতিভার আকর ছিলেন। কিন্তু যে পদ্ধতির ছত্র-ছায়ায় তাঁরা শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তা যদি ত্রুটিমুক্ত হত তাহলে এই দুই মহাপ্রাণ কর্তৃক উপলব্ধ পরিণাম ব্যাপকতর হত। আমি একথা স্বীকার করতে প্রস্তুত নই যে রাজা এবং লোকমান্য

চিন্তার ক্ষেত্রে যে অবদান দিয়েছিলেন, ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি না থাকলে তা দিতে সক্ষম হতেন না। ভারতবর্ষ যে সব কুসংস্কার দ্বারা আক্রান্ত, তার শিরোমণি হচ্ছে এই কথা বিশ্বাস করা যে স্বাধীনতার ভাবধারায় উদ্দীপ্ত হবার জন্য এবং চিন্তার যথার্থতা গড়ে তোলার জন্য ইংরাজী ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে বিগত অর্ধ শতাব্দী কাল যাবত দেশে একটিমাত্র শিক্ষা-পদ্ধতি চলেছে এবং একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে দেশবাসীর উপর একটিমাত্র ভাবপ্রকাশের মাধ্যম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং প্রচলিত স্কুল-কলেজের শিক্ষা ছাড়া আমরা যে কি হতাম, তা প্রমাণ করার মত মাল-মশলা আমাদের কাছে নেই। তবে এ কথা অবশ্য সর্বজনবিদিত যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের তুলনায় আজকের ভারত দরিদ্রতর এবং আত্মরক্ষায় অধিকতর অপটু। ভারতের সন্তান-সন্ততিদের জীবনীশক্তি আজ পূর্বাপেক্ষা ক্ষীণ। আমি একথা শুনতে চাই না যে শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে এ সব ঘটেছে। শিক্ষা-পদ্ধতিই এর সর্বাপেক্ষা বিকৃত অংশ।

এই শিক্ষা-পদ্ধতির পরিকল্পনা এবং জন্ম সবই ভ্রমাত্মক। কারণ ইংরেজ শাসক-সম্প্রদায় মনে প্রাণে একথা বিশ্বাস করতেন যে, এ দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা একেবারে অপদার্থ। ইংরাজী শিক্ষা-পদ্ধতিকে পাপের মধ্যে লালন পালন করা হয়েছে। কারণ সদা-সর্বদা এর গতিপ্রকৃতি ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের দেহ মন ও আত্মাকে খর্ব করনাভিমুখে সঞ্চালিত হয়েছে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-৪-২১

১৩

ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে

এই ত্রুটির কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষা পাওয়া এর জন্য মূলতঃ দায়ী। প্রবেশিকা

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে প্রায় বার বৎসর সময় লাগে। কিন্তু এতগুলি বৎসরে ছাত্ররা যে সাধারণ জ্ঞান পায় তার পরিমাণ একেবারেই যৎসামান্য। তাছাড়া আমাদের ভবিষ্যতের কাজের সঙ্গে আমরা এ জ্ঞানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করি না। অর্থাৎ এ জ্ঞানকে আমরা বাস্তব জীবনে কাজে লাগাই না। এ না করে আমাদের উদ্যমের অধিকাংশই ব্যয়িত হয় ইংরাজী ভাষা ভাল করে শেখার জন্য। অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের অভিমত এই যে প্রবেশিকা মান পর্যন্ত ছাত্রদের যা পড়ান হয় তা যদি তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়ান হত তাহলে অন্ততঃ পাঁচ বছর সময়ের সাশ্রয় হত। এই হারে হিসাব করলে বৎসরে যে দশ হাজার ছেলে মেয়ে প্রবেশিক্ষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাদের জন্য পঞ্চাশ হাজার বছরের লোকসান হয়ে থাকে! এ এক গুরুতর পরিস্থিতি এবং সকলের পক্ষেই এ দুশ্চিন্তার কারণ হওয়া উচিত। শুধু এই নয়, এর ফলে আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে দরিদ্র করে ফেলি।...বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের সঙ্গে আমাদের পরিবারের একটা বিভেদ সৃষ্টি করছে। আমাদের পিতামাতা পরিবার পরিজন এবং নারী সমাজ ইত্যাদি যাদের সঙ্গে আমাদের দিনের অধিকাংশ সময় কাটাতে হয় তাদের কাছে আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা গুপ্তধনের মত। এ তাদের কোনই কাজে লাগে না।...

আমাদের কলেজী শিক্ষা সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। কলেজে যে কয় বছর কাটাতে হয় সে সময় স্কুল-জীবনে লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিকে আরও মজবুত করার কথা। কিন্তু হয় বিপরীত। কারণ এই সময় আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে ভুলতে শুরু করি। অনেকের মনে নিজ মাতৃভাষার প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব জাগ্রত হয়। আমাদের কাজ কারবার ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে সহস্র ভুলে কণ্টকিত ইংরাজীর মাধ্যমে করা আরম্ভ করি। আমাদের মাতৃভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক শব্দের যথার্থ পরিভাষা আমরা এখনও রচনা করি নি এবং ইংরাজী পরিভাষাও আমরা ভাল করে বুঝতে পারি নি। কলেজের

শিক্ষা শেষ হতে হতে আমাদের বুদ্ধির তেজ ও তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়ে যায় এবং আমাদের স্বাস্থ্য হয়ে পড়ে দুর্বল।...

আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অতীব নৈরাশ্যজনক চিত্র অঙ্কন করলেও এই নিরাশার মধ্যেই আশার বীজ বিদ্যমান। আমি এ কথা বলছি না যে ভারতীয়েরা ইংরাজী শিখবেন না। রাশিয়া যা করেছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা জাপান ইত্যাদি যা করতে চলেছে আমাদেরও তা-ই করতে হবে। জাপানে বাছাই করা কিছু লোক ইংরাজী ভাষার উচ্চ জ্ঞান অর্জন করে সে ভাষার ভাল ভাল জিনিস সহজ করে নিজের ভাষায় অনুবাদ করেন। এইভাবে তাঁরা দেশের অগনিত জনসাধারণের ইংরাজী শেখার নিরর্থক পরিশ্রম বাঁচিয়ে দেন।....

"সমালোচক", অক্টোবর, ১৯১৬

১৪

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার প্রত্যুত্তরে

কবি সম্ভবত জানেন না যে আজকাল ইংরাজী অধ্যয়ন করা হয় এর আর্থিক এবং তথাকথিত রাজনৈতিক মূল্যের কারণ। আমাদের ছেলেরা মনে করে—অবশ্য বর্তমান পরিস্থিতিতে এ রকম মনে করা যুক্তিযুক্তও বটে—যে ইংরাজী না জানলে তারা সরকারী চাকুরী পাবে না। মেয়েদের ইংরাজী শিখতে হয় বিবাহের ছাড়পত্র পাবার জন্য। একাধিক ক্ষেত্রে আমি শুনেছি যে ইংরেজদের সঙ্গে ইংরাজীতে কথাবার্তা বলতে পারবেন বলে মহিলারা ইংরাজী শিখতে চান। এমন অনেক স্বামীর কথা শুনেছি যাঁদের স্ত্রী তাঁদের ও তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ইংরাজীতে কথা বলতে পারেন না বলে তাঁরা দুঃখিত। এমন অনেক পরিবারের কথা জানি যেখানে ইংরাজীকে মাতৃভাষায় পরিণত করা হচ্ছে। বহু যুবক মনে করেন যে ইংরাজীর জ্ঞান না পেলে ভারতের স্বাধীনতা পাওয়া একরকম

অসম্ভব। এই দুষ্টক্ষত এমন গভীরভাবে সমাজদেহে অনুপ্রবেশ করেছে যে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার অর্থ কেবল ইংরাজী ভাষার জ্ঞান। আমার কাছে এ সব আমাদের দাসত্ব ও অধোগতির নিদর্শন। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাকে যেভাবে পদদলিত করা হয়েছে এবং যেভাবে এগুলিকে উপবাসী রাখা হয়েছে—এ আমার কাছে অসহনীয়। পিতামাতা সন্তানকে এবং স্বামী স্ত্রীকে, নিজ নিজ মাতৃভাষায় নয়, ইংরাজীতে পত্র লিখছে—এ অবস্থা আমার পক্ষে বরদাস্ত করা অসম্ভব। আমার বিশ্বাস কবিবরের মত আমিও স্বাধীনতার বায়ু প্রবাহিত রাখার নীতিতে আস্থাশীল।

নিজের ঘরের চতুর্দিকে দেওয়াল তুলে দিয়ে আমি জানালাগুলি বন্ধ করে দিতে চাই না। সমস্ত দেশের সংস্কৃতি যতদূর সম্ভব বিনা বাধায় আমার গৃহের চারিদিকে সঞ্চালিত হক—এ আমি চাই। তবে কেউ যে নিজের পায়ের নীচের মাটি থেকে আমাকে উৎখাত করবে, তাতে আমি রাজী নই। বৃথা গর্ব করার জন্য বা অনিশ্চিত সামাজিক সুবিধা পাবার জন্য আমার ভগ্নীদের ইংরাজী শেখার জন্য অহেতুক চাপ দিতে আমি গররাজী। সাহিত্যিক রুচিসম্পন্ন আমাদের যুবক-যুবতীরা যত খুশী ইংরাজী বা দুনিয়ার অন্যান্য ভাষা শিখতে পারেন এবং তারপর একজন বসু, রায় বা ঠাকুরের মত তাঁদের জ্ঞানের দ্বারা ভারতকে সমৃদ্ধিশালী করতে পারেন। তবে একজন ভারতবাসীকেও আমি তার মাতৃভাষাকে ভুলতে, অবহেলা করতে বা তার জন্য লজ্জা অনুভব করতে দেব না, আর কেউ যে তার মাতৃভাষায় শ্রেষ্ঠ চিন্তা-সমূহ প্রকাশ করতে অসমর্থ—একথাও আমি তাদের অনুভব করতে দেব না। কারাগারের ধর্ম আমার লক্ষ্য নয়। ঈশ্বরের ক্ষুদ্রতম সৃষ্টিরও স্থান এখানে আছে। তবে এ হচ্ছে রূঢ়তা এবং জাতিগত ও বর্ণগত গর্বের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য বর্ম-স্বরূপ।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-১-২১

১৫
ইংরাজী থেকে অনুবাদ করাই যথেষ্ট

ইংরাজী শিক্ষার জন্য বর্তমানাপেক্ষা অল্প সময় ব্যয়ের জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ করার সময় ইংরাজী অধ্যয়ন দ্বারা তাঁরা যে আনন্দ পেতে পারেন, তা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করার অভিসন্ধি আমার মনে থাকে না। আমার অভিমত এই যে এতদপেক্ষা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে স্বল্পতর ব্যয়ে ও পরিশ্রমে তাঁরা সমপরিমাণ আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। পৃথিবী বহু অমূল্য সাহিত্য-রত্নের আকর ; কিন্তু এর সবগুলিই ইংরাজী নয়। অন্যান্য ভাষাও সঙ্গতভাবে এবম্বিধ রত্নের গর্ব করতে পারে। দেশের সর্ব-সাধারণের জন্য সবগুলি সহজলভ্য করতে হবে এবং আমাদের দেশের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা মাতৃভাষায় এ সবের অনুবাদ করলে এ আশা সফল হবে।

স্পিচেস এণ্ড রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী, পৃঃ ৪২৫-২৮ : ২০-২-১৯১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ শিক্ষার আদর্শ

১

শিক্ষার লক্ষ্য

আমাদের দেশে আজ স্বরাজের দাবী উঠেছে। কেবল দাবী করলেই যদি স্বরাজ পাওয়া যেত তবে অনেক আগেই আমরা স্বাধীন হয়ে যেতাম। সুতরাং স্বরাজের দাবী করা প্রয়োজন হলেও কেবল তাতে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। পৃথিবীতে যেখানেই লোকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাদের সেই সাফল্যের একটা পূর্ব প্রস্তুতির কাল ছিল। তারা প্রথমে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে চলতে ও আচরণ করতে শিখেছে। আমরা দেখতে পাব যে সেই সব দেশে জনসাধারণকে শিক্ষিত করার কাজ স্বয়ং জনসাধারণ করেছে। আমাদের দেশে কিন্তু আমরা বিপরীত দিশায় চলছি বলে আমার আশঙ্কা হয়। আমাদের দেশাবাসী স্বরাজের জন্য দাবী করলেও আমাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার বিশেষ কোন নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। স্বাধীনভাবে চলার চেষ্টার বিশেষ কোন নিদর্শন দেখা যায় না। **আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ষোল আনা বিদেশী।** বর্তমান প্রবন্ধে আমি আমাদের উপর এই বিদেশী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া ও তজ্জনিত সমস্যাবলী সম্বন্ধে প্রধানতঃ আলোচনা করতে চাই। জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ব্যতিরেকে আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা নিরর্থক প্রতিপাদিত হবে। আজ অথবা পরে যখনই আমরা স্বরাজ পাই না কেন, খেয়াল রাখতে হবে যে জাতীয় শিক্ষা ব্যতিরেকে সে স্বরাজকে বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যাবে না। শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বছর ছাড়া আর বাদবাকী শিক্ষা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে দেওয়া হয়। এ ছাড়া শিক্ষার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় প্রথম পাঁচ বছর শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় মূখ্যতঃ অতি সাধারণ স্তরের

শিক্ষকদের উপর। এর পর ইংরাজী আরম্ভ হয়। এই পর্যায়ে শিশুদের যেন এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জগতে যেতে হয়। এই শিক্ষার সঙ্গে বাড়ীর জীবনের কোন সম্বন্ধই থাকে না। এ যাবত যেসব শিশুরা খুশী মনে মেঝেতে বসে লেখাপড়া করেছে তাদের এরপর বেঞ্চে বসতে হয়। অথচ আজও অধিকাংশ ঘরে মেঝেতে বসারই রেওয়াজ। হিন্দু ছেলে হলে এ যাবত সে ধুতি কুর্তা ও আংরাখা পরত আর মুসলমান হলে পরত ধুতির বদলে পাজামা। এবারে সে কোট পাতলুন পরা ধরে। এ যাবত তার বাড়ীর তৈরী কলমে চলত কিন্তু এখন থেকে স্টিলের নিবওয়ালা কলম চাই। এই ভাবে তার বাহ্য জীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয় এবং তার বাড়ীর জীবনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের জীবনের দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়। ধীর কিন্তু নিশ্চিত গতিতে এই পরিবর্তন তার আভ্যন্তরীণ জীবনেও অনুপ্রবেশ করা শুরু করে। ছেলেদের বাড়ী ও আত্মীয়স্বজনের উপর ছেলেদের বাহ্য ও অন্তর্জীবনের এই পরিবর্তনের কি রকম প্রতিক্রিয়া ঘটে? ছেলে কি ধরণের শিক্ষা পাচ্ছে সে সম্বন্ধে তার মা বাবার মনে কোন ধারণা নেই এবং সেই শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর তাদের বিশ্বাসও অকিঞ্চিৎকর।

মা বাবা শুধু এইটুকু জানেন যে এই শিক্ষা তাঁর ছেলেকে অর্থোপার্জনে সাহায্য করবে। আর এতেই তাঁরা সন্তুষ্ট। এই অবস্থা বেশী দিন চললে আমরা সবাই বিদেশী হয়ে যাব। আর এর চেয়েও খারাপ কথা হল এই যে, যে স্বরাজের জন্য আমরা সংগ্রাম করছি শেষ অবধি তা পাবার পর দেখব যে তা বিদেশী বস্তু। এর পরিণামে বর্তমানে আমরা যে বোঝার চাপে নিষ্পেষিত তা হয়ত স্বরাজের পর রয়েই যাবে। এই বিপদের হাত এড়াবার একটি মাত্র পন্থা বিদ্যমান। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন ও আমূল সংস্কার সাধন করতে হবে। জাতীয় শিক্ষার চারিত্র্যধর্ম হবে নিম্নরূপ:

১. মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে।

২. শিশুর বিদ্যালয় ও গৃহের পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে।

৩. দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের প্রয়োজন পূর্তির ব্যবস্থা এতে থাকবে।

৪. প্রথম বর্ষ থেকেই প্রাথমিক পর্যায়ে যোগ্য ও সচ্চরিত্র শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৫. শিক্ষা হবে অবৈতনিক।

৬. শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ জনসাধারণের হাতে থাকবে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে। এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়টির জন্য যে প্রমাণ চাই এ অতি পরিতাপের বিষয়। ইংরাজীর মোহে আমাদের চোখ যদি ধাঁধিঁয়ে না যেত তাহলে এই সুস্পষ্ট সত্যকে প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন ঘটত না।...

শিশুর বিদ্যালয় ও গৃহের পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে। এর কারণও অতীব স্পষ্ট। বর্তমানে এতদুভয়ের মধ্যে এ জাতীয় কোন সামঞ্জস্য নেই। জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমাদের দেখতে হবে যে এ জাতীয় সামঞ্জস্য যেন প্রতিষ্ঠিত হয় ও বজায় থাকে।

এরপর আমরা জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার তৃতীয় চারিত্র্যধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করব। এটি হল: **দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের প্রয়োজন পূর্তির ব্যবস্থা এতে থাকবে।** আমাদের অধিকাংশ স্বদেশবাসী কৃষিজীবি। সুতরাং গোড়া থেকেই যদি আমাদের ছেলেদের কৃষি এবং তাঁত সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হত এবং শুরু থেকেই তারা যদি এই দুই সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হত ও তার কারণ এরা নিজ নিজ পেশা সম্বন্ধে যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত হত, আজ তাহলে আমাদের দেশের কৃষক সমাজ সুখী ও সমৃদ্ধ হত। তাহলে আমাদের গৃহপালিত পশুগুলি বর্তমানের মত দুর্বল ও রোগগ্রস্ত হত না। বর্তমানে দারিদ্র্যের কারণ কৃষকদের যে ভাবে ঋণভারে জর্জরিত হতে হচ্ছে তাও তাহলে ঘটত না। আমাদের দেশের উৎপন্ন কাঁচা মাল তাহলে বিদেশে গিয়ে আমাদের

সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য পাকা মাল হয়ে এদেশে ফিরে আসত না। আজকের অবস্থায় আমরা লজ্জা বোধ করি। সূতি কাপড় কেনার জন্য ইংলণ্ডকে বছরে ৮৫ কোটি টাকা দেবার প্রয়োজন নেই। প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের প্রভু করার পরিবর্তে ক্রীতদাসে পর্যবসিত করেছে।

প্রথম বর্গ থেকেই প্রাথমিক পর্যায়ে যোগ্য ও সচ্চরিত্র শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে শিশুই মানুষের পিতা। আমাদের দেশেও অনুরূপ ভাবে বলা হয়ে থাকে যে ভবিষ্যতে শিশু যেমন হবে দোলনায় শোওয়া অবস্থাতেই তার নিদর্শন পাওয়া যায়। যে বয়সে শিশুর মনে সব বিষয়ের ছাপ সব চেয়ে গভীর ভাবে পড়ে থাকে সেই বয়সটায় তাকে অযোগ্য শিক্ষকের হাতে ছেড়ে দিলে সে যে বড় হলে সৎ ও দৃঢ় চরিত্রের হবে—এমন আশা পোষণ করার আর অধিকার থাকে না। এ হল নিমের বীজ পুঁতে আম খাবার সাধের মত। যতই ব্যয় হক না কেন শিশুদের জন্য সেরা শিক্ষক সংগ্রহ করা উচিত। পুরাকালে জ্ঞানী ও পণ্ডিত মুনি ঋষিদের কাছে শিশুরা শিক্ষা পেত।

জাতীয় শিক্ষার পঞ্চম চারিত্র্যধর্ম হল এই যে **শিক্ষা হবে অবৈতনিক**। শিক্ষাকে যেন **অর্থনির্ভর** হতে না হয়। সূর্য যেমন সকলকে সমান ভাবে কিরণ দেয় এবং বৃষ্টিধারা যেমন সবার জন্যই ঝরে পড়ে, শিক্ষাও তেমনি সকলের কাছে সহজলভ্য হবে।

সর্ব শেষ প্রশ্ন হল ঃ **শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা ও তার রূপায়ণের কর্তৃত্ব জনসাধারণের হাতে থাকবে।** আর এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করার ভিতরই শিক্ষা নিহিত। এ হলে শিশুদের যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে জনসাধারণের তার উপর আস্থা থাকবে ও তারা এর প্রতি নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবে। যখন আমরা এই পর্যায়ে উন্নীত হব এবং দেশের জনসাধারণের জীবনে শিক্ষা যখন গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করবে তখন বিনা আয়াসে স্বরাজ অর্জন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব

হবে। সেইজন্য আমাদের কর্তব্য হল এই জাতীয় শিক্ষার সূত্রপাত করা। সরকারের কাছে এ জাতীয় শিক্ষার দাবী করার অধিকারও আমাদের আছে। তবে আমরা নিজেরা কিছুটা কাজ শুরু করার পরই সরকারের কাছে দাবী করা শোভন হবে।

মারাঠী মাসিক "আত্মোদ্ধার" থেকে

২

তপস্বীর প্রয়োজনীয়তা

....আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে **সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করা এই সব** (শিক্ষা সম্বন্ধীয়) **সমস্যার সমাধানের পথ নয়।** শাসকেরা কখনও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পরিবর্তন সংসাধন করতে পারেন না। জনসাধারণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কর্তব্য হল এই জাতীয় পথিকৃৎ-এর কর্তব্য পালন করা।...আমরা যদি ভেবে থাকি যে সরকারই কেবল এ সমস্ত কাজ করবে তাহলে দীর্ঘ দিনেও আমাদের লক্ষ্য সাধিত হবে না। ইংলণ্ডের মত আমাদেরও এ দেশে সরকারকে দিয়ে নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করানর পূর্বে নিজেদের এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কিছুটা ফল দেখতে হবে।

এপথে একটি বিরাট বাধা আছে আর তা হল ডিগ্রীর মোহ। আমাদের জীবিকার জন্য আমরা পরীক্ষা পাশ করার উপর নির্ভরশীল। এর পরিণামে জনসাধারণের সবিশেষ ক্ষতি হয়। আমরা ভুলে যাই যে ডিগ্রী কেবল তাঁদেরই দরকার যাঁরা সরকারী চাকুরী করতে চান। তবে মুষ্টিমেয় যে-জনকতক সরকারী চাকুরী চাইবেন তাঁদের দ্বারা জনসাধারণের জীবন-সৌধ গড়ে উঠবে না। আমরা দেখেছি যে সরকারী চাকুরী না করেও অনেকে যথেষ্ট অর্থোপার্জন করছেন। বুদ্ধি ও কূট-কৌশলের দ্বারা একরকম নিরক্ষর ব্যক্তিও যখন লক্ষপতি হতে পারেন তখন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে কেন এটা করতে পারবেন না তার কোন সঙ্গত কারণ নেই। শিক্ষিতরা মনের

ভয়কে বিসর্জন দিলে একথা প্রমাণ করতে পারবেন যে তাঁরা অন্ততঃ অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নন।

ডিগ্রীর এই মোহ ঝেড়ে ফেলতে পারলে আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী যে কোন সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করে চালান যেতে পারে। কোন সরকারই জনসাধারণের যতটা শিক্ষা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতে পারে না। আমেরিকাতে শিক্ষা প্রধানতঃ বেসরকারী উদ্যমের ব্যাপার। ইংলণ্ডেও বেসরকারী ভাবে এ জাতীয় অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালান হয়ে থাকে। এই সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নিজেদের প্রমাণ-পত্র দিয়ে থাকেন।

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সঠিক ভিত্তি-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন ব্যাপার এবং এ বহু আয়াসসাধ্যও বটে। এর পিছনে আমাদের সব কিছু—শরীর মন আত্মা এবং সবার শেষে উল্লেখ করলেও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বস্তু, অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে।

...সে দেশে (আমেরিকায়) কতিপয় বৃহত্তম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান জনসাধারণ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত হয়। ধনী আমেরিকাবাসীরা শিক্ষাপ্রসারের জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেছেন। সময় সময় এই সব ট্রাস্টের তরফ থেকে একাধিক বেসরকারী স্কুল কলেজ চালান হয়ে থাকে। এই সব বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য ধনীরা যেমন অর্থ দিয়েছেন স্বদেশপ্রেমী পণ্ডিতেরা তেমনি দিয়েছেন তাঁদের সেবা। তাঁরা এইসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকেন এবং এর শিক্ষাগত মান বজায় রাখার জন্য পরামর্শ দেন। যে প্রতিষ্ঠানের যতটা সাহায্য প্রয়োজন তাকে তাঁরা ততটুকু সাহায্য দেন। কোন বিশেষ ট্রাস্টের নিয়ম কানুন মেনে চলতে রাজী থাকলে যে কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সহজেই সেই ট্রাস্টের সাহায্যপ্রার্থী হতে পারে। এই রকম একটি ট্রাস্টের উদ্যোগে পরিচালিত এক আন্দোলনের ফলে কৃষকদের কাছে কৃষিগবেষণার নূতন নূতন ফলশ্রুতি কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া

হয়।···এদেশে অর্থ এবং পাণ্ডিত্য দুই-ই আছে এবং দেশ থেকে ধর্মানুরাগ এখনও অদৃশ্য হয়ে যায় নি। দেশের শিশুরা শিক্ষা পাবার আশায় অপেক্ষা করছে। যথোচিত গুরুত্বসহকারে আমরা যদি একাজ শুরু করি তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে আমরা সরকারের কাছে এ কথা সপ্রমাণ করতে পারব যে আমাদের প্রচেষ্টা সঠিক পথেই চলেছে। আমার বিশ্বাস যে তারপর সরকার এই কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করতে আর গড়িমসি করবে না। হাজার হাজার দরখাস্তের চেয়ে আমাদের কাজ বেশী জোরে কথা বলবে এবং অধিকতর বর্ণবৈভবে সমুজ্জ্বল হবে।

···অবশ্য একাজ খুব সহজ নয়। সরকারের মত ধনীব্যক্তিরাও জাগিয়ে না দিলে জানেন না। আর তাঁদের জাগানর মাত্র একটিই পথ আছে। সেটি হল তপস্যা বা কৃচ্ছ্রসাধনের মার্গ। কৃচ্ছ্রসাধন হল ধর্মের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ সোপান।···গুজরাত কেলাবনী মণ্ডলের (একটি এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান—সম্পাদক) সম্পাদক ও সদস্যেরা যখন পরোপকারের আদর্শে সম্যক্‌ভাবে অনুপ্রাণিত হবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শ্রেণীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হবেন তখন তাঁদের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে টাকা আসবে। অর্থশালী লোকেরা সর্বদাই সংশয়ী চিত্তের হয়ে থাকেন। এ সংশয়ী মনোভাবের কারণও অবশ্য আছে। তাই যদি আমরা লক্ষ্মীদেবীকে সন্তুষ্ট করতে চাই তাহলে প্রথমে আমাদের নিজ যোগ্যতা সপ্রমাণ করতে হবে।

এ কাজের জন্য প্রভূত অর্থ লাগলেও এর জন্য অহেতুক দুশ্চিন্তা করার কারণ নেই। জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি স্বয়ং অশিক্ষিত হলে শ্রমজীবির পেশা গ্রহণ করবেন এবং সেই অবকাশে নিজেকে শিক্ষিত করে নেবেন। যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করার পর তিনি কোন গাছের তলায় ছোট একটি বিদ্যালয় শুরু করে তাঁর কাছে যাঁরা আসেন তাঁদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করবেন। অর্থাভাব যেন জাতীয় শিক্ষা প্রসারে তাঁর সঙ্কল্প থেকে তাঁকে

বিচ্যুত না করে। শিক্ষাদান ব্রাহ্মণের কর্তব্য। ব্রাহ্মণের জীবন যাপন করতে প্রস্তুত যে-কেউ এ কাজ করতে পারেন। এ রকম ব্রাহ্মণ পাওয়া গেলে অর্থ এবং কর্তৃত্ব উভয়ই তাঁর সম্মুখে নতি স্বীকার করবে।

স্বরাজের চাবিকাঠি হল শিক্ষা।···সঠিক শিক্ষাপদ্ধতি ছাড়া যাবতীয় প্রচেষ্টা নিরর্থক···। এক্ষেত্রে জয়ী হতে পারলে আমরা যে-কোন মহান্ প্রচেষ্টায় ব্রতী হই না কেন সে কার্যেও নিঃসন্দেহে জয়যুক্ত হব।

বিচারসৃষ্টি, ১৯১৭

৩

শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু

শিক্ষাক্ষেত্রে যখন চরিত্রগঠনের চেয়ে অক্ষরজ্ঞানের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে তখন "সানডে স্কুল ক্রনিক্‌ল্"-এ প্রকাশিত অধ্যক্ষ জ্যাক্‌স্-এর নিম্নোদ্ধৃত প্রবন্ধটি পাঠে সকলে উপকৃত হবেন :

"আমাদের জীবন চিরন্তন গতির মত এবং এই জীবনে বিজ্ঞানের অগ্রগতি কখনই এর প্রয়োগজনিত চূড়ান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আমরা যেখানে পৌঁছাই আমাদের দায়িত্বের সীমারেখা তার চেয়েও খানিকটা এগিয়ে থাকে। পশ্চাদ্ধাবনকারী তার গতিবেগ যতটা বাড়ায় পলাতক বাড়ায় তার চেয়ে বেশী। বিজ্ঞান যে দায়িত্বের সীমারেখাকে অতিক্রম করতে পারে না, এর মূলে রয়েছে এর সীমাবদ্ধতা। ফলিত বিজ্ঞান আপনাকে বন্দুক তৈরীর কৌশল শেখাবে কিন্তু কখন কার উপর গুলি চালাতে হবে—একথা ফলিত বিজ্ঞান বলতে পারে না। বলবেন এ হল নীতিবিজ্ঞানের এলাকা। আমার উত্তর হল এই যে বন্দুকের ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগ সম্বন্ধে বলার সময় নীতিবিজ্ঞান বন্দুকের

অন্যায় ব্যবহারের প্রতিও ইঙ্গিত করবে এবং যেহেতু সময় সময় বন্দুকের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের চেয়ে অন্যায় ব্যবহার দ্বারা আমার স্বার্থ অধিকতর পরিমাণে সাধিত হবার সম্ভাবনা, সেইজন্য আমার প্রতিবেশীদের গুলি খাবার এবং লুণ্ঠিত হবার নূতন আশঙ্কার সম্মুখীন হতে হবে। নীতিবিজ্ঞান দ্বারা সজ্জিত খারাপ লোকের অপর নাম হল শয়তান। মেফিস্টোফেল্‌সের* যদি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতিবিজ্ঞানে পরীক্ষা নেওয়া হত তাহলে সে নিশ্চয় সব পুরস্কারগুলি পেত। এ ব্যাপারে নীতিবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান একই পথের পথিক। বিজ্ঞান যে পলাতককে কখনই ধরতে পারে না তার নাম কি দেব? আমি একে জীবন বলি। কেউ কেউ একে বলেন চৈতন্য বা আত্মা কিংবা চিৎশক্তি অথবা হয়ত ইচ্ছাশক্তি। তবে আমার মনে হয় যে যতক্ষণ আমরা এর অস্তিত্ব স্বীকার করি ও বুঝি যে মানবসমাজের যাবতীয় সম্পদ এর করায়ত্ত ততক্ষণ নামে কিছু আসে যায় না। শিক্ষা যেন এই দিকে দৃষ্টি দেয়। মানবীয় দায়িত্বের এই সীমারেখায় শিক্ষা ও ধর্মের ক্ষেত্রস্থ যাবতীয় প্রচেষ্টা উদ্ভাসিত হয়। আর সব ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়ে মানুষের দায়িত্ব-গ্রহণের এই ক্ষেত্রে যদি আমরা নিষ্ক্রিয় থাকি তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের দুঃখভোগ করতে হবে।"

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-৯-১৯২৬

৪

যথার্থ শিক্ষা

আহমেদাবাদ থেকে অধ্যাপক মালকানী নিম্নোক্ত তারবার্তা পাঠিয়েছেন:

"...কৃপালনী খবর দিচ্ছেন বিদ্যাপীঠের স্বেচ্ছাসেবকরা সিন্ধুতে যাচ্ছে।"

* গ্যেটের ফাউস্ত-এ বর্ণিত শয়তান। (সম্পাদক)

পুণাতে গত ৩রা তারিখে অখিল ভারতীয় স্বদেশী বাজার ও শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে স্যার এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন বলে প্রকাশ :

"বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপর আমার কথার যদি কোন প্রভাব পড়ে তাহলে আমি তাদের অনুরোধ করব যে যত দিন আমাদের আর্থিক অযোগ্যতা থাকবে ততদিন চারুচর্চামূলক ও তাত্ত্বিক পাঠ্য-ক্রমে ছাত্রভর্তি সীমাবদ্ধ করে ছাত্রদের কৃষি বাস্তু ও যন্ত্র বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে স্নাতক হবার জন্য প্রবুদ্ধ করতে হবে।"

একমাত্র চারুচর্চামূলক শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার গুরুতর ত্রুটি সম্বন্ধে স্যার বিশ্বেশ্বরাইয়া দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমি এর চেয়ে আর এক গুরুতর ত্রুটির কথা বলতে চাই এবং তা হল এই যে ছাত্রদের এই কথা বিশ্বাস করতে বলা হয় যে তারা যখন এই চারুচর্চামূলক শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে তখন শিক্ষার ক্ষতি করে ছোট বা সাময়িক যে কোন ধরনের সেবামূলক কাজই হক না কেন, তা করা উচিত নয়। গুজরাতের কোন কোন ছাত্র বর্তমানে পড়াশুনা ছেড়ে আর্তত্রাণের কাজ করছে। চারুচর্চামূলক বা শিল্প—যে কোন ধরনের শিক্ষা হক না কেন তা সাময়িক ভাবে মুলতুবী রেখে ছাত্র-সমাজ যদি ওদের মত সেবামূলক কাজ করে তাহলে তাদের কোন ক্ষতি তো হবেই না, বরং অনেক লাভ হবে। নিঃসন্দেহে সবরকমের শিক্ষার অন্তিম লক্ষ্য হবে মানুষের সেবা করা এবং অধ্যয়নকালেই যদি কোন ছাত্র সেবা করার সুযোগ পায় তাহলে একে এক দুর্লভ সুযোগ বলে মনে করা উচিত। সেবায় আত্মনিয়োগ করার সময়কে পড়াশুনা মুলতুবী রাখার অবধি মনে না করে বরং শিক্ষার পরিপূরক কাল বিবেচনা করা কর্তব্য। গুজরাতের জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে গুজরাতের পরিধির বাইরে তাঁদের সেবামূলক কার্য-কলাপের বিস্তার করেছেন তাকে আমি তাই আন্তরিক ভাবে অভিনন্দিত করি। দিন কয়েক পূর্বেই আমি মন্তব্য করেছি যে

আমাদের সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাবাদী হওয়া উচিত নয়। আর্তত্রাণের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠিত করার ব্যাপারে সিন্ধু গুজরাতের মত অতটা সুসংগঠিত নয়। সুতরাং গুজরাতের কর্তব্য হল সিন্ধু বা অন্য যে প্রদেশে দরকার এ রকম স্বেচ্ছাসেবক পাঠান।...

* * *

গুজরাতের বিপদে সাহায্যের জন্য যে আবেদন জানান হয়েছিল তার অতীব উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেছে। এর মধ্যে গুরুকুল কাংড়ী এবং শান্তিনিকেতন—এই দুটি প্রতিষ্ঠানের কথা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যেখান থেকে প্রথম দিকে সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল।

সাহায্যের অর্থ এঁরা সোজা শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেলকে পাঠালেও তাঁদের দানের সংবাদ পেলে আমি আনন্দিত হব জেনে তারবার্তাযোগে সে খবর আমাকেও জানিয়েছেন। গুরুকুল থেকে চার কিস্তিতে যে দান পাওয়া গেছে আচার্য রামদেবজী তার বিশদ্ বিবরণ আমাকে পাঠিয়েছেন। আরও দান পাবার সম্ভাবনা আছে জানিয়ে তিনি বলেছেন:

"শিক্ষকেরা তাঁদের বেতনের একাংশ দিয়েছেন এবং ব্রহ্মচারীরা সচরাচর ধোপাকে দিয়ে কাপড় কাচালেও এবার নিজেদের কাপড়-চোপড় নিজেরা কেচে যে পয়সা বেঁচেছে তা পাঠিয়েছে। বালিকা বিদ্যালয়ের ব্রহ্মচারিণীরা এক বেলা ঘি ও দুধ খাওয়া বন্ধ করে পয়সা বাঁচিয়ে সেই পয়সা পাঠিয়েছে।"

গুজরাতে যাঁরা সাহায্য পাচ্ছেন এবং সাহায্য বণ্টন করেছেন তাঁরা যেন স্মরণ রাখেন যে কোন্ কোন্ দানের পিছনে কতখানি আত্মত্যাগ রয়েছে। গুরুকুলের ছেলেমেয়েদের বর্তমান কৃচ্ছ্রসাধন দেখে আমার স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর আত্মত্যাগের কথা মনে পড়ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের সময় তাঁর স্বদেশবাসীদের সাহায্য করার জন্য গুরুকুলের তদানীন্তন প্রধান শ্রদ্ধানন্দজী আত্মত্যাগের

প্রথার সূত্রপাত করেন। সুতরাং গুরুকুলের সেই ঐতিহ্যে মানুষ ছেলেমেয়েদের কাছে প্রয়োজনকালে এই জাতীয় আত্মত্যাগই লোকে সর্বদা আশা করে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-১০-১৯২৭

৫

কৃত্রিম বিধিনিষেধ চাই না

দক্ষিণের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের উপর আরোপিত বিধিনিষেধসমূহের একটি তালিকা আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে এগুলির অধিকাংশ দূর করা উচিত। ছাত্রদের মন এবং এমন কি শিক্ষকদের মনকেও খাঁচায় বন্দী করা উচিত নয়। তাঁরা অথবা রাষ্ট্র ছাত্রদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক পন্থা কোন্‌টিকে মনে করেন শিক্ষকেরা ছাত্রদের কেবল এইটুকু বলে দেবেন। এরপর ছাত্রদের চিন্তাশক্তি ও অনুভূতিকে খর্ব করার কোন অধিকার তাঁদের নেই। এর অর্থ এই নয় যে ছাত্ররা কোন শৃঙ্খলার অধীন হবে না। নিয়মশৃঙ্খলা ছাড়া কোন বিদ্যালয় চলতে পারে না। কিন্তু নিয়মশৃঙ্খলার সঙ্গে ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপর আরোপিত কৃত্রিম বিধিনিষেধের কোন সম্বন্ধ নেই। আর যেখানে ছাত্রদের উপর গোয়েন্দাগিরি করা হয় সেখানে এরকম পরিবেশ সৃষ্টি করা অসম্ভব। আসল কথা হচ্ছে এই যে ইতঃপূর্বে তারা প্রকাশ্য না হলেও প্রচ্ছন্ন জাতীয়তাবিরোধী পরিবেশের মধ্যে ছিল। এবার এই পরিবেশ দূর হওয়া দরকার। ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে জাতীয়তাবাদের অনুশীলন কোন অপরাধ নয়—এ একটি সদ্‌গুণ।

হরিজন, ১৮-৯-১৯৩৭

তৃতীয় অধ্যায়ঃ নূতন শিক্ষাপদ্ধতির পূর্বাভাষ

আচার্যের অভিভাষণ

আমার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য অনুষ্ঠান থেকে আজকের আয়োজন পৃথক। এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাকে আমি অতীব দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে মনে করি। জাতির কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করে ফেলছি বলে আমার মনে এই উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয় নি, আমার শুধু মনে হচ্ছে যে আমি এ কার্যের যথোপযুক্ত ব্যক্তি নই। শিক্ষা বলতে সত্যসত্যই যা বোঝায়, এই কলেজটি যদি তার প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হত তাহলে আমার মনে এই অযোগ্যতার ভাবনা জাগত না। কিন্তু মহাবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য শুধু ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া নয়; ছাত্রদের জীবিকার সন্ধান করে দেওয়াও এর লক্ষ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গুজরাত কলেজের সঙ্গে মহাবিদ্যালয়ের তুলনা করলে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। গুজরাত কলেজ একটি বিরাট ব্যাপার; কিন্তু আমাদের মহাবিদ্যালয় সে তুলনায় নগণ্য। তবে আমার মতে এটি একটি মহান্ প্রতিষ্ঠান। গুজরাত কলেজে ইট-কাঠ আর চুন-সুরকি বেশী লেগেছে। প্রতিষ্ঠানের গুণবিচারের জন্য অট্টালিকা ও অন্যবিধ সাধন-সামগ্রী যে যথেষ্ট মানদণ্ড নয়, এ বিশ্বাস আমি যদি আপনাদের মনে সৃষ্টি করতে পারতাম তাহলে বড় ভাল হত। ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করি যে আমাদের আদর্শ সম্বন্ধে আপনাদের মনে আমারই মত দৃঢ়মূল প্রতীতি জন্মাক।

আজকের অবস্থা হচ্ছে এই যে দেশের সূচ্যগ্র ভূমিও আমাদের নয়, সবই এক বিদেশী সরকারের অধীন। শুধু এই মাটি আর গাছপালাই নয়; আমাদের দেহগুলিও তাদের দখলে এব নিশ্চিতভাবে একথা বলা মুশকিল যে আমরা আমাদের আত্মার স্বামী কিনা। এই যখন আমাদের অবস্থা তখন জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের জন্য সুন্দর একটি অট্টালিকা বা এর অধ্যাপক-পদের জন্য খুব জ্ঞানী

ব্যক্তি পাবার আশা করা অনুচিত। এমন কি কোন ব্যক্তি যদি এসে আমাদের জানান যে আমাদের আত্মার জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে এবং আমাদের দেশ থেকে প্রাচীনকালের প্রজ্ঞা বিদায় নিয়েছে, তাহলে অন্যান্য বিষয়ে তিনি অজ্ঞ হলেও আমি তো সানন্দে তাঁকে আপনাদের অধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করব। তবে আমি বলতে পারছি না যে আপনারা একজন পশুপালককে এইভাবে গ্রহণ করতে পারবেন কিনা। সেইজন্য আমাদের শ্রীযুক্ত গিদওয়ানীকে খুঁজে বার করতে হয়েছে। আমি স্বীকার করছি যে তাঁর ডিগ্রীগুলির প্রতি আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি না। এই কলেজে পৃথক ধরনের মূল্যমান বিদ্যমান। চরিত্রের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে এখন যা পিতল মনে হচ্ছে, তাই সোনা বলে ধরা পড়বে।

আদর্শ চরিত্রের সিদ্ধি মারাঠী ও গুজরাতী অধ্যাপকমণ্ডলী পাওয়ায় আমরা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করি।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাদের আমি প্রাণভরে এই মহাবিদ্যালয়কে আশীর্বাদ করতে অনুরোধ জানাই। ভারতের আত্মার পুনরুভ্যুদয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানে নিজ পুত্রকন্যাকে পাঠিয়ে তাঁরা সবচেয়ে ভালভাবে এর প্রতি আশীর্বচন উচ্চারণ করতে পারেন। অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে ভারতবাসী স্বাধীন। তবে অর্থাভাবে কাজের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় না। অগ্রগতি রুদ্ধ হবার কারণ হচ্ছে মানুষের অভাব, নেতার অভাব এবং নেতা জুটলে তার অনুগামীর অভাব। আমি অবশ্য মনে করি যে, যোগ্য নায়কের কখনও অনুগামীর অভাব ঘটে না। মেঝে যতই খারাপ হক না কেন, নাচিয়ে কখনও বলে না যে উঠান বাঁকা। ঐ উঠানেই সুষ্ঠুভাবে সে কাজ চালিয়ে নেয়। নেতার বেলাতেও ঠিক এই কথা খাটে। জাতশিল্পী হলে তিনি কাদাকে সোনায় রূপান্তরিত করবেন। আমি প্রার্থনা করি যে আপনাদের অধ্যাপকমণ্ডলী যেন এই জাতীয় জীবনশিল্পী হয়ে ওঠেন।

শুধু পাণ্ডিত্যে কোন কাজ হবে না। স্বরাজ অর্জন করতে হলে আমাদের চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। আমাদের শান্তিময় ও আধ্যাত্মিক আন্দোলন ক্রটিযুক্ত হলেও বিদেশী শাসকবর্গের শয়তানোচিত হিংসার সম্মুখীন হবার জন্য এই আমাদের আয়ুধ। ঈশ্বর-নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ হলে যাতে মুক্তির বীজ সুন্দর স্বরাজ-বৃক্ষে রূপায়িত হয়, সেজন্য এ বীজ বপন করে এতে জল সিঞ্চন করতে হবে। চারিত্র্যশক্তি ছাড়া এর বৃদ্ধি সম্ভব নয়। আপনাদের শিক্ষকবৃন্দ একথা সদা-সর্বদা স্মরণ রাখলে আর সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি জানি তাঁরা এ আদর্শ পূর্ণ করার জন্য জীবন পণ করেছেন। আর এর জন্য মৃত্যুবরণ করা তো আসলে চিরজীবী হওয়া।

অধ্যাপকবর্গ তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করবেন ধরে নিলে ছাত্রদের আমার আর কিছু বলবার থাকে না। ছাত্র বেচারীরা তো প্রচলিত পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবি। তাঁরা যদি উদ্যমী সত্যবাদী ও নির্মল হৃদয়ের না হন, তবে তার জন্য দোষী হচ্ছেন তাঁদের পিতামাতা তাঁদের শিক্ষকগণ ও তাঁদের শাসকবর্গ। “যথা রাজা তথা প্রজা” কথাটি যদি সত্য হয়, তবে যেমন প্রজা তেমনি রাজা কথাটিও সত্য। আমাদের জাতীয় চরিত্রের ক্রটি দূর করার জন্য আমরা অর্থাৎ অভিভাবকবর্গ ও শিক্ষকগণ যেন বদ্ধপরিকর হই।

দেশের প্রতিটি গৃহই হচ্ছে বিদ্যালয় এবং মাতাপিতা তার শিক্ষক। কিন্তু শিক্ষাদানে বিরত থেকে পিতামাতা তাঁদের পবিত্র কর্তব্য থেকে চ্যুত হয়েছেন। বিদেশী সভ্যতার বর্তমান রূপ দেখে এর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নেই এবং এর গুণাগুণ সম্বন্ধেও আমাদের বিশেষ জ্ঞান নেই। আমরা যেন ধার করে এবং চুরি করে সভ্যতার বহিরাবরণ ধারণ করেছি। এই চোরাই মালে আমাদের কোন রকম উন্নতি সম্ভব নয়।

এটি আমাদের মুক্তি-মন্দির, পুঁথিগত বিদ্যার দেউল নয়। চরিত্র-গঠন আমাদের কর্তব্য। একাজে ছাত্রদের মধ্যে আমরা যে মাত্রায়

সাফল্য অর্জন করব, স্বরাজ অর্জনের সেই পরিমাণ যোগ্য হয়েছি বলে মনে করব। ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করাই স্বরাজ গড়ে তোলার একমাত্র উপায়। আজ যে ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল তার পিছনে আমাদের নিজ সম্পদ ও হৃদয় সমর্পণ করতে হবে।

কথা বলার সময় আর নেই, কর্মের মহালগ্ন সমুপস্থিত। যেসব ছাত্র এই জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন, তাঁদের আমি অর্ধেক শিক্ষক বিবেচনা করি। তাঁরা এই মহাবিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর সংস্থাপন করেছেন। এইজন্য তাঁদের নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। এই অনুষ্ঠানের পুরোদস্তুর কুশীলব তাঁরা। তাঁরা যদি নিজ ভূমিকা যথাযথভাবে গ্রহণ না করেন, তবে শিক্ষকদের উদ্যমের অধিকাংশ বৃথা যাবে। কেন তাঁরা সরকারী কলেজ ছেড়ে এ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন এবং এখানে তাঁরা কি পাবার আশা রাখেন, একথা ছাত্রদের জানতে হবে। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম হয়তো দীর্ঘকালব্যাপী হবে। ভগবান্ যেন ছাত্রদের শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকার শক্তি দেন। শেষ পর্যন্ত আপনাদের মধ্যে জনকয়েকও যদি ঠিক থাকেন, তবে আপনারা শুধু এই মহাবিদ্যালয়ের গর্বের বস্তু বলে আখ্যাত হবেন না, আপনারা হবেন আপনাদের মাতৃভূমির গৌরব। গুজরাতের ধন-সম্পদ ও জ্ঞানের জন্য আপনারা সে মর্যাদা পাবেন না, সে সম্মান পাবার কারণ হচ্ছে এই যে, এ প্রদেশে অসহযোগের বীজ বপন করা হয়েছে ও অঙ্কুরিত হবার জন্য তাকে যত্ন করা হয়েছে। আত্মপ্রশংসা এ নয়, কারণ আমি তো শুধু জনসাধারণের সামনে এর কল্পনা পেশ করেছিলাম। জনগণই উৎসাহভরে এ পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে এবং যথোচিত নিষ্ঠাসহকারে আমার বিশ্বাসের সঙ্গে একাত্ম হয়। আমার চোখের সামনে ঐ বৃক্ষগুলি যেমন বাস্তব, তেমনি অহিংস অসহযোগও যে ভারতের মুক্তি আনবে এও বাস্তব। আর এই মহাবিদ্যালয় হচ্ছে সেই মহান্ আন্দোলনের ইন্দ্রিয়গোচরের প্রতীক। আমি শুধু এর একটি

পত্র এবং তাও শুষ্কপত্র। শিক্ষকরা এর পত্র, তবে তাঁরা কথঞ্চিৎ সজীব। কিন্তু আপনারা এই ছাত্রের দল হচ্ছেন এর শাখা-প্রশাখা এবং এর থেকে একদল নূতন শিক্ষক জন্মলাভ করবে। আমার প্রতি আপনাদের যে আস্থা, সে আস্থা আপনাদের শিক্ষকদের উপরও জন্মাক। তাঁদের ভিতর আদর্শ চিত্তবৃত্তির অভাব দেখলে প্রহ্লাদ যেমন নিজ পিতাকে অগ্রাহ্য করেছিলেন, আপনারাও তেমনি তাঁদের নাকচ করে তাঁদের ছাড়াই এগিয়ে চলুন।

আমি কামনা করি যে এই মহাবিদ্যালয় যেন ঈশ্বরের অবদান হয়। এ যেন আমাদের স্বরাজ অর্জনের অন্যতম শক্তিশালী আয়ুধ হয় এবং শুধু ভারতের হিতসাধনেই আমাদের স্বাধীনতারূপী স্রোতস্বতীর জলস্রোত নিঃশেষ না হয়ে সমগ্র বিশ্ব যেন তার কল্যাণধারায় নিষিক্ত হয়।

১৫-১১-১৯২০

২

জাতীয় বিদ্যালয়ের চারিত্রধর্ম

প্রশ্ন: রুজিরোজগারের ব্যাপারে আজকে দেশবাসীর যে অসুবিধা তার থেকে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্ররা কি মুক্ত হবে?

উত্তর: হওয়া উচিত। এই প্রাথমিক স্বাধীনতাটুকুও যা দিতে পারে না, তা শিক্ষা নামের অযোগ্য। সত্যকার শিক্ষা ছাত্রদের আর্থিক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার স্বাদ দেবে। এই ত্রিবিধ স্বাধীনতার প্রথমটি যে পায় নি, দ্বিতীয়টিও সে পেতে পারে না।

প্রশ্ন: সকল রকমের স্বার্থ-ভাবনা বর্জন করা কি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কর্তব্য নয়?

উত্তর: অবশ্যই। আমার বিশ্বাস স্বার্থ ছাড়তে না পারলে দেশের সেবক হওয়া যায় না।

প্রশ্ন: স্নাতকরা কি দেশের সেবায় নিজ জীবন উৎসর্গ করবেন না?

উত্তর: এ নীতি সর্বদা কার্যকরী হবে না। জাতি যখন শেষ অবধি সঠিক পন্থায় গড়ে উঠবে তখন যাঁরাই সৎ ও নির্ভীক-ভাবে জীবনযাপন করবেন, তাঁরা সবাই দেশের সেবা করছেন ধরে নিতে হবে।

প্রশ্ন: আমরা বিশ্বাস করি সরকারী বিদ্যালয়সমূহে পুঁথিগত বিদ্যা শেখান হলেও চরিত্রগঠনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় না। এর অর্থ কি এই হয় না যে জাতীয় বিদ্যালয়ে চরিত্রগঠনকে প্রথম স্থান দেওয়া হবে?

উত্তর: হ্যাঁ, এর অর্থ তাই। তবে চরিত্রগঠনের জন্য জ্ঞানদান করা হবে। জ্ঞান হল মাধ্যম এবং লক্ষ্য হল চরিত্রগঠন।

প্রশ্ন: তাহলে আপনি কি মনে করেন যে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সচ্চরিত্র হওয়া অত্যাবশ্যক?

উত্তর: নিশ্চয়ই।

প্রশ্ন: তবে কি ধরে নিতে হবে যে মদ্যপ ও ধূমপানকারী শিক্ষকের জাতীয় বিদ্যালয়ে স্থান নেই?

উত্তর: নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা এমন একটা পর্যায়ে উপনীত হয়েছি যেখানে এটা মোটামুটি সর্বজনমান্য যে মদ্যপানকারী শিক্ষকের হাতে ছাত্রদের ছেড়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু ধূমপান করার অভ্যাস সম্বন্ধে একই কথা বলার সাহস আমার নেই। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে ধূমপানকারীও অন্যান্য বিষয়ে আদর্শচরিত্র হতে পারেন। চরিত্রবিচারের সময় আমরা যেন হৃদয়হীন বিচারকে পরিণত না হই।

প্রশ্ন: প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতে ছাত্রদের শরীর উচ্ছন্নে যায় এবং বি. এ. পাস করতে করতে তাদের দেহ মন দুই-ই ধ্বংস হয়ে যায়—এটা কি একটা শোচনীয় ব্যাপার নয়?

উত্তর : আমার ক্ষমতা থাকলে ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের ছাত্রদের আমি কোনরকম শিক্ষা পেতে দিতাম না।

প্রশ্ন : জাতীয় শিক্ষায়তনের ছাত্রদের সমস্ত শক্তির সুসমঞ্জস বিকাশ কি বাঞ্ছনীয় নয় ?

উত্তর : এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমার কাছে একথা অতীব যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে দেহ সুস্থ হলে মনও সুস্থ হবে এবং মন সুস্থ হবার অর্থ আত্মাও সুস্থ হওয়া।

প্রশ্ন : জাতীয় বিদ্যালয়ে চূড়ান্ত শাস্তির স্থান আছে কি ?

উত্তর : না, চূড়ান্ত শাস্তির স্থান নেই।

প্রশ্ন : ছাত্রদের যদি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা ভাল না লাগে, তাহলে এর জন্য আপনি কাকে দায়ী করবেন ?

উত্তর : সাধারণ দোষ ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েরই। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকেরই দোষ বেশী।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন না যে আমাদের বিদ্যালয়-সমূহে যতগুলি ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা আছে তা প্রয়োজনের চেয়ে কিছু বেশী ?

উত্তর : একই গোষ্ঠীর একাধিক ভাষা শিখতে চাপ পড়ে না। উদাহরণস্বরূপ যে কেউ সহজেই হিন্দুস্থানী গুজরাতী মারাঠী ও বাঙলা শিখতে পারেন। কিন্তু ইংরাজী গ্রীক লাতিন ও আরবী একসঙ্গে শেখা কঠিন। কারণ এগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষা, এদের ভিতর সাধারণ তত্ত্ব বলতে কিছু নেই।

প্রশ্ন : শিক্ষকের মর্যাদা কি মন্ত্রীর চেয়ে ঊর্ধ্বে নয় ? তাহলে বড়লাটের এক হাজার টাকা মাইনে হলে শিক্ষকের বেতন কি দুই হাজার টাকা হওয়া উচিত নয় ?

উত্তর : বড়লাটের কাজের হিসাব ও পরিমাপ করা সম্ভব কিন্তু শিক্ষকদের কাজ অমূল্য। এইজন্য শিক্ষককে দারিদ্র্য বরণ করে নিতে হবে। আমি বরং বলব যে শিক্ষক-সমাজ যেন স্রেফ পেটে-

ভাতে কাজ করেন। বড়লাট তাঁর কাজের প্রতিদান চাইতে পারেন। কিন্তু প্রতিদান চাইলে শিক্ষকের কাজ নিরর্থক হয়ে যাবে।

নবজীবন, ২০-১০-১৯২১

৩

ভবিষ্যৎ জীবন ও শিক্ষা

আমার মতে শিক্ষা অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে আহরিত জ্ঞানকে অর্থ উপার্জন করার জন্য নিয়োগ করা উচিত নয়। জীবিকার সাধন হবে কাপড় বোনা ছুতার মিস্ত্রি ও দর্জির কাজ ইত্যাদি কোন না কোন রকমের উৎপাদনমূলক শারীরিক শ্রম। আমার মতে জাতি হিসাবে আমাদের অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ হল চিকিৎসক আইনজীবী এবং শিক্ষক ইত্যাদি কর্তৃক অর্থোপার্জনের জন্য নিজ নিজ পেশার অনুশীলন। তবে এ হল একটা আদর্শ স্থিতির কথা এবং বাস্তব জীবনে এর সম্পূর্ণ রূপায়ণ কোন দিনই সম্ভব না হতে পারে। কিন্তু তাহলেও আমরা যতটা এই আদর্শের কাছাকাছি যেতে পারব আমাদের ততটা কল্যাণ হবে। এই বিদ্যাপীঠ সম্পূর্ণভাবে এই আদর্শকে গ্রহণ না করলেও দেশের সেবাকে শিক্ষার মুখ্য লক্ষ্য হিসাবে বরণ করেছে। সুতরাং জ্ঞানকে যেখানে দেশসেবার জন্য উৎসর্গ করার কথা সেখানে "ভবিষ্যৎ জীবন"-এর কথা ওঠে না এবং অর্থোপার্জনও সেখানে গৌণ হয়ে দাঁড়ায়।

নবজীবন, ১-৬-১৯২৪

৪

জাতীয় বিদ্যালয়

স্বরাজ অর্জনের জন্য জাতীয় বিদ্যালয়সমূহ সৃষ্ট হয়, এই অর্থে জাতীয় বিদ্যালয়গুলিকে নামের তাৎপর্য রক্ষা করার জন্য এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যে শিক্ষাক্ষেত্রে যেন জাতীয় কর্মসূচীকে রূপদানের পূর্ণ প্রচেষ্টা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে,

জাতীয় বিদ্যালয়গুলি চরখার বাণী প্রচারের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বাহন হবে; হিন্দু মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভিতর পারস্পরিক সৌহার্দ্য স্থাপনার প্রযত্ন করবে এবং "অস্পৃশ্যদের" শিক্ষা দেবার চেষ্টা করবে ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপকে বিদ্যানিকেতন থেকে বিদূরিত করবে। এই মানদণ্ডে বিচার করতে হলে আমাদের এই জাতীয় বিদ্যালয়রূপী পরীক্ষাকে একেবারে ব্যর্থ আখ্যা না দিলেও অবশ্যই নৈরাশ্যজনক সাফল্য আখ্যা দিতে হবে। ত্রিশ হাজার ছাত্রের ভিতর খুব বেশী হলে এক হাজার ছাত্র একশত চরখায় দৈনিক আধ ঘণ্টা হিসাবে সূতা কাটছে। শত শত চরখা বৃথাই উপেক্ষিত হয়ে পড়ে আছে। বিদ্যালয়গুলির দরজা নামে মাত্র "অস্পৃশ্যদের" জন্য খোলা থাকলেও বস্তুতঃ তার অল্প কয়েকটিতে "অস্পৃশ্য" ছাত্র আছে। বিদ্যালয়গুলিতে মুসলমান ছাত্রদের উপস্থিতি অতীব স্বল্প। সুতরাং দ্বিধাহীন চিত্তে আমি এই পরামর্শ দিয়েছিলাম যে অতঃপর আমাদের সংখ্যার উপর জোর না দিয়ে গুণের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভের প্রারম্ভিক পরীক্ষার মান ক্রমশঃ কঠিন করতে হবে। ছেলেদের সূতা কাটতে শেখাতে বা "অস্পৃশ্যদের" সঙ্গে মিশতে দিতে যে-সব অভিভাবকদের আপত্তি আছে, ইচ্ছা করলে তাঁরা নিজেদের ছেলেদের বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারেন। শিক্ষকদের এ পরামর্শ দিতে আমার বাধে নি যে চরখা ও "অস্পৃশ্যদের" বর্জন না করে যদি তাঁদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালান অসম্ভব হয়, তবে বিদ্যালয়ের দ্বার বন্ধ করে দেওয়া উচিত। "অস্পৃশ্যদের" ছেলেরা কোনক্রমে এসে পড়লে তাদের বরদাস্ত করাই যথেষ্ট নয়; বরং আমাদের কাজ হচ্ছে প্রেম ও সহৃদয়তা দ্বারা অভিভূত করে "অস্পৃশ্যদের" বিদ্যালয়ে আকর্ষণ করা। মুসলমান ও পার্শী ছাত্রদের অভিভাবকেরা কবে তাঁদের ছেলেদের পাঠাবেন, এজন্য শিক্ষকদের পথ চেয়ে বসে থাকলে চলবে না। তাঁদের কাজ হচ্ছে এই জাতীয় অভিভাবকদেরকে নিজ সন্তানদের পাঠাবার জন্য আমন্ত্রণ জ্ঞাপন

করা। জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষককে নিজ ক্ষেত্রে স্বরাজ আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক হতে হবে। তাঁর উপর যতগুলি ছাত্রের দায়িত্ব ন্যস্ত, তিনি তাদের প্রত্যেকের ইতিহাস জানবেন এবং ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিদ্যালয়ের গণ্ডীর ভিতরই শেষ হয়ে যাবে না। ছাত্রদের অভিভাবকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকবে এবং কেন তাঁরা নিজ সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন না, সে সমাচারও তাঁদের রাখতে হবে। এসব কাজ করার সময় অধৈর্য হলে চলবে না; তাঁকে সদা প্রেমময় হতে হবে। কংগ্রেস-কথিত জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এই একমাত্র পথ। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

এই মহান্ কর্তব্যসাধন-পথে যে সব প্রতিবন্ধক বিদ্যমান, তার সম্বন্ধেও যেন ভ্রান্ত ধারণা না থাকে। বর্তমান সরকার সব-কিছুকে কেনাবেচার সামগ্রীতে পরিণত করেছে। চরিত্র আর কোন কিছুর মানদণ্ড নয়। যন্ত্রবৎ এক পল্লবগ্রাহী বৃত্তি-দ্যোতক পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে চলাই এখন একমাত্র নিরীখ। প্রত্যেকটি পেশা আজকাল হীন অর্থোপার্জনের মনোভাবনা-চালিত। দেশবাসীর সেবার জন্য নয়, অধিকাধিক অর্থোপার্জন করার মানসে আমরা আইনজীবী চিকিৎসক বা শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করি। গুজরাত বিদ্যাপীঠকেও তাই এবম্বিধ আত্মগ্লানিকর পরিবেশের ভিতর শিক্ষক সংগ্রহ করতে হয়। এখানকার শিক্ষকরা যে সকলে দেশের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, এই এক আশ্চর্যের কথা।

কিন্তু অতঃপর এই চার বৎসরের অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের এক নবীন অধ্যায়ের সূত্রপাত করতে হবে। জলে হাত পা অনড় রেখেও নিমজ্জিত হব না—এ হতে পারে না। সুতরাং ছাত্রছাত্রীরা যাতে প্রত্যহ অন্ততঃ আধ ঘণ্টা করে সুতা কাটে তার প্রতি আমাদের জোর দিতে হবে। ত্রিশ সহস্র বালক-বালিকা এবং তাদের আটশত শিক্ষক প্রত্যহ সূতা কাটছেন, অর্থাৎ দৈনিক আধ ঘণ্টা জাতির জন্য পরিশ্রম করছেন—এ শিক্ষা লঘুদৃষ্টিতে দেখার মত নয়। এ দেশ-

প্রেমের প্রাত্যহিক প্রত্যক্ষ শিক্ষা এবং উপযোগী শ্রম ও দানের নিদর্শন। একটি বালক এমন ছাত্রাবস্থা থেকেই যদি প্রতিদানের আশা পোষণ না করে দান করা আরম্ভ করে, তবে তাকে ত্যাগবৃত্তির মূর্ত পরাকাষ্ঠা বলতে হবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনেও সেই বালক এর কথা বিস্মৃত হবে না। আর জাতির কাছে এই কার্যের অর্থ হচ্ছে মাসিক ১৮৭৫ মণ সুতার অর্ঘ্য। অন্ততঃ পঞ্চ সহস্র ব্যক্তি এর ফলে একটি করে ধুতি পাবে। প্রত্যেক ছাত্র যদি এই ভেবে সুতা কাটে যে সে এবং তার আর পাঁচ জন সাথী মাদ্রাজের সাম্প্রতিক বন্যার ফলে দুঃস্থ ও বিবস্ত্র তাঁদের প্রত্যেকটি দেশবাসীকে অন্ততঃ একখানি ধুতি দেবার উপযুক্ত সুতা একমাসে কাটবে, তাহলে সেই মনোবৃত্তি অনুসরণ করার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা যে শিক্ষা পাবে প্রত্যেকটি শিক্ষক আর কিছু না হক, অন্ততঃ তার মূল্য নিরূপণ করুন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৭-৮-১৯২৪

৫

জাতীয় বিদ্যালয় ও খদ্দর

শুধু স্বরাজের পরিপ্রেক্ষিতেই আমার পক্ষে জাতীয় শিক্ষার কথা ভাবা সম্ভব। সুতরাং কলেজী ছাত্ররাও যাতে সুতা কাটা এবং তৎসংশ্লিষ্ট সবকিছুতে পারঙ্গম হবার জন্য মনোযোগ দেয়, আমি তাই চাইব। খদ্দরের তাৎপর্য ও অর্থশাস্ত্র তারা জানুক। কাপড়ের কল স্থাপন করতে কত সময় ও পুঁজি লাগে, সে কথাও তাদের জানা দরকার। অনির্দিষ্টভাবে মিলের পরিধি বৃদ্ধি করার সম্ভাবনার পরিণতি কি, সে সম্বন্ধেও তাদের ওয়াকিবহাল হওয়া উচিত। সুতা কাটা ও ভারতের বস্ত্র উৎপাদন-কলাকে কি প্রকারে বিনষ্ট করা হয়, তার ইতিহাস তাদের জানা দরকার। ভারতের লক্ষ লক্ষ কৃষকের পর্ণকুটীরে সুতা কাটা প্রবর্তিত হলে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে, তা তাদের হৃদয়ঙ্গম ও প্রদর্শন করা প্রয়োজন। পূর্ণমাত্রায় এই কুটীর-

শিল্পের প্রবর্তনের ফলে কিভাবে আজকের শতধা বিভক্ত হিন্দু-মুসলমানের হৃদয় এক এবং অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠবে, তাও তোমাদের কাছে স্পষ্ট হওয়া উচিত।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-১২-১৯২৪

৬

সুতাকাটা ও বিজ্ঞান

আমি একথা বলতে চাইনা যে আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ কেবল সুতাকাটা ও বুনাইএর কেন্দ্র হয়ে উঠবে। তবে সুতাকাটা ও বুনাইকে আমি জাতীয় শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ বিবেচনা করি। এর জন্য ছাত্রদের সমগ্র শিক্ষাকাল আমি নিতে চাই না। দক্ষ ভিষগের ন্যায় আমি শুধু রোগগ্রস্ত অঙ্গের প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই। কারণ আমি জানি যে এই হচ্ছে অন্যান্য অঙ্গগুলির প্রতি মনোযোগ দেবার শ্রেষ্ঠতম পন্থা। শিশুর হস্ত মস্তিষ্ক এবং আত্মার বিকাশ আমার লক্ষ্য, বর্তমানে শিশুদের হস্তগুলি পুষ্টির অভাবে পঙ্গুপ্রায় হয়ে গেছে। আত্মাকে একপ্রকার উপেক্ষাই করা হয়েছে। অতএব দিবারাত্র আমি আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার এই মারাত্মক ত্রুটী সংশোধন করার জন্য চীৎকার করেছি। আমাদের শিশুরা প্রত্যহ আধ ঘণ্টা সুতা কাটলে তাদের উপর কি খুব একটা চাপ পড়ছে বলতে হবে? এর ফলে কি মানসিক পক্ষাঘাত হবে?

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে শিক্ষাদান কার্যকে আমি উচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকি। তবে আমাদের ছেলেদের যতই রসায়ন পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি শেখান হক না কেন, তাকে কখনও বাড়াবাড়ি বলা যেতে পারে না। তবে যে-সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষ-রূপে যুক্ত বলে বলা হয়, সেখানে এ সকল বিষয়ের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দিতে না পারার কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা এর উপযুক্ত অধ্যাপক সংগ্রহ করতে পারি নি এবং বিজ্ঞানের এইসব বিভাগে

হাতে কলমে শিক্ষাদানের জন্য ব্যয়বহুল গবেষণাগার প্রয়োজন। উপরি-উক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের এই প্রারম্ভিক ও অনিশ্চিত অবস্থায় এর সংস্থান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-৩-১৯২৫

৭

বিত্যালয়ে সুতাকাটা

সুতাকাটাকে এক অপরিহার্য শিল্পরূপে যদি পুনরুজ্জীবিত করতে হয়, তবে এর প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং সুপরিচালিত বিত্যালয়সমূহে যেমন অন্যান্য বিষয়াবলী সুষ্ঠুভাবে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে, সুতাকাটাও তেমনি ব্যবস্থিত ভাবে শেখাতে হবে। তাহলে চরখাগুলি ঠিকঠাক থাকবে ও এই পত্রিকায় মাঝে মাঝে তার পরীক্ষার যে সকল মানদণ্ডের উল্লেখ করা হয়, উপরি-উক্ত চরখাগুলি তার অনুরূপ হবে। অন্যান্য বিষয় যেমন নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ পরীক্ষিত হয়, সে অবস্থায় ছাত্রের সুতাকাটার কাজও তেমনি পরীক্ষিত হবে।

ছেলেমেয়েরা যাতে ইচ্ছা হলে ঘরেও সুতা কাটতে পারে সেইজন্য তাদের চরখা চালান শেখাতে হবে। তবে ক্লাসে সুতা-কাটার জন্য তকলী-ই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মিতব্যয়ী লাভজনক যন্ত্র।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-১০-২৫

৮

শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

প্রচলিত পদ্ধতির প্রতি বড় বেশী বহ্বাড়ম্বর ভাব এবং আত্ম-প্রতারণা-প্রবণতা ও অহেতুক আনুগত্যের নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়। শিক্ষাক্ষেত্র হচ্ছে দেশবাসীর ভবিষ্যতের আধার-শিলা। সুতরাং এক্ষেত্রে সত্য মার্গ অনুসরণার্থ এবং অসীম সাহসিকতার সঙ্গে নব

নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য আত্যন্তিক সততা ও নির্ভয় বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজন। তবে এ জাতীয় প্রচেষ্টা সদা-সর্বদা সুবিবেচিত ও দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন হবে এবং নবীন গবেষকদের জীবন ধূপশিখার মত সেবাধর্মী হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শিক্ষানবীশের অবশ্য এ জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার অধিকার থাকবে না। সুবিবেচিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এ ক্ষেত্রে যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা থাকে, তবে স্বর্ণ-শিকারীদের মত এর অবিবেচনা-প্রসূত ও পরিকল্পনাবিহীন দুরুপযোগ হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-৯-২৬

৯

গৃহের শিক্ষা

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ডারবানে থাকাকালীন আমাদের বাড়ীতে তিনটি শিশু ছিল। আমার ভাগিনেয়র বয়স তখন দশ বৎসর এবং আমার পুত্রদ্বয়ের বয়স যথাক্রমে নয় ও পাঁচ বৎসর। এখন প্রশ্ন উঠল এই যে, কোথায় এদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়? ওদের ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কারণ তখন থেকেই আমি বিশ্বাস করতাম যে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের পিতামাতার সান্নিধ্য থেকে দূরে রাখা অনুচিত। কোন সুচারুরূপে চালিত পরিবারে শিশুদের স্বাভাবিক ভাবে যে শিক্ষা হয়, ছাত্রাবাসে তা হওয়া অসম্ভব। এইজন্য ছেলেগুলিকে আমি নিজের কাছেই রেখে দিলাম। অবশ্য তাদের পিছনে যতটা সময় দেব বলে ভেবেছিলাম, কার্যগতিকে তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। নিজের সন্তানদের প্রতি যথোপযুক্ত মনোযোগ দানে অক্ষমতা এবং অন্যান্য অপরিহার্য কারণ বশতঃ তাদের জন্য আমি উচিতমত চারুচর্চামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি নি এবং সেইজন্য আমার প্রত্যেকটি পুত্র সঙ্গত ভাবেই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকে। এম. এ., বি. এ.

এমন কি ম্যাট্রিক পাশ কারও সংসর্গে এলেই যেন তাদের ভিতর স্কুলের শিক্ষার অভাব-বোধ জাগ্রত হয়।

এতৎসত্ত্বেও আমি মনে করি যে, যেন তেন প্রকারেণ আমি যদি তাদের পাব্লিক স্কুলে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করতাম, তাহলে শুধু অভিজ্ঞতার বিদ্যাপীঠ এবং পিতামাতার সান্নিধ্যে যে শিক্ষা উপলব্ধ হয় তারা তা থেকে বঞ্চিত থাকত। তাদের জন্য আজ আমার মনে উৎকণ্ঠা নেই; কিন্তু তারা প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষিত হলে কিছুতেই আমার এর হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় থাকত না। এ ছাড়া আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইংলণ্ড বা দক্ষিণ আফ্রিকায় যে কৃত্রিম শিক্ষা তারা পেত, তার ফলে কিছুতেই তাদের ভিতর আজকের মত অনাড়ম্বরতা ও সেবাপরায়ণতা পরিদৃষ্ট হত না। এতদ্ব্যতিরেকে তাদের কৃত্রিম জীবনযাত্রা-পদ্ধতি হয়ত আমার জনসেবামূলক জীবনে প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াত। সুতরাং আমি তাদেরকে আমার বা তাদের মনোমত চারুচর্চামূলক শিক্ষা দিতে না পারলেও নিজ অতীত জীবনের দিকে তাকিয়ে আমার পক্ষে নিশ্চিত ভাবে একথা বলা অসম্ভব যে আমি তাদের প্রতি যথাসাধ্য নিজ কর্তব্য পালন করি নি। আর তাদেরকে পাবলিক স্কুলে না পাঠাবার জন্যও আমার মনে কোন খেদ নেই। সর্বদাই আমার মনে হয় যে আজকাল আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জীবনের যে সব অবাঞ্ছনীয় লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, তা প্রত্যুত আমার নিজের বিশৃঙ্খল ও অব্যবস্থিত প্রথম জীবনের প্রতিচ্ছবি। জীবনের উপরি-উক্ত অংশকে আমি অপরিণত জ্ঞান ও অসংযত ভোগের কালস্বরূপ বিবেচনা করি। ঘটনাচক্রে ঐ সময় আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মনোভাব গঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল হওয়ায় স্বভাবতই সে প্রাগুক্ত কালকে আমার অর্বাচীনতা ও অসংযমের লগ্ন বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। পক্ষান্তরে সে মনে করে যে, আমার জীবনের ঐ ভাগ সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এবং পরবর্তী পরিবর্তন সকল ভ্রমাত্মক বিশ্বাসযুক্ত ও ভ্রান্তিবশতঃ

প্রজ্ঞা নামে আখ্যাত। তার ওরূপ মনে করায় কিছু যায় আসে না। কেনই বা সে ভাববে না যে আমার জীবনের প্রথম ভাগ জাগরণের কাল ও পরবর্তী অংশ ভ্রান্তি ও অহমিকাপূর্ণ? সময় সময় অনেক বন্ধুর নিকট হতে নিম্নরূপ প্রশ্নাবলীর সম্মুখীন হয়েছি: আমার পুত্রদের কেতাবী শিক্ষা দিলে হানি কি ছিল? এইভাবে তাদের ডানা কেটে দেবার কি অধিকার আমার আছে? ডিগ্রী নিয়ে নিজ পথ বেছে নেবার অধিকার থেকে তাদের নিবৃত্ত করার আমি কে?

এসব প্রশ্নে খুব একটা সার তত্ত্ব আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি অসংখ্য ছাত্রের সংসর্গে এসেছি। আমি স্বয়ং বা অন্য অনেকের মারফৎ আমার তথাকথিত শিক্ষা-সম্বন্ধীয় "বাতিক" বহু শিশুর উপর চাপিয়ে দেবার সুযোগও পেয়েছি এবং তার ফলাফল লক্ষ্য করেছি। আমার পুত্রদের সাথী বহু যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমি মনে করি না যে মানুষ হিসাবে তারা আমার পুত্রদের চেয়ে কোন অংশে শ্রেয়ঃ বা তাদের নিকট থেকে আমার সন্তানদের বহু কিছু শিক্ষণীয় আছে।

তবে আমার প্রয়োগের চূড়ান্ত পরিণাম অবশ্য ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। এখানে আমার এ বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, সভ্যতার ইতিহাসের কোন ছাত্র যেন সুশৃঙ্খল গৃহ-পরিবেশ আধারিত শিক্ষা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা ও তাদের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে এবং পিতামাতার জীবন-পরিবর্তন শিশুর মনে কি প্রভাব সৃষ্টি করে, সে সম্বন্ধে অবহিত হয়। সত্যপ্রেমীকে সত্যের সন্ধানে কতদূর পর্যন্ত যেতে হয় এবং স্বাধীনতা দেবীর পূজারীকে সেই পাষাণ দেবতার বেদীমূলে কি পরিমাণ বলিদান করতে হয়, তা দেখানও এই অধ্যায়টির একটি লক্ষ্য। আমার আত্মসম্মান-জ্ঞান যদি আর একটু কম হত এবং অন্যান্য শিশুরা যে শিক্ষা-ব্যবস্থার সুযোগ পায় না, নিজ সন্তানদের জন্য যদি তার

ব্যবস্থা করতাম, তাহলে তাদেরকে আমি যে স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান জ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছিলাম, তার বিনিময়ে সাহিত্যরস-প্রধান শিক্ষা দিতে হত। স্বাধীনতা এবং শিক্ষার ভিতর একটি বেছে নেবার প্রশ্ন উঠলে এমন কে-ই বা আছেন যিনি স্বাধীনতাকে শিক্ষা অপেক্ষা লক্ষগুণ শ্রেয়ঃ বলবেন না?

আত্মকথা (১৯২৬), পৃঃ ২৪৫-৪৬

১০

টলস্টয় ফার্মের শিক্ষা-ব্যবস্থা

ফার্মের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তত্রস্থ বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল। প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির উপর আমার আস্থা ছিল না। সুতরাং অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা যথার্থ শিক্ষা-পদ্ধতি আবিষ্কার করার আগ্রহ ছিল। আমি শুধু এইটুকু জানতাম যে আদর্শ ব্যবস্থা অনুযায়ী একমাত্র মাতাপিতাই যথার্থ শিক্ষা দিতে সক্ষম এবং এর জন্য বাইরের সাহায্য যথাসম্ভব কম হওয়া উচিত। টলস্টয় ফার্ম একটি পরিবারস্বরূপ ছিল এবং আমার স্থান এই পরিবারে পিতার ন্যায় ছিল বলে আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে এখানে আমার কর্তব্য হচ্ছে এখানকার বালক-বালিকাদের শিক্ষাদানের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাওয়া।

অবশ্য উপরি-উক্ত ধারণায় যে কিছুটা ফাঁক ছিল, একথা আমি জানি। তত্রস্থ প্রতিটি বালক-বালিকা শৈশবাবস্থা থেকে আমার কাছে থাকে নি। তারা বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছিল এবং তাদের সকলেই এক ধর্মমতাবলম্বী ছিল না। সুতরাং নিজেকে পরিবারের পিতার স্থলাভিষিক্ত বিবেচনা করলেও তত্রস্থ যে সব বালক-বালিকা এইভাবে মানুষ হয়েছে, তাদের প্রতি উপযুক্ত আচরণ করা আমার কাছে এক সমস্যাস্বরূপ বিবেচিত হল।

তবে চিরকালই আমি অন্তরের সংস্কৃতি বা চরিত্রগঠনের উপর

সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকি বলে আমার মনে দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে বয়স বা অতীত সংস্কারের কথা চিন্তা না করেই সকলকে সমভাবে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া যায়। সুতরাং আমি তাদের পিতার মত চব্বিশ ঘণ্টা তাদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকা স্থির করলাম। চরিত্রগঠনকে আমি তাদের শিক্ষার যথার্থ বনিয়াদ মনে করতাম এবং তাই ভাবলাম যে যদি এই ভিত্তি সুদৃঢ় ভাবে রচিত হয়, তবে এই বালক-বালিকারা নিঃসন্দেহে স্বয়ং বা অপর কোন মিত্রের সহায়তায় বাদবাকী সব কিছু শিখে নিতে পারবে।

এতদ্ব্যতিরেকে লিখতে পড়তে শেখাও প্রয়োজন মনে করে আমি শ্রীযুক্ত কেলেনবাক্ এবং প্রাগজী দেশাইএর সহায়তায় তার ব্যবস্থাও করলাম। শরীরগঠনের গুরুত্বও আমি কম করে দেখি নি। দৈনন্দিন কর্মসূচিতে এর ব্যবস্থা ছিল। কারণ ফার্মে কোন চাকর-বাকর ছিল না। রান্না থেকে আরম্ভ করে ঝাড়ুদারের কাজ পর্যন্ত সব-কিছু ফার্মের অধিবাসীদের করতে হত। অনেকগুলি ফলের বৃক্ষ থাকায় সেগুলির দেখাশুনা করতে হত এবং বাগানের কাজও যথেষ্ট ছিল। শ্রীযুক্ত কেলেনবাকের বাগানের শখ ছিল এবং তিনি একটি সরকারী আদর্শ বাগানে এ সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। রান্নার কাজ না থাকলে বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেরই বাগানের জন্য খানিকটা করে সময় দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। ছেলেমেয়েরা একাজে সবচেয়ে বেশী সময় দিত এবং তাদের গর্ত খোঁড়া, গাছ কাটা ও বোঝা বওয়া ইত্যাদি যাবতীয় কাজ করতে হত। এর ফলে তাদের যথেষ্ট ব্যায়াম হত। সানন্দে তারা এইসব কাজ করত। সুতরাং সাধারণতঃ তাদের এতদতিরিক্ত ব্যায়াম বা খেলাধূলার প্রয়োজন হত না। অবশ্য তাদের মধ্যে জনকয়েক প্রায় সদাসর্বদা এবং কখনও কখনও সকলে বিদ্রোহী হয়ে উঠত বা কাজে ফাঁকি দিত। সময় সময় আমি তাদের এ আচরণের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে এসব উপেক্ষা করতাম। আবার সময়ে আমি বেশ কঠোর হতাম। এই

কঠোরতা তারা পছন্দ করত না এমন কথা বলবো না, তবে তারা এর প্রতিরোধ করেছে—এ জাতীয় ঘটনা আমার মনে পড়ে না। যখনই আমি কঠোর হতাম, তখনই যুক্তি দিয়ে তাদের এ কথা বুঝিয়ে দিতাম যে কাজ নিয়ে তামাসা করা উচিত নয়। অবশ্য তাদের এ বোধ বেশীক্ষণ থাকত না এবং পর-মুহূর্তেই তারা হয়ত কাজ ফেলে খেলা শুরু করত। যাই হক আমরা কাজ চালিয়ে যেতাম এবং মোটামুটি তাদের সকলের সুন্দর স্বাস্থ্য গড়ে উঠেছিল। ফার্মে কেউ অসুখে পড়ত না বললেই চলে। তবে এ প্রসঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে নির্মল বায়ু জল এবং নিয়মিত সময়ে আহার ইত্যাদিও এর জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে একটি কথা বলব। প্রত্যেক বালক-বালিকাকে কোন-না-কোন প্রয়োজনীয় শরীর-শ্রমমূলক বৃত্তি শেখান আমার ইচ্ছা ছিল। এইজন্য শ্রীযুক্ত কেলেনবাক্ একটি ট্রাপিস্ট মঠে গিয়ে জুতা তৈরী করা শিখে আসেন। তাঁর কাছ থেকে এই বিদ্যা শিখে আমি যাঁরা ইচ্ছুক তাঁদের দেখালাম ও শেখালাম। শ্রীযুক্ত কেলেনবাক্ ছুতার মিস্ত্রির কাজ জানতেন এবং আমাদের পরিবারস্থ আর একজনও এ বিদ্যা জানতেন। ফলে সূত্রধার বৃত্তি শিক্ষা করার ছোটখাট একটি ক্লাস ফার্মে চলত। প্রায় প্রতিটি বালক-বালিকাই রন্ধনকলা জানত।

এসব তাদের কাছে নূতন ছিল ; স্বপ্নেও তারা কদাপি একথা চিন্তা করে নি যে তাদের একদিন এসব শিখতে হবে। কারণ সাধারণতঃ দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয় শিশুরা মোটামুটি লিখতে পড়তে ও হিসাব করতে শিখত।

টলস্টয় ফার্মে আমরা এই নিয়ম করি যে স্বয়ং শিক্ষকরা যা করবেন না, বালক-বালিকাদের তা করতে বলা হবে না এবং সেই জন্য তাদের কোন কাজ করতে বলা হলে সর্বদাই জনৈক শিক্ষক তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ও প্রত্যক্ষভাবে তাদের সঙ্গে কাজ

করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। অতএব ছোটরা যা কিছু শিখত তা হর্ষোৎফুল্ল চিত্তেই শিখত।

অবশ্য সাহিত্যরসপ্রধান শিক্ষা দেওয়া এতদপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। আমাদের কাছে এর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও সাধন-সামগ্রী ছিল না। এ ছাড়া এর জন্য যতটা সময় দেওয়া দরকার, তাও আমি দিতে পারি নি। আমাকে যে দৈহিক শ্রম করতে হত, তার ফলে দিনের শেষে আমি একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম এবং যখন আমার শরীর বিশ্রামের জন্য অতীব ব্যাকুল হয়ে পড়ত, তখনই ছিল আমার এইসব ক্লাসের সময়। সুতরাং পড়াতে যাবার সময় বেশ উৎফুল্ল ও কর্মঠ থাকার পরিবর্তে আমি অতি কষ্টে চোখের পাতা খুলে রাখতাম। সকাল বেলাটা ফার্মের কাজ এবং গৃহস্থালীর কাজকর্মে যেত বলে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পর পড়াবার সময় নির্দিষ্ট করতে হয়েছিল। পঠন-পাঠনের জন্য এতদপেক্ষা সুবিধাজনক সময় ছিল না।

সাহিত্যরসপ্রধান শিক্ষার জন্য আমরা বড় বেশী হলে তিন ঘণ্টা সময় দিতাম। হিন্দী তামিল গুজরাতী ও উর্দু শেখান হত এবং এইসব ভাষা ছাত্রদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত। ইংরাজীও শেখান হত। এ ছাড়া গুজরাতী হিন্দু ছেলেদের কিছুটা সংস্কৃত শেখান প্রয়োজন ছিল এবং প্রত্যেকটি বালক-বালিকাকে প্রাথমিক ইতিহাস ভূগোল এবং গণিত শেখানও দরকার বোধ করতাম।

তামিল ও উর্দু শেখানর ভার আমার উপর ছিল। আমার তামিল সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান ছিল, তা সমুদ্রযাত্রা ও কারাবাস-কালে শেখা। পোপলিখিত তামিল ভাষা শিক্ষার সুন্দর বইটি পর্যন্ত ছিল আমার দৌড়। একবার সমুদ্রযাত্রার সময় যতটুকু উর্দু হরফ শিখেছিলাম, আমার উর্দু জ্ঞানের গণ্ডি ততটুকু ছিল এবং মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে সান্নিধ্য লাভের দৌলতে কিছু সচরাচর

প্রচলিত উর্দু ও আরবী শব্দ শিখেছিলাম। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে যেটুকু সংস্কৃত শিখেছিলাম, তাই ছিল আমার দেবভাষার পুঁজি এবং আমার গুজরাতী ভাষার জ্ঞানও স্কুলের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

এই মূলধন নিয়ে আমাকে কারবার করতে হত। ভাষাজ্ঞানের দীনতা সম্বন্ধে আমার সাথীরা আমার চেয়েও এক কাঠি উপরে ছিলেন। কিন্তু স্বদেশীয় ভাষাসমূহের প্রতি আমার আকর্ষণ এবং শিক্ষক হিসাবে আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার আত্মবিশ্বাস ও আমার ছাত্রদের অজ্ঞতা এবং সর্বোপরি তাদের মহানুভবতার কারণে আমি ভাল ভাবে কাজ চালিয়ে যাই।

দক্ষিণ আফ্রিকাতেই তামিল ছেলেদের জন্ম হয় বলে তাদের মাতৃভাষায় যৎসামান্য জ্ঞান ছিল এবং তামিল লিপি তো তারা জানতই না। সুতরাং আমি তাদের তামিল লিপি এবং ব্যাকরণের প্রথম পাঠ শিক্ষা দিতাম। কাজ সহজ ছিল। আমার ছাত্ররা জানত যে ইচ্ছা করলেই তারা আমাকে তামিল ভাষায় বার্তালাপের প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করতে পারবে; ফার্মে কোন ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ তামিল আগন্তুক এলে ছাত্ররাই আমার দোভাষীর কাজ করত। আমি সানন্দে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম; কারণ কদাপি আমি ছাত্রদের কাছে নিজ অজ্ঞতা গোপন করার চেষ্টা করি নি। সর্বদা আমি তাদের নিকট নিজেকে যথার্থ স্বরূপে প্রকট হবার প্রযত্ন করেছি। তাই তামিল ভাষায় আমার প্রচণ্ড অজ্ঞতা সত্ত্বেও আমি তাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত হই নি। মুসলমান ছেলেদের উর্দু শেখান অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ছিল। তারা এর লিপি জানত। আমার কাজ ছিল শুধু তাদের ভিতর পড়ার আগ্রহ জাগান ও তাদের হস্তলিপির উন্নতি বিধান করা।

এখানকার ছেলেদের বেশীর ভাগ অক্ষরপরিচয়-বিহীন ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক-বর্জিত ছিল। কিন্তু কাজ আরম্ভ করে

দেখলাম যে, তাদের আলস্যভাব ছাড়ান ও তাদের লেখাপড়ার দেখাশুনা করা ছাড়া আমার আর তাদেরকে বিশেষ কিছুই শেখানর মতো ছিল না। এইটুকুতেই আমি তৃপ্ত ছিলাম বলে বিভিন্ন বয়ঃক্রমের ছেলেদের নিয়ে চলতে পারতাম এবং একই ক্লাসঘরে তাদের একসঙ্গে বিভিন্ন বিষয় পড়াতে পারতাম।

আজকাল আমরা পাঠ্য-পুস্তকের কথা খুব শুনি। আমি কিন্তু কখনও এর বিশেষ প্রয়োজন বোধ করি নি। এমন কি সহজলভ্য পুস্তকসমূহের খুব একটা ব্যবহার করেছি বলে মনে পড়ে না। বালকদের মাথায় পুস্তকের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বলে কখনও মনে হয় নি। আমার সদা-সর্বদা মনে হয়েছে যে ছাত্রদের সত্যকার পাঠ্যপুস্তক হচ্ছে তার শিক্ষক। আমার শিক্ষকরা পুস্তকের সাহায্যে আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার বিশেষ কিছুই আমার স্মরণ নেই; কিন্তু বই ছাড়া তাঁরা যা শিখিয়েছেন তার কথা স্পষ্ট মনে আছে।

শিশুরা চোখের তুলনায় কানের সাহায্যে বেশী শেখে এবং এ শিক্ষা হয়ও অল্পায়াসে। আমাদের ছেলেদের সঙ্গে কোন বই-এর প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েছি বলে মনে পড়ে না। তবে বিভিন্ন গ্রন্থপাঠে আমি যা শিখেছিলাম, তার সারমর্ম ছেলেদের আমি নিজের ভাষায় বলতাম এবং দৃঢ়তার সঙ্গে আমি বলতে পারি যে আজও তাদের মনে তার স্মৃতি জাগরূক আছে। বই পড়ে যা জানত, তা মনে রাখা তাদের পক্ষে কঠিন হত; কিন্তু মুখের কথায় তাদের যা শেখাতাম, তারা অবলীলাক্রমে তার পুনরাবৃত্তি করতে পারত। পড়া তাদের একটা কাজ বলে মনে হত, কিন্তু আমার কথা শুনতে তারা ভালবাসত। আমি আমার বক্তব্য হৃদয়গ্রাহী করে বলতাম। নীরসভাবে নিজ বক্তব্য পেশ করে তাদের বিরক্তির উদ্রেক করতাম না। আমার বক্তব্য শ্রবণ করে তারা যে সব প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ হত, তার দ্বারা তাদের বোধ-শক্তির পরিমাপ করতাম।

অতীব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি। আমি তাকে যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু সে একেবারে অটল রইল এবং এমন কি আমার উপর হম্বিতম্বি করা শুরু করল। অবশেষে আমি হাতের কাছের রুলটি তুলে নিয়ে তার বাহুমূলে একবার আঘাত করলাম। তাকে আঘাত করার সময়েই আমার দেহে কম্পন আরম্ভ হল, তবে সে এটা লক্ষ্য করে নি। তাদের সকলের পক্ষে এ অভিজ্ঞতা একেবারে অভিনব। বালকটি উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগল। আঘাত বেদনাদায়ক হওয়ায় সে কেঁদে ওঠে নি, সতের বছরের সুগঠিত দেহী যুবকটি ইচ্ছা করলে আমাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারত। কিন্তু এই বীভৎস পন্থা গ্রহণ করার পিছনে আমার যে মনোবেদনা বিদ্যমান, তা সে উপলব্ধি করল। এই ঘটনার পর আর কখনও সে আমার অবাধ্য হয় নি। আমি কিন্তু সেই হিংসাচারের জন্য এখনও অনুতাপ করি। আমি সেদিন তার সামনে আত্মা-সত্তার পরিচয় দিই নি, আমার ভিতরের পশুটিকে বন্ধনমুক্ত করে দিয়েছিলাম।

চিরকালই আমি চূড়ান্ত শাস্তির বিরুদ্ধে। আমার যতদূর মনে পড়ে জীবনে মাত্র একবারই আমি আমার একটি পুত্রের উপর দৈহিক নির্যাতন করেছিলাম। সুতরাং অদ্যাবধি আমি স্থির করতে পারি নি যে ঐ ভাবে রুল ব্যবহার করা আমার পক্ষে উচিত হয়েছিল কি না। সম্ভবতঃ কাজটা আমি ঠিক করি নি; কারণ ক্রোধ ও তাড়নার ইচ্ছাচালিত হয়ে আমি ঐ কাজ করেছিলাম। এ যদি শুধু আমার দুঃখের অভিব্যক্তি হত, তবে হয়ত এ আচরণকে সমর্থনযোগ্য মনে করতাম। কিন্তু এক্ষেত্রে মিশ্র উদ্দেশ্য ছিল।

এই ঘটনা আমাকে চিন্তার খোরাক দেয় এবং এর ফলে আমি ছাত্রদের সংশোধন করার শ্রেয়ঃতর পদ্ধতি আবিষ্কার করি। তবে সে পদ্ধতি পূর্বোক্ত ঘটনায় কার্যকরী হত কি না, একথা বলা কঠিন। ছেলেটি শীঘ্রই সে ঘটনার কথা বিস্মৃত হল এবং আমার

মনে হয় না যে তার বিশেষ কোন উন্নতি হয়েছিল। তবে এ ঘটনায় আমি ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে কি করণীয় আরও ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছিলাম।

এ ঘটনার পরও মাঝে মাঝে ছেলেরা অসদাচরণ করত; তবে আর কোনদিন আমি চূড়ান্ত শাস্তি দিই নি। এইভাবে আমাদের ছেলেমেয়েদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেবার প্রচেষ্টায় ক্রমশঃ আমি অধিকতর সুষ্ঠুভাবে আত্মার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হলাম।

বালক-বালিকাদের সুশিক্ষা দেওয়া ও মানুষ করা যে কঠিন কাজ দিনচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে কথা আমার কাছে স্পষ্ট হতে লাগল। ওদের সত্যকার শিক্ষক ও অভিভাবক হবার জন্য আমাকে ওদের অন্তর স্পর্শ করতে হবে, সুখ-দুঃখে ওদের সমব্যথী হতে হবে, ওদের সামনে যে সব সমস্যা উপস্থিত হবে তার সমাধানে ওদের সহায়তা দিতে হবে এবং ওদের উচ্ছ্বাস-স্ফীত যৌবনোচিত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপযুক্ত খাতে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে।

আমার অভিমত এই যে ছাত্রদের গর্হিত কার্যের জন্য সময়-বিশেষে শিক্ষকের অনশন করা-রূপী কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হতে পারে; কিন্তু এর জন্য স্বচ্ছ ও অনাবিল দৃষ্টিভঙ্গী এবং আধ্যাত্মিক পবিত্রতা প্রয়োজন। শিক্ষক ও ছাত্রের ভিতর সত্যকার প্রেম-সম্পর্ক না থাকলে এবং ছাত্রদের দুষ্কৃতি শিক্ষকের সত্তামূল স্পর্শ না করলে ও ছাত্রের মনে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে উপবাস করা অপ্রয়োজনীয় এমন কি হানিকারক সিদ্ধ হতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে উপবাসের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও ছাত্রের ত্রুটী-বিচ্যুতির জন্য শিক্ষকের দায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই।

আত্মকথা (১৯২৬), পৃঃ ৪০৭-১৫, ৪১৮ ও ৪১৯

জাতীয় বনাম সরকারী শিক্ষা

আমাদের একটি ছাত্র বরদৌলীর ব্যাপারে কারাবরণ করেছে এবং আরও অনেকে তার অনুগামী হবে। এরা বিদ্যাপীঠের গৌরব। আমাদের ছাত্রদের মনে এই জাতীয় ইচ্ছা উদিত হলেও সরকারী প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা কি কল্পনাতেও এর ঠাঁই দিতে পারে? তোমাদের মত বরদৌলীতে গিয়ে বল্লভভাইকে সাহায্য করা তাদের পক্ষে সহজ নয়। তারা শুধু গোপনে সহানুভূতি পোষণ করতে পারে। জাতীয় জীবনের সংকট-মুহূর্তে যদি আমাদের আবদ্ধ ও বন্দী করে রাখে, তাহলে চারুচর্চামূলক শিক্ষার মূল্য কি? জ্ঞান বা চারুচর্চা-মূলক শিক্ষা দ্বারা পুরুষত্বহীন করার ক্ষতিপূরণ করা যায় না।

ওদের এবং আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। আমরা ওদের মত করে ইংরাজী শেখাই না। কাজ চলা গোছের ইংরাজী জ্ঞান আমরা দিতে পারি। কিন্তু জাতিগত ভাবে আত্মহত্যা না করলে নিজের মাতৃভাষার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করতঃ ইংরাজীকে আমরা আমাদের চিন্তার বাহন করতে পারি না। আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে আমরা এই ক্ষতিকর প্রথার সংশোধন করতে চাই। শিক্ষণীয় প্রত্যেকটি বিষয় আমাদের গুজরাতীর মাধ্যমে শিখতে হবে। একে সমৃদ্ধ করে আমরা সর্বপ্রকারের চিন্তা ও ভাবধারা প্রকাশের উপযুক্ত করে তুলব। কুত্রাপি আমরা এ দেশের মত ব্যাপার দেখি না। এই কয় বৎসর ইংরাজীর মাধ্যমে সবকিছু শিক্ষা করার জন্য আমাদের উচ্চমূল্য দিতে হয়েছে। আমরা কর্তব্যচ্যুত হয়েছি।

এরপর অর্থশাস্ত্র শিক্ষা দেবার প্রণালীর কথা ধর। সরকারী প্রতিষ্ঠানের বর্তমান পদ্ধতি আতঙ্কজনক। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব অর্থশাস্ত্র রয়েছে। জার্মান পাঠ্যপুস্তকগুলি ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অবাধ বাণিজ্যাধিকার ইংলণ্ডের বাঁচার উপায় হতে

পারে আমাদের কাছে এ কিন্তু মৃত্যুতুল্য। ভারতীয় অর্থশাস্ত্র রচনা করার কাজ এখনও বাকী আছে।

ইতিহাসের ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাপার। কোন ফরাসী দেশীয় ব্যক্তি ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখলে নিজের মত করে তা লিখবেন। ইংরেজরা আবার পৃথক ভাবে তা লিখবেন। ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধের বিবরণ লেখক অনুসারে ভিন্ন হবে। কোন ভারতীয় দেশপ্রেমিক কর্তৃক মূল সূত্রাবলম্বনে লিখিত ইতিহাস কোন আমলা-তান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ইংরেজলিখিত ইতিহাস হতে পৃথক হবে, যদিও দুজনেই হয়ত ইতিহাস রচনা ব্যাপারে সততা অবলম্বন করেছেন। আমাদের জাতীয় জীবনের ঘটনাবলী বিশ্লেষণের ব্যাপারে ইংরেজদের দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে আমরা প্রচণ্ড ভুল করেছি। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তোমাদের ও তোমাদের শিক্ষকদের মৌলিক গবেষণা করার বিশাল ক্ষেত্র রয়েছে।

এমন কি আমাদের গণিতের মত বিষয়ের শিক্ষা-প্রণালীও পৃথক হবে। আমাদের গণিত-শিক্ষকেরা ভারতীয় পরিবেশ থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করবেন। এইভাবে তিনি গণিত শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ভূগোলও শিখিয়ে ফেলবেন।

তাছাড়া আমরা শরীরচর্চা এবং শিল্প শিক্ষার প্রতি বিশেষ জোর দিচ্ছি। একথা মনেও ঠাঁই দিও না যে এতে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি স্থূল হয়ে যাবে। আমাদের মস্তিষ্ককে কতকগুলি ঘটনাকে আটকে রাখার গুদাম বানাবার জন্য বোধশক্তির উন্মেষ হয় না। সময় সময় বিচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য অধ্যয়ন করার চেয়ে বুদ্ধি-সহকারে শিল্প শিক্ষা করলে মস্তিষ্কের বিকাশের পক্ষে তা অধিকতর সহায়ক হয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-৬-১৯২৮

১২

ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বাণী

সংখ্যা গৌরবে উল্লসিত হয় ভীরু। শৌর্যবানের গৌরব একক সংগ্রামে এবং আপনারা সকলে সেই শৌর্যের মন্ত্রে দীক্ষা নিতে এসেছেন। আপনারা এক বা একাধিক যাই হন না কেন, মনের এই সাহসিকতাই হচ্ছে আসল বীরত্ব এবং আর সবকিছু মিথ্যা। আর ত্যাগ দৃঢ়তা বিশ্বাস ও বিনয় ছাড়া মনের এই সাহসিকতা অর্জন করা যায় না।

আত্মশুদ্ধির ভিত্তিতে আমরা এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেছি। অহিংস অসহযোগ এর একটি অঙ্গ। অহিংস ও অসহযোগের এই "অ"-এর অর্থ হচ্ছে হিংসা ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল কিছু অর্থাৎ সরকারী নিয়ন্ত্রণের সঙ্গেও সম্পর্কচ্ছেদ। তবে যতদিন না আমরা 'অস্পৃশ্য' ভাইদের সঙ্গে সহযোগিতা করি, যতদিন না বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী ব্যক্তিদের ভিতর হৃদয়ের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যতদিন না দেশের জনগণের সুমহান মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমরা চরখা ও খদ্দরকে জীবনের অঙ্গীভূত করে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করি, ততদিন এই নঙর্থক পূর্ব সংযোজনাটি সম্পূর্ণরূপে অহেতুক। সে অসহযোগ অহিংসা-ভিত্তিক না হয়ে ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। গঠনমূলক নির্দেশ ছাড়া শুধু নেতিবাচক বিধান হচ্ছে প্রাণহীন দেহের মত এবং অগ্নিতে অর্পণ করলেই এর সদুপযোগ হবে। ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের জন্য সাত হাজার রেলওয়ে স্টেশন বিদ্যমান। এই সাত হাজার জনপদকেও আমরা চিনি বলে দাবি করতে পারি না। রেল স্টেশন থেকে দূরে অবস্থিত গ্রামগুলি সম্বন্ধে আমরা শুধু ইতিহাসের বই থেকে সংবাদ পেয়ে থাকি। এইসব গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ-সাধনকারী একমাত্র প্রেমবন্ধন হচ্ছে চরখা। এই মৌলিক সত্য যাঁরা এখনও বোঝেন নি, তাঁদের এখানে থাকা নিরর্থক হয়েছে। যে শিক্ষা ভারতের এই কোটী

কোটী বুভুক্ষু জনতার অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করে না ও এদের অবস্থার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয় না, তাকে "জাতীয়" আখ্যা দেওয়া চলতে পারে না। কর সংগ্রহের পর সরকারের সঙ্গে গ্রামের আর সম্পর্ক থাকে না। তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের সূত্রপাত হয় চরখার দ্বারা তাদের সেবার সূচনায়। তবে সেখানেই কিন্তু তার পরিসমাপ্তি নয়। চরখা হচ্ছে এই সেবাকার্যের কেন্দ্রবিন্দু। আপনাদের আগামী অবকাশ যদি কোন সুদূর গ্রামে কাটান তবে আমার কথার যথার্থতা বুঝতে পারবেন। দেখবেন যে সেখানকার অধিবাসীরা নিরানন্দ ও ভয়ভীত। বহু ঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে দেখবেন। বৃথাই আপনারা কোনরকম স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত বা ময়লা পরিষ্কারের ব্যবস্থা আছে কিনা খুঁজে বেড়াবেন। পশুগুলির অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা দেখবেন; কিন্তু তবুও সেখানে দৃঢ়মূল আলস্য চোখে পড়বে। লোকে আপনাদের জানাবে যে বহুদিন আগে ঘরে ঘরে চরখা ছিল; তবে আজ তারা চরখা বা অন্য কোন কুটীরশিল্প সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করবে না। তাদের ভিতর আশার লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। ইচ্ছা করলেই মরা যায় না বলে তারা বেঁচে আছে। আপনারা যদি সুতা কাটেন, তাহলেই তারা সুতা কাটা ধরবে। ৩০০ জন অধ্যুষিত কোন গ্রামের ১০০ জনও যদি সুতা কাটে তাহলে তারা যে বার্ষিক ১৮০০৲ টাকা রোজগার করতে পারে, এটা তাদের দেখিয়ে দিতে হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই অতিরিক্ত উপার্জনের ভিত্তিতে পল্লী-সংস্কারের স্থায়ী বনিয়াদ স্থাপিত হতে পারে। আমি জানি যে একথা বলা সহজ; কিন্তু করে দেখানো খুব কঠিন। বিশ্বাস থাকলে একাজ সহজে হতে পারে। মোহ আমাদের কানে কানে বলবে, 'আমি একা হাতে সাত লক্ষ গ্রামে কি করতে পারি?' এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ শুরু করুন যে একটি মাত্র গ্রামে কাজ আরম্ভ করে তা সফল হলে বাদবাকী সব আপনি হবে। তাহলে কাজের প্রগতি সম্বন্ধে চিন্তার কোন কারণ থাকবে না।

এই বিদ্যালয় আপনাদের ঐ জাতীয় কর্মীরূপে গড়তে চায়। একাজে যদি আনন্দ না থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে এ বিদ্যালয় আনন্দবিহীন এবং একে ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৬-১৯২৬

১৩

বিহার বিদ্যাপীঠের সমাবর্তন

প্রথমেই তিনি এই আশা প্রকাশ করলেন যে, সেদিন স্নাতকরা যে পবিত্র শপথ গ্রহণ করেছেন তদনুযায়ী তাঁরা জীবন যাপন করবেন। গুজরাত বিদ্যাপীঠের সমাবর্তন উপলক্ষে তিনি যা বলেছিলেন, তার পুনরাবৃত্তি করে তিনি বললেন যে, যদি একজন মাত্র আদর্শ শিক্ষক ও একজনও আদর্শ ছাত্র তৈরী হয়, তাহলে এই বিদ্যাপীঠ প্রয়োজনাতিরিক্ত কাজ করেছে বলে মানতে হবে। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের কাজ কি? এদের কাজ হচ্ছে সংখ্যায় যতই কম হোক না কেন, সাঁচ্চা রত্ন খুঁজে বার করা।

এরপর তিনি অসহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রিয়াত্মক এবং নেতিবাচক দিকের উল্লেখ করেন। প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলি এর নেতিবাচক দিক অর্থাৎ সরকারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কাজে সফল হয়েছে। যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষকদের তিনি সরকারী বিদ্যালয় ছাড়িয়েছেন, তার কথা মনে পড়লে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হয় না। এঁদের মধ্যে অনেকেই আবার পুরাতন জায়গায় ফিরে গেঁছেন এবং আরও অনেকে বর্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট জানা সত্ত্বেও গান্ধীজীর মনে তিলমাত্র অনুতাপ জন্মায় নি। এঁদের জন্য তাঁর দুঃখ হয়, এঁদের প্রতি তিনি সহানুভূতি বোধ করেন; কিন্তু মনে কখনও অনুতাপ বা অনুশোচনা হয় নি। "এইসব দুঃখকষ্ট আমাদের দৈনন্দিন ললাট-লিখন এবং এ আমাদের নিত্যসাথী। সত্যপালন যদি কুসুমাকীর্ণ শয্যায় শয়নতুল্য হয়, সত্যের জন্য যদি ত্যাগ ও

কৃচ্ছ্রসাধন নিষ্প্রয়োজন হয় ও এ পথে সবাই যদি সুখ ও আরাম পান, তাহলে সত্যের কোন সৌন্দর্যই অবশিষ্ট থাকবে না। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লেও আমাদের সত্য আঁকড়ে থাকতে হবে। সত্যপথাশ্রয়ী হবার জন্য আমাদের যদি ভারতবর্ষসহ সমগ্র বিশ্ব হারাতে হয়, তবে তাতে ক্ষতি কি? ঈশ্বরকৃপা লাভে সমর্থ হলে ভারতবর্ষসহ সমগ্র বিশ্ব আমাদের হবে এই বিশ্বাস হৃদয়ে নিয়ে জীবনে মরণে সত্যকে অনুসরণ করলে আমরা খাঁটি সত্যাশ্রয়ী বলে পরিগণিত হব। আমি জানি যে আমাদের শিক্ষক ও অধ্যাপকমণ্ডলীর অনেকেই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। দেশের আবহাওয়ায় পবিত্রতার পরশ দিতে হলে এই হচ্ছে খাঁটি প্রায়শ্চিত্ত।"

এ হচ্ছে নেতিবাচক কার্যক্রম এবং এ কাজের ব্যাপকতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যথোচিত পরিমাণ প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে জেনে তিনি সুখী। কিন্তু এই দ্বৈত বিশ্বের একটি ক্রিয়াত্মক দিকও আছে। এই দিকটিকে অধিকতর কঠিন আবার স্থায়ী ফলপ্রদ দুই-ই বলা চলে। এই জাতীয় বিদ্যাপীঠ ছাড়া আর কোথায় সে আদর্শ মূর্ত হতে পারে? এরপর তিনি ইউরোপ ও ভারতের শিক্ষাপদ্ধতির তুলনামূলক সমালোচনা করেন। "ইউরোপে ছাত্রের যেদিকে প্রতিভা আছে তার কথা খেয়াল করে শিক্ষা দেওয়া হয়। দেশের সংস্কৃতি ও প্রতিভার কথা স্মরণ রেখে একই বিষয় তিনটি দেশে হয়ত ত্রিবিধ উপায়ে শেখানো হয়ে থাকে। আমরা শুধু ইংলণ্ডের পদ্ধতির দাসোচিত অনুকরণে আনন্দ পেয়ে থাকি। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের পাশ্চাত্য পদ্ধতির একান্ত বশম্বদ অনুকরণকারীতে পরিণত করা। অবশ্য এতে আশ্চর্যের কারণ নেই। কারণ আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনে সম্পূর্ণরূপে অনিচ্ছুক একদল ব্যক্তিকে দেশের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের অধিনায়কপদে বরণ করার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে এই। মেকলে বেচারী আর কি করতে পারেন? তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে সংস্কৃত সাহিত্যই আমাদের যাবতীয়

কুসংস্কারের মূল এবং তাই পাশ্চাত্য সংস্কৃতিরূপী জীবন রসায়ন দিয়ে তিনি আমাদের পুষ্ট করতে মনস্থ করেছিলেন। অজ্ঞাতসারে আমাদের সর্বনাশের কারণ হয়েছিলেন বলে মেকলেকে তাই নিন্দা করার প্রয়োজন নেই। ইংরাজী ভাষা আমাদের শিক্ষার মাধ্যম হওয়ায় আমরা সবটুকু স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের অবস্থা পক্ষবিহীন পক্ষীর ন্যায়। আমাদের জীবনের চরমকাম্য হচ্ছে কেরানীগিরি বা সম্পাদকত্ব। এই পদ্ধতিতে আমাদের ভিতর একজন হয়ত লর্ড সিনহা হয়েছেন ; কিন্তু বাদবাকি সকলেই খুব বেশী হলে এই বিরাট বিদেশী যন্ত্রের অংশমাত্র। মজঃফরপুরে একটি ছেলে আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে জাতীয় বিদ্যালয়ে গিয়ে সে লাটসাহেব হতে পারবে কিনা ? আমি তাকে জবাব দিয়েছিলাম, "না, তুমি গ্রাম্য লাট হতে পার ; কিন্তু লর্ড সিনহা হতে পারবে না। সে ক্ষমতা আছে শুধু লর্ড বার্কনহেডের।"

দরিদ্রের পক্ষে যে শিক্ষা-ব্যবস্থার স্বাদগ্রহণ করা অসম্ভব, তার পীঠস্থান রচনার জন্য দরিদ্রেরই অর্থে নিত্য নূতন প্রাসাদোপম হর্ম্যরাজি নির্মাণ করার যে উন্মত্ততা দেশে প্রকট হচ্ছে, এরপর তিনি তার উল্লেখ করলেন : "একবার এলাহাবাদের ইকনমিক ইনষ্টিটিউটে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রফেসর জীভন্স্ আমাকে প্রতিষ্ঠানটি দেখাতে দেখাতে যখন বললেন যে এর ঘরবাড়ি তৈরী করতে ৩০ লক্ষ টাকার মত লেগেছে, তখন আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হল। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে অনশনে না রেখে এসব প্রাসাদ নির্মাণ করা সম্ভব নয়। নূতন দিল্লীর দিকে তাকিয়ে দেখুন, ঐ একই কাহিনী শুনতে পাবেন। রেলগাড়ীর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যে চমকপদ উন্নতি সাধন করা হয়েছে তার দিকে তাকান। এর মধ্যে সুবিধাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কথা খেয়াল করে দরিদ্রদের অবহেলা করার মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। শয়তানী না বলে একে আর কি আখ্যা দেওয়া যায় ? সত্যি কথা বলতে গেলে এর চেয়ে আর কতটুকু কম বলা যায় ? এ পদ্ধতির

জনকদের সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নেই। তাঁদের অন্য উপায় ছিল না। হাতী কি কখনও পিঁপড়ের কথা মনে রাখে? আমাদের প্রত্যেকটি কার্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তাঁদের হাতে এবং তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিও যদি বিশ্বের যাবতীয় সদিচ্ছা নিয়ে একাজে নামেন তবু আমাদের মত সুষ্ঠুভাবে একাজ নিষ্পন্ন করতে পারবেন না। কারণ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা সুবিধাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করেন। আমাদের চিন্তা করতে হবে বুভুক্ষু জনসাধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে।"

এর থেকে স্বভাবতই চরখার কথা উঠল এবং তিনি মন্তব্য করলেন যে চরখাই হবে আমাদের জাতীয় কার্যকলাপের অর্থদণ্ড বা কেন্দ্রবিন্দু।

"স্নাতকরা ডিগ্রী নিন এবং যা ইচ্ছা শিখুন। কিন্তু এ শিক্ষা যেন চরখা-কেন্দ্রিক হয়। তাঁরা যে অর্থশাস্ত্র ও বিজ্ঞান শিখবেন তা যেন চরখার সহায়তার্থ প্রযুক্ত হয়। চরখাকে যেন এক কোণে নির্বাসন না দেওয়া হয়। আমাদের যাবতীয় কর্মের সৌরজগতে চরখার স্থান সূর্যের মত। চরখা বিনা বিদ্যাপীঠ শুধু নামেই। লর্ড আরউইন একটি অতি সত্য কথা বলেছেন যে আইন-পরিষদ ইত্যাদির ভিতর দিয়ে যে কোন উন্নতির কথা চিন্তা করতে হলে আমাদের ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে চোখের সামনে রাখতে হবে। তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হবার কারণ নেই। এ পদ্ধতির সূর্য লণ্ডন এবং আমাদের পদ্ধতির সূর্য চরখা। আমি হয়ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছি; কিন্তু সে সম্বন্ধে আমাকে বুঝিয়ে না দিলে আমার মত পরিবর্তন হবে না। চরখা আর যাই করুক, কারও ক্ষতি করে না এবং চরখাকে বাদ দিলে আমরা (এবং আমি বলব যে সমগ্র বিশ্ব) উৎসন্নে যাবে। যে যুদ্ধের সময় অসত্য ভাষণকে উচ্চ কোটির ধর্ম আখ্যা দেওয়া হত, তার অবসানের পর ইউরোপের কি মনে হচ্ছে তা আমরা জানি। যুদ্ধোত্তর প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ব আজ ক্লান্ত এবং ভারতের আজকের অভয়দাতা চরখা কাল বিশ্বত্রাতার রূপ নিতে পারে। কারণ চরখার বনিয়াদ

'অধিক সংখ্যকের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থার' উপর নয়, এর লক্ষ্য হচ্ছে সকলের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা করা। কোন মানুষকে যখন আমি ভুল করতে দেখি, তখন মনে হয় ও ভুল আমারও। ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষ দেখলে আমার মনে পড়ে যে আমারও একদিন অমন গেছে। এইভাবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করি ও মনে হয় আমাদের মধ্যে দীনতম ব্যক্তিটি সুখী না হওয়া পর্যন্ত আমার সুখ নেই। এইজন্য আমি চরখাকে আপনাদের অধ্যয়নের কেন্দ্রবিন্দু করতে চাই। প্রহ্লাদ যেমন সর্বত্র রামকে দেখতেন এবং তুলসীদাস যেমন কৃষ্ণের বিগ্রহতেও রামের মূর্তি দেখতেন, তেমনি আপনাদের সকল জ্ঞান যেন চরখার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য নিয়োজিত হয়। আমাদের বিজ্ঞান সূত্রধরবিদ্যা ও অর্থশাস্ত্রআদি সকল বিষয়ই যেন চরখাকে দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিটির মুখ্য অবলম্বনে রূপায়িত করার কার্যে প্রযুক্ত হয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১০-২-১৯২৭

চতুর্থ অধ্যায়ঃ নবীন শিক্ষার ভূমিকা

১

জাতীয় শিক্ষা

বর্তমান শিক্ষার আধার-শিলারূপী পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণাদর্শ অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ এডিনবরা ও লণ্ডন থেকে আমদানী করা। নিঃসন্দেহে এসব বিদেশজ এবং এসবকে বাতিল না করলে কোন ক্রমেই জাতীয় শিক্ষার শিলান্যাস হতেপারে না। ভারতবর্ষ ইউরোপীয় শিক্ষা-পদ্ধতি ছাড়া বাঁচতে পারে কি না, সে সমস্যা সম্বন্ধে আমরা এখন আলোচনা করছি না। (তবে এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে আমাদের মতে ইংরাজী পদ্ধতি পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থারই একটি বিশেষ রূপ।) ইউরোপ আজ নিজসৃষ্ট মারণাস্ত্রে যে ভাবে আত্মঘাতী যুদ্ধে জড়িত ও যান্ত্রিকতা পুঁজিবাদ জঙ্গীবাদ ইত্যাদি যে ভাবে সে দেশে তাদের করাল বদন ব্যাদান করছে, ভারত যদি নিজ সন্তান-সন্ততিদের এই জাতীয় কাজের নায়ক মেকী ইউরোপীয়তে রূপান্তরিত করতে চায়, অর্থাৎ সৈনিক, মারণাস্ত্রের আবিষ্কারক, বিজ্ঞানের ব্যভিচারী এবং ঈশ্বরদ্রোহী সৃষ্টি করা যদি তার লক্ষ্য হয়, তবে যে-কোন বিপর্যয় আসুক না কেন তাকে সজ্ঞানে অকম্পিত চরণে বর্তমান পথ ধরে এগিয়ে চলতে হবে। সে অবস্থায় জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ছাড়াই এগিয়ে যাবার জন্য তাকে মনস্থির করতে হবে। কারণ জাতীয় শিক্ষায় পূর্বোক্ত লক্ষ্য সিদ্ধ হবে না, জাতীয় শিক্ষা তার সন্তান-সন্ততিদের ঐ প্রকার কার্যসাধনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবে না। একটি বিষয় আপনাদের স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। ভারতে বহু প্রাচীন ও সুবিন্যস্ত অখণ্ড ধারা প্রবাহিত থাকায় একদা এদেশে এক নিজস্ব শিক্ষা-পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল এবং তাই শুধু একেই "জাতীয়" আখ্যায় অভিহিত করা চলতে পারে। পরবর্তীকালীন ইঙ্গ-ভারতীয়

এবং তথাকথিত জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে এর এক মৌলিক প্রভেদ বিদ্যমান। তাহলে এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, শেষবারের মত স্পষ্টভাবে জাতীয় ও বিদেশী শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিতর যে-কোন একটিকে বেছে নিতে হবে। এবার শিক্ষার আসল ও নকল, শিক্ষার অর্থ ও লক্ষ্য এবং সাধ্য ও সাধনের মাঝে স্পষ্ট সীমারেখা টানতে হবে। এ যাবৎ এ কাজ শুরু হয় নি বললেই চলে। আমরা একরকম নিশ্চিত যে এই ভাবে বাছ-বিচার করার প্রয়োজনীয়তাই হয়ত তেমন কেউ উপলব্ধি করেন নি। এ বিষয়ে যতদিন এই গণ্ডগোল চলবে "জাতীয়" শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হবে না। এর কারণও অতীব স্পষ্ট। সরকার একপ্রকার শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং এই ক্ষেত্রে কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সরকারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথাই উঠতে পারে না। সরকারী সংগঠন তুলনায় বিশালায়তন, এর কর্তৃপক্ষের হাতে অনেক বেশী অর্থ ও তাঁরা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ লভ্যাংশ দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে সমর্থ। আমাদের বিশ্বাস মৌলিক স্থিতি সম্বন্ধে পূর্বাপর সুস্পষ্টভাবে চিন্তা না করা পর্যন্ত এই বনিয়াদী স্ববিরোধ অপনোদিত হবে না। সতর্ক ভাবে বিচার-বিবেচনার পর আমরা যদি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে জনগণকে অতঃপর জানিয়ে দেওয়া হবে যে ভবিষ্যতে আমরা সরকারী স্কুল-কলেজের অক্ষম অনুকরণমূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা না চালিয়ে একেবারে ভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির রূপায়ণ করব, তাহলে জনসাধারণ অবশ্যই আমাদের কথা শুনবেন। আমরা বিশ্বাস করি যে যাঁরা প্রচলিত ব্যবস্থার কারণে পীড়িত, যাঁরা সামাজিক ব্যবস্থার বিরোধী এবং যৌবনশক্তির অপচয় দৃষ্টে যাঁরা ক্ষুব্ধ, তাঁরা পরিত্রাণের একটি পথ পেয়ে ধন্য ধন্য করবেন। জাতীয় ও সামাজিক ঐতিহ্য পুনঃ প্রবর্তনের অপরিহার্য বিপ্লবের অগ্রদূতদের হাতে ভবিষ্যত নেতৃত্বের চাবিকাঠি থাকবে।

এর জন্য নিম্নোক্ত বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা ভীষণ দৃশ্যগোচর অভিশাপ হচ্ছে (এটা আবার

আরও একটি গভীর ত্রুটির দ্যোতক) এই যে, এ শিক্ষা আমাদের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। সুশিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই যুগকে পূর্বসূরীদের সম্পদভার বহনে উপযুক্ত করা এবং সমগ্র সমাজ-জীবনকে অসংহতি ও দুর্বিপাকের হাত থেকে বাঁচিয়ে সজীব রাখা। সমাজ-জীবনের সম্পত্তির উত্তরাধিকার-ভার অবিচ্ছিন্ন এবং তাই কোন সময় সমাজ যদি তার পূর্বসূরীদের কর্মপ্রচেষ্টা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্বন্ধবিবর্জিত হয়ে যায় বা কোন কারণে নিজ সংস্কৃতির জন্য লজ্জা বোধ করে, তাহলে তার সমাধি রচিত হয়েছে বলতে হবে। কতিপয় সুমহান্ আনুগত্য-শক্তি সমাজকে ধারণ করে আছে। বিশ্বাস বৃত্তি পিতামাতা পরিবার ও ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন-রূপে এই আনুগত্য-শক্তি প্রকট হয়। ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থা অবিসম্বাদীরূপে আত্মগরিমা ও সেবার সেই সনাতন ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছিল। আবার আধুনিক বিদেশী ও বিজাতীয় শিক্ষা যে তরুণসম্প্রদায়কে জীবনের যে-কোন প্রয়োজনীয় অভীষ্ট সাধনের অযোগ্য করে ফেলে—এ কথাও সমপরিমাণে সত্য। ইংরাজী স্কুলে যাঁরা নিজ সন্তান-সন্ততিদের পাঠান তাঁদের অধিকাংশই হচ্ছেন ঈশ্বরে গভীরভাবে বিশ্বাসী কৃষিজীবী নরনারী। একথা সন্দেহাতীত যে এইসব নব্য যুবক শিক্ষা সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তন করলে দেখা যায় যে তারা কৃষির বিন্দু-বিসর্গ জানে না এবং বস্তুতঃ তাদের হৃদয়ে নিজ জনকের পেশার প্রতি গভীর অনুকম্পাভাব বিদ্যমান। তারা এ কথাও ঘোষণা করে যে তারা সকল প্রকার ঈশ্বর-বিশ্বাসের উর্ধ্বে উঠে গেছে এবং তাঁর সর্ব-কল্যাণকর সত্তায় তাদের আস্থা নেই। এই বিয়োগান্তক ঘটনার সর্বনাশা পরিধি সরকারের কৃপাশ্রিত নির্দিষ্ট গুটিকয়েক কেরাণী ও হাকিমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ভেবে বাস্তব পরিস্থিতিকে গোপন করা যাবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে একের পর এক "রিফর্ম" বা সংস্কার হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা বিচারের জন্য কত শত কমিশন বসেছে, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কথা

হয়েছে ; কিন্তু কদাপি স্বপ্নেও এ কথা চিন্তা করা হয় নি যে সমগ্র জাতির জীবন ও বিকাশের উপায় অঙ্কুরে বিনষ্ট করেছে বলে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাই পাপে পরিপূর্ণ। এই প্রথাকে সমূলে বাতিল করতে হবে। লর্ড মেকলে তাঁর প্রাণঘাতী রায় দেবার পূর্বে এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হবারও পূর্বে শিক্ষা-ব্যবস্থার স্বরূপ কি ছিল, সে সম্বন্ধে অবিলম্বে তত্ত্ব-তল্লাস করতে হবে। এক্ষেত্রে ত্বরিৎগতি একান্ত অপরিহার্য ; কারণ প্রাচীন গুরুবংশ প্রায় বিলুপ্তির শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছে এবং তাঁদের সঙ্গেই হয়ত তাঁদের পদ্ধতি বিস্মৃতি-সাগরে চিরবিলীন হয়ে যাবে। সেইসব পাঠ্যক্রম পুনঃ প্রবর্তনের অর্থ হয়ত আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাস ও ভূগোলের বিলুপ্তিকরণ ; কিন্তু এ সম্ভাবনায় আমরা তিলমাত্র বিচলিত নই। অন্ততঃ দেশের একটি কোণে আমরা প্রাচীন পাঠ্যক্রম সৃষ্ট ফলপ্রাপ্তির প্রচেষ্টা করছি এবং মুক্ত বিবেকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আমরা ঘোষণা করেছি যে এর পরিণাম ইউরোপের সর্বাধুনিক অবদান অপেক্ষা বহুগুণ কর্মকুশল ও সন্তোষজনক। তবে একথাও আমরা স্বীকার করছি যে এ অভিমত কোন বিশেষজ্ঞের নয়। এইজন্য আমরা চাই যে বিশেষজ্ঞেরা এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করুন। এ সম্ভব হলে এবং তার পরিণাম গ্রহণে আমরা প্রস্তুত হলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এদেশের অধিবাসিবর্গ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা বোধ করবেন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-৩-২৪

২

সংস্কৃতির পরিপন্থী

প্রায় একেবারে প্রথম থেকেই আজকালকার পাঠ্যপুস্তকসমূহে এমন সব বিষয়ের অবতারণা করা হয়ে থাকে যার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের গৃহ-পরিবেশের কোন সম্বন্ধই নেই। প্রত্যুত এসব বিষয় তাদের কাছে একেবারে অপরিচিত। গার্হস্থ্য জীবনের কোন্‌টা উচিত

এবং কোন্‌টা অনুচিত, তা কোন বালক পাঠ্যপুস্তক মারফত শেখে না। তাকে কদাচ নিজ পরিবেশের জন্য গর্ব অনুভব করতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। বিদ্যালয়ে যতই সে উচ্চ শ্রেণীতে ওঠে ততই তাকে ক্রমাগত গৃহ-পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং শিক্ষা সমাপনান্তে সে নিজ পরিবেশের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে ওঠে। নিজ গৃহের জীবনযাত্রায় সে কাব্য-সুষমা দেখতে পায় না। গ্রাম্য দৃশ্যাবলী তার কাছে এক বন্ধ-প্রচ্ছদপট গ্রন্থের মত প্রতীয়মান হয়। তার নিজস্ব সভ্যতাকে মনীষাহীন বর্বর ও কুসংস্কারপূর্ণ এবং বাস্তব জীবনে একেবারে অপ্রয়োজনীয়রূপে তার কাছে চিত্রিত করা হয়। নিজ সনাতন সংস্কৃতির প্রতি তাকে বিরূপ ভাবাপন্ন করার জন্য বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। তবে অধিকাংশ শিক্ষিত যুবক যে পরিপূর্ণভাবে জাতীয় ঐতিহ্য-বিবর্জিত নয়, তার রহস্য হচ্ছে এই যে আমাদের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির বিকাশের পরিপন্থী শিক্ষা-ব্যবস্থা যুবকদের উপর চাপিয়ে দিলেও সেই সংস্কৃতি তাদের মনে এমন গভীরভাবে দৃঢ়মূল যে সম্পূর্ণভাবে তার মূলোৎপাটন করা অসম্ভব। ক্ষমতা থাকলে আমি নিঃসন্দেহে আজকালকার পাঠ্যপুস্তকরাজির অধিকাংশ বিনষ্ট করে ফেলতাম এবং এমন সব পাঠ্যপুস্তক লেখাবার ব্যবস্থা করতাম, যাতে ছাত্রদের গৃহের পরিবেশের সঙ্গে সম্বন্ধও সম্পূর্ণ থাকবে এবং এর ফলে ছাত্র শিক্ষালাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তার সন্নিকটস্থ পরিবেশে সেই শিক্ষার প্রয়োগ করতে পারবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ১-৯-২১

৩

পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক নেই

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের পরিবেশের সঙ্গে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার কোন সম্পর্ক নেই এবং তার ফলে জাতির যে অতিমাত্রায় স্বল্পসংখ্যক

বালক-বালিকা শিক্ষা পায়, তারা এই পরিবেশকে এক রকম তিলমাত্র প্রভাবিত করতে পারে না বললেই চলে।

হরিজন, ২৩-৫-৩৬

৪

শিক্ষা ও ভবিষ্যত জীবন

যতই সদিচ্ছা থাকুক না কেন ইংরেজ শিক্ষকদের পক্ষে ইংরেজ ও ভারতীয়দের প্রয়োজনের পার্থক্য পূর্ণতঃ অনুধাবন করা অসম্ভব। আমাদের দেশের জলবায়ুতেও সে দেশের মত স্কুল-ভবন ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে না। এ ছাড়া আমাদের ছেলেমেয়েরা মূলতঃ গ্রামীণ পরিবেশে মানুষ হয় বলে তাদের শিক্ষা-পদ্ধতি প্রধানতঃ নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রভাবে মানুষ ইংরেজ ছেলেদের মত হবে না।

বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর আমাদের ছেলেদের শ্লেট পেনসিল বা বইএর প্রয়োজন খুব একটা পড়ে না। তাদের এমনসব সরল গ্রাম্য যন্ত্রপাতি প্রয়োজন, যা তারা সহজে চালাতে পারে ও যাতে তাদের কিছু উপার্জন হয়। এর অর্থ হচ্ছে—শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করা। কিন্তু এক্ষেত্রে বিপ্লব সংঘটিত না হলে আর কোন উপায়েই শিক্ষাকে দেশের প্রতিটি শিশুর জন্য সহজলভ্য করা যাবে না।

একথা স্বীকার করা হয় যে বর্তমানে সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমূহে তথাকথিত লেখা, পড়া ও গণিত সম্বন্ধে যে সাধারণ জ্ঞান দেওয়া হয়, বালক-বালিকাদের ভবিষ্যৎ জীবনে তার প্রয়োজন অতি অল্পমাত্রাতেই পড়ে। স্রেফ চর্চার অভাবে এর অধিকাংশই তারা এক বৎসরের মধ্যে বিস্মৃত হয়। তাদের গ্রামীণ পরিবেশে এর প্রয়োজন ঘটে না।

কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশের অনুকূল বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা যদি করা যায় তবে তার ফলে শুধু শিক্ষাকালীন ব্যয়নির্বাহ-ব্যবস্থাই হবে না, পক্ষান্তরে সে শিক্ষা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে

লাগবে। যদি কোন বিদ্যালয়ে সুতাকাটা এবং বুনাই শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকে ও:তার সঙ্গে যদি কাপাস চাষের জন্য খানিকটা জমি থাকে, তবে আমার মনে হয় বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে।

আমি যে পরিকল্পনার আভাস দিলাম তাতে চারুচর্চামূলক শিক্ষাকে বর্জন করা হয় নি। লিখতে পড়তে এবং মোটামুটি গণিত না জানলে কোন রকম প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হল বলা চলবে না। প্রাথমিক পর্যায়ের শেষ বৎসরে যখন বালক-বালিকারা সত্য সত্যই সঠিকভাবে বর্ণপরিচয়ের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তাদের লিখতে পড়তে শেখান হবে। হস্তলিপি একটি চারুকলা। শিল্পীর চিত্রাঙ্কনের মত প্রত্যেকটি হরফকে সঠিকভাবে ও সযত্নে অঙ্কন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বপ্রথম মোটামুটি অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা দিলে তবে এ সম্ভব। এইভাবে বিদ্যালয়ে অধিকাংশ সময় কারিগরী বিদ্যা শেখার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ মুখে-মুখে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক ইতিহাস, ভূগোল এবং গণিত শিক্ষাদানের কার্যক্রম চলতে থাকবে। মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহার করার কলা তারা শিখবে, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও সাফাই বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ পাঠ নেবে এবং এই সব তারা তাদের গৃহে মূর্ত করে নীরব বিপ্লবীতে পরিণত হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৭-২৯

৫

অন্তরের শিক্ষা

অন্তরের শিক্ষার বিষয়ে একটি কথা বলব। এ যে পুঁথিপত্রের দ্বারা দেওয়া যায়, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। মাত্র শিক্ষকের প্রাণময় সাহচর্যে এ শিক্ষাপ্রাপ্তি সম্ভব। কিন্তু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক কারা? তাঁরা কি বিশ্বাস ও চারিত্র-শক্তির আকর? তাঁরা কি স্বয়ং এই হৃদয়ের শিক্ষণ লাভ করেছেন? তাঁদের

হাতে যে সব ছেলেমেয়েদের সঁপে দেওয়া হয়, তাদের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁদের হাতে হবে—এ আশা কি পোষণ করা যায়? প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক নিয়োগ-পদ্ধতি কি চরিত্র গঠনের পথে সফল বাধা নয়? শিক্ষকরা কি কোন মতে জীবন ধারণ করার মতও পারিশ্রমিক পান? এ ছাড়া আমরা জানি যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্বাচনকালে স্বদেশহিতৈষণার কথা স্বপ্নেও মনে ঠাঁই দেওয়া হয় না। যাঁদের কোন গতি নেই, তাঁরাই এ পথে আসেন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৯-২১

৬

অন্তরের পবিত্রতা অপরিহার্য

সুষ্ঠু শিক্ষার সৌধ রচনার্থ ব্যক্তিগত জীবনের শুচিতা এক অপরিহার্য শর্ত। আমি সহস্র সহস্র ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পাই ও প্রতিনিয়ত ছাত্রদের নিকট থেকে অজস্র পত্র পাই এবং এই অবকাশে তারা পরম বিশ্বাসভরে আমার কাছে তাদের হৃদয়ের দুয়ার উন্মুক্ত করে থাকে। ছাত্রমানসের এই রকম অভিজ্ঞতার আলোকে আমি স্পষ্টতঃ দেখতে পাই যে, পূর্বোক্ত ব্যক্তিগত জীবনের শুচিতার জন্য এক্ষেত্রে বহু কিছু করণীয় বাকী আছে। আমার বিশ্বাস, তোমরা আমার ইঙ্গিত বুঝতে পারছ। আমাদের ভাষায় ছাত্র শব্দটির একটি চমৎকার প্রতিশব্দ আছে। ছাত্রের অপর নাম ব্রহ্মচারী। বিদ্যার্থী শব্দটি যেন জোর করে করা এবং ব্রহ্মচারী শব্দের সঙ্গে এর তুলনাই চলতে পারে না। আমি আশা করি যে তোমরা ব্রহ্মচারী শব্দটির তাৎপর্য জান। এর অর্থ ঈশ্বর-সন্ধানী, এর অর্থ সংক্ষিপ্ততম সময়ের ভিতর ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ মানসে উৎসর্গিত জীবন। পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধর্মমতের ভিতর অন্য বিষয়ে যতই মতদ্বৈধতা থাকুক

না কেন, এই মৌলিক বিষয়ে তারা একমত যে অশুচিহৃদয় নরনারী কোনক্রমেই তাঁর মহান্ শ্বেত শুভ্র সিংহাসনের ছায়াতলে শরণ পেতে পারে না। হৃদয় পবিত্র করতে না শিখলে বেদোচ্চারণ বা সংস্কৃত, লাতিন, গ্রীক ইত্যাদির শুদ্ধ জ্ঞান—সবই অযথা। চরিত্র-গঠনই হবে সকল প্রকার শিক্ষার অন্তিম লক্ষ্য।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-৯-২৮

৭

ছাত্রসমাজ ও চরিত্র

জনৈক ছাত্র লিখছেন ঃ

"প্রায়ই আপনি আপনার সমালোচকদের এমন জবাব দেন যা যুক্তির দিক অকাট্য এবং মনকেও তা একটা সাময়িক সন্তুষ্টি দেয়; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সমস্যা যেমনকার তেমনি থেকে যায়। উদাহরণস্বরূপ আপনার 'সংখ্যা গৌরবে উল্লসিত হয় ভীরু' (তৃতীয় অধ্যায় ঃ দ্বাদশ প্রবন্ধ) উক্তিটির কথা ধরুন। যুক্তির দিক থেকে কথাটি ঠিক। কথাটি শুনলে সাময়িকভাবে মনে মনে একটা ভরসাও হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এর মূল্য কতটুকু? কোন রকম বাছবিচার না করে সবার কাছে আপনি আপনার আত্মিক শক্তির কথা প্রচার করেন। কিন্তু আপনি কি একথা বিশ্বাস করেন যে যাঁদের চরখা-খদ্দরের উপর বিশ্বাসটুকুও নেই তাঁরা কেউ আপনার ঐ সব মাত্রাতিরিক্ত আদর্শবাদী উক্তি নিয়ে মাথা ঘামাবে? আপনার এই সব প্রচার কি হাঁসের গায়ে জল ছিটাবার মত নিতান্ত নিরর্থক প্রচেষ্টা নয়?"

আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি আত্মিক শক্তি সম্বন্ধে আমার উপদেশ সাময়িকভাবে অকার্যকরী মনে হলেও পূর্ণমাত্রায় পণ্ডশ্রম নয়। লোকে বলে ঘসতে ঘসতে পাথরের ক্ষয় হয়। আর আমি বিশ্বাস করি যে আজকে যাকে পত্রলেখকের মাত্রাতিরিক্ত

আদর্শবাদী উক্তি বলে মনে হচ্ছে কাল তা বাস্তব সত্য বলে প্রতীয়মান হবে। ইতিহাস এরকম উদাহরণে পূর্ণ। আজকের ছাত্রসমাজের কাছে "আত্মিক শক্তি" শব্দটি যদি অর্থহীন মনে হয় তাহলে বুঝতে হবে যে কী শোচনীয় অধঃপতন আমাদের ঘটেছে। কারণ আত্মা ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের মত শাশ্বত বিষয়কে আমাদের যুবসম্প্রদায় অলীক মনে করবেন এবং ক্ষণস্থায়ী ফন্দি-ফিকিরকেই তাঁদের একমাত্র বাস্তব জিনিস মনে হবে—এটা কি নিতান্ত পরিতাপজনক নয়?

নিছক সংখ্যাশক্তির অকিঞ্চিৎকরতা নিত্য আমরা চোখের সামনে দেখছি। ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উপর এক লক্ষেরও কম ইংরেজ প্রভুত্ব করছে দেখার পরও সংখ্যাশক্তির অকিঞ্চিৎকরতার সপক্ষে আর কি প্রমাণ চাই? সিংহকে দেখা মাত্র হাজার হাজার ভেড়া পালান শুরু করে। এর কারণ অতীব স্পষ্ট। মেষের দল তাদের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন এবং সিংহ নিজের শক্তির কথা জানে। সুতরাং সিংহের শক্তি-সচেতনতা মেষের দলের সংখ্যাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে দেয়। অনুরূপ ভাবে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই না যে "অধ্যাত্ম শক্তি" বা "আত্মার শক্তি" নিছক স্বকপোল-কল্পিত কোন কিছু বা অলীক কল্পনা নয়—এ হল বাস্তব সত্য।

সংখ্যাশক্তিকে আমি হতাদর করছি না। এর প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু কেবলই তখন যখন এর পিছনে প্রচ্ছন্ন শক্তির আভাস থাকে। হাতির দুর্বল জায়গায় সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করতে পারলে লক্ষ লক্ষ পিপীলিকার হাতে হাতির মৃত্যু ঘটতে পারে। পিপীলিকাদের সংহতিবোধ, দৈহিক ভিন্নতা সত্ত্বেও চেতনার অভিন্নতা সম্বন্ধে বোধ অর্থাৎ তাদের চৈতন্যশক্তি পিপীলিকাদের দুর্ধর্ষ করে তোলে। অনুরূপভাবে আমরাও পিপীলিকাদের মত গণসংহতি বোধ দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠা মাত্র অপ্রতিরোধ্য হব এবং দাসত্ব-শৃঙ্খলের বন্ধন ভেঙ্গে ফেলব।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও তারা যদি যথার্থ আত্মত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় এবং নিজেদের আদর্শের উপর যদি তাদের জ্বলন্ত আস্থা থাকে তাহলে তারা সরকারী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ছাত্রের তুলনায় দেশের অধিকতর কল্যাণসাধন করবে। গুণ সংখ্যার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ—এ তত্ত্ব যথার্থ। কারণ বাস্তবে এই ঘটে। প্রত্যুত পক্ষে আমি মনে করি যে যাকে বাস্তবে প্রমাণ করা যায় না তা তাত্ত্বিক দিক থেকেও যথার্থ হতে পারে না।

গ্যালিলিও যখন ঘোষণা করলেন যে পৃথিবী গোলাকার এবং আপন অক্ষের চতুর্দিকে আবর্তিত হচ্ছে তখন তাঁকে কল্পনাবিলাসী ও স্বপ্নলোকচারী বলে উপহাস করা হয়েছিল এবং তাঁর উপর কটূ কাটব্যের বর্ষণ হয়েছিল। আজ কিন্তু আমরা জানি যে গ্যালিলিও ছিলেন অভ্রান্ত। আর তাঁর যেসব বিরোধী পৃথিবীকে স্থাণু ও সমতল জানতেন তাঁরাই অজ্ঞানের ধূম্রলোকে বিচরণ করতেন।

আজকালকার শিক্ষা আমাদের দৃষ্টিকে আত্মা ও আধ্যাত্মিকতা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই আত্মিক শক্তি বা আধ্যাত্মিক শক্তির সম্ভাবনার কথা আমাদের মনে সাড়া জাগায় না, আমাদের দৃষ্টি কেবলই গিয়ে পড়ে অস্থায়ী ক্ষণস্থায়ী ভৌতিক শক্তির উপর। নিঃসন্দেহে এ হল নীরস কল্পনা-শক্তিবিহীনতার দ্যোতক।

আমি কিন্তু আশা ও ধৈর্যের পরিমণ্ডলে বসবাস করি। আমার বক্তব্যের অভ্রান্ততায় আমার অবিচল আস্থা আছে। এ বিশ্বাসের আধার হল আমার নিজের এবং আমার সহকর্মীবৃন্দের অভিজ্ঞতা। আর ধৈর্য ও অনাসক্ত গবেষণা বৃত্তিবিশিষ্ট প্রতিটি ছাত্র স্বয়ং নিম্নোক্ত বিষয়গুলি হাতে-কলমে প্রমাণ করতে পারবেন ঃ

(১) নিছক সংখ্যাবল অকিঞ্চিৎকর।

(২) আত্মিক শক্তি ছাড়া আর সব শক্তি ক্ষণস্থায়ী ও নিরর্থক।

একথা বলাই বাহুল্য যে উপরি-উক্ত বক্তব্য যদি যথার্থ হয় তাহলে প্রত্যেক ছাত্রের কর্তব্য হচ্ছে আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে এই অতুলনীয় আয়ুধের অধিকারী হবার প্রয়াস করা।

-ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৪-১১-১৯২৯

৮

স্বাধীনতা কিন্তু শৃঙ্খলার অধীন

ছাত্রদের পথিকৃৎ-বৃত্তি থাকবে। তাদের কেবল অনুকরণকারী হলে চলবে না। নিজেদের জন্য চিন্তা ও কাজ করতে তারা শিখবে। তবে তাদের ভিতর পূর্ণ মাত্রায় আনুগত্য ও শৃঙ্খলা-বোধ থাকবে। চূড়ান্ত স্বাধীনতার ভিতর অত্যুগ্র শৃঙ্খলা ও বিনম্রতা অন্তর্নিহিত। নিয়মানুবর্তিতা ও নম্রতাজাত স্বাধীনতা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। বল্গা-বিহীন স্বেচ্ছাচার অশ্লীলতাদ্যোতক এবং এ সমভাবে স্বয়ং ও প্রতিবেশী—উভয়েরই অহিতকারক।

য়ং ইণ্ডিয়া, ৩-৬-২৬

৯

শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতার সপক্ষে

গুজরাতের আমার সাম্প্রতিক সফরের সময় দেখেছি যে বহু সংখ্যক ছাত্র আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। তবে তাদের মধ্যে অধিকাংশের পরিধানেই মলিন ও নোংরা পোষাক দেখেছি। অনেক টুপিতে ঘাম আর ময়লার একটা পুরু আস্তর পড়েছিল এবং ফলে তা থেকে এমন দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল যে সেই সব ছাত্রদের স্পর্শ করা কারও পক্ষে অসম্ভব। অনেকের পরনে বিচিত্র ধরণের পোষাক ছিল। কোন কোন ছাত্র আবার প্রয়োজনাতিরিক্ত জামা কাপড় গায়ে চাপিয়েছিল। কেউ কেউ আবার এমন প্যাণ্ট পরে এসেছিল যাতে বোতামের বালাই নেই। কারও কারও

পোষাক আবার শতছিন্ন। ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত ছাত্রদের যেমন বিদ্যালয়ে আসতে দেওয়া হয় না আমার মতে তেমনি অপরিষ্কার দেহ ও পরিচ্ছদ এবং ছিন্নভিন্ন পোষাক-পরিধানকারী ছাত্রদের বিদ্যালয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করা উচিত। প্রশ্ন উঠবে ঃ এই রকম আদর্শ ছেলের দল কোথায় এবং কার কাছে তারা সৌন্দর্য জ্ঞান এবং ভব্যতা সম্বন্ধে শিক্ষা পাবে ? এর প্রতিবিধান খুবই সহজ। শিক্ষক সর্বপ্রথম এই রকম ছাত্রদের বিদ্যালয়ের স্নানাগারে নিয়ে গিয়ে স্নান করাবেন। এর পর তাদের কাপড় কাচতে বলা হবে এবং তাদের নিজেদের কাপড় যখন শুকাতে থাকবে তখন তারা বিদ্যালয় থেকে সরবরাহ করা কাপড় চোপড় পরবে। তাদের নিজেদের কাপড় শুকিয়ে গেলে বিদ্যালয়ের পোষাক কেচে তারা ফেরত দেবে। যদি মনে হয় যে এ প্রস্তাবকে কার্যকরী করতে এমন একটা খরচ হবে যা মেটাবার সঙ্গতি বিদ্যালয়ের নেই তাহলে এইরকম ছেলেদের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং কেন তাদের ফেরত পাঠান হল তার কারণ একটি কাগজে লিখে তাদের হাতে দিতে হবে। তবে স্নান করে এলে আবার তাকে ক্লাসে নেওয়া হবে। বিদ্যালয়ের তরফ থেকে সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং ভব্য আচার ব্যবহারের পাঠ দেওয়া হবে। ছাত্রদের একরকমের পোষাক পরে আসতে বাধ্য করা যদি নেহাৎ কঠিন মনে হয় তবু ছেঁড়াখোড়া নোংরা অথবা অভব্য পোষাক পরাকে উৎসাহ দেওয়া চলবে না।

এই ভাবে ব্যায়াম ও কুচকাওয়াজের উপর মনোযোগ দিতে হবে। শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য এর সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। ঠিকভাবে চলা বসা ও দাঁড়ানোর নিয়ম ছেলেরা জানবে। হাজার হাজার ছেলে এক সঙ্গে চললেও তারা যাতে পরস্পরের পায়ের সঙ্গে মিলিয়ে চলতে পারে তার শিক্ষা তাদের দিতে হবে। পিঠ কুঁজো করে একজন নিস্তেজ হয়ে বসে আছে, আর একজন বসে আছে পা ছড়িয়ে, তৃতীয়জন হাই তুলছে

এবং চতুর্থজন কেঁদেই চলেছে—কোন ভাল বিদ্যালয়ে এরকম দৃশ্যের অবতারণা হতে দেওয়া চলে না। এই ভাবে ছাত্রদের যদি যথেচ্ছ চলতে দেওয়া যায় তাহলে হাজারে হাজারে এক সঙ্গে এক তালে চলবে কি করে? ছেলেদের একেবারে গোড়া থেকে এসব শেখাতে হবে। এর ফলে তাদের ভিতর শিষ্টতাবোধ জাগাবে। তাদের ঝরঝরে ও চটপটে দেখাবে। বিদ্যালয়ের মর্যাদাবৃদ্ধি হবে এবং সেখানে উৎফুল্লকর পরিবেশ গড়ে উঠবে। এইভাবে প্রশিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবোধ দ্বারা চালিত ছাত্রদের তখন হাজারে হাজারে এক সঙ্গে বাইরে নিয়ে গেলেও আমাদের আজকের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে যেমন গোলমাল অথবা গণ্ডগোল হয়ে থাকে, সেরকম কিছু হবে না। দুই একটি এমন বিদ্যালয়ও আমি দেখেছি যেখানে বাঁশীর আওয়াজ শোনার তিন মিনিটের ভিতর ৯০০ ছাত্র নিঃশব্দে নির্ধারিত জায়গায় সমবেত হল এবং কাজ সারা হতেই তেমনি নিঃশব্দে আবার নিজ ক্লাসে ফিরে গেল—যেন তারা আদৌ আসে নি।

আমার মতে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পোষাক হওয়া উচিত শার্ট প্যাণ্ট ও একটি টুপি। এই-ই যথেষ্ট। পোষাক পরিষ্কার থাকলে শত শত ছেলে এই রকম পোষাক পরে আছে —এ দৃশ্য দেখতে সুন্দর। কোন কোন ছেলে দেখা যায় এর উপর একটি জ্যাকেট এবং লম্বা বা খাট কোট পরে বেশ গর্ব অনুভব করছে। এই ভাবে নিজেদের বোকা প্রতিপাদন করার হাত থেকে তাদের বাঁচাতে হবে।

আমি একথা ভাল ভাবেই বুঝি যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ব্যায়ামে দক্ষতা ইত্যাদি শিশুর শিক্ষার একটি গৌণ অঙ্গ—কোন মতেই একে শিক্ষার সব কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না। তাদের চরিত্রবলে বলীয়ান হবার শিক্ষা দিতে হবে এবং লিখতে পড়তেও শেখাতে হবে। তবে যত গৌণই হক না কেন, শিক্ষার কোন অঙ্গকেই আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। শরীর মন ও আত্মা

—তিনেরই বিকাশের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। এর মধ্যে যেটি অবিকশিত থেকে যাবে ভবিষ্যতে সেটিই ছাত্রের অসুবিধার কারণ হবে। শিক্ষা এবং গড়ে ওঠার প্রথম দিকে এই সব ত্রুটীর কথা জানতে পারলে ছাত্ররা তার জন্য অনুতপ্ত হবে। শুধু তাই নয় সমাজের উপরও এর যথেষ্ট কুপ্রভাব পড়বে। আজও আমরা অবিবেচনাপ্রসূত শিক্ষাব্যবস্থার কুপ্রভাবের ফল ভোগ করছি। আমাদের এমন বহু অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস আছে যার কারণ আমরা প্লেগ ইত্যাদি মহামারীর হাত থেকে এখনও নিষ্কৃতি পাই নি। আমাদের শহরগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা একরকম অসম্ভব ব্যাপার। আদর্শ নাগরিক হবার প্রাথমিক নিয়মগুলিও আমরা জানি না এবং যে কটি নিয়ম জানি, তা আমরা পালন করি না।

নবজীবন, ২৬-৪-১৯২৫

১০

শ্রীমতী মন্তেসরীকে

শিশুদের প্রতি আপনার ঐকান্তিক ভালবাসার কারণ আপনি যেমন আপনার অসংখ্য প্রতিষ্ঠান মারফৎ শিশুদের শিক্ষা দেবার ও তাদের সদগুণাবলীর পূর্ণতম বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টা করেছেন, তেমনি আমিও আশা করি যে শুধু সম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্তান-ই নয়, নিতান্ত দরিদ্রের ঘরের শিশুও জাতীয় শিক্ষা পাবে। আপনি যথার্থই বলেছেন যে, আমরা যদি এই বিশ্বে সত্যকার শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে সত্যকার যুদ্ধ করা যদি আমাদের অভীষ্ট হয়, তাহলে শিশুদের নিয়ে আমাদের কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত করতে হবে। শিশুরা যদি স্বাভাবিক সারল্যের ভিতর বেড়ে ওঠে তাহলে আমাদের এত সব বাদ-বিসম্বাদের সম্মুখীন হতে হবে না, নিষ্ফল দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করারও প্রয়োজন পড়বে না। প্রেম হতে উচ্চতর প্রেমে এবং শান্তি হতে অধিকতর শান্তিতে বিচরণ করতে করতে

আমরা অবশেষে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করব যখন পৃথিবীর প্রত্যন্ত প্রদেশেও সকলের চেতনও অচেতন ইচ্ছার প্রতিবিম্ব অসীম শান্তি ও প্রেমের লীলাভূমি রূপে প্রতিভাত হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯-১১-৩১

১১

শিক্ষার উপকরণ

জনসাধারণের সম্মুখে কোন পাঠ্যপুস্তক পেশ করার পূর্বে আমি হাজার বার চিন্তা করব। শিশুদের জন্য আমি একখানি চটি বই লিখেছি।....এই পুস্তকটি লেখার পিছনে যে আদর্শ রয়েছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ। এই আদর্শ হল এই যে শিক্ষক প্রধানতঃ মুখে মুখে শেখাবেন। কেবল পুস্তক অথবা পাঠ্যপুস্তকের মারফতই যে জ্ঞান দেওয়া যায়—এরকম মনে করা ভুল। পড়ার জন্য একাধিক পাঠ্য-পুস্তক নির্ধারণ করলে শিশুদের মনে তার এক বিচিত্র প্রভাব পড়ে। এই সমস্ত বই তাদের মনকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে থাকে যে তাদের চিন্তাশক্তির বিকাশ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। অসংখ্য শিশুদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভিজ্ঞতায় এবং বহু শিক্ষকের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার আধারে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। শিশুদের শিক্ষা নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা কালীন আমি সদা সর্বদা আমার চোখ কান খোলা রাখতাম এবং সব কিছুকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতাম। কঠিন সংগ্রামের সময় আমি যখন জ্বলন্ত আগুনের মাঝে বিচরণকারীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছি তখনও আমার অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়। এমন দুটি বিদ্যালয়ের মধ্যে যদি আমরা তুলনা করি যার মধ্যে একটির শিক্ষকেরা অজস্র পাঠ্যপুস্তক পড়ান এবং অপরটিতে কোন পাঠ্যপুস্তকই পড়ান হয় না, তাহলে দেখা যাবে উভয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই সমপরিমাণ যোগ্য হলে দ্বিতীয় বিদ্যালয়ের অর্থাৎ

যেখানে কোন পাঠ্যপুস্তকই পড়ান হয় না সেখানকার শিক্ষকেরা শেষ অবধি প্রথমোক্ত বিদ্যালয়ের তুলনায় ভাল ভাবে ছাত্রদের গড়বেন। শিশুদের উপর আমি পাঠ্যপুস্তকের বোঝা চাপাতে চাই না। প্রয়োজন বুঝলে শিক্ষকেরা পাঠ্যপুস্তক পড়তে পারেন। সুতরাং আমরা শিক্ষকদের মার্গদর্শিকা (guide book) হিসাবে পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে পারি। কিন্তু শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তক লিখলে শিক্ষকেরা যন্ত্রে পর্যবসিত হবেন। এর ফলে শিক্ষকদের মৌলিকতা ও অভিক্রম বিনষ্ট হবে।....

...সরকার কি করে দেশের সাতলক্ষ গ্রামে বিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা করবে? দেশের সাত লক্ষ গ্রামের তিন লক্ষ গ্রামেই কোন বিদ্যালয় নেই। অবস্থা যখন এত শোচনীয় তখন সরকারী বিদ্যালয় খুলে কি হবে? বিদ্যালয়ের জন্য বাড়ী ঘর না হলেও আমাদের চলবে, প্রয়োজন কেবল চরিত্রবান শিক্ষকের। পুরাকালের গুরুরা ছিলেন এমনি শিক্ষক। তাঁরা ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন কিন্তু তাঁদের নিজেদের খরচ চলত ভিক্ষা করে।...এই শিক্ষকেরা ভাল না হলে ছাত্ররা ভাল শিক্ষা পেত না, আর শিক্ষক ভাল হলে শিক্ষাও হত উচ্চশ্রেণীর। আজকে সেই ধরণের শিক্ষক অদৃশ্য। বিদ্যালয়ের ভাল ঘর বাড়ী থাকলেই শিক্ষার মান উন্নত হয় না।

নবজীবন, ৩-৮-১৯২৪

১২
পাঠ্য পুস্তক

ভারতবর্ষে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যাবৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে বিপুলসংখ্যক গ্রাম্য শিশুদের শিক্ষার মাধ্যম থেকে বঞ্চিত করা। সুতরাং ভারতে পাঠ্য পুস্তকের অর্থ হওয়া উচিত মুখ্যতঃ শিক্ষকের পাঠ্য পুস্তক, ছাত্রের নয়। বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর পক্ষে একথা অধিকতর প্রযোজ্য। শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার অধিকাংশ যে মৌখিক

উপায়ে দেওয়া উচিত নয়—একথা আমি দৃঢ়তা সহকারে বলতে পারব না। প্রারম্ভিক সাধারণ জ্ঞান অর্জনের পূর্বে সুকুমারমতি শিশুদের উপর বর্ণ-পরিচয় ও পঠনের বোঝা চাপিয়ে দেবার অর্থ হচ্ছে তরুণ অবস্থা থেকে তাদের মৌখিক শিক্ষা গ্রহণ করার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করা। উদাহরণস্বরূপ প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, রামায়ণ পড়তে না শেখা পর্যন্ত কি একটি বছর সাতেক বয়সের ছেলেকে রামায়ণ শেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে? শহরে যে কয়েক লাখ লোক থাকেন তাঁদের কথা বিবেচনা করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ ভারতবাসীর পট-ভূমিকায় চিন্তা করলে সে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৬-৯-২৬

১৩

শিক্ষক-সম্প্রদায় ও পাঠ্য পুস্তক

এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে সর্বসাধারণের বিদ্যালয়-গুলিতে বিশেষতঃ শিশুদের জন্য যে সব পাঠ্য পুস্তক প্রচলিত, তার অধিকাংশই যদি একেবারে হানিকারক নাও হয়, তবে নিঃসন্দেহে অপ্রয়োজনীয়ের পর্যায়ভুক্ত। এদের মধ্যে অনেকগুলিই যে দক্ষতা সহকারে লিখিত, সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এমনকি যাদের জন্য ও যে পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি লিখিত, তাতে হয়ত এইসব পাঠ্য পুস্তককে সর্বশ্রেষ্ঠ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এসব ভারতীয় পরিবেশ বা ভারতীয় ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত নয়। কোন কোন বই দেখে যদিও মনে হয় যে সেগুলি ভারতীয়দের জন্য লিখিত, বস্তুতঃ সেগুলি সাধারণতঃ পাশ্চাত্য দেশের পুস্তকাবলীর অপক্ক অনুকরণ এবং ছাত্রদের প্রয়োজনপূর্তির ব্যবস্থা এগুলিতে থাকে না বললেই চলে। এদেশে ছাত্রদের প্রদেশ ও শ্রেণী হিসাবে প্রয়োজনের তারতম্য করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ বলা

যায় যে, হরিজন ছাত্রদের প্রয়োজন অন্ততঃ প্রথমাবস্থায় অন্যান্য ছাত্রদের চেয়ে পৃথক।

এইজন্য আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ছাত্র অপেক্ষা শিক্ষকের কাছে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন অধিক এবং ছাত্রদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করতে হলে প্রত্যেক শিক্ষককে উপলব্ধ মাল-মশলা দ্বারা প্রাত্যহিক পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। আর এও তিনি করবেন নিজ শ্রেণীর (ক্লাসের) বিশেষ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে।

যথার্থ শিক্ষার অর্থ হচ্ছে শিক্ষার্থী বালক-বালিকাদের সদ্বৃত্তির সম্যক বিকাশ। ছাত্রের মগজে অপ্রয়োজনীয় এলোমেলো তথ্য বোঝাই করে এ অভীষ্ট লাভ করা যায় না। এ পদ্ধতি ছাত্রের যাবতীয় স্বকীয়তা বিনষ্টকারী পাষাণভাররূপে পরিগণিত হয় ও এর ফলে ছাত্র জড় যন্ত্রে পর্যবসিত হয়। স্বয়ং আমরা যদি এই কুপ্রথার শিকার না হতাম, তবে বহু দিন পূর্বেই আমরা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের মত দেশে পাইকারী ভাবে শিক্ষাদানের আধুনিক প্রক্রিয়ার কুফল সম্বন্ধে সচেতন হতাম।

বহু প্রতিষ্ঠান অবশ্য নিজস্ব পাঠ্য পুস্তক রচনার প্রচেষ্টা করেছেন এবং এতে অল্পাধিক সাফল্যও অর্জন করেছেন। তবে আমার মতে এই সকল পাঠ্যপুস্তক এদেশের একান্ত জরুরী প্রয়োজন পূর্তিতে অক্ষম।

এখানে যে অভিমত ব্যক্ত করেছি, তা যে একেবারে আমার স্বকীয় প্রতিভার অভিনব নিদর্শন—একথা আমি বলতে চাই না। হরিজন বিদ্যালয়সমূহের পরিচালক ও শিক্ষকবর্গের উপকারার্থ এই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা হল। তাঁদের সম্মুখে গুরু দায়িত্বভার বিদ্যমান। জড়বৎ শুধু নিয়মমাফিক কাজগুলি করে আত্মতৃপ্তি বোধ করলে তাঁদের চলবে না। তাহলে তাঁদের অধীনস্থ বালক-বালিকাগুলি বেগার শোধ করার মনোভাব নিয়ে তোতা পাখীর মত যেন তেন

প্রকারেন নির্বাচিত বইগুলি মুখস্থ করবে। হরিজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিচালকবর্গ এক বিরাট দায়িত্বপূর্ণ অছির কর্তব্যভার গ্রহণ করেছেন এবং সাহসিকতা মেধা ও সততা-প্রয়োগে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

এ কর্তব্য কঠিন, তবে শিক্ষক ও পরিচালকেরা সর্বান্তঃকরণে এ কাজে লেগে গেলে যতটা কঠিন মনে হচ্ছে, তা আর মনে হবে না। নিজেদের তাঁরা ছাত্রদের পিতাস্বরূপ বিবেচনা করলে অন্তঃপ্রেরণার বলে তাদের চাহিদা জানতে পারবেন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য সচেষ্ট হবেন। নিজের সে ক্ষমতা না থাকলে তিনি সে যোগ্যতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হবেন। ছেলেমেয়েদের তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা দেবার নীতি মেনে নিয়ে কাজ আরম্ভ করলে হরিজন ছাত্রদের—শুধু তাই বা কেন, যে কোন শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষক-বর্গকেই অসাধারণ বুদ্ধি-চাতুর্য বা অত্যধিক বহির্বিশ্বের জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে না।

এতদ্ব্যতিরেকে আমরা যদি স্মরণ রাখি যে চরিত্র-গঠনই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য বা অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ এ-ই হওয়া উচিত, তাহলে চরিত্রবান শিক্ষকদের হতাশ হবার কারণ নেই।

হরিজন, ১-১২-৩৩

১৪

গ্রামের শিক্ষা

[গুজরাতের জাতীয় বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের একটি ছোট সম্মেলন গত ২২শে মে তিথাল-এ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সংযোজক মহাশয় সদস্যদের কাছে নিম্নোদ্ধৃত প্রশ্নাবলী প্রেরণ করেন :

১. আমাদের গ্রামের উপযোগী এবং গ্রামবাসীদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর শিক্ষাব্যবস্থা কি? গ্রামে গ্রামে সেই শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার হবে কোন্ পন্থায়?

২. ব্যাপক নিরক্ষরতা ও অজ্ঞানের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করা যায়?

৩. বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য অক্ষরজ্ঞান কি অপরিহার্য? বর্ণপরিচয় ও লিখতে পড়তে শেখানর মাধ্যমে যে শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত হয় তা কি বৌদ্ধিক বিকাশের পরিপন্থী?

৪. বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সব রকমের শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু করার সার্থকতা।

৫. বর্তমানের জাতীয় বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ।

৬. ছাত্রদের মাতৃভাষার মাধ্যমে সকলপ্রকারের শিক্ষা প্রদানের সম্ভাবনা।

৭. জাতীয় শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলিত বিদ্যালয়গুলিতে কি কি অপূর্ণতা আছে?

৮. প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে হিন্দি-হিন্দুস্থানীকে বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয়তা।

এই সব প্রশ্ন সম্বন্ধে গান্ধীজীকে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে অনুরোধ করায় পৃথক পৃথক উদাহরণ দিয়ে তিনি তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। উদাহরণগুলি বর্জন করে আমি তাঁর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করছি।······মহাদেব দেশাই]

গ্রামবাসীদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে যদি আমরা শিক্ষা দিতে চাই তাহলে বিদ্যাপীঠকে গ্রামে নিয়ে যেতে হবে। তারপর বিদ্যাপীঠকে প্রশিক্ষণ-বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হবে যাতে শিক্ষকরা গ্রামবাসীদের প্রয়োজন সম্বন্ধে বাস্তব প্রশিক্ষণ পেতে পারেন। শহরে প্রশিক্ষণ-বিদ্যালয় চালিয়ে শিক্ষকদের গ্রামবাসীদের চাহিদা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া যায় না। আর এ রকম প্রশিক্ষণ-বিদ্যালয়েরও প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের মনে গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে আগ্রহও সৃষ্টি করা যায় না। শহরবাসীদের গ্রাম সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত করা এবং তাঁদের গ্রামে গিয়ে থাকতে অনুপ্রাণিত করা সহজসাধ্য নয়। সেবাগ্রামে নিত্য আমি এর অভিজ্ঞতা লাভ করছি। আমি আপনাদের এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না যে গত এক বছর সেবাগ্রামে থাকার ফলে আমরা গ্রামবাসীতে পরিণত হয়েছি অথবা

সর্বসাধারণ সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছি।

প্রত্যুত আমার মতে আমাদের নিরক্ষরতার জন্য লজ্জিত হবার কারণ নেই, লজ্জা যদি বোধ করতেই হয় তবে তা অজ্ঞতার কারণ। সুতরাং বয়স্ক-শিক্ষার জন্যও সযত্নে নির্বাচিত শিক্ষক এবং প্রাপ্তবয়স্ক গ্রামবাসীদের মনকে গড়ে তোলার উপযুক্ত অনুরূপ যত্নসহকারে নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে অজ্ঞান দূর করার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করার আমি পক্ষপাতী। তবে এর অর্থ এই নয় যে তাদের অক্ষরজ্ঞান দেবার প্রস্তাবের আমি বিরোধী। অক্ষরজ্ঞানকে আমি খুবই মূল্যবান মনে করি। সুতরাং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে একে উপেক্ষা করা বা অকিঞ্চিৎকর মনে করার কথাই ওঠে না। অক্ষরকে সহজ ও সরল করার জন্য অধ্যাপক লুবাক্ যে অপরিসীম প্রযত্ন করেছেন এবং এতদুদ্দেশ্যে অধ্যাপক ভাগবতেরও যে বাস্তব অবদান আছে, আমি তার প্রশংসা করি।

গ্রামের কারুশিল্পকে শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য সম্বন্ধে আমার মনে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তাকে আমি শিক্ষা অর্থাৎ মানুষের অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠগুণাবলীর অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া নামের অযোগ্য মনে করি। এ হল বুদ্ধিবৃত্তির লাম্পট্য। প্রচলিত পদ্ধতিতে কোন রকমে কতকগুলি তথ্য মগজে অনুপ্রবিষ্ট করান হয়। পক্ষান্তরে প্রথম থেকে মূলতঃ গ্রামীন কারুশিল্পের মাধ্যমে মনের অনুশীলন করার প্রক্রিয়ার ফলে মনের যথার্থ ও সুশৃঙ্খল বিকাশ ঘটে। এর ফলে বৌদ্ধিক এবং পরোক্ষভাবে আধ্যাত্মিক শক্তির সাশ্রয় হয়। তবে এখানেও যেন মনে না করা হয় যে আমি সুকুমার কলাকে হেয় জ্ঞান করছি। আমি কেবল তাদের যথাযোগ্য স্থানের বদলে অন্যত্র স্থাপন করতে চাই না। স্বস্থানে না থাকলে যে কোন জিনিসকে সঙ্গত কারণেই আবর্জনা আখ্যা দেওয়া হয়।

আমার উক্তির সমর্থনে আমি লক্ষ লক্ষ মন অপদার্থ এবং এমনকি অশ্লীল রচনার নিদর্শন পেশ করব। এই সব পুস্তক ও রচনা আমাদের উপর বর্ষণ করা হচ্ছে এবং এর কুপ্রভাব চক্ষুষ্মান সকলের দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে।

হরিজন, ৫-৬-১৯৩৭

১৫
আত্মনির্ভরশীলতা

গুরুকুল-প্রেমিক হিসাবে এবার আমি এর পরিচালন-সমিতি ও অভিভাবকদের কয়েকটি পরামর্শ দেব। গুরুকুলের ছেলেদের আত্ম-প্রত্যয়শীল ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হলে তাদের প্রয়োজনীয় শ্রমশিল্পের শিক্ষা দেওয়া দরকার। আমাদের মত যে দেশে শতকরা পঁচাশী জন কৃষিজীবী এবং সম্ভবতঃ শতকরা আরও দশজন কৃষককুলের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের কার্যে নিযুক্ত, সেখানে আমার মতে কৃষিকার্য ও বুনাই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রতিটি যুবকের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হওয়া উচিত। হাতের কাজের হাতিয়ারপত্র ঠিকভাবে চালাতে শিখলে বা এক টুকরা কাঠকে সোজাসুজি চিরতে জানলে অথবা ঠিকমত গুণিয়া টেনে স্থায়ী দেওয়াল গাঁথতে পারলে তো আর কোন ক্ষতি নেই। এই রকমের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন ছেলে জীবন-সংগ্রামে কোন দিন নিজেকে অসহায় বোধ করবে না এবং সে কখনও বেকার থাকবে না। স্বাস্থ্যতত্ত্ব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং শিশুপালন সম্বন্ধেও গুরুকুলের ছাত্রদের জ্ঞান থাকা দরকার। এখানকার মেলার সাফাইএর ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ। মক্ষিকাবাহিনী দেখলেই সব কথা বোঝা যায়। এই সব দুর্দম সাফাই-কার্য পরিদর্শকের দল আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে সাফাইয়ের ব্যবস্থা ত্রুটীশূন্য নয়। এরা আমাদের সোজাসুজি এই শিক্ষা দিচ্ছে যে ভুক্তাবশিষ্ট এবং আবর্জনাসমূহ ঠিকভাবে মাটি চাপা

দিতে হবে। আমার এই কথা ভেবে দুঃখ হচ্ছিল যে মেলার বাৎসরিক দর্শকদের স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও সাফাই-বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ শিক্ষা দেবার এমন একটি সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু এ কাজের সূচনা করতে হবে ছেলেদের দিয়েই। তাহলে কর্তৃপক্ষ এর পর বাৎসরিক সম্মেলনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তিনশত সাফাই-বিজ্ঞান-শিক্ষক পাবেন। সর্বশেষে বললেও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, অভিভাবকবৃন্দ এবং পরিচালন-সমিতি যেন তাঁদের ছেলেদের ইউরোপীয় পোষাকের অন্ধ অনুকরণ করতে দিয়ে ও আধুনিক বিলাস দ্রব্য-সম্ভার জুগিয়ে তাদের ধ্বংসের পথ না খুলে দেন। ভবিষ্যৎ জীবনে তারা এ সবের ফলে কষ্ট পাবে এবং এসব আচরণ ব্রহ্মচর্যনীতি-বিরুদ্ধও বটে। আমাদের মধ্যে যেসব কুপ্রথা বিদ্যমান, তার বিরুদ্ধেই তাদের যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হবে। তাদের লোভ বাড়িয়ে দিয়ে সে সংগ্রামকে আমরা যেন কঠোরতর না করি।

স্পিচেস এণ্ড রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী, পৃঃ ৩৩৪-৩৫

১৬
শরীর-শ্রম

তোমরা প্রশ্ন করতে পার, "আমরা নিজেদের হাতে কাজ করব কেন? অশিক্ষিতরাই তো দৈহিক শ্রমমূলক কাজ করবে। আমরা তো সাহিত্য ও রাজনৈতিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে সময়ের সদ্ব্যবহার করব।" আমার মনে হয় আমাদের শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করতে হবে। কোন ক্ষৌরিক বা চর্মকার ছাত্র হিসেবে বিদ্যালয়ে গেলে তার জন্য তার নিজের পেশা বর্জন করার প্রয়োজন নেই। আমার মতে ক্ষৌরিকের জীবিকা চিকিৎসকের মতই ভাল।

স্পিচেস এণ্ড রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী, পৃঃ ৩৮৮-৮৯ ; ১৬-২-১৬

১৭

শ্রমের মর্যাদা

অন্যদেশের ক্ষেত্রে যাই হক না কেন, ভারতে অন্ততঃ মোট জনসংখ্যার শতকরা আশী ভাগেরও অধিক কৃষিজীবী ও শতকরা দশজন শ্রমশিল্পজীবী। এদেশে তাই শিক্ষাকে স্রেফ পুস্তক-আধারিত করা ও এইভাবে ছেলে-মেয়েদেরকে ভবিষ্যৎ জীবনে শরীর-শ্রমের অনুপযুক্ত করে ফেলা এক ভীষণ অপরাধ। জীবিকা অর্জনের জন্য নিজ সময়ের অধিকাংশ ব্যয় করি বলে বস্তুতঃ আমার মতে দেশের শিশুদের বাল্যাবস্থা থেকে ঐ জাতীয় শ্রমের মর্যাদা বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। আমাদের শিশুদের যেন শ্রমকে হেয় জ্ঞান করতে শিক্ষা না দেওয়া হয়। কোন কৃষকের পুত্র বিদ্যালয়ে যাবার পর আজকের মত কেন যে কৃষিজীবী শ্রমিক হিসাবে অপদার্থ হয়ে যাবে, এর কোন কারণ খুঁজে পাই না। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা শরীর-শ্রমের প্রতি শুধু বিরস বদনে নয়, কেমন ঘৃণাভরে কেন যে দৃষ্টিপাত করে, তার কারণ খুঁজে পাই না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৯-২২

১৮

সুতাকাটার কর্তব্য

ভবিষ্যতের যে কোন পাঠ্যক্রমে সুতা কাটাকে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আহার ও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ বিনা যেমন আমরা বাঁচতে পারি না, তেমনি এই প্রাচীন ভূমিতে সুতা কাটার পুনঃ প্রবর্তন বিনা আর্থিক স্বাধীনতা-প্রাপ্তি ও চির-দারিদ্র্য দূর করা অসম্ভব। আমার মতে প্রতিটি গৃহে চরখা উনানের মতই সমান প্রয়োজনীয়। অপর কোন পন্থায় জনসাধারণের শোচনীয় দারিদ্র্য নিরাকরণ করা সম্ভবপর নয়।

তাহলে প্রতিটি কুটীরে সুতা কাটা প্রবর্তনের উপায় কি? প্রতিটি

জাতীয় বিদ্যালয়ে সুতা কাটা প্রবর্তন ও বিধিবদ্ধভাবে সুতা উৎপাদনের কথা আমি পূর্বেই বলেছি। আমাদের ছেলেমেয়েরা একবার কোন কথা শেখার পর অক্লেশে নিজগৃহে এর বিস্তার ঘটাতে পারে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯-১-২১

১৯

স্বাশ্রয়ী হবার জন্য চরখা

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যদি সুতা কাটা প্রবর্তন করা হয়, তাহলে শিক্ষণব্যয় সম্বন্ধীয় আমাদের প্রাচীন ধারণায় বিপ্লব সাধিত হবে। প্রত্যহ ছয় ঘণ্টা কাল পঠন-পাঠন চালিয়ে আমরা ছাত্রদের অবৈতনিক শিক্ষা দিতে পারি। কোন ছাত্র যদি দৈনিক চার ঘণ্টা সুতা কাটে তাহলে প্রত্যহ সে দশ তোলা সুতা কাটতে পারবে এবং এইভাবে সে বিদ্যালয়ের জন্য প্রত্যহ এক আনা উপার্জন করতে সক্ষম হবে। ধরে নেওয়া যাক যে প্রথম মাসে তার উৎপাদন খুব কম হল এবং বিদ্যালয় মাসে মাত্র ছাব্বিশ দিন খোলা থাকে। তবুও প্রথম মাসের পর সে মাসিক একটাকা দশ আনা রোজগার করতে পারবে। ক্লাসে ত্রিশটি ছাত্র থাকলে দ্বিতীয় মাস থেকে মাসিক আটচল্লিশ টাকা বার আনা রোজগার হবে।

পুঁথিপত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে আমি কিছু বলি নি। মোট ছয় ঘণ্টার দুই ঘণ্টা এ কাজের জন্য দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ কোন প্রযত্ন বিনা-ই প্রতিটি বিদ্যালয়কে স্বাবলম্বী করা যেতে পারে এবং বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য জাতি অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করতে পারবে।

এই পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে সর্ববৃহৎ বাধা হচ্ছে চরখা। সুতা কাটা জনপ্রিয় হলে এর জন্য হাজার হাজার চরখা দরকার। সৌভাগ্যক্রমে প্রত্যেক গ্রাম্য সূত্রধর সহজেই এ যন্ত্র নির্মাণে সক্ষম।

বিভিন্ন আশ্রম বা অন্যত্র থেকে এগুলি আনান প্রচণ্ড ভুল। সুতা কাটার মজা হচ্ছে এই যে এ কাজ অতীব সহজ, অনায়াসে শেখা যায় ও গ্রামে চরখা প্রবর্তন স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ।

এখানে যে কার্যক্রমের উল্লেখ করলাম, তা শুধু এই আত্মশুদ্ধি ও শিক্ষানবীশীর বৎসরের জন্য। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে এবং স্বরাজ অর্জিত হলে মাত্র এক ঘণ্টা সুতা কাটার জন্য দিয়ে বাকী পুঁথিপত্রের শিক্ষার জন্য দেওয়া যেতে পারে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-২-২১

২০

শাশ্বত চরখা

মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের আয় বা ভূমি-রাজস্ব দ্বারা আমাদের শিক্ষণ-ব্যয় নির্বাহ হওয়ার প্রয়োজন নেই। স্বরাজ এলে এর প্রধান উৎস হবে চরখা। প্রত্যেক স্কুল-কলেজে সুতা কাটা ও বস্ত্র-বয়ন প্রবর্তিত হলে সহজেই এর উপার্জনে শিক্ষণ-ব্যয় নির্বাহ হবে। আজ আমি চাই যে সুতা কাটার জন্য আমাদের ছেলেরা যেন সবটুকু সময় দেয়। স্বরাজ অর্জিত হবার পর অন্ততঃ এক ঘণ্টা সময় এর জন্য দিতে হবে। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেন স্বরাজের স্পর্শ লাগে। আমাদের আধুনিক বিদ্যালয়সমূহ যেন দাস উৎপাদনের কারখানা। স্বরাজের সময় শিক্ষার লক্ষ্য হবে ছেলেদের তরুণাবস্থা থেকেই স্বাবলম্বী করে তোলা। তাদের অন্যান্য বৃত্তিও শেখান হবে। তবে সুতা কাটা বাধ্যতামূলক হবে। চরখা হচ্ছে দুর্গতজনের সান্ত্বনা। অন্য কোন শ্রমশিল্পের এর মত যোগ্যতা নেই ; কারণ কৃষির পূরক হতে পারে মাত্র এই-ই। সকলেই সূত্রধর বা কর্মকার হতে পারে না ; কিন্তু সকলকেই কাটুনী হতে হবে এবং দেশের জন্য বা নিজেদের উপার্জন বৃদ্ধির জন্য সুতা কাটতে হবে। সর্বাবস্থায় বস্ত্রের প্রয়োজন পড়ে বলে চরখার প্রয়োজনও সর্বদাই হবে।

স্বরাজের সময় যাতে এই প্রশ্ন নিয়ে নূতন করে বাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি না হয়, সেজন্য এখনই আমাদের বিদ্যালয়সমূহে কেতাবী শিক্ষার প্রয়োজনীয় অনুবন্ধ হিসাবে সুতা কাটা প্রবর্তন করা যাক।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-৩-২১

২০

মাদক বিক্রয়ের রাজস্ব

বিনম্রভাবে আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই যে দেশের শিশুদের মাদকদ্রব্য বিক্রয়-খাতে অর্জিত রাজস্বে শিক্ষা দেওয়া অবশ্যই অতীব অপমানজনক বিষয়। আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্ষতি করে যদি আমরা মাদকদ্রব্যের প্রচলন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত করার সুবুদ্ধির পরিচয় না দিই, তাহলে উত্তরকাল আমাদের অভিশাপ দেবে। তবে এতটা ত্যাগ স্বীকার করার প্রয়োজন হবে না। আমি জানি যে আপনাদের ভিতর অনেকে আমাদের স্কুল-কলেজসমূহে সুতা কাটা প্রবর্তন করে শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করার পরিকল্পনাকে বিদ্রূপ করেন। আমি জোর দিয়ে আপনাদের বলতে পারি যে সুতা কাটা শিক্ষণ-ব্যয়ের সমস্যার সমাধান করে এবং অন্য কোন কিছুর এ ক্ষমতা নেই। দেশ নূতন কোন করের বোঝা বইতে সক্ষম নয়। এমন কি প্রচলিত কর-ভারই অসহনীয়। অচিরে জনগণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের সমস্যার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হলে আমাদের শুধু মাদকদ্রব্য-খাতে আমদানী রাজস্ব বিসর্জন দিলেই চলবে না, অন্যান্য খাতে উশুলিকৃত রাজস্বের পরিমাণও যথেষ্ট হ্রাস করতে হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-৬-২১

২১

শিক্ষার ব্যয়-সংস্থান

একথা কার অবিদিত যে সন্তানের শিক্ষার জন্য অর্থসংগ্রহ মানসে পিতা অনেক অসঙ্গত কার্য করা কর্তব্য বলে বিবেচনা করেন?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন না করলে আমাদের ভাগ্যে এর চেয়েও চরম সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে। দেশের বিশাল শিশু-সমুদ্রের মাত্র এক ক্ষীণতম অংশকে আমরা স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছি। এদের অধিকাংশই শিক্ষার আলোক-বর্জিত। এইসব শিশুদের পিতামাতার আগ্রহের অপ্রতুলতা এর কারণ নয়, এর মুলে রয়েছে তাদের অক্ষমতা ও অজ্ঞতা। বিশেষতঃ আমাদের দেশের মত দরিদ্রভূমিতে অভিভাবকদের যদি এতগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহ করতে হয় এবং অবিলম্বে কোন রকম প্রতিদানের আশা না করে তাদের জন্য ব্যয়বহুল শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়, তাহলে বলতে হবে যে এ প্রথার মূলে কোন মারাত্মক গলদ আছে। শিক্ষাপ্রাপ্তির প্রথমাবস্থা থেকেই শিশুরা শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য কাজ করলে আমি তাতে কোন অন্যায় দেখি না। নিঃসন্দেহে সমগ্র ভারতের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং সকলের নিকট রুচিকর ও সরলতম হস্তকর্ম হচ্ছে সুতা কাটা ও তার পূর্ববর্তী প্রক্রিয়াসমূহ। এই কার্য আমাদের শিক্ষায়তনে প্রবর্তন করলে তিনটি উদ্দেশ্য সাধিত হবে। প্রথমতঃ শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে, দ্বিতীয়তঃ ছাত্রদের মনের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক বিকাশও ঘটবে এবং তৃতীয়তঃ বিদেশী বস্ত্র ও সুতার পূর্ণ মাত্রায় বয়কট হবে। এতদ্ব্যতিরেকে এইভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা আত্মবিশ্বাসী ও স্বাধীনচেতা হয়ে গড়ে উঠবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-৬-২১

২২

সার্বত্রিক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যয়

আমরা যদি আশা করি যে (এবং করাও উচিতও) প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে যাবার বয়সের ছেলেমেয়ে সর্বসাধারণের বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে, তা হলে দেখা যাবে প্রচলিত শিক্ষাবিধির শরণ নিলে সকলের

শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান করার সাধ্য আমাদের নেই। এছাড়া লক্ষ লক্ষ অভিভাবকদের পক্ষে আজকালকার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতনের সংস্থান করাও অসম্ভব। অতএব শিক্ষাকে সার্বজনীন করার জন্য অবৈতনিকও করতে হবে। আমি বলতে পারি যে আদর্শ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও আমরা বিদ্যালয়ে যাবার বয়সের প্রতিটি বালক-বালিকার শিক্ষার বন্দোবস্ত করার জন্য দুই শত কোটি টাকা ব্যয় করতে পারব না। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, সর্ববিধ শিক্ষার জন্য আমাদের ছেলেমেয়েদের অংশতঃ বা পূর্ণমাত্রায় **শ্রমদ্বারা** তার ব্যয়ের সংস্থান করতে হবে। আমার মতে সুতা কাটা ও বস্ত্র-বয়ন ছাড়া এবম্বিধ প্রয়োজনীয় অথচ সার্বজনীন শ্রম আর কিছুই হতে পারে না। অবশ্য আমরা সুতা কাটা প্রবর্তন করি বা অন্যবিধ শ্রম করার ব্যবস্থা রাখি, আমি যে কথা সিদ্ধ করতে চাইছি তার জন্য এই পার্থক্যে কিছু যায় আসে না। আসল কথা হচ্ছে এই শ্রমের সদুপযোগ করা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যাবে যে ভারতবর্ষের যাবতীয় বিদ্যালয়ে বস্ত্র উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত বৃত্তি ব্যতিরেকে অপর কোন বিকল্প ব্যবস্থা বাস্তব, লাভজনক ও ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করার মত হবেনা।

আমাদের দেশের মত দরিদ্র দেশে শরীর-শ্রম প্রবর্তন করলে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হবে। এক দিকে এর দ্বারা শিশুদের শিক্ষণ-ব্যয়ের সংস্থান হবে এবং অন্য দিকে শিশুরা এর ফলে এমন একটি উপজীবিকা শিক্ষা করতে পারবে, ইচ্ছা করলে যার উপর তারা ভবিষ্যৎ জীবনে জীবনধারণের জন্য নির্ভর করতে পারবে। এবম্বিধ প্রথা নিঃসন্দেহে আমাদের শিশুকুলকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলবে। জাতীয় মেরুদণ্ড ভঙ্গ করার জন্য শ্রমকে অবজ্ঞা করার চেয়ে শক্তিশালী সাধন আর কিছু নেই।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৯-২১

২৩
পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা

আমার বিশ্বাস হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ ও নাসিকা ইত্যাদি দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্যক অনুশীলন দ্বারাই শুধু বুদ্ধিবৃত্তির যথার্থ শিক্ষা সংসাধিত হতে পারে। অর্থাৎ বিবেচনা সহকারে শিশুর দেহযন্ত্রের উপযোগ-ই হচ্ছে তার বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের সর্বোত্তম এবং দ্রুততম পন্থা। কিন্তু যুগপৎ যদি দেহ ও মনের বিকাশ আত্মিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে না হয় তাহলে শুধু দেহ ও মনের বিকাশ একেবারে এক তরফা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। আধ্যাত্মিক শিক্ষণ বলতে আমি অন্তরের শিক্ষণ বুঝি। সুতরাং মনের সমুচিত ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য এর পূর্বভূমিকা হিসাবে শিশুর দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিনিচয়ের উৎকর্ষ বিধান সমানভাবে আবশ্যক। উভয় ব্যাপার এক এবং অবিচ্ছেদ্য। এতএব এরা যে পৃথক ভাবে পরস্পরের সম্পর্ক-নিরপেক্ষ অবস্থায় বিকাশলাভ করতে পারে—পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একথা মনে করা প্রচণ্ড ভ্রান্তির পরিচায়ক।

দেহ মন ও আত্মার বিভিন্ন বৃত্তির ভিতর পারস্পারিক সমবায় ও সৌহার্দ্যের অভাবের সাংঘাতিক পরিণাম অত্যন্ত স্পষ্ট। এর নিদর্শন আমাদের চতুর্দিকে রয়েছে। আমরা শুধু আমাদের বর্তমান বিকৃত যোগসূত্রের কারণ এর অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছি। আমাদের গ্রামীণ জনতার উদাহরণ নিন। শৈশব থেকে আরম্ভ করে অহোরাত্র মাঠে ঘাটে তাদের কঠিন পরিশ্রমের পালা আরম্ভ হয়। তারা যে গৃহপালিত পশুগুলির মাঝে বাস করে, শুধু তাদের সঙ্গেই এদের এই কঠোর শ্রমমূলক জীবনের তুলনা চলে। এদের অস্তিত্বের অর্থই হচ্ছে দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা এবং যান্ত্রিক গতানুগতিকতার অক্ষদণ্ড কেন্দ্র করে নীরস অবিশ্রান্ত আবর্তন। এর ভিতর বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষণপ্রভার ঔজ্জ্বল্য বা জীবনের উচ্চতর ভাবাদর্শের সামান্য রেখারও স্থান নেই। মন ও আত্মাকে ঊর্ধ্বলোকচারী করার কোন উপায় তাদের সামনে

নেই বলে তারা পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে। তাদের কাছে জীবন এক পীড়াজনক কুকর্মের বোঝাস্বরূপ এবং তাই তারা কোনমতে এর ভিতর দিয়ে স্খলিত চরণে পার হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আজকাল শহরের স্কুল-কলেজগুলিতে শিক্ষার নামে যা চলে, প্রকৃতপক্ষে তা বৌদ্ধিক লাম্পট্য ছাড়া আর কিছু নয়। আধুনিক শিক্ষায়তনসমূহে বৌদ্ধিক শিক্ষণকে শরীর-শ্রম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক বস্তু মনে করা হয়। কিন্তু সুস্থ থাকার জন্য কথঞ্চিৎ শরীর-শ্রম অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে এতদুদ্দেশ্যে তারা কৃত্রিম ও নিষ্ফল পদ্ধতির শরীর-চর্চা করে থাকে। এ ব্যাপার যেমন কিম্ভূতকিমাকার, এর পরিণামও তেমনি শোকাবহ। এই প্রথায় জারিত যুবক শারীরিক সহনশীলতার দিক থেকে কোনক্রমেই একজন সাধারণ শ্রমিকের কাছে দাঁড়াতে পারে না। সামান্য খাটুনীতেই তার মাথা ধরে। এক লহমা রৌদ্রে থাকলে তার শরীর ঘুলাতে থাকে। আর আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এই যে, এ সবকে অতীব "স্বাভাবিক" আখ্যা দেওয়া হয়। হৃদয়-বৃত্তির বিকাশের কথা জিজ্ঞাসা করলে বলতে হয় যে হয় তাদের বে-লাগাম ছেড়ে বংশ বিস্তার করে হাউই-এর মত নিমিষে বিলীন হতে দেওয়া হয়, আর নচেৎ তারা বন্য বিশৃঙ্খলতা সহকারে যেন তেন প্রকারেণ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এর ফল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অরাজকতা। আর একেই একটা প্রশংসনীয় অবস্থা বিবেচনা করা হয়।

অন্যদিকে প্রথমাবস্থা থেকে যে শিশুটির ভিতর হৃদয়ের শিক্ষার বীজ বপন করা হয়েছে তার উদাহরণ নিন। ধরে নেওয়া যাক যে শিক্ষার জন্য তাকে সুতা কাটা ছুতারের কাজ বা কৃষি ইত্যাদি কোন প্রয়োজনীয় কাজে লাগান হল এবং সেই সুবাদে তাকে যেসব ক্রিয়া করতে হবে তার পূর্ণমাত্রায় ও বিশদ তথ্যমূলক শিক্ষা তাকে দেওয়া হল। যেসব যন্ত্রপাতি নিয়ে তাকে কাজ করতে হবে, তার উৎপাদন ও ব্যবহার-পদ্ধতিও যেন তাকে শেখান হল। এতে শুধু সে সুন্দর ও সুগঠিত দেহী হয়ে-ই গড়ে উঠবে না, উপরন্তু এ প্রক্রিয়ায় সে গভীর

জ্ঞান ও প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের আকর হবে। এই জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য কেবল পুঁথিগত হবে না, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার আলোকে এ জ্ঞান হবে জীবনের সঙ্গে দৃঢ়সংবদ্ধ। তার বৌদ্ধিক শিক্ষার ভিতর গণিত থাকবে এবং নিজের জীবিকা সমুচিত ও সুসঙ্গতভাবে চালাবার জন্য বিজ্ঞানের যেসব বিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন, তাও তার পাঠ্যক্রমের ভিতর সন্নিবিষ্ট করা হবে। মনোরঞ্জনের জন্যে এর সঙ্গে সাহিত্য যুক্ত হলে তার জন্য সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে বলা যাবে। এ পদ্ধতিতে বুদ্ধি শরীর ও আত্মার বিকাশের পূর্ণ অবকাশ থাকবে এবং এ সবের সমবায়ে সে স্বাভাবিক ও একাবয়ব পরিপূর্ণ সত্তায় পরিণত হবে। মানুষ শুধু বুদ্ধি বা কেবল স্থূল জৈবিক দেহ নয়, অথবা তাকে স্রেফ হৃদয় বা আত্মা আখ্যা দেওয়া চলে না। পরিপূর্ণ মানবের রূপায়ণের জন্য এই ত্রিবিধের সমুচিত ও সুসঙ্গত সমন্বয় প্রয়োজন এবং শিক্ষার যথার্থ অর্থশাস্ত্রও এই।

হরিজন, ৮-৫-৩৭

২৪
উৎপাদনমূলক কাজ ও শিক্ষা

উৎপাদনমূলক কাজের আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হওয়া উচিত এবং আমাদের দেশে এর সপক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তাহলে বিদ্যালয়গুলি ছেলেদের শিক্ষাকালীন কাজ থেকে নিজের খরচ চালাবার মত যথেষ্ট উপার্জন করতে পারবে। কটকে চামড়ার কারখানা শুরু করার পিছনে শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাসের মনে এই বিচারধারা ক্রিয়াশীল ছিল। পরিকল্পনাটিও ছিল ভাল। কিন্তু এই জাতীয় ব্যবসায়ীক প্রচেষ্টাকে টিকিয়ে রাখার অনুকূল মনোবৃত্তি দেশে না থাকায় শ্রীযুক্ত দাসের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সূত্রধরের কাজ আমাদের উচ্চশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ

হবে না কেন? আর বুনাই-শিক্ষা ছাড়া শিক্ষা-ব্যবস্থা হবে সূর্যবিহীন সৌরজগতের মত। এই সমস্ত হস্তশিল্প যেখানে যথোচিতভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় ছাত্রদের সেখানে বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যয় নির্বাহের মত যথেষ্ট রোজগার করতে পারা উচিত। ছাত্রদের থাকবে দৈহিক যোগ্যতা এবং কাজ করার ইচ্ছা। অবশ্য শিক্ষকদেরও নিজ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। দৈহিক ও মানসিক—উভয় ক্ষেত্রেই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। একজন তাঁতী যদি কবীর হতে পারেন তাহলে অন্যান্য তাঁতীরা কবীর না হলেও গিদওয়ানী কৃপালনী ও কালেলকার হতে পারবে না কেন? একজন চর্মকার যদি শেক্‌স্‌পীয়র হতে পারেন তাহলে অপরাপর চর্মকাররা মহাকবি হতে না পারলেও ভাল রসায়ন বিজ্ঞানী বা অর্থশাস্ত্রী হতে পারবেন না কেন? আমাদের বুঝতে হবে যে হাতের কাজ ও বৌদ্ধিক জ্ঞানের ভিতর বিরোধ আছে বলে অহেতুক কল্পনা করে নিয়ে আমরা জনসাধারণের প্রগতিকে খুবই ব্যাহত করছি।

নবজীবন, ২৩-৯-২৮

২৫

শিক্ষা হস্তশিল্প কেন্দ্রিক হবে

শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে প্রাচীন শিল্পসমূহ শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য সম্বন্ধে আমার মনে সংশয়ের অবকাশ নেই। ভারতের প্রচলিত বিদ্যালয়গুলিতে যা চলে, আমি তাকে শিক্ষা আখ্যা দিই না। মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর সর্বোত্তম অভিপ্রকাশ এর লক্ষ্য নয়। এ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তির লাম্পট্য। বর্তমান প্রথা কোন প্রকারে কতকগুলি তথ্য মগজে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে প্রথম হতে মূলতঃ গ্রামীণ শিল্পের মাধ্যমে মনকে প্রশিক্ষিত করলে তার পরিণামে মনের যথার্থ ও সুশৃঙ্খল বিকাশ ঘটবে এবং এর ফলে বৌদ্ধিক ও এমন কি আধ্যাত্মিক শক্তির অপচয় নিবারিত হবে।

হরিজন, ৫-৬-৩৭

চতুর্থ অধ্যায়ঃ বনিয়াদী শিক্ষা

১

বুদ্ধির বিকাশ না বুদ্ধির লাম্পট্য?

ত্রিবাঙ্কুর ও মাদ্রাজের আমার সাম্প্রতিক সফরের সময় যেসব ছাত্র ও "বুদ্ধিজীবীদের" সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তাদের মধ্যে অধিকাংশের ভিতর বৌদ্ধিক বিকাশের পরিবর্তে বৌদ্ধিক লাম্পট্যের নিদর্শন দেখেছি। এই ত্রুটির মূল রয়েছে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির ভিতর যা এই দুষ্ট প্রবণতাকে প্রোৎসাহিত করে, মনকে করে বিপথগামী। এর ফলে মনের বিকাশ হবার পরিবর্তে তার বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেগাঁও-এ শিক্ষা নিয়ে আমি যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি তার ফলে আমার পূর্বোক্ত ধারণার পরিপুষ্টি ঘটেছে।....

আমি বিশ্বাস করি যে একমাত্র হাত পা চোখ কান নাক ইত্যাদি দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথোচিত অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের দ্বারাই বুদ্ধির যথার্থ শিক্ষণ সম্ভবপর। অর্থাৎ শিশুর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের বুদ্ধিযুক্ত ব্যবহার তার বুদ্ধির বিকাশের শ্রেষ্ঠতম ও দ্রুততম পন্থা। তবে মন ও দেহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে যদি আত্মার স্ফুরণ না হয়, তাহলে কেবল দেহ ও মনের বিকাশ একাঙ্গী ব্যাপার হবে। আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ বলতে আমি হৃদয়ের শিক্ষার কথা বলছি। সুতরাং মনের যথোচিত ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কেবল তখনই সম্ভব হতে পারে যখন শিশুর দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তি-সমূহের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও প্রশিক্ষণ হয়। দেহ মন ও আত্মার প্রশিক্ষণ অবিভাজ্য। সুতরাং এই মতবাদ অনুযায়ী একথা মনে করা একেবারেই ভুল যে এ তিনের পৃথক পৃথক বা পরস্পর অসম্পৃক্তভাবে বিকাশ ঘটা সম্ভবপর।

শরীর মন ও আত্মার বিভিন্ন বৃত্তির সঙ্গে যথোচিত পরস্পর সমন্বয় ও সুসংগতি না থাকার কুপ্রভাব সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর। এর নিদর্শন আমাদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে, কেবল আমাদের বর্তমানের বিকৃত অনুষঙ্গের কারণ এর অনুভূতি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের গ্রামবাসীদের কথা ধরুন। শৈশব থেকে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত তারা তাদের কৃষিক্ষেত্রে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। তাদের এই পরিশ্রমের সঙ্গী হল তাদের গৃহপালিত পশুগুলি, যাদের সাহচর্যে তাদের জীবন কাটাতে হয়। গ্রামবাসীদের অস্তিত্বের অর্থ হল শ্রান্তিবিহীন বিরক্তিকর যান্ত্রিক শ্রম, যার মধ্যে এমন একটু যতি বা ক্ষান্তি নেই যখন বুদ্ধির একটা ক্ষীণ ঝলক অথবা জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধের অভিব্যক্তি ঘটবে। মন ও আত্মার বিকাশের সর্ববিধ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে। তাদের কাছে জীবন হল এক দুঃখদ প্রমাদ এবং কোন রকমে তারা গড়িয়ে গড়িয়ে তার ভিতর দিয়ে চলে। অন্য দিকে দেশের শহরের স্কুল কলেজে শিক্ষা নামে যা চলে বাস্তব পক্ষে তা হল বৌদ্ধিক লাম্পট্য। এইসব তথাকথিত শিক্ষায়তনে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনকে শারিরীক বা দৈহিক কাজের সঙ্গে একেবারে অসম্পৃক্ত একটা জিনিস বলে মনে করা হয়। কিন্তু কিছুটা শরীরচর্চা না হলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে বলে তারা কোন কৃত্রিম অথবা অনুৎপাদক দেহচর্চার শরণ নেয়। তবে তার পরিণামও এমন যে সমগ্র ব্যাপারটা একটা বিরাট প্রহসনে পর্যবসিত হয়। এই পদ্ধতিতে যে যুবকটি গড়ে ওঠে দৈহিক সহ্যশক্তির দিক থেকে কোনমতেই সে কোন সাধারণ শ্রমিকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। একটুখানি পরিশ্রম করলেই তার মাথা ধরবে, সামান্য একটু রোদ লাগলেই তার মাথা ঘুরবে। আর এর চেয়েও বড় কথা হল এই যে এ-সবকে "স্বাভাবিক" মনে করা হয়। হৃদয়ের বৃত্তিসমূহের কথা ধরলে দেখা যাবে হেলায় অশ্রদ্ধায় সেগুলিকে নষ্ট হতে দেওয়া হয় অথবা বড়

বেশী হলে সেগুলি যেমন তেমন করে বিশৃঙ্খলভাবে গড়ে ওঠে। এর পরিণাম হল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নৈরাজ্য। আর একেই শ্লাঘনীয় একটা কিছু বিবেচনা করা হয়।

এর সঙ্গে সেই শিশুটির তুলনা করুন যার হৃদয়ের শিক্ষার প্রতি প্রথমাবধি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ধরুন তাকে শিক্ষার জন্য সুতা কাটা ছুতারের কাজ কৃষি ইত্যাদি কোন প্রয়োজনীয় বৃত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে এবং এইজন্য এইসব বৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রক্রিয়ার বিশদ জ্ঞান ও তার সঙ্গে সঙ্গে সেইসব প্রক্রিয়ায় যেসব হাতিয়ারপত্র ব্যবহার করতে হয় তাকে চালান এবং সেগুলি বানানর পদ্ধতিও সুষ্ঠুভাবে সে শিখেছে। এই রকম ছেলের শরীরই কেবল সুস্থ ও সুগঠিত হবে না, তার বুদ্ধিও হবে চৌকস ও পূর্ণমাত্রায় বিকশিত। এ বুদ্ধি কেতাবী নয়, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে সে বুদ্ধি ভালভাবে যাচাই করা ও তার ভিতর দৃঢ়নিবদ্ধ। গণিত-শাস্ত্র এবং বুদ্ধিযুক্তভাবে ও যোগ্যতাসহকারে তার পেশার অনুশীলন করার জন্য আর যেসব বিজ্ঞানের সহায়তা প্রয়োজন সে সবই তার বৌদ্ধিক শিক্ষার অঙ্গীভূত হবে। চিত্তবিনোদনের জন্য এর সঙ্গে যদি সাহিত্য যুক্ত হয় তাহলে সে আদর্শ সুসম এবং সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা—যে শিক্ষায় বুদ্ধি শরীর ও আত্মা পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয়ে এক স্বাভাবিক ও সুসঙ্গতিপূর্ণ অখণ্ড সত্তায় পরিণত হয় সেই শিক্ষা পাবে। মানুষ নিছক বুদ্ধিবৃত্তি নয় অথবা কেবল স্থূল জৈব দেহটি নয় কিংবা সে শুধু হৃদয় বা আত্মাও নয়। পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরীর জন্য তিনের যথোচিত এবং সুসমঞ্জস সমন্বয় প্রয়োজন আর এই হল শিক্ষার সত্যকার অর্থশাস্ত্র।

হরিজন, ৮-৫-১৯৩৭

২

শিক্ষার বনিয়াদ

শিক্ষা-সমস্যার সঙ্গে দুর্ভাগ্যক্রমে মাদকদ্রব্য বিক্রয়লব্ধ রাজস্ব বন্ধ করার সমস্যাটিও যুক্ত। নূতন কর বসানর উপায় এবং রাস্তা অবশ্য আছে। অধ্যাপক শাহ এবং খামভাটা দেখিয়ে দিয়েছেন যে আমাদের এই দরিদ্র দেশে এখনও নূতন নূতন কর বসান যায়। ধনীদের উপর এখনও যথেষ্ট কর বসান হয় নি। পৃথিবীর আর সব দেশের তুলনায় এই দেশে অতুল সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাকে ভারতীয় জনসমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ স্বরূপ বিবেচনা করতে হবে। সুতরাং একটা সীমার পর ধনীদের উপর আর কর বসান হবে না—এ রকম অবস্থা কখনই আসতে পারে না। আমি যতদূর জানি ইংলণ্ডে একটা নির্দিষ্ট আয়ের উপর যাঁরা উপার্জন করেন তাঁদের উপর শতকরা সত্তর ভাগ কর বসান হয়। ভারতবর্ষে আমরা আরও বেশী হারে কর কেন প্রবর্তন করব না তার কোন কারণ নেই।...

শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা জাতি হিসাবে এত অনগ্রসর যে যদি টাকার অপেক্ষায় থাকতে হয় তবে আমাদের জীবদ্দশায় এ ক্ষেত্রে জাতির জন্য যা করণীয় তা করতে পারব বলে ভরসা নেই। সুতরাং গঠনমূলক কাজের সব যোগ্যতা হারিয়েছি—এই অপবাদ শোনার আশঙ্কা আছে জেনেও আমি সাহস সহকারে ঘোষণা করেছি যে শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে। শিক্ষা বলতে আমি বুঝি শিশু এবং মানুষের শরীর মন ও আত্মা—সমস্ত দিকের সেরা সব কিছুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। অক্ষরজ্ঞান শিক্ষার অন্তিম লক্ষ্য নয়, এর সূচনা তো নয়ই। অক্ষরজ্ঞান হল মানুষের শিক্ষা পাবার অন্যতম মাধ্যম। অক্ষরজ্ঞান স্বয়ং কোন শিক্ষা নয়। আমি তাই শিশুর শিক্ষার পত্তন করব তাকে কোন প্রয়োজনীয় হস্তশিল্পের শিক্ষা দিয়ে যাতে শিক্ষার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই সে উৎপাদন করতে পারে।

এইভাবে প্রতিটি বিদ্যালয়কেই স্বাবলম্বী করা যায় যদি অবশ্য রাষ্ট্র বিদ্যালয়ের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী কিনে নেয়।

আমার বিশ্বাস এই রকম শিক্ষাপদ্ধতিতে মন ও আত্মার সর্বোচ্চ পরিমাণ বিকাশ সাধন সম্ভব। কেবল দেখতে হবে যে হস্ত-শিল্পগুলিকে আজকের মত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে না শিখিয়ে যেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শেখান হয়। অর্থাৎ শিশু প্রত্যেক প্রক্রিয়ার "কেন" ও "কিসের জন্য" জানবে। কোনরকম আত্মবিশ্বাস ব্যতিরেকে আমি এ কথা লিখছি না কারণ আমার বক্তব্যের পিছনে অভিজ্ঞতা রয়েছে। কর্মীদের যেখানে সুতা কাটা শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে মোটামুটি এই পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়। আমি স্বয়ং এই পদ্ধতিতে চপ্পল তৈরী ও এমন কি কাতাই শিক্ষা দিয়েছি এবং তার ভাল ফল পেয়েছি। এ পদ্ধতিতে ইতিহাস ও ভূগোলের জ্ঞান নিষিদ্ধ নয়। তবে আমি দেখছি যে এসব শিক্ষা দেবার শ্রেষ্ঠ পন্থা হল মুখে মুখে গল্পচ্ছলে এসব শেখান। এই প্রক্রিয়ায় একই সময়ে লেখাপড়া শেখানর চেয়ে দশগুণ বেশী শেখান যায়। পরে ছাত্র যখন সার ও অসারের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখবে এবং যখন তার রুচি মোটামুটি গড়ে উঠবে তখন তার বর্ণপরিচয় করান যেতে পারে। প্রস্তাবটি বৈপ্লবীক, তবে এর ফলে বহুল পরিমাণ পরিশ্রমের সাশ্রয় হয় এবং ছাত্র এই পদ্ধতিতে এক বছরে যা শিখবে অন্যভাবে তা শিখতে বহু বছর লাগবে। তাই এ প্রস্তাবের অর্থ হল সব রকমের সাশ্রয়। ছাত্র অবশ্য হাতের কাজ শিখতে শিখতে গণিতও শিখে নেয়।

প্রাথমিক শিক্ষার উপর আমি সবচেয়ে বেশী জোর দিই এবং আমার পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা হবে ইংরাজী বাদ দিয়ে আজকের প্রবেশিকা মানের। আমাদের কলেজগুলির ছাত্রসমাজ হঠাৎ যদি কোন কারণে এ যাবত যা কিছু শিখেছে তার সবটুকু ভুলে যায় তাহলে ধরুন কয়েক লাখ কলেজের ছাত্রের এই আকস্মিক

৫
স্বাবলম্বী শিক্ষা

ডঃ এ. লক্ষ্মীপতি লিখছেন ঃ

"মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত এমন অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমি দেখেছি যেখানে লেখাপড়া হয় কেবল সকাল বেলায়, আর বিকেল বেলা তারা কৃষি বা অন্য কোন হাতের কাজ করে এবং তার জন্য ছাত্ররা কাজের গুণ ও পরিমাণ অনুসারে পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে। এইভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কম বেশী স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে এবং ছাত্ররা বিদ্যালয় ছেড়ে বেরোনর সময় নিজেদের ডাঙ্গার মাছের মত মনে করে না। কারণ তারা অন্ততঃ নিজেদের পেটের ভাতের সংস্থান করার মত কিছু না কিছু রোজগার করার উপায় শিখেছে। আমি দেখেছি যে আমাদের শিক্ষাবিভাগ পরিচালিত প্রচলিত বিদ্যালয়ের নীরস ও গতানুগতিক পরিবেশের থেকে এইসব বিদ্যালয়ের আবহাওয়া একেবারে ভিন্ন। কিছুটা প্রয়োজনীয় কাজ করেছি এবং আমাদের শরীরও সুগঠিত—এই ধারণা ছাত্রদের মনে ক্রিয়াশীল থাকার ফলে তাদের সুস্থ ও সুখী মনে হয়। কৃষিকার্যের সময় এইসব বিদ্যালয় কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে এবং ছাত্রদের পুরো সময় তখন ক্ষেতের কাজে নিয়োগ করা হয়। এমনকি শহরেও যেসব ছেলের অভিরুচি থাকে তাদের কোন-না-কোন শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োগ করা যেতে পারে যাতে তারা একটু পরিবর্তনের স্বাদ পায়। দরিদ্র অথবা সহভোজে ইচ্ছুক ছাত্রদের জন্য এইসব বিদ্যালয়ে একবেলা খাবার দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর জন্য সকালবেলায় আধ ঘণ্টা পাঠ-বিরতির বন্দোবস্ত থাকবে। এমন ব্যবস্থা হলে দরিদ্র ছাত্ররা সাগ্রহে বিদ্যালয়ে যাবে এবং তাদের অভিভাবকেরাও ছেলেদের নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহিত হবেন।

"একবেলার বিদ্যালয়ের এই পরিকল্পনা যদি গৃহীত হয় তাহলে

কোনরকম অতিরিক্ত ব্যয় বিনাই গ্রামে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা দেবার জন্য এই রকম কিছু সংখ্যক শিক্ষকের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। বিদ্যালয়গৃহ এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য সাজসরঞ্জামও এইভাবে একাজে লাগতে পারে।

"আমি মাদ্রাজের শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি এবং তাঁর কাছে একটি পত্র মারফত করে জানিয়েছি যে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেবার বর্তমান অসুবিধাজনক সময়সূচিই তরুণ সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ। আমার মতে যাবতীয় স্কুল কলেজ সকালে অর্থাৎ ছয়টা থেকে বেলা এগারটা পর্যন্ত খোলা থাকা উচিত। বিদ্যালয়ে চারঘণ্টা পড়াশুনা করাই যথেষ্ট বিবেচিত হবে। দুপুর বেলায় ঘরে থেকে বিকালবেলাকে খেলাধুলা ও শরীরচর্চার জন্য নিয়োগ করতে হবে। কোন কোন ছাত্র এই সময়কে নিজের অন্ন-সংস্থানের জন্য কাজে লাগাতে পারে, কেউ কেউ বাবার ব্যবসায়ে সাহায্যও করতে পারে। এই জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিজের মা-বাবার সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। যে কোন হাতের কাজের কুশলতাবৃদ্ধির জন্য এবং বংশগত কলাকৌশলের বিকাশের পক্ষে এই ঘনিষ্ঠতা অতীব প্রয়োজন।

"আমরা যদি উপলব্ধি করি যে শরীর-গঠনের অর্থ জাতি-গঠন তাহলে প্রস্তাবিত পরিবর্তন আপাতদৃষ্টিতে বৈপ্লবীক প্রতীয়মান হলেও ভারতীয় প্রথা ও পরিবেশ অনুসারে এ অধিকাংশ দেশবাসী কর্তৃক অভিনন্দিত হবে।"

কেবল সকালে বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন সংক্রান্ত ডঃ লক্ষ্মীপতির প্রস্তাব সম্বন্ধে আমি কেবল এইটুকুই বলব যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে আমি এ প্রস্তাব গ্রহণের সুপারিশ করছি। আর মোটামুটি স্বাবলম্বী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হল আংশিকভাবে অথবা পূর্ণতঃ শিক্ষাব্যয় উপার্জন করতে হলে এবং ছাত্রদের মানুষের মত গড়ে তুলতে হলে এ ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নেই।

তবুও আমার প্রস্তাবে শিক্ষাবিদ্‌রা আতঙ্কিত হয়েছেন। এর কারণ হল এই যে এই লক্ষ্য সংসাধনের অপর কোন পন্থা তাঁদের জানা নেই। স্বাবলম্বী শিক্ষার পরিকল্পনার কথা শুনলেই তাঁরা ভাবেন যে তাহলে শিক্ষার আর কোন মূল্য থাকবে না। এই প্রস্তাবের পিছনে তাঁরা মজুরী করানর অভিসন্ধি দেখতে পান। শিক্ষা বিস্তারে ইহুদীদের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ পড়েছি। লেখক এতে ইহুদীদের বিদ্যালয়ে হাতের কাজ শেখানর প্রসঙ্গে বলছেন ঃ

"সুতরাং তারা হাতের শ্রমকে স্বয়ং এর পুরস্কার জ্ঞান করে। বৌদ্ধিক কার্যকলাপের দ্বারা এর ভার হাল্কা করা হয় এবং এর সঙ্গে দেশাত্মবোধের যে ভাবনা যুক্ত রয়েছে তার ফলে এ কাজ মহীয়ান হয়ে ওঠে।"

ঠিক ধরণের শিক্ষকের সাহচর্য পেলে আমাদের ছেলেমেয়েরা শ্রমের মর্যাদা শিখবে এবং শ্রমকে তারা নিজেদের বৌদ্ধিক বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও মাধ্যম বিবেচনা করবে। নিজেদের শ্রমে নিজেদের শিক্ষাব্যয় নির্বাহ করাকে তারা দেশাত্মবোধক কাজ বলে মনে করবে। আমার বক্তব্যের সার কথা হল এই যে হাতের কাজকে কেবল উৎপাদনমূলক কাজের উদ্দেশ্যে শেখান হবে না, ছাত্রের বৌদ্ধিক বিকাশও হবে এর মাধ্যমে। রাষ্ট্র যদি সাত থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব নিয়ে উৎপাদনমূলক শ্রমের মাধ্যমে তাদের দেহ ও মনকে প্রশিক্ষিত করে তোলে এবং তারপরও যদি সেই শিক্ষাব্যবস্থা স্বাবলম্বী না হয় তাহলে সেইসব সরকারী বিদ্যায়তনকে ধাপ্পাবাজীর আখড়া ও সেখানকার শিক্ষকদের মূর্খ আখ্যা দিতে হবে।

প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে যদি যন্ত্রের মত নয়, বুদ্ধিযুক্ত হয়ে কাজ করে এবং তারা যদি বিশেষজ্ঞের অধীনে পরিচালিত সামুহিক কার্যে আগ্রহ সহকারে যোগদান করে তাহলে প্রথম বছরের পর তাদের

সামুহিক শ্রমের দ্বারা ঘণ্টায় এক আনা হিসাবে রোজগার করতে পারা উচিত। এইভাবে দৈনিক চার ঘণ্টা হারে মাসে যদি ছাব্বিশ দিন কাজ করা যায় তাহলে প্রতিটি শিশু মাসিক সাড়ে ছয় টাকা রোজগার করবে। একমাত্র প্রশ্ন হল এই যে দেশের লক্ষ লক্ষ শিশুকে কি এইরকম লাভজনক ভাবে কাজে লাগান সম্ভব? এক বছরের শিক্ষার পর আমাদের শিশুদের উদ্যমকে যদি এমন কাজে লাগার্তে না পারি যার থেকে প্রতি ঘণ্টায় এক আমা দামের ব্যবহার্য পণ্য উৎপন্ন হয়, তাহলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির দেউলিয়া দশা উপস্থিত হয়েছে বুঝতে হবে। আমি জানি যে ভারতবর্ষের কুত্রাপি গ্রামবাসীরা গ্রামে থেকে ঘণ্টায় এক আনা হারে উপার্জন করতে পারে না। এর কারণ হল এই যে আমরা বিত্তবান ও নিঃস্বদের ভিতর যে দুস্তর বৈষম্য রয়েছে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি আর শহরের লোকেরা সম্ভবতঃ না বুঝে ইংরেজদের গ্রামকে শোষণ করার পরিকল্পনার ভাগীদার হয়েছেন।

হরিজন, ১১-৯-১৯৩৭

৬

স্বাবলম্বী বিদ্যালয়

"আমাদের অর্থব্যবস্থার একটি মূখ্য লক্ষণ হল জনসংখ্যার তুলনায় সম্পদের স্বল্পতা। ভারতবর্ষে জনবসতিবিহীন ভূখণ্ড আর নেই অথবা আমরা উপনিবেশ ও প্রয়োজনাতিরিক্ত পুঁজির রোগেও ভুগছি না। সুতরাং আমাদের দেশের সম্পদকে কাজে লাগানর অধিকার কেবল তাদেরই থাকা উচিত যারা এর জন্য যথোচিতভাবে প্রশিক্ষিত। একশজন লোক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত একশ টুকরা জমিতে চাষ করলে হয়ত পঞ্চাশজনের খাদ্য উৎপাদন করতে পারবে। কিন্তু এইসব জমির টুকরাকে যদি সংহত করা যায় এবং একজন করে সার বিশেষজ্ঞ, চারা-প্রজনন-বিশেষজ্ঞ ও সেচ-বাস্তকারসহ মাত্র কুড়িজন যদি সেই জমি চাষ করেন তাহলে ঐ একই জমিতে একশজনের খোরাক উৎপন্ন হতে পারে।

শ্রমিকদের পারিবারিক জীবনকে বিপর্যস্ত না করে ও তাদের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ না করে উৎপাদন বৃদ্ধির যেসব পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে তার ফলে বহুল সংখ্যক লোকের আর কাজ করার প্রয়োজন নেই। মানুষকে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর অবসর নিতে বাধ্য করা এক অপচয়মূলক সমাধান। কারণ স্বাভাবিক মানুষের দেহ ও মনের শক্তি ঐ বয়সের পর প্রখরতম হয়ে ওঠে। সুতরাং যথার্থ পন্থা হল সম্যক্‌ভাবে প্রস্তুত হবার পূর্বে মানুষকে জীবন-সংগ্রামে প্রবেশ করতে না দেওয়া।

"প্রত্যুত একটু ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে যে ভারতবর্ষের আর্থিক অবক্ষয়ের প্রধান কারণ হল তার শ্রমিক সমাজের পরিণত বয়সের পূর্বে কাজে লাগা। ছুতার মিস্ত্রির ছেলে এত অল্প বয়সে শিক্ষানবিশী শুরু করে যে বার বছর বয়সেই সে তার সর্বোচ্চ আয় করার ক্ষমতা অর্জন করে। তারপরই সে বিবাহ করে স্বাধীনভাবে নিজের উপজীবিকা চালাতে থাকে। সুতরাং উৎপাদন ও বণ্টনের নূতন পদ্ধতি তাকে আর প্রভাবিত করতে পারে না। অপরিণত বালককে কলকারখানার শিক্ষা-নবিশী করতে দিলে তার মানসিক শক্তি খর্ব ও জড় হয়ে যায় এবং তাদের কাজের কোন আর্থিক তাৎপর্যও থাকে না। এ জাতীয় শ্রমিককে যে-কেউ শোষণ করতে পারে। তার ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্কীর্ণ দুনিয়াতে যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিকের আধারে কোনমতে টিকে থেকে বংশবৃদ্ধি করে সে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে। ভারতবর্ষের বর্তমান সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিকতার মনোভাব, স্বল্পে সন্তুষ্টি ও অদৃষ্টবাদী মনোবৃত্তি, জাতিভেদ প্রথা, মাদকদ্রব্যের বহুল প্রচার ইত্যাদির কারণ হল পূর্বোক্ত অপরিণত শ্রমিকদের বাহুল্য। সিংহলের চা বাগান দেখার সময় আমি যাতে সবচেয়ে বেশী আতঙ্কিত হয়েছিলাম তা হল শিশু-শ্রমিকদের অস্তিত্ব। সেখানে বিদ্যালয় অবশ্য আছে কিন্তু অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের সেখানে না পাঠিয়ে রোজগার করতে পাঠানর জন্য বেশী আগ্রহশীল। বয়স্করা শিশুদের প্রতি নিজ কর্তব্য পালনে সর্বদাই উদাসীন। রাষ্ট্রের কর্তব্য হল ব্যক্তির পক্ষে কল্যাণকর ও জাতির পক্ষে ক্ষতিকারক কার্যকলাপের উপর নজর রাখা। সিংহলের মত দেশ যেখানকার জনসংখ্যা সেদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, সেখানেও শিশু-শ্রমিক নিয়োগ করার সপক্ষে

যুক্তি নেই। আর ভারতবর্ষের মত যেখানে শিশু-শ্রমিক নিয়োগ করার অর্থ বয়স্কদের বেকার করা সেখানে এর কথাই উঠতে পারে না।

"আমরা যেন এই আত্মপ্রতারণার শিকার না হই যে স্বাবলম্বী কারখানা-বিদ্যালয় পণ্য উৎপাদন ও বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দেবারও আয়োজন করতে পারবে। বাস্তব ক্ষেত্রে এ হবে আইন সঙ্গত শিশুশ্রম। কোন বিদ্যালয় যদি কাতাইকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে তাহলে সেখানে চরখার চাকা ঘুরান যান্ত্রিক ক্রিয়া হয়ে উঠবে। হরিজনের সম্পাদকের সঙ্গে আমি এবিষয়ে সহমত নই যে এক টুকরা কাপড়ে কতটুকু স্থতা লাগবে তার হিসাব করে গণিত শিক্ষা দেওয়া যায় অথবা কাপাসের উদগম ও বিকাশকে অবলম্বন করে বিজ্ঞান এবং ভূগোল শিক্ষা দেওয়া যায়। এসব এক-আধবার করলে মনকে উদ্দীপ্ত করতে পারে। কিছু বছরের পর বছর নিত্য এর পুনরাবৃত্তি করলে মন অনুভূতিপ্রবণতা হারিয়ে ফেলবে ও যৎপরোনাস্তি একঘেয়ে লাগবে। জীবনের উদ্বর্তনে মানুষের টিকে থাকার কারণ কোন বিশেষ প্রবণতার আত্মীকরণে তার দক্ষতা নয়, জটিল বাস্তবের নিত্য পরিবর্তনশীল চাহিদা মেটাবার উপযুক্ত এক সর্বসামান্য সংস্কৃতির পরিচয় দিতে পারার জন্যই উদ্বর্তনে মানুষের সাফল্য। চোখ কান ও হাতের অনুশীলন একান্ত অপরিহার্য এবং সব বিদ্যালয়েই দৈহিক শ্রমকে বাধ্যতামূলক করা উচিত; কিন্তু আমাদের এ কথা ভুললে চলবে না যে হাতের প্রশিক্ষণ বলতে আমরা যা বুঝি আসলে তা মস্তিষ্কেরই অনুশীলন। শিক্ষা দেওয়াই যদি কোন বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হয় তাহলে বিক্রির জন্য একই ধরনের জিনিস তৈরী করার কথা ভুলে যেতে হবে। শিশুদের একাধিক ধরনের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি দিতে হবে এবং সেগুলি নিয়ে তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে ও সেগুলিকে নষ্ট করবে। অপচয় এখানে অপরিহার্য। হরিজনের বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত পারিখের প্রবন্ধটিকে খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যাবে যে কোন বিদ্যালয় কোন বিশেষ হাতের কাজে পারদর্শীতা লাভ করলেও এবং বয়স্ক ছেলেদের সেই কাজ শেখালেও অপচয়ের পরিমাণ যথেষ্ট। বিজ্ঞান কলেজের মত বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সম্পদের অপচয়ের জায়গা। স্থতরাং ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে এ জাতীয় বিদ্যালয় যথাসম্ভব কম সংখ্যায় খুলবে

এবং যেগুলি খুলবে সেগুলি হবে দেশের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। গোরক্ষপুর ও অযোধ্যার ছাত্রদের বাছাই করে কানপুরে চামড়া পাকা করার কাজ শিখতে পাঠালে জাতির কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু অসংখ্য বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় শুরু করলে অবশ্যই সম্পদের অপচয় হবে।

"আর এক রকমের অপচয়ের কথা সচরাচর হিসাবে ধরা হয় না। আধসের তুলো দিয়ে কোন অভিজ্ঞ প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক যদি চারজনের মত কাপড় তৈরী করে তাহলে অনভিজ্ঞ শ্রমিক কষ্টেসৃষ্টে দুজনের কাপড় তৈরী করবে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে সমগ্র ভারতবাসীর কাপড় উৎপাদনের জন্য দ্বিগুণ জমিতে কাপাসের চাষ করতে হবে। অর্থাৎ অনভিজ্ঞ শ্রমিকের সাহায্যে ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় কাপড় তৈরী করলে এর প্রয়োজনীয় তুলা উৎপাদন করতে এত জমি লাগবে যাতে দেশবাসীর প্রয়োজনীয় তুলা (অভিজ্ঞ শ্রমিক দ্বারা কাপড় তৈরী করলে) ও খাদ্যশস্যের উৎপাদন হতে পারে।

"এই অপচয়ের তৃতীয় দিকটির কথাও বিবেচনা করা উচিত। শোনা যায় যে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সৌখিন জিনিস তৈরী করতে পারে। সম্প্রতি আমি একটি কারিগরী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্রদের প্লাইউড থেকে খেলনা তৈরী করতে দেখেছি। এর কাঠ স্ক্রু এবং যন্ত্রপাতি—সবই বিদেশী। এই জাতীয় শিল্প বিদেশী পণ্যের নূতন বাজার সৃষ্টি করে। বলতে পারেন যে ভারতবর্ষেই প্লাইউড তৈরী হতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ তো আর আমেরিকা নয় যে উদ্বৃত্ত জমিতে প্লাইউড তৈরীর জন্য গাছ লাগাবে। অপ্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল ও পুঁজির বিনিয়োগকে প্রোৎসাহিত না করে সঙ্কুচিত করতে হবে।

"বিদ্যালয় বা কলেজ এমন একটি জায়গায় হওয়া উচিত যেখানে তরুণ সমাজ দরদামের পরিবেশে নয়, মূল্যবোধের জগতে বসবাস করবে। মনে প্রথম দাগকাটার বয়সে যদি তাদের সামনে উৎপাদন বিক্রয় ও অর্থোপার্জনকে আদর্শরূপে চোখের সামনে ধরা যায় তাহলে তাদের বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং আমরা এমন একটি পদ্ধতির পরিপুষ্টি সাধন করব যার ফলস্বরূপ আজকের পৃথিবী প্রাচুর্যের মধ্যে দৈন্য ভোগ

করছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন না এটা তাৎপর্যমূলক।

"আমরা শেখানর গতি দ্রুত করে ছেলেরা আজকে সাত বছরে যা শিখছে তা দু বছরে শেখাতে পারি বলা এক অলীক মায়া মাত্র। শিশুর মন কোন কিছু দিয়ে ভরার মত খালি পাত্র নয়। শিশু ষোল বছর বয়সে যা শিখবে আট বছর বয়সে তা শিখতে পারে না এবং তাকে তা শেখানর চেষ্টাও করা উচিত নয়। শিক্ষায় বিলম্বের কারণ বিদেশী মাধ্যম নয়। আর লোকে যে মনে করেন যে এর জন্য আমাদের খুব একটা অতিরিক্ত সময় দিতে হচ্ছে—তাও ঠিক নয়। রচনা লেখা মন ও মানসিক আবেগের একটা প্রশিক্ষণ এবং তাই এ জাতীয় প্রশিক্ষণের গতি ধীর হতে বাধ্য।"

পূর্বোক্ত বক্তব্য একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপকের।…পূর্বকল্পিত ধারণা কিভাবে মানুষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে রচনাটি তারই জ্বলন্ত নিদর্শন। লেখক আমার শিক্ষা-পরিকল্পনাকে বোঝার চেষ্টা করেন নি। আমার পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সিংহলের চা-বাগানের প্রায় কৃতদাস শ্রমিকদের সঙ্গে তুলনা করে তিনি নিজের অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ভুলে গেছেন যে চা বাগানের শ্রমিক-বালকদের ছাত্র বলে মনে করা হয় না। তাদের শ্রম তাদের শিক্ষার অঙ্গ নয়। আমি যে ধরনের বিদ্যালয়ের কথা বলছি সেখানকার ছাত্ররা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মতই সবকিছু শিখবে। তফাৎ কেবল এইটুকু যে আমার বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ইংরাজী শিখবে না এবং অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে শিখবে ব্যায়াম সঙ্গীত চিত্রাঙ্কণ ও একটি উৎপাদনমূলক হাতের কাজ। এই জাতীয় বিদ্যালয়কে কারখানা আখ্যা দেওয়ার অর্থ গায়ের জোরে বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা। এ হল সেই রকম লোকের মত যিনি কোন মনুষ্যের বর্ণনা পড়তে রাজী নন কিন্তু তবু তাকে বানর আখ্যা দেবেনই। এর কারণ হল এই যে তিনি বানর ছাড়া অপর কোন জীব দেখেন নি এবং বানরের বর্ণনা কোন অংশে —কেবল কোন কোন অংশেই—মানুষের সঙ্গে মেলে।…

আমি স্বীকার করছি যে আমার প্রস্তাব অভিনব। কিন্তু অভিনবতা কোন অপরাধ নয়। আমি মেনে নিচ্ছি আমার এ প্রস্তাব পূর্ব পরীক্ষিত নয়। তবে আমার এবং আমার সহকর্মীদের যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে তাতে আমরা সোৎসাহে মনে করি যে আমাদের পরিকল্পনাকে যদি যথাযথভাবে রূপায়িত করা যায়, তাহলে এ সফল হবে। আর এ পরিকল্পনা যদি ব্যর্থও হয় তাহলে এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য জাতির কোন ক্ষতি হবে না। আর যদি আংশীক সাফল্যও মেলে তাহলে জাতির অপরিসীম লাভ হবে। অপর কোন পন্থায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক ও কার্যকরী করা সম্ভব। প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা নিঃসন্দেহে ফাঁদ বিশেষ ও একটি মরিচিকা।

যতটা সম্ভব নূতন শিক্ষাপরিকল্পনার সমর্থনের জন্য শ্রীনরহরি পারিখ-এর পরিসংখ্যানগুলির উদ্ধরণ করা হয়েছে। ওগুলিকেই শেষ কথা মনে করার কারণ নেই। তবে পরিসংখ্যানগুলি অবশ্যই উৎসাহব্যঞ্জক। উৎসাহীদের ঐ পরিসংখ্যানগুলি ভাল তথ্য সরবরাহ করে। সাত বছরের শিক্ষা আমার পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। হতে পারে যে আমি ছাত্রদের যতটা বৌদ্ধিক বিকাশ চাই তার জন্য আরও বেশী সময় লাগবে। শিক্ষা-কাল বৃদ্ধি করলে জাতির কোন ক্ষতি হবে না। পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নিম্নরূপঃ

১। সব দিক থেকে বিচার করলে ছেলে বা মেয়ের সর্বাঙ্গীন বিকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম হল বৃত্তিমূলক শিক্ষা। সুতরাং সব রকমের পাঠ্যক্রম বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে কেন্দ্র করে রচনা করতে হবে।

২। প্রথম বা দ্বিতীয় বৎসরে পূর্ণমাত্রায় স্বাবলম্বী না হলেও এইভাবে পরিকল্পিত সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষা স্বাবলম্বী হতে বাধ্য। প্রাথমিক শিক্ষা বলতে এখানে পূর্বোক্ত ধরনের শিক্ষাব্যবস্থাকে বোঝাচ্ছে।

অধ্যাপক মহোদয় গণিত এবং অন্যান্য বিষয় হাতের কাজের

মাধ্যমে শেখানর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। এখানে তাঁর বক্তব্য অনভিজ্ঞতা প্রসূত। আমার বক্তব্যের মূলে রয়েছে অভিজ্ঞতা, ট্রান্সভালের টলস্টয় ফার্মে আমার উপর যেসব ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল তাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনে আমার কোন অসুবিধা হয় নি। আর সেখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল অঙ্গ ছিল দৈনিক প্রায় আট ঘণ্টা হাতের কাজ করা। ছেলেমেয়েরা এক ঘণ্টা বা বড় বেশী হলে দু ঘণ্টা বইখাতা নিয়ে লেখাপড়া করত। মাটি খোঁড়া, রান্না করা, সাফাই, চপ্পল তৈরী, ছুতারের সাধারণ কাজ এবং পত্র বা সংবাদ বহন—এইসব ছিল সেখানকার হাতেকলমে করার কাজ। ছয় থেকে ষোল বছরের ছেলেমেয়ে টলস্টয় ফার্মে ছিল। আর তারপর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।

হরিজন, ১৮-৯-১৯৩৭

৭

স্বাবলম্বী শিক্ষাপ্রসঙ্গে আলোচনা

যথাসম্ভব শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে মাদক বর্জনের কর্মসূচীকে রূপায়িত করার জন্য স্বাবলম্বী শিক্ষার পরিকল্পনার সৃষ্টি হয়েছে—এই ধারণার বিরুদ্ধে গান্ধীজী একটি প্রসঙ্গে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, "দুটিরই স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। এই বিশ্বাস নিয়ে আপনাদের কাজ শুরু করতে হবে যে রাজকোষে অর্থ আসুক বা না-ই আসুক, শিক্ষা হক বা না-ই হক সম্পূর্ণভাবে মাদক বর্জন করতে হবে। অনুরূপভাবে এই বিশ্বাস নিয়ে আপনাদের শুরু করতে হবে যে ভারতবর্ষের গ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে গ্রামীণ শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হলে তাকে স্বাবলম্বীও হতে হবে।"

যে শিক্ষাবিদ্ ভদ্রলোক আলোচনা করছিলেন, তিনি বললেন,

"এর মধ্যে প্রথম বিশ্বাসটি আমার হৃদয়ে দৃঢ়মূল। আমার কাছে মাদকবর্জন একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ লক্ষ্য এবং একে আমি স্বয়ং শিক্ষার একটি মহান্ কর্মসূচী বলে বিবেচনা করি। সুতরাং মাদক-বর্জনকে সফল করার জন্য শিক্ষাকে একেবারে বাদ দিতেও আমি প্রস্তুত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বাসটি আমার ভিতরে নেই। এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করা যায়।"

গান্ধীজী বললেন, "এখানেও আমি আপনাকে ঐ বিশ্বাস নিয়ে আরম্ভ করতে বলছি। একে কাজে রূপায়িত করা শুরু করলে এর উপায় ও পদ্ধতি খুঁজে পাবেন। আমার দুঃখ হচ্ছে যে বড় বেশী বয়সে এই প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি সচেতন হলাম। নচেৎ আমি নিজেই এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতাম। তবে ঈশ্বরের করুণা হলে এযে সম্ভব সেকথা প্রমাণ করার জন্য আমি যতটা পারি চেষ্টা করব। তবে বিগত কয়েক বৎসর অন্যান্য কাজে আমার সময় গেছে এবং সম্ভবতঃ সেসব একাজের মতই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সেগাঁও-এ এসে বসবাস আরম্ভ করার পরই স্বাবলম্বী শিক্ষা সম্বন্ধে আমার প্রত্যয় দৃঢ়মূল হয়েছে। এতাবৎকাল আমরা শিশুর মনকে নানারকম তথ্যে ভারাক্রান্ত করেছি, তার মনকে অনুপ্রেরিত ও বিকশিত করার দিকে নজর দিই নি। এবার যেন আমরা এতে ক্ষান্তি দিয়ে শরীর-শ্রমের মাধ্যমে শিশুর সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ব্যবস্থা করি। এই শ্রম কোন অতিরিক্ত কর্মসূচি হবে না, হবে বৌদ্ধিক প্রশিক্ষণের প্রধান সাধন।"

"এটা হয়ত সম্ভব। কিন্তু এর দ্বারা বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহের কথা ওঠে কেন?"

"এর সারবত্তার কষ্টিপাথর এই। সাত বছরের শিক্ষার পর চোদ্দ বছর বয়সে সমাজের উপার্জনকারী সদস্য হিসাবে শিশু বিদ্যালয় থেকে বেরোবে। আজও গরীবদের ছেলেমেয়েরা স্বতঃই নিজেদের বাপ-মাকে সাহায্য করে থাকে। বাবা-মায়ের সঙ্গে কাজ না করলে

তাঁরা কি খাবেন এবং আমাকেই বা কি খাওয়াবেন—এই মনোবৃত্তি তাদের ভিতর কাজ করে। এই মনোবৃত্তি স্বয়ং এক শিক্ষা। এই ভাবে সাত বছর বয়সে রাষ্ট্র শিশুর দায়িত্ব নিয়ে চৌদ্দ বছর বয়সের ভিতর তাকে উপার্জনক্ষম করে পরিবারের কাছে ফেরৎ দেয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যার মূলোচ্ছেদ হয়। শিশুদের কোন না কোন ধরণের কাজের শিক্ষা দিতে হবে। সেই বিশেষ বৃত্তিটিকে কেন্দ্র করে শিশুর মন ও শরীরের প্রশিক্ষণ হবে, তার হাতের লেখা ও শিল্পবোধের উৎকর্ষ সাধিত হবে এবং তার অন্যান্য বৃত্তি পুষ্ট হবে। যে হাতের কাজ সে শিখবে শিশু তাতে পারঙ্গম হবে।"

"ধরুন কোন ছাত্র খাদি উৎপাদনের কলা ও বিজ্ঞান শেখা আরম্ভ করল। আপনি কি মনে করেন এই হাতের কাজটিতে পারঙ্গম হতে তার সাত বছর সময় লাগবে?"

"হ্যাঁ। নিছক যান্ত্রিকভাবে না শিখলে অবশ্যই এই সময় লাগবে। ইতিহাস কিংবা ভাষা শেখার জন্য আমরা বছরের পর বছর সময় দিই না? পূর্বোক্ত যেসব বিষয়ের উপর অদ্যাবধি কৃত্রিম গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তার চেয়ে কোন হাতের কাজ কম গুরুত্বপূর্ণ কিসে?"

"কিন্তু আপনি যখন প্রধানতঃ সুতা কাটা ও কাপড় বোনার কথা চিন্তা করছেন তখন মনে হয় যে আপনি নিশ্চিতভাবে আপনার পরিকল্পিত সব বিদ্যালয়কে বুনাই বিদ্যালয়ে পর্যবসিত করতে চান। কোন শিশুর বুনাই-এর প্রতি আকর্ষণ না থেকে অন্য কিছুর প্রতি আগ্রহ থাকতে পারে।"

"ঠিক বলেছেন। সেরকম অবস্থায় আমরা তাকে অন্য কোন হাতের কাজ শেখাব। তবে একথাও আপনাদের জানতে হবে যে একটি বিদ্যালয়ে অনেক রকম হাতের কাজ শেখানর ব্যবস্থা থাকবে না। আমার পরিকল্পনা হল পঁচিশজন ছাত্র পিছু

একজন করে শিক্ষকের ব্যবস্থা রাখা। সুতরাং শিক্ষকদের সংখ্যা অনুসারে পঁচিশজন হিসাবে ছাত্র নিয়ে যতগুলি ইচ্ছা ক্লাস বা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই সব বিভিন্ন বিদ্যালয় সূত্রধর কর্মকার চর্মকার অথবা মুচি ইত্যাদিদের বিভিন্ন ধরণের হাতের কাজে পারঙ্গমতা লাভ করবে। আপনাদের শুধু এইটুকুই স্মরণ রাখতে হবে যে এই সব হাতের কাজের প্রতিটির মাধ্যমে আপনাদের শিশুর মনের বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। আর একটি বিষয়ের উপর আমি জোর দিতে চাই। শহরগুলিকে ভুলে গিয়ে আপনাদের গ্রামের উপর জোর দিতে হবে। গ্রামগুলি হল সমুদ্রের মত আর শহর সমুদ্রের বিন্দুর চেয়ে বেশী নয়। সেইজন্য ইঁট গড়ার মত বিষয়কে মনে ঠাঁই দেওয়া যায় না। কোন ছেলেকে যদি বাস্তুকার বা যন্ত্রবিৎ হতেই হয় তাহলে সাত বছরের পাঠ্যক্রম শেষ করে তাকে বিশেষ পাঠ্যক্রমের পাঠ নেবার জন্য নির্দিষ্ট উচ্চতর মহাবিদ্যালয়ে যেতে হবে।”

“আর একটি বিষয়ের উপর জোর দেব। শিক্ষাকে বাড়ীর শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি বলে কুটীর শিল্পের প্রতি তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। শরীর-শ্রমকে একটা হীন কাজ বিবেচনা করা হয় এবং বর্ণপ্রথার বীভৎস বিকৃতিসাধন করে সুতা-কাটা কাপড় বোনা ছুতার অথবা চর্মকারের কাজকে আমরা নীচ জাতি—নিঃস্বদের পেশা বলে মনে করি। হাতের কাজকে দক্ষতা বিবর্জিত হীন একটা কিছু মনে করার এই পাপপ্রথার জন্য আমাদের ভিতর ক্রম্‌পটন অথবা হারগ্রীভ-এর মত যন্ত্রবিৎ-এর আবির্ভাব হয় নি। এই সব পেশাকে যদি লেখাপড়া শেখার মতই স্বাধীন ও সম্মানজনক বৃত্তি বলে মনে করা হত তাহলে আমাদের শিল্পীদের ভিতর থেকেও মহান্ আবিষ্কারকের উদ্ভব হত। অবশ্য ‘স্পিনিং জেনি’-এর ফলে বাষ্পশক্তি ও তৎসংশ্লিষ্ট সহস্র সহস্র শ্রমিককে বেকার করে দেবার অন্যান্য জিনিসের আবিষ্কার

হয়। আমার মতে সেসব দানবীয় ব্যাপার। গ্রামের উপর জোর দিয়ে আমরা দেখব যে কোন হাতের কাজ খুঁটিয়ে শেখার ফলে যে ব্যাপক দক্ষতা অর্জিত হবে তা সামগ্রীকভাবে গ্রামের কল্যাণসাধনের বৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ হবে ও গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয়তার পরিপূর্তি করবে।"

হরিজন, ১৮-৯-১৯৩৭

৮

অলস চিন্তায় হবে না

ডঃ জ. স. আরুণ্ডলে নিম্নোদ্ধৃত পত্র সহ 'ওরিয়েণ্টাল ইলাস্ট্রেটেড উইকলি' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরিত তাঁর একটি প্রবন্ধের নকল আমার কাছে পাঠিয়েছেন :

"আপনি এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন যে অতঃপর এদেশের শিক্ষা যেন বাস্তবতা সম্মত হয়, অতীতের মত আর যেন কৃত্রিম না হয়। ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে গত ত্রিশ বৎসর সক্রিয়ভাবে জড়িত একজন হিসাবে আমি আপনাকে এই প্রবন্ধটি পাঠাচ্ছি। এতে হয়ত কিছু মাত্রায় আপনার অভিমতের প্রতিধ্বনি পাবেন। আমার দৃঢ় অভিমত এই যে শিক্ষার একটা জাতীয় পরিকল্পনা থাকা উচিত এবং প্রতিটি জাতীয় মন্ত্রীর কর্তব্য নিজ নিজ প্রদেশে সযত্নে একে রূপায়িত করা। এ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে অনেক চিন্তা করা হয়েছে। সুতরাং আমার মনে হয় আর কাল বিলম্ব না করে সরকার ও জনসাধারণের সহযোগীতায় শিক্ষা-সংস্কারের একটি সাধারণ সূত্র ও সর্বসামান্য প্রচেষ্টার উদ্ভব করা প্রয়োজন।"

প্রবন্ধটি থেকে আমি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি। কিভাবে এগোতে হবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করার পর তিনি বলছেন :

"জাতীয় শিক্ষার মূল নীতির ধারা কেমন হবে সে সম্বন্ধে

আলোচনা করার স্থান এখানে নেই, তবে বিদ্যালয়ের পরিধির সঙ্গে ছেলে ও মেয়েদের যতটুকু সম্বন্ধ সেক্ষেত্রে আমরা 'বিদ্যালয়' ও 'মহাবিদ্যালয়ে'র ভিতরকার অবাস্তব পার্থক্য ধীরে ধীরে ঘুচিয়ে ফেলব বলে আশা করছি। সর্বত্র হাতে কাজ করার উপর জোর দেওয়া হবে।

"চিন্তা যতই উদ্দীপ্ত হক না কেন তা কাজে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত নিরর্থক। আবেগ এবং অনুভূতি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে, অথচ অতি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাতেও এদের বিপজ্জনক ভাবে উপেক্ষা করা হয়। ভারতবর্ষের প্রয়োজন তার যুবসম্প্রদায়কে কর্মীতে পরিণত করা। শিক্ষার দ্বারা এই সব কর্মীদের চরিত্র এমনভাবে বিকশিত হবে যাতে তারা সহজেই কর্মে প্রবৃত্ত হয়—বাস্তব দক্ষতা ও সেবার প্রতীক যেন হয় তারা। পরিবেশ অথবা বংশানুক্রমিকতা—যে কোন কারণে জীবনের যে বিভাগেই তাদের ডাক পড়ুক না কেন সেখানে যোগ্যতাসহকারে কাজ করবে, এমন তরুণ নাগরিক ভারতবর্ষের প্রয়োজন। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয়ের লক্ষ্য হল আদর্শ জীবনযাত্রার জন্য ছাত্রদের তৈরী করা। প্রতিটি বিষয় সেই মহান্ ঐশ্বরীক বিধান, সেই বিধিব্যবস্থা ও জীবনের লক্ষ্যকে অভিব্যক্ত করে। তথাকথিত তথ্যের ধূলিজালে চাপা পড়ে শিক্ষকেরা যেন এই সত্য বিস্মৃত না হন। তাঁরা যেন স্মরণ রাখেন যে আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য এই জগতে তথ্য বলে কোন কিছু নেই, আছে কেবল প্রচল। স্যার আর্থার এডিংটন ঠিকই বলেছেন যে নিশ্চয়তা থেকে সন্দেহের রাজ্যে প্রবেশ করে বিজ্ঞান এক মহান্ পদক্ষেপ করেছে। তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যেন তার যাবতীয় 'তথ্য' একটু ধীরে সুস্থে ছাত্রদের মনের উপর চাপায় আর চরিত্র গঠনের জন্য এর ব্যবহার যেন সীমিত হয়। কারণ চরিত্র গঠনই ব্যক্তি ও জাতির বলিষ্ঠ ভিত্তি স্থাপনের প্রধান উপাদান।

"চরিত্র একবার দানা বাঁধলে স্বাবলম্বন ও আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার ইচ্ছা বেগবতী হবে। তখন ভূমিমাতার যথাসম্ভব অন্তরঙ্গ হবার ইচ্ছা জাগবে, কৃষির মাধ্যমে তাঁর আরাধনা করতে মানুষ প্রবৃত্ত হবে। প্রয়োজনকে যথাসম্ভব কমিয়ে অনাড়ম্বরতা ও আকাঙ্ক্ষার পবিত্রতা দ্বারা মানুষ ভূমাতার ভার লাঘব করবে। প্রত্যুত আমি বিশ্বাস করি যে ভূমিমাতার কোন সন্তানই তাঁর কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে জীবনরস আহরণ করা থেকে যেন বঞ্চিত না হয় এবং শহরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আসাকে আমি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ করার পক্ষপাতী।

"শিক্ষাক্ষেত্রের যেসব বিধি বিধান শিক্ষাকে আজকে একরকম নিরর্থক করে ফেলেছে সাহসিকতা সহকারে তার সঙ্গে সম্পর্কবিচ্ছেদ করতে হবে।.......শিক্ষার সেকেলে প্রথা ও জড় আচারের বন্দিশালায় আমরা আজ কয়েদ হয়ে আছি। এইজন্য আমি গান্ধীজী কথিত স্বাবলম্বী শিক্ষাব্যবস্থাকে অভিনন্দন জানাই। তবে তিনি যতটা চাইছেন অতদূর পর্যন্ত যাওয়া যাবে কি না তা আমি ঠিক বলতে পারি না। তবে আমি তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সহমত যে সাত বছরের পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করার পর কোন তরুণ নাগরিক যেন 'উপার্জনকারী ব্যক্তি হিসাবে সমাজে ফিরে যায়।' আমি স্বয়ং মনে করি যে অংশতঃ শিক্ষার দ্বারা প্রত্যেকে যেন তার সর্জনক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হয়, কারণ ঈশ্বরত্বের অভিমুখে অভিযান মানুষের ধর্ম আর সেইজন্য তার ভিতরে রয়েছে ঐশ্বরীক বিভূতির অংশ—সৃষ্টির ক্ষমতা, করার শক্তি। এই ক্ষমতাকে জাগরিত করতে না পারলে শিক্ষার মূল্য কি?

"হাতেও মাথার মত মস্তিষ্ক আছে। বহুকাল যাবত মাথার বুদ্ধিই আমাদের কাছে ভগবান স্বরূপ। এই বুদ্ধি আমাদের অত্যাচারী প্রভু—স্বৈরতন্ত্রী একনায়কের ভূমিকা নিয়েছে। নূতন ব্যবস্থায় বুদ্ধি হবে আমাদের বহু সেবকের মধ্যে একটি, সরল জীবনের অনুকূল

সবকিছু এবং যা কিছু আমাদের প্রকৃতির মনোরম সারল্যের সমীপবর্তী করে তার প্রশংসা করার শিক্ষা আমাদের পেতে হবে। চারুশিল্পী কারিগর ও কৃষকের কাজ সহ সব রকমের শরীরশ্রমমূলক কাজ, যা আমাকে আমার হাতের ভরসায় বেঁচে থাকতে সাহায্য করে—আমরা যেন তাদের জয়গান করতে পারি।"

আমি জানি যে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় শিক্ষিত হলে আমি আরও সুখী ও কার্যকরী জীবন যাপন করতে পারতাম।

সাধারণ মানুষ হিসাবে সাধারণ পাঠকের উদ্দেশ্যে আমি এযাবত যা বলে আসছি দেশের যুবকদের ভবিষ্যত গঠনের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ্‌দের কাছে শিক্ষাশাস্ত্রী হিসাবে ডঃ আরুণ্ডলে সেই কথাই বলেছেন। আমার স্বাবলম্বী শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি যে সতর্কতার মনোভাব অবলম্বন করেছেন তাতে আমি বিস্মিত হই নি। আমার কাছে অবশ্য স্বাবলম্বন এর সার মর্ম। আমার একমাত্র ক্ষোভ এই যে গত চল্লিশ বছর ধরে কাঁচের আড়ালে অস্পষ্টভাবে আমি যা দেখে এসেছি সম্প্রতি ঘটনাচক্রে তা একেবারে স্পষ্টভাবে দেখতে আরম্ভ করেছি।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দেই আমি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার কুফল সম্বন্ধে তীব্র ভাবে বলেছি। এখন যখন দেশের গৌরবজনক স্বাধীনতা-যুদ্ধে আমার সহকর্মী ও সেই সংগ্রামে সমান ভাবে নিগ্রহবরণকারী সাতটি প্রদেশের মন্ত্রীদের প্রভাবিত করার কিছু না কিছু সুযোগ এসেছে, তখন বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যে আগাগোড়া ভুল একথা প্রমাণ করার একটা দুর্নিবার আহ্বান ভিতর থেকে অনুভব করছি। এই পত্রিকা মারফত আমি একান্ত অক্ষম ভাবে যা বোঝাতে চাইছি তা হঠাৎ আমার মনে উদ্ভাসিত হয়েছে, যদিচ এ বক্তব্যের অন্তর্নিহিত সত্য আমি উত্তরোত্তর উপলব্ধি করছি। দেশের নিরপেক্ষ ও মুক্ত মন-বিশিষ্ট শিক্ষাশাস্ত্রীদের আমি তাই শিক্ষার এই দুই পথ সম্বন্ধে অবধান করতে অনুরোধ জানাই। এ ব্যাপারে প্রচলিত শিক্ষা সম্বন্ধীত

তাঁদের পূর্বগঠিত ও ছকে বাঁধা ধারণা যেন তাঁদের যুক্তির স্বাধীন প্রবাহকে প্রভাবিত না করে। প্রচলিত গোঁড়া ধারণা অনুযায়ী শিক্ষা সম্বন্ধে আমি একেবারে অজ্ঞ। তবে কেবল সেই কারণেই তাঁরা যেন আমার রচনা ও বক্তব্যের প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ না করেন। লোকে বলে যে কখনও কখনও এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখেও জ্ঞানগর্ভ কথা শোনা যায়। কথাটায় একটু কাব্যিক অতিরঞ্জন থাকতে পারে, তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে কখনও কখনও শিশুদের মুখেও জ্ঞানের কথা শোনা যায়। আর বিশেষজ্ঞরা তাকে ঘষে মেজে তার একটা বিজ্ঞানসম্মত আকার দেন। আমি তাই চাই যে নিছক গুণাগুণের মানদণ্ডে আমার বক্তব্যকে বিচার করা হক। সুতরাং নূতন ভাবে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি ঃ

১. বর্তমানে প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবর্তে সাত বছর বা আরও কিছু সময় ব্যাপী এমন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে যাতে ইংরাজী বাদে আজকালকার প্রবেশিকা মানের সব বিষয় পড়ান হবে। এ ছাড়া ছাত্ররা একটি হাতের কাজ শিখবে যার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের মনকে জ্ঞানরাজ্যের সকল বিভাগে আকৃষ্ট করা যাবে।

২. সবটা মিলিয়ে এই শিক্ষাব্যবস্থা স্বাবলম্বী হতে পারে এবং একে তা হতেও হবে। প্রত্যুত এর বাস্তবতার অগ্নিপরীক্ষাই হল স্বাবলম্বন।

হরিজন, ২-১০-১৯৩৭

৯

ওয়ার্ধার শিক্ষাসম্মেলন

ক

[সম্মেলনে বিবেচনার জন্য গান্ধীজী নিম্নোদ্ধৃত মূল সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ করেন]

১। প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি কোন ক্রমেই দেশের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম নয়। উচ্চশিক্ষার প্রতিটি শাখায় জ্ঞানার্জনের মাধ্যম

ইংরাজী হওয়াতে বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও অগণিত অশিক্ষিত জনসাধারণের ভিতর বিভেদের এক স্থায়ী প্রাচীর সৃষ্টি করেছে। এই কারণে এঁদের কাছ থেকে পরিস্রাবিত হয়ে জনসাধারণের কাছে জ্ঞান পৌঁছবার পথে বহু প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়েছে। ইংরাজীর উপর এই ভাবে অতধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের উপর এত অধিক মাত্রায় চাপ পড়েছে যে প্রত্যক্ষ জীবনের ক্ষেত্রে তাঁদের মানসিক শক্তি পঙ্গু হয়ে গেছে এবং তাঁরা নিজভূমে পরবাসীতে পর্যবসিত হয়ে গেছেন। শিক্ষা-ব্যবস্থায় শ্রমশিল্পের শিক্ষণ সন্নিবিষ্ট না থাকার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায় উৎপাদনমূলক কার্যের পক্ষে একেবারে অযোগ্য ক্ষতি পড়েছেন এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের দিক থেকেও এর ফলে তাঁদের হানি রয়েছে। আজ প্রাথমিক শিক্ষাখাতে যে ব্যয় হচ্ছে, তা একেবারেই নিরর্থক। কারণ ছাত্রদের যতটুকু শিক্ষা দেওয়া হয়, অত্যল্প কালের ভিতরই তারা তা বিস্মৃত হয় এবং শহর ও গ্রামের প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকে এক্ষেত্রে প্রাপ্ত শিক্ষার মূল্য এক কানাকড়িও নয়। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা যতটুকু লাভ হয়, দেশের করদাতৃবর্গের অধিকতম অংশ তার ফল ভোগ করতে :পারে না। তাদের শিশুদের কপালে কিছুই জোটে না বললেই চলে।

২। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম অন্যূন পক্ষে সাত বৎসরের হওয়া উচিত। এই সময়ের ভিতর ছাত্রদের অন্ততঃ প্রবেশিকার মান অবধি সাধারণ জ্ঞান পাওয়া প্রয়োজন। নূতন পরিকল্পনায় অবশ্য ইংরাজী থাকবে না। তার পরিবর্তে কোন এক সুষ্ঠু শ্রমশিল্প ছাত্রকে শেখান হবে।

৩। বালক-বালিকাদের সর্বতোমুখী বিকাশের জন্য যতদূর সম্ভব সমগ্র শিক্ষা কোন-না-কোন শিল্পের মাধ্যমে দেওয়া উচিত ও এর ফলে ছাত্ররা অধ্যয়নকালেই কিছু-না-কিছু উপার্জন করতে সক্ষম

হবে ; অর্থাৎ আমার বক্তব্যের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে শিল্প দ্বারা দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে। প্রথমতঃ ছাত্র সেই শিল্প দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য ও নিজ পরিশ্রমের সাহায্যে নিজ শিক্ষার ব্যয় উপার্জন করবে এবং দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই শিল্প দ্বারা বালক ও বালিকাদের আদর্শ নর ও নারী হবার উপযুক্ত সর্ববিধ গুণ এবং শক্তির পূর্ণ বিকাশ হওয়া প্রয়োজন।

পাঠশালার জমি, ঘর-দুয়ার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাবদ ব্যয় ছাত্রদের পরিশ্রম দ্বারা প্রাপ্তির কল্পনা করা হয় নি।

কাপাস, রেশম এবং পশমের সাফাই থেকে আরম্ভ করে ধুনাই, কাতাই, রঞ্জন, মাড় দেওয়া, তানা করা, দোস্থতি করা, বোনা ও নানা রকম নক্সা করা ইত্যাদি শিল্প প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা যেতে পারে। এ ছাড়া সূচীশিল্প, শেলাই, কাগজ তৈরী করা ও কাটা, দপ্তরী ও ছুতারের কাজ, খেলনা তৈরী করা, গুড় উৎপাদন ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্প অতীব সহজে শেখা যায় এবং বিদ্যালয়ে এইসব কাজ শুরু করার জন্য খুব বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় না।

এই প্রকার প্রাথমিক শিক্ষার ফলে বালক-বালিকারা নিজ জীবিকা উপার্জন করার উপযুক্ত হয়ে উঠবে। যে শিল্পের শিক্ষা তারা পাচ্ছে, ভবিষ্যতে সেই সব শিল্পে তাদের নিযুক্ত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে। অথবা রাষ্ট্র-নির্ধারিত মূল্যে সরকার তাদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করবে।

৪। উচ্চশিক্ষা এবং বিভিন্ন শিল্প ব্যবসায়, প্রযুক্তি-শিল্প রম্য রচনা ও চারুকলার ক্ষেত্রে জাতির চাহিদা পূরণের দায়িত্ব থাকবে বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর।

রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিছক পরীক্ষা নেবার প্রতিষ্ঠান হবে এবং তাদের খরচ চলবে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরীক্ষাশুল্ক থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ শিক্ষার সমগ্র ক্ষেত্রের উপর দৃষ্টি রাখবে এবং শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগের পাঠ্যক্রম তৈরী ও অনুমোদনের দায়িত্বও হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিগত বিদ্যালয় চলবে না। দক্ষ এবং যোগ্য লোকেরা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়লে সহজেই তা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাবে। একথা ধরে নেওয়া হবে যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর পরিচালনা করা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রের কোন অতিরিক্ত ব্যয় হবে না।

হরিজন, ২-১০-১৯৩৭

খ

[দ্বিতীয় দিনে সমিতির খসড়া প্রস্তাবসমূহ সম্মেলনের সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং আলোচনার পর তা গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলির মর্ম নিম্নরূপ :]

১। এই সম্মেলন মনে করে যে সমগ্র জাতিকে সাত বছরব্যাপী অবৈতনীক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা উচিত।

২। শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।

৩। সাত বছরের এই শিক্ষাব্যবস্থায় কোন রকম উৎপাদনমূলক শরীরশ্রমকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দেওয়া হবে—মহাত্মা গান্ধীর এই প্রস্তাব এই সম্মেলন অনুমোদন করছে। এই সম্মেলন তাঁর এই বক্তব্যও সমর্থন করছে যে শিশুর সব রকমের যোগ্যতার বিকাশ এবং তার প্রশিক্ষণের জন্য তার পরিবেশ-নির্ভর কোন হাতের কাজের সঙ্গে যথাসম্ভব তার অন্তরঙ্গ সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

৪। সম্মেলন আশা করে যে এই শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে ক্রমশঃ শিক্ষকদের বেতন উপার্জন করা সম্ভবপর হবে।

হরিজন, ৩০-১০-১৯৩৭

গ

তিনি (গান্ধীজী) বলেন যে শিক্ষার পূর্বোক্ত মূলসূত্র প্রাথমিক এবং কলেজের শিক্ষা—উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে তাঁদের প্রধানতঃ প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিই মনোযোগ দিতে হবে। অবশ্য মাধ্যমিক শিক্ষাকেও তিনি প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে ধরছেন। কারণ আমাদের গ্রামের…যে অল্পসংখ্যক লোক শিক্ষার স্বাদ পেয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডির ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। এই সব গ্রাম্য ছেলেমেয়ে যাদের অধিকাংশই নিরক্ষর, তাদেরই প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ করে তিনি বলছিলেন।…

হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা

তাঁর দৃঢ় অভিমত এই যে বর্তমানের প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি কেবল অপচয়মূলক নয়, ক্ষতিকারকও বটে। নিজের পিতামাতা ও বংশগত বৃত্তির দিক থেকে অধিকাংশ ছেলের নামই খরচের খাতায় লেখা। তারা কুঅভ্যাস শেখে, শহুরে আদব-কায়দাদুরস্ত হয় এবং এমন বিষয় সম্বন্ধে তাদের ভাসা ভাসা জ্ঞান হয় যা আর যা-ই হক অন্ততঃ শিক্ষা নয়। তাঁর মতে এর প্রতিকার হল হাতের কাজ বা শরীরশ্রম মারফত শিক্ষা দেওয়া।

তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হাতের কাজটি নয়, হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা। সাহিত্য ইতিহাস ভূগোল গণিত বিজ্ঞান ইত্যাদি সবরকমের জ্ঞান শরীরশ্রমের মারফত দিতে হবে। কথা উঠতে পারে যে মধ্যযুগে তো এ ছাড়া আর কিছু শেখান হত না। কিন্তু তখন যে বৃত্তি শেখান হত তার সঙ্গে শিক্ষার কোন সম্বন্ধ ছিল না। এযুগে বিভিন্ন বৃত্তির লোকেরা কেরাণীর চাকরী নেওয়ায় নিজেদের বংশগত বৃত্তি ভুলে যাচ্ছেন এবং গ্রামও তাঁদের কাছ থেকে কিছু পাচ্ছে না। এর ফলে দেশের যে অঞ্চলেই যান না কেন কোন সাধারণ গ্রামে ভাল ছুতোর বা কামার দেখতে পাওয়া যায় না। হস্তশিল্প প্রায় উচ্ছন্নে

গেছে এবং চরখাকে উপেক্ষা করায় ল্যাঙ্কাশায়ারে গিয়ে তা ইংরেজদের উদ্ভাবনী শক্তির দৌলতে কি রূপ পরিগ্রহ করেছে তা সকলেরই চোখের সামনে রয়েছে। যান্ত্রিকতা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত সত্ত্বেও তিনি একথা বলছেন।

তকলী—একটি উৎপাদনকারী খেলনা

প্রত্যক্ষভাবে কোন হাতের কাজের কলা ও বিজ্ঞান শেখানর সঙ্গে সঙ্গে তার মারফত শিক্ষা দিলে এ সমস্যার সমাধান হবে। উদাহরণস্বরূপ তকলীতে সুতা কাটতে শেখানর মানেই হল বিভিন্ন ধরনের তূলা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মাটি, এদেশের হস্তশিল্পের ধ্বংসের ইতিহাস, ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের বিবরণসহ এর রাজনৈতিক কারণ ও গণিত শাস্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া।...

তিনি যে তকলীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তার একাধিক কারণ আছে। তাঁরা তাহলে তাঁকে (গান্ধীজীকে) তকলী সম্বন্ধে প্রশ্ন করবেন। কারণ তকলীর সঙ্গে তাঁর গভীর সম্বন্ধ এবং এর শক্তি ও রহস্যের স্বাদ তিনি পেয়েছেন। এ ছাড়া একমাত্র বস্ত্র তৈরীর কলাকেই সর্বত্র শেখান যায় ও তকলীতে বিশেষ কোন খরচ নেই।...

তিনি যে সাত বছরের পাঠ্যক্রমের পরিকল্পনা করেছেন তার ফলে তকলীর শিক্ষা শেষ পর্যন্ত রঙাই নক্সা তোলা সহ বুনাই-এর বাস্তব অভিজ্ঞতা পর্যন্ত যাবে।...

শিক্ষাকে দেশের কোটি কোটি শিশুর কাছে সহজলভ্য করার দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ায় ছাত্রদের শরীরশ্রমে উৎপন্ন পণ্যের দ্বারা শিক্ষকের ব্যয় নির্বাহের উপর তিনি এত জোর দিচ্ছেন। যতদিন না প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হচ্ছে অথবা যত দিন না বড়লাট সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস করছেন কিংবা এই জাতীয় আর কোন আশায় অপেক্ষা করা যেতে পারে না।

শ্রোতৃমণ্ডলীকে তিনি এই কথা মনে রাখতে বললেন যে সাফাই স্বাস্থ্য-রক্ষাবিধি খাদ্যবিজ্ঞান ইত্যাদির প্রাথমিক তত্ত্ব এবং নিজের কাজ নিজে করে নেওয়া ও বাড়ীতে বাবা মায়ের কাজে সাহায্য করা ইত্যাদি এই প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গ হবে। এ যুগের ছেলেরা সাফাই সম্বন্ধে অজ্ঞ, নিজের কাজ নিজেরা করতে পারে না এবং তাদের স্বাস্থ্য একেবারেই শোচনীয়। তিনি তাই সঙ্গীত সমন্বিত কুচকাওয়াজ ইত্যাদির মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে ছেলেদের শরীরচর্চা করাবেন।

একমাত্র পন্থা

তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে তিনি পুঁথিপত্রের শিক্ষার বিরোধী। এ অভিযোগ আদৌ সত্য নয়। তিনি কেবল দেখিয়ে দিতে চান যে কোন্ পন্থায় এই শিক্ষা দিতে হবে। তাঁর পরিকল্পনার স্বাবলম্বনের দিকটিকেও আক্রমণ করা হয়েছে। একদিকে বলা হয় যে আমাদের পরিকল্পনার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হবে। অন্যদিকে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে আমরা শিশুদের শোষণ করার ব্যবস্থা করেছি। কেউ কেউ আশঙ্কা করেন যে এ পরিকল্পনায় জাতীয় সম্পদের অপচয় হবে। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে এ আশঙ্কা অমূলক। শিশুদের শোষণ করা অথবা তাদের ভারাক্রান্ত করা সম্বন্ধে তিনি বলতে চান যে শিশুকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করার নাম কি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া? তকলী একটি ভাল খেলনা। আর আজও শিশুরা তাদের মা বাবাকে কিছুটা সাহায্য করে। সেগাঁও-এর শিশুরা বাবার সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করে বলে কৃষিকার্য সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান তাঁর চেয়ে ভাল। শিশুকে সুতাকাটতে প্রোৎসাহিত করে তার পিতার কৃষি থেকে প্রাপ্ত আয়ের কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি করে পিতাকে সাহায্য করতে শেখানর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে এই ধারণার সৃষ্টি করতে হবে যে সে কেবল নিজ পিতামাতা অথবা গ্রামের

নয়, সে সমগ্র দেশেরও এবং তাই দেশবাসীর প্রতি তার কিছু কর্তব্যও আছে। এই একমাত্র পন্থা। মন্ত্রীদের তিনি বলতে চান যে খয়রাত হিসাবে শিক্ষা দিয়ে ছেলেদের তাঁরা অসহায় করে ফেলবেন। নিজেদের শিক্ষার ব্যয় নিজেদের পরিশ্রমে উপার্জন করতে শেখালে ছাত্ররা আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী হয়ে গড়ে উঠবে।

এই শিক্ষাব্যবস্থা হিন্দু মুসলমান পার্শী খ্রীস্টান নির্বিশেষে সকলের জন্য। তিনি ধর্মীয় শিক্ষার উপর কেন জোর দিচ্ছেন না—তাঁকে এই প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। সকলকে বাস্তব ধর্ম—স্বাবলম্বনের ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছেন বলে এর প্রয়োজনীয়তা নেই।

বাধ্যতামূলক সেবা

গান্ধীজী আরও বললেন: এইভাবে শিক্ষিত প্রতিটি ছাত্রকে কাজ দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য। এদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষকের সমস্যার সমাধানকল্পে অধ্যাপক শাহ্ বাধ্যতামূলক সেবার প্রস্তাব গ্রহণ করার সুপারিশ করেছেন। ইতালী এবং অন্যান্য দেশের উদাহরণ দিয়ে তিনি এই প্রস্তাবের মূল্য দেখাবার প্রয়াস করেছেন। মুসোলিনী যদি ইতালীর যুবসম্প্রদায়কে দেশসেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে থাকেন তাহলে আমরাই বা পারব না কেন? নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন শুরু করার পূর্বে এক বছর বা আরও কিছু বেশী সময়ের জন্য তাদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক সেবা নেওয়াকে কি দাসত্ব আখ্যা দেওয়া ন্যায়সঙ্গত হবে? বিগত সতের বছরে দেশের যুবসম্প্রদায় স্বাধীনতার আন্দোলনের সাফল্যের জন্য বহু ত্যাগস্বীকার করেছেন। গান্ধীজী তাই স্বেচ্ছায় তাঁদের জাতির সেবার জন্য আরও একটি বছর দেবার জন্য আহ্বান জানাবেন। এ ব্যাপারে যদি আইন প্রণয়ন করতে হয় তবে তাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপার বলা চলবে না। কারণ আমাদের প্রতিনিধিদের অধিকাংশের অনুমোদন না থাকলে সে আইন বিধিবদ্ধ হতে পারবে না।

অহিংসা ভিত্তিক

গান্ধীজী তাঁর স্বাবলম্বী প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনার মূলনীতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর বক্তব্যের উপসংহার করলেন। তিনি বললেন, "...অহিংসা থেকে এই পরিকল্পনার উদ্গম। সম্পূর্ণরূপে মাদক দ্রব্য বর্জন করার জন্য জাতি যে সংকল্প করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এ পরিকল্পনা উপস্থাপিত করলেও আপনাদের আমি নিবেদন করতে চাই যে যদি রাজস্বের কোন ঘাটতি না হয় এবং আমাদের রাজকোষ যদি ভরাও থাকে আমাদের ছেলেদের শহুরে করে তোলার ইচ্ছা না থাকলে এই শিক্ষাব্যবস্থা অপরিহার্য। দেশের ছেলেমেয়েদের আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি ও জাতির সত্যকার চারিত্রধর্মের যথার্থ প্রতিনিধি করে তুলতে হবে। স্বাবলম্বী প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলা ছাড়া জাতির এ উত্তরাধিকার তারা পাবে না। ইউরোপ আমাদের উদাহরণস্থল নয়। ইউরোপ হিংসায় বিশ্বাসী বলে তদনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণ করে। রাশিয়ার সাফল্যকে আমি আদৌ ছোট করে দেখাতে চাই না কিন্তু সেখানার সমস্ত কাঠামোও হিংসা ও জবরদস্তির উপর খাড়া রয়েছে। ভারত যদি হিংসা পরিহারের সঙ্কল্প গ্রহণ করে থাকে তাহলে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য অনুশীলন হিসাবে এই শিক্ষাপদ্ধতি তাকে গ্রহণ করতেই হবে। বলা হয়ে থাকে যে ইংলণ্ড শিক্ষা খাতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। আমেরিকাও একই পথের পথিক। আমরা কিন্তু ভুলে যাই যে ঐ সব দেশের ঐ বিপুল পরিমাণ অর্থ শোষণলব্ধ। শোষণকলাকে ঐ সব দেশ একেবারে বিজ্ঞানে পর্যবসিত করেছে এবং তাই তাঁরা নিজেদের দেশের ছেলেমেয়েদের ঐ রকম ব্যয়বহুল শিক্ষা দিতে পারেন। আমরা কাউকে শোষণের কথা চিন্তা করতে পারি না এবং করবও না। তাই অহিংসাভিত্তিক এই শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।

হরিজন, ৩০-১০-১৯৩৭

ঘ

বিকেলে গান্ধীজী কয়েকটি সমালোচনার উত্তর দিয়ে সম্মেলনের কাজের সূত্রপাত করলেন। তকলীই একমাত্র জিনিস নয়, তবে তকলীই একমাত্র জিনিস যাকে সর্বত্র কাজে লাগান যায়। এছাড়া কাগজ তৈরী, তাল খেজুরের গুড় তৈরী, ইত্যাদি শিল্পকেও গ্রহণ করা যেতে পারে। মন্ত্রীদের কাজ হবে কোন্ বিদ্যালয়ে কোন্ শিল্প সবচেয়ে ভাল চলবে তার আবিষ্কার করা। যন্ত্রপ্রেমীদের তিনি সতর্ক করে দিতে চান যে যন্ত্রের উপর খুব বেশী জোর দিলে মানুষেরই যন্ত্রে পরিণত হবার আশঙ্কা আছে। যাঁরা যন্ত্রযুগের আওতায় বাস করতে চান তাঁদের কাছে তাঁর শিক্ষাপরিকল্পনার মূল্য নেই। তিনি তাঁদের আরও জানিয়ে দিতে চান যে যন্ত্রের সাহায্যে গ্রামবাসীদের বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। যেদেশে ত্রিশ কোটি জীবিত যন্ত্র রয়েছে সেখানে নূতন জড় যন্ত্র আনার কথা চিন্তা করা নিরর্থক। ডঃ জাকির হোসেন-এর একথা ঠিক নয় যে আদর্শগত পটভূমিকা যাই হক না কেন শিক্ষার দৃষ্টিতে এ পরিকল্পনা যথার্থ। প্রজেক্ট পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ জনৈকা মহিলা কয়েক দিন পূর্বে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে যান এবং তিনি মন্তব্য করেন যে প্রজেক্ট পদ্ধতির সঙ্গে গান্ধীজীর পরিকল্পনার দুস্তর পার্থক্য। গান্ধীজী কিন্তু কাউকে বিশ্বাস না হলে তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বলবেন না। আমাদের নিজেদের লোকেরা যদি যথাযথভাবে কাজ করেন তাহলে এই সব বিদ্যালয় থেকে দাস-এর সৃষ্টি হবে না, আদর্শ কারিগর বেরিয়ে আসবে আমাদের বিদ্যালয়গুলি থেকে। শিশুরা যে কোন রকমের শ্রমই করুক না কেন তার মূল্য নিশ্চয় ঘণ্টায় দুই পয়সা হবে।

তবে সকলকে তিনি এ বিষয়ে সতর্ক করে দিতে চান যে নিছক তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হয়ে কেউ যেন কোন কিছু গ্রহণ না করেন। তিনি প্রায় মৃত্যুর দ্বারদেশে উপনীত এবং তাই জনসাধারণের

গলার মধ্যে কোন কিছু জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়ার কথা তিনি স্বপ্নেতেও চিন্তা করতে পারেন না। বেশ ভাল করে সব দিক সম্বন্ধে খুঁটিয়ে চিন্তা করে এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত যাতে কিছু দিন পরই একে বর্জন করতে না হয়। অধ্যাপক শাহ্-এর সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে সহমত যে কর্মহীনদের জন্য কর্মের সংস্থান করতে না পারলে রাষ্ট্রের মূল্য এক কড়াকড়িও নয়। কিন্তু বেকারদের খয়রাতী সাহায্য দিয়ে সমস্যার কোন সমাধান হবে না। তিনি তাই সকলকে কাজ দেবেন এবং টাকা দিতে না পারলেও কাজের বিনিময়ে খাবার দেবেন। খেয়ে দেয়ে ফুর্তি করার জন্য ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেন নি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পেটের ভাত রোজগার করার জন্য আমাদের জন্ম।

হরিজন, ৩০-১০-১৯৩৭

১০

বোম্বাই-এর প্রাথমিক শিক্ষা

গ্রামেই ভারতবর্ষের অধিবাসী থাকেন বলে প্রাথমিক শিক্ষার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে স্বেচ্ছায় আমি নিজেকে গ্রামের পরিধির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছি। গ্রামবাসীদের সমস্যার সুচারুরূপে সমাধানের অর্থ শহরের সমস্যারও সমাধান। কিন্তু বোম্বাই শহরের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহশীল জনৈক বন্ধু নিম্নলিখিত সমস্যাটি তুলে ধরেছেন ঃ

"কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী এখন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলানের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করার কথা চতুর্দিকে গুঞ্জরিত হচ্ছে। অতএব বোম্বাই-এর মত শহরে এই দাবী কিভাবে এবং কতটা কার্যকরী করা যায় তা পরীক্ষা করে দেখার তাৎপর্য আছে। শিক্ষা খাতে বোম্বাই পৌর সভার বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ৩৫ থেকে ৩৬ লক্ষ টাকার মত

বলে বলা হয়। তবে বোম্বাই-এ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনাকে সাকার করতে হলে এই ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বর্তমানে শিক্ষকদের বেতনখাতে বৎসরে কুড়ি লক্ষ টাকারও বেশী ব্যয় করা হয় এবং ভাড়া বাবদ খরচ হয় বাৎসরিক চার লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রতিটি ছাত্রের জন্য মাথাপিছু ব্যয় চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ টাকা। হাতের কাজ শেখার সময় কোন ছাত্র কি এই পরিমাণ টাকা রোজগার করতে পারে? যদি না পারে তাহলে প্রাথমিক শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে কি করে?"

আমার মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে হাতের কাজকে প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গ করলে বোম্বাই শহর ও সেখানকার ছেলেদের লাভই হবে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার শেষে সেখানকার ছাত্ররা যতটুকু শেখে তার মূল্য বিশেষকিছু নয় এবং নিঃসন্দেহে তা তাদের নাগরিক হবার যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারে না।

শহরেরও প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে হাতের কাজকে সুপারিশ করতে আমার মনে কোন দ্বিধা নেই। বর্তমানে বোম্বাই-এ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ হয় তার সবটা না হলেও অধিকাংশ তাহলে বেঁচে যাবে। ধরে নেওয়া গেল যে প্রতিটি ছাত্র পিছু শিক্ষার জন্য বছরে ৪০ টাকা খরচ হয়। তাহলে বোম্বাই পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা অনুদান থেকে মোট ৮৭,৫০০ জন ছাত্র শিক্ষা পায় বলা যেতে পারে। বোম্বাই-এর জনসংখ্যা যদি দশ লক্ষ হয় তাহলে দেড় লক্ষ বিদ্যালয়ে যাবার বয়সের ছেলেমেয়ে সেখানে আছে ধরে নিতে হবে। সুতরাং এখন ৬২,০০০ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে ৬,০০০ ছেলেমেয়ে বাড়ীতে লেখাপড়া শিখছে ধরে নিয়ে তাদের সংখ্যা বাদ দিলে ৫৬,০০০ এমন ছাত্র বাকী থাকে যাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বর্তমানে

খরচের যে হার তাতে এদের শিক্ষার জন্য অন্ততঃ ২২,৪০,০০০ টাকা লাগবে মনে হয় এবং এটাকার সংস্থান কোন দিন হবে বলে ভরসা হয় না।

ভারতবর্ষে বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার নীতিতে আমি দৃঢ় বিশ্বাসী। আমি আরও বিশ্বাস করি যে শিশুদের একটি প্রয়োজনীয় হাতের কাজ শিখিয়ে এবং তার মাধ্যমে তার মানসিক দৈহিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। শিক্ষাপ্রসঙ্গে এই সব আর্থিক বিষয়ের বিবেচনকে কেউ যেন নীচতা বা অবান্তর ব্যাপার মনে না করেন। আর্থিক বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করার মধ্যে মূলতঃ কোনই নীচতা নেই। যথার্থ অর্থনীতি কখনই উচ্চতম নৈতিক মানের পরিপন্থী হতে পারে না, যেমন সব রকমের সত্যকার নীতিশাস্ত্রকে তার নামের মর্যাদা রক্ষা করতে হলে একযোগে ভাল অর্থশাস্ত্রও হতে হবে। যে অর্থশাস্ত্র কুবেরের উপাসনাকে প্রোৎসাহিত করে ও দুর্বলকে শোষণ করে ক্ষমতাবানের বিত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তা মিথ্যা ও ভয়ঙ্কর বিজ্ঞান। এর পরিণাম মৃত্যু। পক্ষান্তরে যথার্থ অর্থশাস্ত্র সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতীক। দুর্বলসহ সকলের কল্যাণ-সাধন এর লক্ষ্য এবং সুন্দর জীবনের পক্ষে এ অপরিহার্য। সুতরাং সাহস করে আমি এ কথা বলতে চাই যে বোম্বাই যদি হাতের কাজের সহায়তায় তার প্রাথমিক শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করতে পারে তাহলে দেশের সম্মুখে অনুসরণীয় এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। কোন ছাত্র দিনে যদি চার ঘণ্টা হাতের কাজের জন্য দেয় তাহলে মাসে পঁচিশ দিন কাজ করলে এবং ঘণ্টায় দু পয়সা রোজগার করলে মাসে সে তিন টাকা দুই আনা করে বিদ্যালয়ের জন্য উপার্জন করতে পারবে। হাতের কাজ তার বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত করার সঙ্গে সঙ্গে তার মনকে চাঙ্গা ও চটপটে রাখবে। অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে শিশু গোড়া থেকেই ঘণ্টায়

দুই পয়সা হিসাবে রোজগার করতে সক্ষম হবে। পুরো সাত বছরে মিলিয়ে সে গড়ে ঘণ্টায় দুই পয়সা হিসাবে উপার্জন করবে।

এ জাতীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষা শিক্ষাকেই নীরস করে দেবে অথবা শিশুর মনকে পঙ্গু করে ফেলবে মনে করা চূড়ান্ত কুসংস্কারের পরিচায়ক। আমার স্মৃতির পটে কয়েকটি উজ্জ্বলতম চিত্র হল উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে হাতের কাজ শিক্ষণরত শিশুদের আনন্দোদ্ভাসিত মুখমণ্ডল। পক্ষান্তরে আমি এও জানি যে অযোগ্য শিক্ষক ভুল ভাবে পড়াচ্ছেন বলে খুব চিত্তাকর্ষক বিষয়ও ছাত্রদের কাছে বিরক্তিকর মনে হচ্ছে। তবে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে এই রকম যোগ্য শিক্ষক আমরা পাব কোথায়? আমার উত্তর হল: প্রয়োজনীয়তাই আবিষ্কারের জননী। একবার আমরা শিক্ষানীতির পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলে তাকে কার্যকরী করার উপায় অনায়াসে আবিষ্কৃত হবে। আমি এ বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় যে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার পিছনে যে সময় অর্থ ও জনশক্তি নিয়োগ করা হয় তার এক সামান্য ভগ্নাংশের দ্বারা আমাদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সব কয়জন কারিগরী বিদ্যার শিক্ষককে প্রশিক্ষিত করা যায়। আগ্রহ থাকলে বোম্বাই-এর শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের কোন কমিটি আমার প্রস্তাবিত পন্থায় বোম্বাই-এর প্রাথমিক শিক্ষার একটি পরিকল্পনা রচনা করতে পারেন ও আর কালক্ষেপ না করে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে লেগে যেতে পারেন। প্রয়োজন কেবল এই শিক্ষা-নীতিতে আমারই মত বিশ্বাস। এ ধরণের বিশ্বাস ভিতর থেকে গড়ে ওঠে, অপর কারও মাধ্যমে পাওয়া যায় না। আর জীবন্ত বিশ্বাস ব্যতিরেকে এ পৃথিবীতে কোথাও মহান কোন কিছু সংসাধিত হয় নি।

শহরের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শেখানর পক্ষে কোন্ ধরনের হাতের কাজ সবচেয় ভাল? এর কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কিন্তু আমার জবাব খুব স্পষ্ট। আমি ভারতের গ্রামগুলির

পুনরুজ্জীবন চাই। আজকে আমাদের গ্রামগুলি শহরের লেজুড়ে পরিণত হয়েছে। তাদের অস্তিত্বই যেন শহর কর্তৃক শোষিত হবার জন্য, এবং গ্রামগুলি যেন টিকে আছে শহরের অনুমোদনের কৃপায়। এ পরিস্থিতি অস্বাভাবিক। গ্রাম থেকে যে শক্তি ও রসদ পাচ্ছে তার বিনিময়ে শহরগুলি যখন গ্রামকে যথোচিত প্রতিদান দেবার কর্তব্যবুদ্ধিতে অনুপ্রেরিত হয়ে উঠবে তখনই কেবল শহর ও গ্রামের মধ্যে একটা স্বাস্থ্যকর ও নৈতিক সম্বন্ধ গড়ে উঠবে। আর এই মহান্ সামাজিক পুনর্গঠন-কার্যে শহরের ছেলেদের যদি যথোচিত ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় তাহলে তাদের শিক্ষার মাধ্যম বিভিন্ন বৃত্তি যেন গ্রামের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত হয়। আমি যতদূর দেখতে পাই কাপাসের বীজ ছাড়ান ও ধুনাই থেকে শুরু করে সূতা কাটা পর্যন্ত বস্ত্র উৎপাদনের যাবতীয় প্রক্রিয়া আর যে-কোন বৃত্তির তুলনায় এই প্রয়োজনীয়তা পরিপূর্তিতে সর্বাপেক্ষা সক্ষম। আজও তূলা জন্মায় গ্রামে ও তার বীজ ছাড়িয়ে সূতা কেটে কাপড় তৈরীর কাজ হয় শহরে। কিন্তু কাপড়ের কলে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত যেভাবে কাপাসের রূপান্তর ঘটে, তা জনশক্তির কাঁচামাল ও যন্ত্রশক্তির অপচয়ের এক বিরাট বিয়োগান্তক ব্যাপার।

গ্রাম্য কুটিরশিল্প যথা সূতা কাটা, তূলা ধুনাই করা ইত্যাদি মারফত প্রাথমিক শিক্ষা দেবার আমি যে পরিকল্পনা করেছি, তাকে সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ এক নিঃশব্দ সামাজিক বিপ্লবের অগ্রদূত বলে মনে করা যেতে পারে। এর ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে এক সাবলীল নৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হবে আর আধুনিক সমাজের বিপদসঙ্কুল অবস্থা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরাজিত বিষাক্ত সম্পর্ক দূর করার পথে বহুল পরিমাণে এ সাফল্য অর্জন করবে। এর ফলে আমাদের গ্রামগুলির ক্রমবর্ধমান ক্ষয়ের গতি রুদ্ধ হবে এবং এমন এক অধিকতর ন্যায়সঙ্গত সমাজ-ব্যবস্থার

ভিত্তি স্থাপন করবে যেখানে "স্বত্ববান" ও "নিঃস্বদের" ভিতর বর্তমানের মত কোন কৃত্রিম পার্থক্য থাকবে না এবং প্রত্যেকেরই জীবনধারণোপযোগী জীবিকা ও স্বাধীনতা পাবার অধিকার থাকবে। আর এ লক্ষ্য সংসাধিত হবে শ্রেণীসংগ্রামের রক্তাক্ত ভয়ঙ্করতা অথবা ভারতবর্ষের মত বিশাল উপমহাদেশকে যন্ত্রশিল্পে অধ্যুষিত করতে যে সুবিপুল পরিমাণ পুঁজি লাগে তা ছাড়াই। বিদেশ থেকে আমদানী করা যন্ত্রপাতি অথবা কারিগরী কৌশলের উপর অসহায়ভাবে নির্ভর করার দরকার হবে না এ পন্থায়। আর শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত রকমের বিশেষজ্ঞদের প্রতিভার প্রয়োজনীয়তা দূর করার এই পন্থায় জনসাধারণের বিধিলিপি তাদের নিজেদের হাতে ন্যস্ত হবে। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? শহর-বাসীরা কি আদৌ আমার কথায় কান দেবেন? অথবা আমার কথা অরণ্যে রোদনের সামিল হবে? এই প্রশ্ন এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে আমার উপর নয়, পত্রলেখকের মত শহরবাসী শিক্ষাপ্রেমীদের উপর।

হরিজন, ৯-১০-১৯৩৭

১১

কয়েকটি সমালোচনার উত্তর

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষাবিভাগের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী একজন সাধারণ বন্ধুর মারফত প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীত আমার পরিকল্পনার একটি বিস্তৃত ও সুবিবেচিত সমালোচনা করে পাঠিয়েছেন।....

আমার পরিকল্পনাকে লেখক নিম্নোক্তভাবে নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন:

"(ক) আগাগোড়া হাতের কাজ ও শিল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে আর সাধারণ জ্ঞান হিসাবে যা কিছু জানা দরকার প্রথমাবস্থায় ছাত্ররা তা জানবে গৌণভাবে। ইতিহাস

ভূগোল এবং অঙ্কের মত যেসব বিষয়কে লিখন ও পঠনের মাধ্যমে শেখাতে হয় সেগুলি শেখান হবে সবার শেষে।

(খ) প্রথম থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে। বিদ্যালয়ের উৎপন্ন মাল রাষ্ট্র কিনে নিয়ে জনসাধারণের কাছে বিক্রয় করবে। এইভাবে স্বাবলম্বনের আদর্শকে কার্যকরী করা যায় এবং করা উচিতও।

(গ) প্রাথমিক শিক্ষা পুরোপুরি প্রবেশিকা মান পর্যন্ত যাবে, অবশ্য ইংরাজী বাদ যাবে তার থেকে।

(ঘ) যুবক যুবতীদের বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে লাগান সম্বন্ধে অধ্যাপক ক. ট. শাহ্ যে প্রস্তাব করেছেন তা পূর্ণমাত্রায় বিবেচনা করে দেখতে হবে এবং সম্ভব হলে তদনুযায়ী আচরণ করতে হবে।”

এর পরই লেখক বলছেন ঃ

“উপরি-উক্ত পরিকল্পনাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত ভাবধারা কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার এমন ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যা ধোপে টিকবে না। সম্ভবতঃ তৃতীয় অনুচ্ছেদটি খুবই উচ্চাশামূলক।”

আমার বক্তব্য নিজের ভাষায় উপস্থাপিত না করে আমার নিজের ভাষায় উদ্ধৃত করলে সম্ভবতঃ লেখক ভাল করতেন। কারণ প্রথমোদ্ধৃত “আমার বক্তব্যটি” সত্য থেকে বহু দূরে। আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য এ নয় যে এর সূত্রপাত করতে হবে হাতের কাজ দিয়ে এবং বাদবাকী সবকিছু পরে গৌণ ব্যাপার হিসাবে এসে যাবে। পক্ষান্তরে আমি এই কথা বলেছি যে সমগ্র সাধারণ শিক্ষা হাতের কাজের মাধ্যমে দেওয়া হবে এবং হাতের কাজে প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এরও প্রগতি হবে। মধ্যযুগে যা হয়েছিল এ তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে আমি এ কথা ভালভাবেই জানি যে হাতের কাজের মাধ্যমে সমগ্র মানুষটির বিকাশ মধ্যযুগ অথবা

অন্য কোন যুগের আদর্শ ছিল না। আমার পরিকল্পনা মৌলিক। আমার বক্তব্য ভ্রান্ত প্রমাণ হলেও এর মৌলিকতার দাবী ক্ষুণ্ণ হয় না। আর ব্যাপকভাবে তাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না হলে কোন মৌলিক পরিকল্পনার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করা চলে না। পূর্ব ধারণা চালিত হয়ে একে অসম্ভব বলে দেওয়া যুক্তির কথা নয়।

আমি একথাও বলি নি যে লিখন ও পঠনের মাধ্যমে যেসব বিষয় শেখাতে হয় সেগুলি শেখান হবে সবার শেষে। পক্ষান্তরে এ শিক্ষা দেওয়া হয় একেবারে গোড়ার দিকে। প্রত্যুত এ হল ছাত্রকে সাধারণভাবে গড়ে তোলার অঙ্গ। আমি অবশ্য একথা বলেছি এবং আবার তার পুনরাবৃত্তি করছি যে পড়া একটু পরে শুরু করা যেতে পারে ও লেখা আসবে সবার শেষে। তবে সমগ্র ব্যাপারটিই প্রথম বছরের মধ্যে সেরে ফেলতে হবে যাতে প্রথম বছরেই আমার পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের সাত বছর বয়সের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রচলিত বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশী সাধারণ জ্ঞান পায়। বর্তমানে শিশুরা যে হিজিবিজি লেখে তার বদলে আমার পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের প্রথম বছরের ছাত্ররা শুদ্ধভাবে পড়তে ও সঠিকভাবে লিখতে শিখবে। শিশু প্রাথমিক যোগ বিয়োগ ও গুণও জানবে। সূতা কাটার মত কোন উৎপাদনমূলক হাতের কাজ শেখার সঙ্গে সঙ্গে এবং তার মাধ্যমে শিশু এইসব শিখবে।

আমার অভিমতের দ্বিতীয় শব্দান্তরিত অনুলিপি প্রথমটিরই মত ত্রুটীযুক্ত। কারণ আমি এই কথা বলেছি যে সাত বছরে সমগ্রভাবে হাতের কাজের মাধ্যমে প্রদত্ত শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে। আমি স্পষ্ট ভাবেই বলেছি যে প্রথম দুই বছরে এতে হয়ত আংশিক লোকসান হতে পারে।

মধ্যযুগ হয়ত খারাপ ছিল; কিন্তু কোন জিনিস মধ্যযুগীয় বলেই তাকে নস্যাৎ করতে প্রস্তুত নই। চরখা অবশ্যই মধ্যযুগীয় কিন্তু

ভারতবর্ষে এ থেকেই যাবে। জিনিসটি একই কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের পর এক সময় চরখা যেমন দাসত্বের প্রতীকে পরিণত হয় আজ তেমনি এ স্বাধীনতা ও ঐক্যের নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক ভারতবর্ষ চরখার ভিতর এমন এক গভীর ও যথার্থ অর্থ খুঁজে পেয়েছে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি। অনুরূপভাবে হস্তশিল্প একদা পীড়নমূলক শ্রমের প্রতীক হলেও আজ তা যথার্থ শিক্ষার মাধ্যম ও প্রতীক হতে পারে। মন্ত্রীদের যদি যথেষ্ট দূরদৃষ্টি ও সাহস থাকে তাহলে এই আদর্শকে তাঁরা একবার পরখ করে দেখতে পারেন। শিক্ষাবিভাগের উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী বা অন্য কারও সমালোচনা সদিচ্ছা প্রণোদিত হলেও তা কাল্পনিক প্রতিজ্ঞানির্ভর বলে এসব সমালোচনা যেন মন্ত্রীদের নিরুৎসাহ না করে।

বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষকতার কাজ নেবার জন্য অধ্যাপক ক. ট. শাহ্ যে প্রস্তাব করেছেন, পত্রলেখক তার সমীচীনতার সম্ভাব্যতা স্বীকার করলেও পরে মনে হয় তার জন্য অনুতাপ করেছেন। কারণ তিনি বলেছেন ঃ

"বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষকতার কাজ নেওয়া আমাদের মতে এক অপমানজনক ব্যাপার। যেখানে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা একত্র হয় সেই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী হিসাবে এমন লোকের প্রয়োজন যাঁরা স্বেচ্ছায় শিক্ষকতার জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন (অবশ্য বর্তমান পৃথিবীতে এরকমভাবে নিজেকে উৎসর্গ করা যতটা সম্ভব) এবং যাঁরা প্রাণোচ্ছল ও উদ্যমে পরিপূর্ণ। দেশের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমরা প্রয়োজনাতিরিক্ত বহু রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। কিন্তু প্রস্তাবিত পরীক্ষা-নিরীক্ষাটির পরিণামে আমরা এমন এক সর্বনাশের আবর্তে পতিত হব যার হাত থেকে অন্ততঃ আগামী পঞ্চাশ বছর নিষ্কৃতি পাবার আশা নেই। সমগ্র প্রস্তাবটি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে শিক্ষাদান

এমন একটি কলা যার জন্য যথেষ্ট প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নেই এবং প্রত্যেকেই স্বভাব-শিক্ষক। ক. ট. শাহ্-এর মত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যে কি করে একথা মনে করেন তা বোঝা ভার।… তারপর যে-কোন লোক ছাত্রদের হাতের কাজ ইত্যাদি শেখাবেন কি করে?"

অধ্যাপক শাহ্ নিজের বক্তব্য সমর্থন করার ক্ষমতা রাখেন। তবে পত্রলেখককে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে আজকালকার শিক্ষকরা আদৌ স্বেচ্ছাসেবক নন। তাঁরা নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জনের জন্য কর্মরত ভাড়াটে লোক। ভাড়াটে শব্দটিকে অবশ্য এখানে তার স্বাভাবিক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। অধ্যাপক শাহ্-এর পরিকল্পনায় ধরে নেওয়া হয়েছে যে প্রস্তাবিত শিক্ষকদের ভিতর দেশপ্রেম আত্মত্যাগ বৃত্তি ও কিঞ্চিৎ পরিমাণ সংস্কৃতিবোধ থাকবে এবং প্রত্যক্ষ শিক্ষকতা শুরু করার পূর্বে তাঁরা হাতের কাজ শিখে নেবেন। তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবতা আধারিত, পূর্ণমাত্রায় সম্ভাব্য এবং সকলেরই এটি বিবেচনা করে দেখা উচিত। স্বভাব-শিক্ষক পাবার জন্য আমাদের যদি অপেক্ষা করে থাকতে হয় তাহলে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষাই সার হবে। আমি বলতে চাই যে যথাসম্ভব অল্প সময়ের ভিতর শিক্ষকদের পাইকারী হারে প্রশিক্ষিত করতে হবে। আজকের শিক্ষিত যুবক যুবতীদের সহায়তা না পেলে এরকম করা সম্ভব নয়। আর তাঁরা মোটামুটি স্বেচ্ছায় সাড়া না দিলে এ সম্ভব হবে না। অবশ্য আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তাঁদের কাছ থেকে এ সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। পেটে ভাতে থাকার বিনিময়ে এই গঠনমূলক সেবা দেবার জন্য কি তাঁরা পুনর্বার সাড়া দেবেন না?

এরপর পত্রলেখক প্রশ্ন করছেন:

(১) শিশুরা কাঁচামাল নিয়ে কাজ করলে এর অনেক অপচয় হবে না কি?

(২) বিদ্যালয়ের উৎপাদিত সামগ্রী কি কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিক্রিত হবে? এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ হবে কি করে?

(৩) জনসাধারণকে কি এসব জিনিস কিনতে বাধ্য করা হবে?

(৪) আজ যেসব শিল্পী এইসব জিনিস উৎপাদন করছেন তাঁদের কি হবে? তাঁদের উপর এই পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া কি হবে? আমার উত্তর হল ঃ

(১) খানিকটা অপচয় অবশ্যই হবে। তবে প্রথম বছরের ভিতরই প্রত্যেকটি ছাত্র কিছু না কিছু লাভ করবে।

(২) সরকার বিভিন্ন সরকারী বিভাগের জন্য অধিকাংশ জিনিস কিনে নেবে।

(৩) দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে তৈরী জিনিস কিনতে কাউকে বাধ্য করা হবে না। তবে দেশবাসীর প্রয়োজন পূর্তির জন্য ছেলেমেয়েরা যা উৎপন্ন করবে দেশবাসী তা গর্ব ও দেশপ্রেমমূলক আনন্দ সহকারে কিনবেন এইটা ধরে নেওয়া হচ্ছে।

(৪) গ্রামের শিল্পী ও কারিগরদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্ন কদাচিৎ উঠবে। খেয়াল রাখা হবে যে গ্রামীণ শিল্পের সঙ্গে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে এমন জিনিসের উৎপাদন যেন না হয়। যেমন খাদি, হাতে তৈরী কাগজ, তালগুড় এবং এই জাতীয় জিনিস উৎপাদন করলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন সম্ভাবনা নেই।

হরিজন, ১৬-১০-১৯৩৭

১২

কংগ্রেস ও বনিয়াদী শিক্ষা

একথা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই যে দেশের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা এসেছে বলে অবিলম্বে এর চারিত্র-ধর্মে এমন পরিবর্তন ঘটবে যা এর পূর্বে কংগ্রেসের ভিতর ছিল না। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের যুগ-

সন্ধিক্ষণের এক বিশিষ্ট উপাদান গঠনমূলক কার্যক্রম কংগ্রেসকর্মিদের সম্মুখে থাকলেও একথা বলা যায় না যে তাঁদের এতে জীবন্ত বিশ্বাস আছে অথবা তাঁরা এর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যাঁরা কংগ্রেসের বাইরে আছেন তাঁদের কাছে আশা তো আরও কম। একথা অবশ্য সত্য যে গঠনমূলক অর্থাৎ সর্জনাত্মক কার্যক্রম যদিও ধ্বংসাত্মক (অহিংস প্রচেষ্টার একটি অঙ্গকে এই অভিধায় অভিহিত করা যদি অনুচিত না হয়) অর্থাৎ নেতিবাচক কর্মসূচির মত অতটা জনপ্রিয় হতে পারে নি তবুও স্বেচ্ছায় হক বা অনিচ্ছায় ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ থেকে কংগ্রেস এই কর্মসূচিকে গ্রহণ করেছে। কংগ্রেস একবারও এই কর্মসূচির বিরুদ্ধে কিছু বলে নি এবং কংগ্রেসের বহু সদস্য এই কর্মসূচির রূপায়নে ব্রতী হয়েছেন।...

সুতরাং গঠনমূলক কার্যক্রমে বিশ্বাসী কংগ্রেসের সদস্যেরা যেন সতর্ক হন। শিক্ষার যে পরিকল্পনা আমি উপস্থাপিত করেছি সেটিও গঠনমূলক কাজের অঙ্গ এবং এর রূপায়নের দায়িত্বও আমাদের সকলের। তবে আমি একথা বলতে চাই না যে আপনাদের কাছে আজকে যে ভাবে এই পরিকল্পনাকে উপস্থাপিত করছি কংগ্রেস ঠিক সেই ভাবে একে গ্রহণ করেছে। তবে ইদানিং আমি এ সম্বন্ধে যা-কিছু লিখছি তা ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ থেকেই জাতীয় বিদ্যালয় সম্বন্ধিত আমার রচনা ও বক্তব্যে অন্তর্নিহিত ছিল। কেবল এখন সময় অনুকূল হয়েছে বলে সে-যুগের বক্তব্য আরও বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ-ভাবে উপস্থাপিত করেছি।

হস্তশিল্পের মাধ্যমে যদি প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হয় তাহলে একমাত্র তাঁরাই এ কাজে হাত দিতে পারেন যাঁদের চরখা ও অন্যান্য কুটীরশিল্পের উপর আস্থা আছে। কুটীরশিল্পের ভিতর চরখার স্থান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।......এইজন্য আমি মনে করি যে দেশের জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়ে তাদের উন্নতিবিধানে ব্রতী হওয়া যদি

আমাদের লক্ষ্য হয় তাহলে তা সম্ভব কেবল চরখা ও কুটীরশিল্পের অধিকতর প্রচলন দ্বারা। তবে মুস্কিল হল এই যে চরখায় বিশ্বাসী সবাই শিক্ষক নন। সব সূত্রধরই সূত্রধর-বিজ্ঞান জানেন না। কোন হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হলে তার বিজ্ঞানও জানা চাই। অতএব প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবল তাঁরাই আমার পদ্ধতিকে সাফল্য সহকারে কার্যকর করতে পারবেন যাঁরা চরখার বিজ্ঞান ও শিক্ষা-বিজ্ঞান—ছুই বিষয়েই আগ্রহশীল।

হরিজন বন্ধু, ১৭-১০-১৯৩৭

১৩

ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার ভাষ্য

[দক্ষিণ ভারতের একটি বিশিষ্ট শিক্ষায়তনের কর্ণধার ডঃ জন স্থ বোহ্‌র সম্প্রতি ওয়ার্ধাতে আসেন।…গান্ধীজীর সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য দেখা করতে তিনি উৎসুক হন। সা-াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে পরিকল্পনাটির বনিয়াদে অহিংসা আছে বলে এ পরিকল্পনা তাঁকে খুবই আকৃষ্ট করেছে। তবে এর পাঠ্যক্রমে অহিংসার স্থান খুব বেশী নেই বলে তিনি অসুবিধা বোধ করছেন।]

গান্ধীজী বললেন, "যে কারণে এই পরিকল্পনা আপনার হৃদয়গ্রাহী হয়েছে তা অতীব সমীচীন। তবে সমগ্র পাঠ্যক্রম অহিংসাকে কেন্দ্র করে রচিত হতে পারে না। এইটুকু স্মরণ রাখাই যথেষ্ট যে একটি অহিংস মস্তিষ্ক থেকে এর জন্ম। তবে একথা ধরে নেওয়া হচ্ছে না যে যাঁরাই পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছেন তাঁরাই অহিংসাকেও বরণ করে নিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে নঈ তালিম সমিতির সব সদস্য অহিংসাকে ধর্মনীতি হিসাবে গ্রহণ করেন নি। নিরামিষ আহারী হলেই অহিংসায় বিশ্বাসী হতে হবে বলে যেমন কোন কথা নেই (নিছক স্বাস্থ্যের খাতিরেও

লোক নিরামিষাহারী হতে পারেন) তেমনি এই পরিকল্পনাকে গ্রহণকারী সকলে অহিংসায় বিশ্বাসী নাও হতে পারেন।”

ডঃ বোহ্‌র বললেন, “তা জানি। এ পরিকল্পনা অহিংস জীবনদর্শন আধারিত বলে কোন কোন শিক্ষাবিদ্ এর সঙ্গে সম্পর্কই রাখতে চাইবেন না।”

“আমিও সেকথা জানি। আমি এও জানি যে কেবল আমার জীবনাদর্শের উপর দণ্ডায়মান বলে কোন কোন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি খাদিকে গ্রহণ করেন না। তবে আমি এর কি করব? নিঃসন্দেহে পরিকল্পনাটির কেন্দ্রবিন্দু হল অহিংসা এবং সেটা আমি সহজে প্রমাণও করতে পারি। তবে আমি এও জানি যে সেকথা প্রমাণের পর এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনেকেরই উৎসাহ চলে যাবে। তবে যাঁরা এই পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছেন তাঁরা এই সত্যকে স্বীকার করেন যে লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষুতে আকীর্ণ এই দেশের শিশুদের আর কোন পন্থায় শিক্ষা দেওয়া যাবে না এবং এই পরিকল্পনাকে যদি চালু করা যায় তাহলে তার পরিণামে এক নূতন অর্থব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে। আমার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট… ।”

ডঃ বোহ্‌র বললেন, “বুঝেছি। তবে একটি বিষয় বুঝতে পারছি না। আমি সমাজবাদীও বটে। অহিংসায় বিশ্বাসী হিসাবে পরিকল্পনাটি আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় হলেও সমাজবাদী হিসাবে আমার মনে হয় যে পরিকল্পনাটি ভারতবর্ষকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অথচ সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হওয়াই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং সমাজবাদ ছাড়া আর কোন কিছু এই যোগসূত্রের ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম নয়।”

গান্ধীজী উত্তর দিলেন, “এতে তো অসুবিধা হবার কথা নয়। আমরা তো আর সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চাই না। আমরা প্রতিটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অবাধ আদান-প্রদান ব্যবস্থা রাখব। তবে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া আদান-প্রদান অবশ্যই বন্ধ

করতে হবে। আমরা চাই না যে কেউ আমাদের শোষণ করুক এবং আমরাও স্বয়ং কোন দেশকে শোষণ করতে অভিলাষী নই। এই পরিকল্পনা দ্বারা আমরা প্রতিটি বালককে উৎপাদকে রূপায়িত করে সমগ্র রাষ্ট্রের রূপান্তর ঘটাতে চাই। কারণ এই পরিকল্পনার পরিণামস্বরূপ আমাদের সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হবে। তবে এর অর্থ এ নয় যে, আমরা সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সকলের কাছ থেকে অসম্পৃক্ত হয়ে যেতে মনস্থ করেছি। এমন অনেক রাষ্ট্র থাকবে, যারা নিজেদের প্রয়োজনীয় সবকিছু উৎপাদন করতে না পারার জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে পণ্য বিনিময় করবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ঐসব দ্রব্যের জন্য তাদের অপর রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করতে হবে। কিন্তু যে রাষ্ট্র তাদের প্রয়োজন পূর্তি করবে, তার তরফ থেকে তাদের শোষণ করার পরিকল্পনা থাকবে না।"

"ধরুন আপনি আপনার জীবনযাত্রাকে এত সরল করে দিলেন যার ফলে অপর কোন দেশের কোন কিছুর দরকার আপনার আর রইল না। সে অবস্থায় আপনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন। অথচ আমি চাই যে আপনি আমেরিকার জন্যও দায়ী হন।"

"শোষণ করতে এবং শোষিত হতে অস্বীকার করেই আমরা কেবল আমেরিকার জন্যও দায়ী হতে পারি। কারণ আমেরিকাও তখন আমাদের উদাহরণ গ্রহণ করবে এবং আমাদের ভিতর স্বাধীন বিনিময়ে আর কোন বাধা থাকবে না।"

"কিন্তু আপনি তো জীবনযাত্রাকে সরল করে যান্ত্রিকতার মূলোচ্ছেদ করতে চান।"

"আমাদের দেশের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু যদি আমি ত্রিশ কোটির বদলে তিন লক্ষ লোকের শ্রমে উৎপাদন করতে পারতাম এবং এর ফলে এই ত্রিশ কোটি লোক যদি অলস ও বেকার হয়ে না যেত তাহলে আমার আপত্তির কিছু ছিল না। আমি জানি যে

সমাজবাদীরা এই পরিমাণ যন্ত্রীকরণ করার অভিলাষী যার ফলে মানুষকে দিনে দুই এক ঘণ্টার বেশী পরিশ্রম করতে হবে না। আমি কিন্তু তাতে রাজী নই।"

"এতে মানুষের অবসর বাড়বে।"

"হকি খেলার জন্য অবসর?"

"শুধু তাই বা কেন? ধরুন না সে সময় সর্জনাত্মক হস্তশিল্পেও নিয়োগ করা যেতে পারে।"

"আমিও তো তাদের সর্জনাত্মক হস্তশিল্পে প্রবৃত্ত হতেই বলছি। অবশ্য দিন আট ঘণ্টা কাজ করে তারা সে সব উৎপাদন করবে।"

"আপনি নিশ্চয় এমন সাহায্য-ব্যবস্থার কথা কল্পনা করেন না যখন প্রতিটি বাড়ীতে একটি করে বেতারযন্ত্র ও সকলের একখানি করে মোটর গাড়ী থাকবে। প্রেসিডেণ্ট হুভারের পরিকল্পনা এই ছিল। তিনি একটি নয় দুটি বেতারযন্ত্র ও দুটি করে গাড়ীর কথা বলেছিলেন।"

"এত মোটর গাড়ী হলে তো আর হাঁটা চলার পথ থাকবে না।" গান্ধীজী বললেন।

"আমারও তাই মনে হয়। আমাদের দেশে বছরে ৪০,০০০ লোক দুর্ঘটনায় মারা যায় এবং এর তিনগুণ লোকের অঙ্গহানি ঘটে।"

"যাই হক আমার জীবিত কালে ভারতবর্ষের সব গ্রামে বেতার যন্ত্র যাচ্ছে না।"

"পণ্ডিত জওহরলাল সম্ভবতঃ প্রাচুর্যের অর্থশাস্ত্রে বিশ্বাসী।"

"জানি, কিন্তু প্রাচুর্য বলে কাকে? আমেরিকাতে আপনারা যেমন লক্ষ লক্ষ টন গম নষ্ট করেন, তার নাম নিশ্চয় প্রাচুর্য নয়।"

"হ্যাঁ, এ হল পুঁজিবাদের শয়তানের প্রভাব। আজকাল অবশ্য আর আগের মত গম নষ্ট করা হয় না। তবে তার বদলে গম উৎপাদন করবে না—এই শর্তে লোকে টাকা পায়। ডিমের দাম কমে গেছে বলে লোকে শখ করে পরস্পরের গায়ে ডিম ছুঁড়ে মারে।"

"এ জিনিস আমরা চাই না। প্রাচুর্য বলতে যদি এই কথা বোঝাতে চান যে সকলে খাওয়া পরার মত যথেষ্ট পাবে, মনের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা থাকবে, তাহলে তাতে আমি রাজী। তবে যতটা আমি হজম করতে পারব তার চেয়ে বেশী জিনিসে আমার পেট আমি বোঝাই করতে চাই না অথবা যত জিনিস আমি ব্যবহার করতে পারব তার চেয়েও বেশী জিনিসের মালিক হতে চাই না। তবে আমি এও চাইনা যে ভারতবর্ষে দারিদ্র্য দৈন্য অভাব ধূলোবালি ও আবর্জনা থাকুক।"

হরিজন, ১২-২-১৯৩৮

১৪

অহিংস ভিত্তি

সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত বনিয়াদী শিক্ষা পর্ষৎ-এর এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী নঈ তালিমের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও আদর্শ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে বললেন, "...আমি বলছি মাত্র এই কারণে আপনারা কোন বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করবেন না। যা আপনাদের বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় কেবল তা-ই বিশ্বাস করুন। তবে আমি এ বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় যে মাত্র দুটি বিদ্যালয়ও যদি আমরা সঠিক পন্থায় পরিচালিত করতে পারি তাহলে আমি আনন্দে নৃত্য করব।"

সঠিক পন্থা-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "এইসব প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়কে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের বিদ্যালয়ে পরিণত করতে হবে। আমাদের সব রকমের সমস্যা—যার মধ্যে প্রমুখ হল সাম্প্রদায়িক বিরোধ, তার সমাধান যেন আবিষ্কৃত হয় এই বিদ্যালয়ে। এর জন্য আমাদের অহিংসার উপর জোর দিতে হবে। হিটলার ও মুসোলিনীর দেশের বিদ্যালয়ে হিংসাকে মূল আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের আদর্শ হবে কংগ্রেস কথিত অহিংসা। সুতরাং অহিংস পদ্ধতিতে আমাদের সব সমস্যার সমাধান

করতে হবে। আমাদের গণিত বিজ্ঞান ইতিহাস—সবেরই একটা অহিংস আবেদন থাকবে এবং এর পাঠও অহিংসার রঙে রঞ্জিত হবে। জমিয়া মিলিয়া ইসলামিয়াতে মাদাম হালিদা এদিব হান্নুম যখন তুরস্ক সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, আমি তখন মন্তব্য করেছিলাম যে সাধারণতঃ ইতিহাস রাজা রাজড়ার কুলপঞ্জিও ও তাঁদের যুদ্ধসমূহের বিবরণ হলেও ভবিষ্যত ইতিহাস হবে মানুষের ইতিবৃত্ত। আর এই ইতিবৃত্ত অহিংস ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না এবং নয়ও। অতএব আমরা শহরের শিল্পের উপর জোর দিতে পারি না, আমাদের নজর দিতে হবে গ্রামীণ শিল্পের উপর। অর্থাৎ দেশের এক ভগ্নাংশকে নয়, সমগ্র দেশের সাত লক্ষ গ্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আমাদের গ্রামীণ হস্তশিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। আর আপনারা ভালভাবে জেনে রাখুন যে এইসব হস্তশিল্পের মাধ্যমে যদি আমরা উচ্চতর জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতে পারি তাহলে আমরা দেশে এক বিপ্লব আনয়ন করব। আমাদের পাঠ্যপুস্তকসমূহকেও অনুরূপ লক্ষ্য সাধনের উপযুক্ত করে রচনা করতে হবে।

হরিজন, ৭-৫-১৯৩৮

১৫
পশ্চিম থেকে আমদানী করা নয়

[ওয়ার্ধায় ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত বনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলন ডঃ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে যে কমিটি নিযুক্ত করেন তার প্রতিবেদন "বেসিক ন্যাশনাল এডুকেশন" বা বনিয়াদী জাতীয় শিক্ষা নামে প্রকাশিত হয়। সেই প্রতিবেদনের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।]

এই পুস্তিকার প্রথম মুদ্রণের এক হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেছে দেখে মনে হয় যে ডঃ জাকির হোসেন এবং তাঁর কমিটি যাকে বনিয়াদী জাতীয় শিক্ষা আখ্যা দিয়েছেন তা দেশে বিদেশে যথেষ্ট

আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। এই শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি অধিকতর সঠিক নাম দেওয়া যায় যদিও সেটি বনিয়াদী জাতীয় শিক্ষা নামটির মত অত আকর্ষণীয় হবে না। এ নাম হল গ্রামের হস্তশিল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ জাতীয় শিক্ষা। "গ্রামীণ"-এর ভিতর তথাকথিত উচ্চতর অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষা পড়ে না। আর বর্তমানে "জাতীয়" বলতে সত্য ও অহিংসা বোঝায়। "গ্রামের হস্তশিল্পের মাধ্যমে" বলতে এই কথা বোঝায় যে এই পরিকল্পনার জনকেরা চান যে শিক্ষকেরা এমন ভাবে গ্রামের শিশুদের নিজ নিজ গ্রামে শিক্ষা দেবেন যাতে কোন নির্বাচিত গ্রাম্য হস্তশিল্পের মারফত বাইরের থেকে চাপিয়ে দেওয়া বিধিনিষেধ এবং হস্তক্ষেপের পরিবেশমুক্ত হয়ে তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসমূহের সম্যক্ বিকাশ সাধন করতে পারে। এই ভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে পরিকল্পনাটি গ্রামের শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে একটি বৈপ্লবীক পদক্ষেপ। এ পরিকল্পনা পশ্চিম থেকে আমদানী করা নয়। পাঠক এই কথা মনে রাখলে এই যে পরিকল্পনাটি রচনা করার জন্য দেশের বহু বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অখণ্ড মনযোগ দিয়েছেন, তাকে ভাল করে বুঝতে পারবেন।

সেগাঁও ২৫-৫-১৯৩৮

১৬

হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা

এখন আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে শিল্পশিক্ষার সঙ্গে সাহিত্যশিক্ষা নয়, শিল্পশিক্ষার **দ্বারা** সাহিত্যশিক্ষা দিতে হবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে ছাত্ররা শিল্পশিক্ষাকে এক হীন নীরস পরিশ্রম মনে করবে না এবং সাহিত্যশিক্ষাতেও এক নবীন সন্তুষ্টি ও নূতন উপযোগিতা দেখা দেবে।

আমরা স্থির করেছি যে ইংরাজীকে পাঠ্যক্রম থেকে বর্জন করা উচিত। কারণ আমি জানি যে ছাত্রদের অধিকাংশ সময় ইংরাজী

শব্দ ও বাক্য মুখস্থ করার পিছনেই যায় এবং এত পরিশ্রম করার পর তারা যা শেখে, তাকে নিজের মত করে ব্যক্ত করতে পারে না। এছাড়া তাদের শিক্ষক তাদেরকে যা শেখান, তাও তারা ঠিক মত বুঝতে পারে না। পক্ষান্তরে মাতৃভাষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করার জন্য তারা তা বিস্মৃত হয়। অতএব আমি বুঝতে পেরেছি যে শিল্প-শিক্ষার মাধ্যমে যদি জ্ঞান দান করা যায় তাহলেই শুধু এই দ্বিবিধ দুষ্পরিণামের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে।

আমাকে যদি শিক্ষাদানের সূত্রপাত করতে হয়, তবে আমি নিম্নবর্ণিত পন্থা অনুসরণ করব ঃ শিশুরা যখন আমার কাছে আসবে, সর্বপ্রথমে আমি দেখব যে তাদের বুদ্ধি কতদূর বিকশিত হয়েছে। তারা লিখতে পড়তে ও যৎসামান্য ভূগোল জানে কি না। তারপর আমি তাদের ভিতর তকলী চালান প্রবর্তন করে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা করব।

আপনারা হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন যে এত কারুশিল্প থাকতে আমি তকলীকেই নির্বাচন করলাম কেন? এর কারণ হচ্ছে এই যে সর্বপ্রথম আমি যেসব কুটীরশিল্পের অন্বেষণ করি, তকলী তাদের অন্যতম এবং এ শিল্প বহু যুগ ধরে চলে আসছে। প্রাচীনকালে আমাদের সমুদয় বস্ত্র তকলী দ্বারা উৎপন্ন হত। চরখার প্রচলন পরে হয়। এ ছাড়া অতি সূক্ষ্ম শ্রেণীর সূতা চরখায় কাটা যায় না। সেইজন্য পুনরায় আমাদের তকলীর শরণ নিতে হয়। তকলী মানুষের অনুসন্ধিৎসু বৃত্তিকে উন্নতির শীর্ষদেশে উন্নীত করেছিল। এতে করাঙ্গুলীর কার্যকুশলতার সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোগ হয়। তবে তকলীর প্রয়োগ অশিক্ষিত কারিগরদেরই ভিতর সীমিত থাকায় এর প্রয়োজনীয়তা ক্রমে লুপ্তপ্রায় হয়ে যায়।

অতএব আমার দ্বিতীয় পাঠ হবে ঃ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তকলীর কি স্থান ছিল এইবার ছেলেদের তা শেখান। এর পর তাদের আমি তকলীর মোটামুটি ইতিহাস বলব ও কী ভাবে এর

পতন হল, তাও জানাব। তারপর সংক্ষিপ্তভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা বর্ণনা করব। এর সূত্রপাত হবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে, বা তারও পূর্বের মুসলমান যুগ থেকে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য কিভাবে আমাদের দেশকে শোষণ করে এবং কেমন করে সুপরিকল্পিত উপায়ে আমাদের দেশের প্রধান শিল্প বস্ত্রোদ্যোগকে শ্বাস রোধ করে হত্যা করে, এসব কথা বিস্তৃতভাবে তাদের জানাব। এর পর তকলীর যন্ত্রশাস্ত্র ও নির্মাণ-কৌশলের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্রম শুরু হবে। প্রথমে মাটি বা আটার ছোট ছোট চাকতি বানিয়ে তার মধ্যভাগে বাঁশের শলাকা বিদ্ধ করে তকলী তৈরি করা হত। বিহার এবং বঙ্গের কোন কোন অংশে এখনও এই জাতীয় তকলী পরিদৃষ্ট হয়। এর পর পোড়া মাটির চাকতির প্রবর্তন হয়। এখন এর পরিবর্তে লোহা, ইস্পাত বা পিতলের চাকতি ব্যবহৃত হয় এবং বাঁশের শলাকার স্থান নিয়েছে ইস্পাতের তার। এখানেও শিক্ষার দৃষ্টি থেকে বহুবিধ প্রশ্ন ওঠে। যথা ঃ চাকতি এবং তারের মাপ এতটাই কেন রাখা হয়? এর চেয়ে কম বেশী আকৃতি না হবার কারণ কি? এর পর কাপাস সম্বন্ধে কিছু বলা হবে। যথা ঃ কাপাস বিশেষতঃ কোন্ ধরনের জমিতে উৎপন্ন হয়? কাপাস কোন্ কোন্ জাতের হয় এবং পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে ও ভারতের কোন্ কোন্ প্রদেশে এর প্রচুর উৎপাদন হয় ইত্যাদি তাদের জানান হবে। কাপাস চাষ-পদ্ধতি এবং এর অনুকূল জমি সম্বন্ধে ছাত্রদের কিছুটা জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে কৃষি সম্বন্ধেও তাদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

আপনারা দেখতে পাবেন যে এইভাবে ছাত্রদের শিক্ষা দেবার পূর্বে শিক্ষককে স্বয়ং যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কত তার সূতা হল গণনা করা, গজে এর হিসাব করা, সূতার নম্বর বার করা, লাছি তৈরি করা, তাঁতিকে দেবার জন্য সূতা ঠিক করা, কি রকম কাপড়ে কতখানি সূতা লাগবে তার হিসাব করা ইত্যাদি দ্বারা

প্রাথমিক গণিত শেখান যেতে পারে। কাপাস বীজ অঙ্কুরিত করা থেকে আরম্ভ করে বুনাই করা পর্যন্ত কাপাস পরিষ্কার করা, বীজ বাছাই, ধুনাই করা, সূতা কাটা, মাড় লাগান ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধিত যন্ত্রশাস্ত্র, ইতিহাস ও গণিত রয়েছে।

এই পদ্ধতির অন্তর্নিহিত মুখ্য কল্পনা হচ্ছে এই যে, শিশুদের যে হস্তশিল্পই শেখান হক না কেন, তার মারফৎ তাকে পূর্ণ মাত্রায় শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং আত্মিক জ্ঞান দিতে হবে। শিল্পের সঙ্গে সম্বন্ধিত যাবতীয় ক্রিয়া দ্বারা শিশুদের ভিতর প্রচ্ছন্ন সদ্‌গুণাবলী আপনাদেরকে বিকাশ করতে হবে। আপনারা ইতিহাস, ভূগোল ও গণিত ইত্যাদি যা-কিছু পঠিতব্য বিষয় শেখাবেন, তা এই শিল্পের সঙ্গে সম্বন্ধিত হবে।

শিশুদের এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে পরিণামে তা স্বাবলম্বী হবে। তবে একমাত্র স্বাশ্রয়ী হওয়া দ্বারা এর সাফল্যের পরিমাপ করা হবে না। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় শিল্প শিক্ষা দ্বারা ছাত্রের মনুষ্যত্বের কতখানি বিকাশ হল—তার দ্বারা এই শিক্ষার সফলতার মূল্যাঙ্কন করতে হবে। সত্য কথা বলতে কি আমি কখনও এমন শিক্ষক রাখব না, যিনি যে-কোন মূল্যে শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেবেন। ছাত্ররা নিজেদের প্রতিটি কার্যশক্তির যথাযথ ব্যবহার করতে শেখার ন্যায়সঙ্গত পরিণামই হচ্ছে শিক্ষা স্বাবলম্বী হওয়া। কোন বালক যদি তিন ঘণ্টা কোন শিল্পে নিযুক্ত থেকে সুনিশ্চিতভাবে নিজ জীবনযাত্রার ব্যয়নির্বাহের উপযুক্ত অর্থ উপার্জন করতে পারে, তাহলে যে নিজের বিকশিত বুদ্ধি ও আত্মা প্রয়োগে ঐ কাজ করবে, সে আরও কত বেশী উপার্জন করবে।

হরিজন সেবক, ১১-৬-৩৮

১৭
নঈ তালিমের কাছে আশা

নঈ তালিমের নূতনত্ব বা মৌলিকত্ব সম্বন্ধে বোঝা দরকার। পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতির ভালটুকু অবশ্যই নঈ তালিমে রাখা হবে; কিন্তু এছাড়া এতে অনেক নূতন জিনিস থাকবে। নঈ তালিম যথার্থই নূতন হলে এর ফল হবে নিম্নরূপঃ আমাদের হতাশার মনোবৃত্তি চলে গিয়ে আশার সঞ্চার হবে, আমাদের দৈন্য ও বুভুক্ষার বদলে আসবে নিজেদের ব্যয়ভার-নির্বাহের উপযুক্ত সচ্ছলতা, বেকারত্বের পরিবর্তে শিল্প ও কর্মের কলগুঞ্জন আর অনৈক্যের স্থলে ঐক্য। আমাদের ছেলেমেয়েরা লিখতে পড়তে শিখবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শিখবে এমন একটি হাতের কাজ যার মাধ্যমে তারা উত্তরোত্তর জ্ঞানার্জন করবে।

উতমানগাই, ১৪-১০-১৯৩৮

১৮
সংশয় নিরসন

প্রতিনিধিরা গান্ধীজীকে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। প্রথম প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে বনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা কি কালের কষ্টিপাথরে টিকবে, না এ কেবল একটা সাময়িক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা। অনেক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী মনে করেন যে শীঘ্র হক অথবা ভবিষ্যতে হস্তশিল্প ছেড়ে দিয়ে পুরোদস্তুর যন্ত্রীকরণের শরণ নিতে হবে। বনিয়াদী শিক্ষাপরিকল্পনার ভিত্তিতে শিক্ষিত এবং ন্যায়বিচার সত্য ও অহিংসার আধারে দণ্ডায়মান কোন সমাজ কি যন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়ার প্রচণ্ড চাপ বরদাস্ত করতে সক্ষম?

গান্ধীজী উত্তর দিলেন, "প্রশ্নটি বাস্তব নয়। আমাদের অবিলম্বে করণীয় কাজের সঙ্গে এর সম্বন্ধ নেই। আজ থেকে কয়েক পুরুষ পর কি হবে, তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। প্রশ্ন হল বনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা গ্রামের লক্ষ লক্ষ লোকের যথার্থ প্রয়োজনীয়তা

পরিপূর্তিতে সক্ষম কি না। ভারতবর্ষ এমনভাবে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পে অধ্যুষিত হবে যে দেশে গ্রাম বলতে কোন কিছু থাকবে না—এমন অবস্থা আদৌ কোনদিন আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। ভারতবর্ষের অধিকাংশ চিরকালই গ্রাম দ্বারা গঠিত হবে।"

"দেশকে যন্ত্রশিল্পে অধ্যুষিত করার পরিকল্পনা উপস্থাপিত করলেও কংগ্রেস দেশের সম্মুখে আজ যে আদর্শ পেশ করেছে তা যন্ত্রীকরণের নয়। বোম্বাই-এ কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত এক প্রস্তাব অনুসারে এ আদর্শ হল গ্রামীণ শিল্পের পুনরুজ্জীবন। কৃষকদের সম্মুখে যন্ত্রশিল্পের বিকাশের জন্য যতই বিস্তারিত পরিকল্পনা পেশ করুন না কেন তার দ্বারা জনজাগৃতি ঘটান সম্ভব নয়। এর দ্বারা তাদের আয় এক পয়সাও বাড়বে না। কিন্তু অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ এবং গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ বছর ঘুরতে না ঘুরতেই গ্রামবাসীদের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে দেবে।···বনিয়াদী শিক্ষা ঐসব প্রতিষ্ঠানেরই এক অঙ্গ। শিক্ষা-মন্ত্রীদের পরিবর্তন হলেও এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে যাবে। সুতরাং বনিয়াদী শিক্ষাপ্রেমীরা কংগ্রেসের রাজনীতি নিয়ে যেন দুশ্চিন্তা না করেন। নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা নিজের যোগ্যতার বলে বাঁচবে আর তার অভাব হলে মরবে।"

মূল আদর্শ

সভায় উপনীত হবার পূর্বে জনৈক বন্ধু গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে বনিয়াদী শিক্ষার মূল আদর্শ কি এই যে তকলীর সঙ্গে যেসব বিষয়ের সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর নয়, সেসব বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রদের কাছে শিক্ষকরা একটি কথাও বলবেন না? সাধারণ সভায় এই প্রশ্নটির উত্তরদান প্রসঙ্গে গান্ধীজী মন্তব্য করলেন :

"এ আমার প্রতি মিথ্যা নিন্দারোপ। আমি সত্য সত্যই একথা বলেছি যে সব রকমের শিক্ষাই কোন না কোন মূল হাতের কাজের সঙ্গে সম্বন্ধিত হবে। সাত বা দশ বছরের কোন ছেলেকে যখন

কোন শিল্পের মাধ্যমে জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে তখন প্রথম দিকে যেসব বিষয়কে সেই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না, তার শিক্ষা মুলতুবী রাখাই বাঞ্ছনীয়। প্রত্যহ এরকম করলে দেখতে পাবেন যে এমন অনেক বিষয়কে হাতের কাজের সঙ্গে সম্বন্ধিত করার উপায় পাওয়া যাচ্ছে যা ইতিপূর্বে জানা ছিল না। প্রথমে বাদ দেওয়ার এই প্রক্রিয়া গ্রহণ করলে আপনার নিজের ও ছাত্রদের পরিশ্রম বাঁচাতে পারবেন। আমাদের কাজের নির্দেশদানকারী কোন বই বা পদ্ধতি আজ আমাদের সামনে তৈরি নেই। এইজন্য আমাদের ধীরে-সুস্থে এগোতে হবে। প্রধান কথা হল এই যে শিক্ষক তাঁর মনের সজীবতা বজায় রাখবেন। আপনারা যদি এমন কোন বিষয় পান যাকে শিল্পের সঙ্গে সম্বন্ধিত করতে পারছেন না তবে তার জন্য বিচলিত হয়ে হতাশা বোধ করবেন না। সাময়িক ভাবে সে বিষয় ছেড়ে দিয়ে সেইসব বিষয় নিয়ে অগ্রসর হন যার সঙ্গে হাতের কাজের সমন্বয় সাধন করতে পারবেন। এমন হতে পারে যে অন্য কোন শিক্ষক সেইসব বিষয়ের সমন্বয় সাধনের সঠিক পন্থা উদ্ভাবন করবেন। আর অনেকের অভিজ্ঞতার সার সংগৃহীত হলে আপনাদের কাজের সহায়ক বই রচিত হবে। তার ফলে আপনাদের পরবর্তী শিক্ষকদের কাজ সহজ হয়ে যাবে।”

“আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে কতদিন এই বাদ দিয়ে চলার নীতি দ্বারা চালিত হতে হবে? আমার জবাব হল—সমগ্র জীবনের জন্য। শেষ পর্যন্ত আপনারা দেখতে পাবেন যে এমন অনেক বিষয় গ্রহণ করেছেন যা প্রথমে বর্জিত ছিল এবং প্রত্যুত গ্রহণ করার মত সব বিষয়ই গৃহীত হয়েছে আর অবস্থাগতিকে শেষ অবধি যা বর্জন করেছেন তা অত্যন্ত হাল্কা বিষয় ও বর্জন করারই উপযুক্ত। আমার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতাই এই। আমি যেসব কাজ করেছি তার অনেকগুলিই করতে পারতাম না যদি না সমপরিমাণ কাজ আমি বর্জন করতাম।”

"আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লব সংসাধন করতে হবে। মস্তিষ্ককে হাতের সাহায্যে প্রশিক্ষিত করতে হবে। আমি কবি হলে পাঁচ আঙ্গুলের সম্ভাবনার সম্বন্ধে কবিতা রচনা করতাম। আপনারা কেন একথা মনে করবেন যে মনই সবকিছু এবং হাত পা কিছুই নয়। শিক্ষার গতানুগতিক পথে যাঁরা চলেন এবং হাতকে যাঁরা গড়ে তোলেন না, তাঁর জীবনে "সঙ্গীতের" অপ্রতুলতা ঘটে। তাঁদের সব বৃত্তি বিকশিত হয় না। কেবল জ্ঞান ছাত্রের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে না এবং তাই তার মনকেও পূর্ণমাত্রায় টেনে রাখতে পারে না। কেবল কথার চাপে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং ছাত্রের মনও সে-ধরনের পড়ায় বসে না। হাত চোখ কানের যা করা দেখা এবং শোনা উচিত নয়, তা-ই করে দেখে ও শোনে। আর তাদের যা করা দেখা ও শোনা উচিত, তা করে না দেখে না এবং শোনে না। তাদের সঠিক জিনিসটি বেছে নিতে শেখান হয় না এবং তাই সময় সময় শিক্ষা সর্বনাশ ডেকে আনে। যে শিক্ষা ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায় না অথবা যা ভালকে গ্রহণ করতে ও মন্দকে বর্জন করতে শেখায় না তা শিক্ষা নামের অযোগ্য।"

হাতের সাহায্যে মনের শিক্ষা

হাতের মাধ্যমে কি করে মনের প্রশিক্ষণ হতে পারে সে সম্বন্ধে সকলকে বুঝিয়ে দেবার জন্য শ্রীমতী আশা দেবী গান্ধীজীকে অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন।

গান্ধীজী জবাব দিলেন, "পুরাতন মত অনুসারে বিদ্যালয়ে প্রচলিত পাঠ্যক্রমের সঙ্গে একটি হাতের কাজ যোগ করা হত। অর্থাৎ হাতের কাজকে শিক্ষার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিতভাবে গ্রহণ করা হত। আমার একে এক মারাত্মক ভ্রম বলে মনে হয়। শিক্ষককে সেই হাতের কাজটি ভাল ভাবে জানতে হবে এবং নিজের জ্ঞানকে সেই কাজের সঙ্গে সম্বন্ধিত করতে হবে যাতে তিনি ছাত্র কর্তৃক

নির্বাচিত সেই হাতের কাজের মাধ্যমে তাকে সর্ব প্রকারের জ্ঞান দিতে পারেন।”

“সূতা কাটার উদাহরণ দিন। অঙ্ক না জানলে রোজ তকলীতে আমি কত গজ সূতা কেটেছি তার হিসাব দিতে পারব না অথবা তাতে কত তার হবে কিংবা সেই সূতার নম্বর কত তাও বলতে পারব না। এ কাজ করার জন্য প্রথমতঃ আমাকে সংখ্যাগুলি শিখতে হবে এবং তারপর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগও শিখে নিতে হবে। জটিল অঙ্ক করার জন্য আমাকে প্রতীক-চিহ্ন ব্যবহার করা শিখতে হবে ও এইভাবে বীজগণিত এসে পড়বে। তবে রোমান হরফ-এর বদলে হিন্দুস্থানী বর্ণমালা ব্যবহার করার উপর আমি জোর দেব।”

“এর পর জ্যামিতির কথা ধরুন। বৃত্ত সম্বন্ধে শেখাতে হলে তকলীর চাকতির চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে? এইভাবে এমন কি ইউক্লিডের নাম একবারও উচ্চারণ না করেই আমি বৃত্ত সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারি।”

“তারপর আপনারা প্রশ্ন তুলতে পারেন যে কাতাই-এর মাধ্যমে কি করে আপনি ছেলেমেয়েদের ভূগোল ও ইতিহাস শিক্ষা দেবেন? কিছুদিন পূর্বে আমি “কাপাস—মানবজাতির কাহিনী” নামক একটি বই পড়েছিলাম। বইটি পড়ে আমি চমৎকৃত হলাম। পড়তে এটি একটি উপন্যাসের মত। প্রাচীন কালের ইতিহাস বিবৃত করে বইটি শুরু হয়েছে। কোথায় কিভাবে সর্বপ্রথম কাপাসের চাষ হয়, এর বিকাশের ধারা, বিভিন্ন দেশের মধ্যে কাপাসের বাণিজ্য ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। ছাত্রদের এইভাবে পড়াতে পড়াতে বিভিন্ন দেশের প্রসঙ্গ এলে সেইসব দেশের ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধেও ছাত্রদের কিছুটা জ্ঞান দেওয়া যায়। বিভিন্ন যুগে কার কার রাজত্বকালে কোন্ কোন্ বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল? কোন্ কোন্ দেশ কাপাস আমদানী করে আর কেনই বা কোন কোন দেশকে কাপড় আমদানী করতে হয়? সব দেশ নিজের প্রয়োজনীয় কাপাস

উৎপাদন করে নিতে পারে না কেন? এর থেকে অর্থ শাস্ত্র ও প্রাথমিক কৃষিবিজ্ঞান এসে যাবে। কাপাসের বিভিন্ন জাতি, কোন্ ধরনের মাটিতে কোন্ কাপাস জন্মায় ও কিভাবে তার চাষ করতে হয় এবং কোথায় কোন্‌টি পাওয়া যায় ইত্যাদির জ্ঞান ছাত্রদের আমি দেব। এইভাবে তকলীতে সূতা কাটা থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সম্পূর্ণ ইতিহাসে চলে যাওয়া যায়। কেন তারা এ দেশে এল, কি-ভাবে তারা আমাদের বস্ত্রশিল্পের ধ্বংসসাধন করল, যে আর্থিক উদ্দেশ্য চালিত হয়ে গোড়ার দিকে তারা এখানে এসেছিল তার পরিপুষ্টির জন্য পরে তারা কেমন করে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল এবং কিভাবে এর কারণ মোগল ও মারাঠা রাজত্বের পতন হয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যের পত্তন হল এবং তারপর কিভাবে আমাদের যুগের জনজাগৃতি এল—এ সবই তকলীতে সূতা কাটাকে কেন্দ্র করে পড়ান যায়। সুতরাং নঈ তালিমের শিক্ষাবিষয়ক সম্ভাবনা অফুরন্ত। আর নিজের মন ও স্মৃতিশক্তির উপর অহেতুক চাপ না দিয়ে অতীব শীঘ্র শিশু এসব শিখবে।

"বিষয়টিকে আরও একটু স্পষ্ট করে বোঝাই। জীববিৎকে যেমন ভাল জীববিৎ হতে হলে জীববিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞানও শিখতে হয়, বনিয়াদী শিক্ষাও (একে যদি বিজ্ঞান বলে মনে করা হয়) তেমনি আমাদের জ্ঞানের অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় নিয়ে যায়। আবার তকলীর উদাহরণ নেওয়া যাক। সূতা কাটার যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর কেবল দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে (শিক্ষককে অবশ্য সূতা কাটায় দক্ষ হতে হবে) জিনিসটির মূল নীতির উপর নজর দিলে তিনি তকলীর বিভিন্ন দিকের তাৎপর্য বুঝতে পারবেন। তকলী কেন লোহার শলাকা ও তামার চাকতির সহযোগে তৈরি হয়—এ প্রশ্ন তাঁর মনে জাগবে। প্রথম যুগে তকলীর চাকতি যেমন তেমন করে তৈরি হত। আরও প্রাচীনকালে তকলী তৈরী হত কাঠের শলা এবং স্লেট বা মাটির চাকতি দিয়ে।

তকলীর বিকাশ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে হয়েছে এবং পিতলের চাকতি ও লোহার বালা ব্যবহার করার পিছনে সঙ্গত কারণ আছে। তাঁকে সেই কারণ আবিষ্কার করতে হবে। তারপর শিক্ষককে মনে মনে চিন্তা করতে হবে যে চাকতির ব্যাস অতটাই কেন—কেনই বা ওর বেশী বা কম নয়। আপনাদের ছাত্ররা যখন সেই প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা করতে পারবে এবং এর গণিত সম্বন্ধে পরঙ্গম হবে তখন তারা সুদক্ষ যন্ত্রবিজ্ঞানীতে পরিণত হবে। তকলী তখন তার কামধেনু হয়ে উঠবে। এর মাধ্যমে যে পরিমাণ জ্ঞান দেওয়া সম্ভব তার কোন সীমা পরিসীমা নেই। আপনাদের উদ্যম ও বিশ্বাসের দ্বারাই কেবল এ সীমিত। আপনারা তিন সপ্তাহ যাবত এখানে আছেন। আপনারা যদি এই শিক্ষা-পরিকল্পনাকে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে থাকেন এবং এর সাফল্যের জন্য যদি "মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতনের" প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে থাকেন তাহলেই এতদিন এখানে থাকা সার্থক হয়েছে।

"সূতা কাটা আমি নিজে জানি বলেই বার বার এর উদাহরণ দিচ্ছি। আমি যদি সূত্রধর হতাম তাহলে কাঠের কাজের মাধ্যমে আমার ছেলেকে এসব বিষয় শেখাতাম অথবা পিজবোর্ডের কারিগর হলে সেই শিল্পের মাধ্যমে।"

গান্ধীজী বলে চললেন, "মৌলিকতা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ই আমাদের কাম্য, সত্যকার প্রেরণার আগুন যাঁদের অন্তরে জ্বলছে। ছাত্রদের তাঁরা কি শেখাবেন সে সম্বন্ধে প্রতিনিয়ত তাঁরা চিন্তা করবেন। মোটা মোটা কেতাবে শিক্ষক এ পাবেন না। শিক্ষককে তাঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার গুণকে কাজে লাগাতে হবে এবং কোন হাতের কাজের মাধ্যমে মুখে মুখে ছাত্রদের শেখাতে হবে। এর অর্থ হল শিক্ষাপদ্ধতিতে বিপ্লব সাধন, শিক্ষকের দৃষ্টিকোণে বিপ্লব সংসাধন। এযাবত আপনারা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের প্রতিবেদনের দ্বারা চালিত হয়েছেন। আপনারা পরিদর্শকদের ইচ্ছানুযায়ী চলতে

চেয়েছেন যাতে আপনাদের বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সাহায্যের বরাদ্দ বাড়ান যায় অথবা নিজেদের বেতন বৃদ্ধি হয়। নূতন ধরণের শিক্ষক কিন্তু এসবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। তিনি বলবেন, 'ছাত্রকে যদি আমি মানুষ হিসাবে উন্নততর করে গড়ে তুলে থাকি তাহলে তার প্রতি আমার কর্তব্য সম্পাদিত হয়েছে মনে করব। আর এই প্রক্রিয়ায় আমার সমগ্র শক্তি আমি নিয়োগ করেছি। আমার পক্ষে এই যথেষ্ট।"

হরিজন, ১৮-২-১৯৩৯

১৯
প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: শিক্ষক-প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণের সময় তাঁদের প্রথমে পৃথক ভাবে হাতের কাজটি শিখিয়ে তারপর সেই হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার যথাযথ পদ্ধতি শেখান কি ভাল নয়? বর্তমান ব্যবস্থায় তাঁদের পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে যে তাঁরা যেন নিজেদের সাত বছরের শিশু বলে মনে করেন এবং কোন হাতের কাজের মাধ্যমে সব বিষয় নূতন করে শেখেন। এই পন্থা অনুসরণ করলে তো নূতন পদ্ধতি শিখে যোগ্য শিক্ষক হতে তাঁদের বহু বছর সময় লেগে যাবে।

উত্তর: না, বহু বছর সময় লাগবে না। ধরে নেওয়া যাক যে শিক্ষক আমার কাছে আসার সময় কাজ চলার মত গণিত ইতিহাস ও অপরাপর বিষয় জানেন। আমি তাঁকে কার্ড বোর্ডের বাক্স তৈরি করতে অথবা সূতা কাটতে শেখান শুরু করলাম। এই কাজ তিনি যখন করছেন তখন আমি তাঁকে দেখিয়ে দিলাম যে সেই বিশেষ হাতের কাজের মাধ্যমে তিনি কিভাবে গণিত ইতিহাস ও ভূগোলের জ্ঞান পেতে পারতেন। এইভাবে নিজের জ্ঞানকে হাতের কাজের সঙ্গে সম্বন্ধিত করার প্রক্রিয়া তিনি শিখলেন। এর জন্য খুব বেশী সময় লাগার কথা নয়। অপর একটি উদাহরণ নিন। ধরুন আমার

সাত বছর বয়সের ছেলের সঙ্গে আমি কোন বনিয়াদী বিদ্যালয়ে যাওয়া আরম্ভ করলাম। দু'জনেই আমরা সূতা কাটা শিখছি এবং আমি আমার পূর্বতন জ্ঞানকে সূতা কাটার সঙ্গে সম্বন্ধিত করতে শিখিলাম। ছেলেটির কাছে সব কিছুই নূতন। আর সত্তর বছর বয়স্ক পিতার কাছে সব কিছুই পুনরাবৃত্তি হলেও তিনি নূতন পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতন জ্ঞান পাবেন। তাই এই নূতন পদ্ধতি শিখতে তাঁর কয়েক সপ্তাহের বেশী সময় লাগার কথা নয়। সুতরাং শিক্ষক যদি আট বছরের বালকের মত গ্রহণশীলতা ও আগ্রহের পরিচয় দিতে না পারেন তাহলে তিনি যান্ত্রিক কাটুনী ছাড়া আর কিছু হতে পারবেন না এবং তাহলে তিনি নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার যোগ্যতাও অর্জন করতে পারবেন না।

প্রশ্ন : প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ কোন ছেলে ইচ্ছা করলে কলেজে যেতে পারে। বনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সমাপ্তকারী কোন ছেলেও কি তা পারবে ?

উত্তর : প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ ও বনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনকারী ছাত্রের মধ্যে দ্বিতীয়োক্ত জন অধিকতর যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কারণ তার বৃত্তিসমূহের সম্যক্ বিকাশ হয়েছে। প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ ছাত্রেরা কলেজে গিয়ে প্রায়ই যেমন অসহায় বোধ করে বনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রের বেলায় তেমন হবে না।

প্রশ্ন : বনিয়াদী বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য ন্যূনপক্ষে সাত বছর বয়স হওয়া চাই স্থির হয়েছে। এই সাত বছর কি পঞ্জিকা মতে না মানসিক বয়স অনুসারে ?

উত্তর : সাত বছর হল গড় ন্যূনতম বয়স। তবে কোন কোন ছাত্র এর চেয়ে বেশী বয়সের এবং কোন কোন ছাত্র কম বয়সেরও হতে পারে। শারীরিক এবং মানসিক—উভয় বয়সের কথাই বিবেচনা করতে হবে। সাত বছর বয়সের কোন শিশুর হয়ত হাতের কাজ করার উপযুক্ত যথেষ্ট দৈহিক বিকাশ হয়েছে। অপর শিশুটি

হয়ত সাত বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও তা পারে না। সুতরাং কোন বাঁধাধরা নিয়ম করা চলে না। এতদসংশ্লিষ্ট সব রকম বিষয়ই বিবেচনা করতে হবে।

গান্ধীজী বলে চললেন, "প্রশ্নগুলির ধরন দেখে মনে হচ্ছে যে আপনাদের মধ্যে অনেকের মনেই নানারকম সন্দেহ আছে। কাজ করার সঠিক পন্থা নয় এ। আপনাদের মনে প্রবল বিশ্বাস থাকা চাই। আমার মত আপনাদের মনেও যদি এই বিশ্বাস থাকে যে একমাত্র বনিয়াদী শিক্ষাই দেশের লক্ষ লক্ষ শিশুকে জীবনের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে তাহলে আপনাদের কাজ সমৃদ্ধ হবে। এ বিশ্বাস না থেকে থাকলে বুঝতে হবে যে আপনাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন গলদ আছে। তাঁরা আপনাদের আর কিছু দিতে পারুন বা না-ই পারুন, এই বিশ্বাস যেন আপনাদের অন্তরে অঙ্কিত করতে সমর্থ হন।"

প্রশ্ন : বনিয়াদী শিক্ষাপরিকল্পনা গ্রামের জন্য। তাহলে শহর-বাসীদের মুক্তির উপায় নেই কি? তাঁদের কি গতানুগতিক পন্থাতেই চলতে হবে?

উত্তর : ...কথা হচ্ছে এই যে আমাদের হাতের গ্রাসটি এমনিতে যথেষ্ট বড়। আমরা যদি সাত লক্ষ গ্রামের শিক্ষাসমস্যার সমাধান করতে পারি তাহলে এখনকার মত যথেষ্ট করা হল বলতে হবে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে শিক্ষাবিদেরা শহরের কথাও চিন্তা করছেন। তবে গ্রামের সঙ্গে শহরের প্রশ্নও যদি আমরা হাতে নিতে যাই তাহলে আমাদের উদ্যম বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : ধরুন কোন গ্রামে তিনটি বিদ্যালয় আছে এবং সেগুলিতে বিভিন্ন হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই তিনটি শিল্পের কোনটির মাধ্যমে যদি অপর দুটির চেয়ে অধিকতর জ্ঞান দানের অবকাশ থাকে তাহলে শিশু এর মধ্যে কোন্‌টিতে যাবে?

উত্তর : এরকম ঘটা উচিত নয়। কারণ আমাদের অধিকাংশ

গ্রামই এত ছোট যে সেখানে একাধিক বিদ্যালয় হতে পারে না। তবে বড় গ্রামে একাধিক বিদ্যালয় থাকতে পারে। তবে এরকম ক্ষেত্রে সব বিদ্যালয়ে একই হস্তশিল্প শেখান হবে। অবশ্য এসম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম আমি করতে চাই না। এসব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাই সবচেয়ে বড় পথপ্রদর্শকের কাজ করবে। বিভিন্ন শিল্পের কতটা জনপ্রিয় হবার ক্ষমতা আছে এবং কোন্‌টি ছাত্রের গুণাবলীর কতটা বিকাশ সাধন করতে পারে তা খতিয়ে দেখতে হবে। আসল কথা হচ্ছে এই যে যে-কোন হাতের কাজই বাছা হক না কেন, তা যেন শিশুদের গুণাবলী সম্পূর্ণভাবে ও সমপরিমাণে বিকশিত করতে সক্ষম হয়। এই শিল্প হবে গ্রামীণ শিল্প এবং নিত্যকার জীবনে তার প্রয়োজনীয়তা থাকবে।

প্রশ্ন : শিশুর ভবিষ্যৎ জীবিকা যখন অন্য কিছু হবে তখন কেন সে কোন হস্তশিল্প শেখার জন্য সাত বছর সময়ের অপব্যয় করবে? অর্থাৎ মহাজনের ছেলেকে ভবিষ্যতে যখন মহাজনীই করতে হবে তখন কেন সে সাত বছর ধরে সূতা কাটা শিখবে?

উত্তর : যদি দেখা যায় যে এক মাস সূতা কাটা শেখানোর পর ছাত্রদের সে বিষয় নীরস মনে হচ্ছে তাহলে যে শিক্ষক সূতা কাটা শেখাচ্ছেন তাঁকে আমি বরখাস্ত করব। যেমন একই বাদ্যযন্ত্র থেকে নূতন নূতন সুর সৃষ্টি হতে পারে তেমনি প্রত্যেকটি পাঠে অভিনবত্ব থাকবে। বার বার ছাত্রকে হাতের কাজ বদল করতে হলে তার অবস্থা হয় গৃহবিহীন শাখা থেকে শাখান্তরে ঝম্প-প্রদানকারী বানরের মত।...বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সূতা কাটা শেখাতে হলে শিক্ষককে সূতা কাটা ছাড়া আরও বহু বিষয় শিখতে হয়। শীঘ্রই ছাত্রকে নিজের তকলী ও পরেতা তৈরি করে নেওয়া শেখাতে হবে। সুতরাং আমার প্রথমের বক্তব্যের পুনরুক্তি করে বলব যে শিক্ষক যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি চালিত হয়ে হস্তশিল্পকে গ্রহণ করেন তাহলে নিজের ছাত্রদের

সঙ্গে তিনি নানা মাধ্যমে কথা বলবেন এবং সেগুলির সব কয়টিই ছাত্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিপোষক হবে।

হরিজন, ৪-৩-১৯৩৯

২০
বাধ্যতামূলক সূতা কাটা

"প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবং জনসাধারণকে আপনি যদি এই মর্মে বাণী বা নির্দেশ দেন যে তাঁরা যেন প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের পক্ষে সূতা কাটা ও কাপড় বোনা বাধ্যতামূলক করেন, তাহলে আমার কোন সন্দেহ নেই যে অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা নিজেদের হাতে তৈরি কাপড় পরবে। এটা হবে প্রথম পদক্ষেপ। আপনার আদর্শে আমি বিশ্বাস হারাই নি। আমি এই আশা পোষণ করি যে প্রতিটি কুটিরে নিজ প্রয়োজনীয় বস্ত্র উৎপন্ন হবে এবং আপনার গ্রামোদ্যোগ ও নয়ী তালিমের পথ গ্রহণ করে প্রতিটি গ্রাম কেবল বস্ত্রেই স্বাবলম্বী হবে না, জীবনধারণোপযোগী অন্যান্য জিনিসেও স্বাবলম্বী হবে।..."

জনৈক কংগ্রেসী মন্ত্রী উপরোক্ত মর্মে লিখেছেন। আমার যদি কোন স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রনায়কের ক্ষমতা থাকত তাহলে অন্ততঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমি সূতা কাটাকে বাধ্যতামূলক করতাম। সূতা কাটার উপর যে মন্ত্রীর বিশ্বাস আছে তিনি অন্ততঃ এরকম করবেন। আমাদের বিদ্যালয় সমূহে বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে বাধ্যতামূলক করা হয়। তাহলে এই অতি প্রয়োজনীয় হস্তকলাকে কেন বাধ্যতামূলক করা হবে না? তবে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় না হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন কিছুকে বাধ্যতামূলক করা যায় না। সুতরাং গণতন্ত্রে বাধ্যতামূলক কেবল কথার কথা। গণতন্ত্রের আওতায় বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অলসতা দূর করে, কাউকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে বাধ্য করে না। এই রকম বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা শিক্ষার অঙ্গ। তবে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে আমি একটি অপেক্ষাকৃত মৃদু ব্যবস্থাপত্র দেব। সেরা কাটুনীকে যেন পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা

থাকে। এর আকর্ষণে সবাই না হলেও অধিকাংশ ছাত্রই সূতা কাটার প্রতি আকৃষ্ট হবে। তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আস্থা না থাকলে কোন পরিকল্পনাই কার্যকরী হবে না। প্রাদেশিক সরকারগুলি যদি বনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করে থাকেন তাহলে সূতা কাটা ও তার আনুসঙ্গিক সবকিছু কেবল পাঠ্যক্রমের অঙ্গ নয়, এসব শিক্ষার মাধ্যমরূপে স্বীকৃত। আর বনিয়াদী শিক্ষা যদি দৃঢ়মূল হয় তাহলে আমাদের এই দরিদ্র দেশে খদ্দর নিঃসন্দেহে সর্বব্যাপক ও অপেক্ষাকৃত সস্তা হবে।

হরিজন, ১৪-১০-১৯৩৯

২১

মধ্যপ্রদেশের দৃষ্টান্ত

গত সপ্তাহে মধ্যপ্রদেশ ও বেরার-এর স্বায়াত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয়েছিল। সম্মেলনে গান্ধীজী বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সম্মেলনের জনৈক সদস্য একটি সাধারণ প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং গান্ধীজীর বক্তৃতা তার জবাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রশ্নটি হল ঃ বনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনার দ্বারা কিভাবে দেশের আর্থিক এবং রাজনৈতিক প্রগতি হতে পারে?

গান্ধীজী বললেন, "আপনারা আমাকে এই প্রশ্ন করায় আমি সুখী হয়েছি। এই প্রশ্নের উদারদান প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে আমি বলতে চাই যে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা দেশের আর্থিক প্রগতি সম্বন্ধে কোনরকম বিচার-বিবেচনা না করেই প্রবর্তিত হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে যে ব্যয় হচ্ছে তার প্রতিদানে রাষ্ট্র কিছুই পাচ্ছে না। তথাকথিত উচ্চশিক্ষার সৃষ্টিরূপে অভিহিত শুক্লাজীর (তদানীন্তন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী) মত কিছু সংখ্যক প্রশাসক পাই বলে প্রাথমিক শিক্ষা খাতের অপব্যয়ের সমর্থন করা যায় না। এ জাতীয় ঘটনা বেদনাদায়ক ভাবে এই সত্য প্রমাণ করে যে ইংরাজী ডিগ্রী

অথবা ইংরাজী জ্ঞান না থাকলে আমরা ভারতবর্ষের কাজকর্ম চালাতে পারি না। শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তারা স্বীকার করেছেন যে বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচণ্ড অপব্যয়ের নিদর্শন, অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণী পর্যন্ত যেতে পারে, অক্ষরজ্ঞান দেবার যে প্রচেষ্টা হয় তার দ্বারা কোন স্থায়ী ফল হয় না এবং আজও বিশাল গ্রামাঞ্চলের এক সামান্য ভগ্নাংশই এই প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ প্রশ্ন তোলা যায় যে মধ্যপ্রদেশের শতকরা কয়টি গ্রামে এই প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে? আর যে কয়টি গ্রামে আছে তার দ্বারা গ্রামের কতটুকুই বা উপকার হচ্ছে?

"সুতরাং আপনারা আমাকে যে প্রশ্ন করেছেন তা ওঠার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু নূতন পরিকল্পনা সুদৃঢ় আর্থিক বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত ; কারণ সব স্তরে শিক্ষা কোন না কোন হাতের কাজের মাধ্যমে দেওয়া হবে। এর অর্থ শিক্ষা এবং একটি হাতের কাজের প্রশিক্ষণ নয়, এ হোল হাতের কাজের মাধ্যমে সব রকমের শিক্ষা। সুতরাং তাঁতের মত হস্তশিল্পের মাধ্যমে যে ছাত্র শিক্ষালাভ করবে নিঃসন্দেহে সে পেশাদার তাঁতীর চেয়ে ভাল বস্ত্রবয়নকারী হবে। আর কেউ নিশ্চয় একথা বলবেন না যে তাঁতী আর্থিক দৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয়। এই তাঁতী তাঁত ও বস্ত্রবয়ন সংক্রান্ত সব রকমের যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক্ ভাবে জানবেন এবং যে-কোন তাঁতের কারিগরের চেয়ে ভাল ফল দেখাবেন। নূতন প্রথায় গত কয়েক মাসে যে কাজ হয়েছে তার আর্থিক পরিণাম সম্বন্ধে শ্রীমতী আশা দেবী তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সেই তথ্য দেখলে বোঝা যাবে যে আমাদের আশাতীত ফললাভ হয়েছে। স্বাবলম্বী শিক্ষা বলতে আমি এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা বুঝি। স্বাবলম্বী শব্দটি ব্যবহার করার সময় আমি একথা বলতে চাই না যে বিদ্যালয়ের মূলধনী ব্যয় শিক্ষার প্রক্রিয়ায় উপার্জিত হবে। আমার বক্তব্য এই

যে অন্ততঃ শিক্ষকদের বেতন যেন ছাত্রদের দ্বারা উৎপন্ন পণ্যের আয়ে দেওয়া চলে। সুতরাং বনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির আর্থিক দিক স্পষ্ট।

"এর পর দ্বিতীয় দিক অর্থাৎ জাতীয় জাগরণের কথা ওঠে। গ্রামীণ শিল্প সম্বন্ধে কুমারাপ্পা কমিটির প্রতিবেদন আপনারা পড়েছেন কি না জানি না। ভারতবর্ষের মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ৭০ টাকা বলে বলা হয়। কিন্তু কুমারাপ্পা প্রমাণ করেছেন যে মধ্যপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ১২ থেকে ১৪ টাকার বেশী নয়। বনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সূতা কাটা ও অন্যান্য যেসব শিল্প নির্বাচন করা হয়েছে তা গ্রামবাসীদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। সুতরাং গ্রামীণ শিল্পের মাধ্যমে যেসব বালক শিক্ষা পাবে তারা তাদের ঘরে নিজেদের জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে পারবে। আপনারা তাই দেখতে পাচ্ছেন যে গ্রামীণ শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারলে গ্রামবাসীদের গড় আয় সহজেই দ্বিগুণ করা যায়। আপনারা যদি জনসাধারণের সেবক হন এবং নূতন শিক্ষাপরিকল্পনার সঙ্গে নিজেদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করেন তাহলে জেলা বোর্ডের অধিকাংশ দলাদলি ও ঝগড়াঝাটির অবসান হবে। এই সভায় আসার পূর্বে আমি বিদ্যালয় থেকে একটি পত্র পেয়েছি। পত্রে জানান হয়েছে যে সেখানকার ছেলেরা ৩০ দিন ৪ ঘণ্টা হিসাবে সূতা কেটে ৭৫ টাকা কয়েক পয়সা উপার্জন করেছে। ৩০ জন ছাত্র মাসে যদি ৭৫ টাকা রোজগার করে থাকে তাহলে আপনারা হিসাব করলে সহজেই জানতে পারবেন যে ভারতবর্ষের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের কোটি কোটি ছাত্র কত টাকা রোজগার করবে।

"এছাড়া এইসব শিশুদের ভিতর আত্মবিশ্বাস ও সহস্রবুদ্ধির বৃত্তি জেগে উঠবে এবং তারা জমির আয়ের বৃদ্ধিসাধন করছে ও অসম বণ্টনের সমস্যার সমাধান করছে বলে মনে করবে। এর পরিণাম কী হতে পারে আপনারা চিন্তা করুন। এর পরিণামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হবে। আমি চাই যে

আমাদের শিশুরা স্থানীয় ব্যাপার সম্বন্ধে সবকিছু জানুক—দুর্নীতির কারণ ও তার নিরাকরণের উপায় সম্বন্ধেও তারা সচেতন হক। আমি চাই যে দেশের সব শিশু এই জাতীয় রাজনৈতিক শিক্ষা পাক। এর ফলে নিঃসন্দেহে তাদের ব্যক্তিত্ব কিছু পরিমাণে সমৃদ্ধ হবে।

"মূলধনী ব্যয় সম্বন্ধে একটি কথা বলব। আপনাদের যে মূলধনী ব্যয় করতে হবে ঘর বাড়ীর খাতে খরচের মত তা ডাহা লোকসান হবে না। এমন যন্ত্রপাতি ও মালমশলার জন্য এ খরচ হবে যা কয়েক বছর পর্যন্ত উৎপাদনমূলক কাজে লাগবে। যেসব চরখা তাঁত ও ধুনকী কেনা হবে তা ছাত্রদের একাধিক দল ব্যবহার করতে পারবে। দেশকে যন্ত্রশিল্পে অধ্যুষিত করতে হলে প্রভূত মূলধনী ব্যয় করতে হয় এবং যন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতির খাতেও বহু ব্যয় হয়ে থাকে। বর্তমান পরিকল্পনায় এ জাতীয় কোন ব্যয়ের প্রস্তাব নেই। প্রত্যুত সুপরিকল্পিত গ্রামীণ অর্থনীতিতে এ জাতীয় ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা নেই।

"সর্বোপরি আমি আপনাদের এই কথা বলতে চাই যে আপনাদের বিশ্বাস ও দৃঢ়তার উপর সবকিছু নির্ভর করে। আপনাদের মনে ইচ্ছা থাকলে নিশ্চয়ই একটা পথ বেরোবে। আপনাদের মনে যদি এই পরিকল্পনাকে সফল করার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তাহলে সকল বাধা বিপত্তি অপসারিত হবে। কেবল এই বিশ্বাস যেন জীবন্ত বিশ্বাস হয়। হাজার হাজার লোক মুখে বলে থাকেন যে ঈশ্বরের উপর তাঁদের বিশ্বাস আছে কিন্তু সামান্যমাত্র বিপদের আশঙ্কাতেই তাঁরা পালাতে আরম্ভ করেন। তাঁদের ঈশ্বর-বিশ্বাস মৃত, জীবন্ত বিশ্বাস নয়। জীবন্ত বিশ্বাস মানুষকে তার পরিকল্পনা সফল করার উপযুক্ত জ্ঞান ও সঙ্গতিতে সমৃদ্ধ করে।..."

হরিজন, ২৮-১০-১৯৩৯

২২
তকলী বনাম খেলনা

প্রশ্ন : বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনায় তকলীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রবর্তন করার কারণ কি? শুধু আর্থিক অর্থাৎ স্বাবলম্বী হবার দৃষ্টিকোণ থেকে তকলী চালান হবে, না শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে?

উত্তর : বুনিয়াদী শিক্ষার কর্মসূচির ভিতর সন্নিবিষ্ট প্রত্যেকটি জিনিসের পিছনে একটিমাত্র দৃষ্টিকোণ থাকে এবং এর নাম হচ্ছে শিক্ষা। বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে হস্ত-কর্মকে মাধ্যম করে শিশুর দৈহিক, বৌদ্ধিক এবং নৈতিক বিকাশ করা। অবশ্য আমি একথাও বলব যে, শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রটীশূন্য যে-কোন পরিকল্পনা দক্ষতা সহকারে কার্যান্বিত হলে, তার পরিণামে আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তা কর্মকুশল বলে সপ্রমাণ হবে। উদাহরণ স্বরূপ শিশুদের ক্ষণভঙ্গুর খেলনা বানানোর কথা বলা যেতে পারে। এর দ্বারাও তাদের বুদ্ধির বিকাশ হবে। কিন্তু এভাবে কাজ করলে এক মহান্ নৈতিক আদর্শকে উপেক্ষা করা হবে। মানুষের পরিশ্রম এবং তৎলব্ধ সামগ্রী ব্যর্থ নষ্ট হওয়া উচিত নয় ও অনুৎপাদক পদ্ধতিতে তার ব্যবহার হওয়াও উচিত নয়—এই আদর্শ এর ফলে পদদলিত হয়। উত্তম নাগরিক সৃষ্টি করার শিক্ষার উপায় হচ্ছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উপযোগী কার্যে অতিবাহিত করা। এই জাতীয় বনিয়াদী শিক্ষা অনায়াসে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল।

হরিজন, ৬-৪-১৯৪০

২৩
সূতাকাটা ও চরিত্র গঠন

হুবলী সেট্‌লমেণ্টের অনুমোদিত বিদ্যালয়সমূহের মহিলা সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট শ্রীমতী ব্রিস্কো আমাকে নিম্নোদ্ধৃত সুন্দর চিঠিখানি পাঠিয়েছেন :

"আমাদের অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলিতে সূতা কাটার যে কাজ হচ্ছে সে সম্বন্ধে আপনাকে জানাবার জন্য অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

১। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী আমরা সূতা কাটার বর্গ খুলি।

২। ছেলেদের বয়স ১৪ থেকে ১৬-এর ভিতর এবং তারা কী রকম আগ্রহ সহকারে এ কাজ করেছে তা দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেছি।

৩। এর আগে তারা ঐ সময়ে কোন কাজকর্ম না করে চুপচাপ বসে থাকত কারণ বেশী পয়সা খরচ করে কোন শিল্প শুরু করার সঙ্গতি আমাদের ছিল না। সূতা কাটা প্রবর্তন করার পর তাদের বেশ খুশী মনে হচ্ছে এবং সাগ্রহে তারা এ কাজ করছে। এ কাজ ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছা তাদের মধ্যে আছে বলে মনে হচ্ছে না।

৪। বর্তমানে তারা দিনে পাঁচ ঘণ্টা পরিশ্রম করে দুই আনা থেকে সোয়া দুই আনা রোজগার করছে। সূতা কাটার কাজ আরম্ভ করার জন্য যেটুকু আগাম খরচ হয়েছিল তারা এখন ধীরে ধীরে তা শোধ করে দিচ্ছে। এ ছাড়া তাদের হাতেও অল্প কিছু দেওয়া হয় এবং বাদ বাকী তাদের নামে জমা থাকে। তারা এই বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাবার সময় এই জমা পয়সা তাদের দিয়ে দেওয়া হবে। ছেলেদের মধ্যে সূতা কাটা খুবই সফল হওয়ায় আমরা এবার মেয়েদের অনুমোদিত বিদ্যালয়ে অপেক্ষাকৃত বয়স্কদের মধ্যে এর প্রবর্তন করছি। আমাদের মনে হল এ খবর পেলে আপনি সুখী হবেন, তাই এই চিঠি আপনাকে লিখছি ও যেসব ছেলেরা সূতা কাটে তাদের একটি আলোক-চিত্র আপনাকে পাঠাচ্ছি। ছেলেদের কেমন হাসিখুশী দেখাচ্ছে তা দেখে আপনি নিশ্চয় তাদের তারিফ করবেন।"

সূতা কাটার আকর্ষণীয় প্রভাব সম্বন্ধে পূর্বোক্ত পত্রে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমি আশা করি শ্রীমতী ব্রিস্কো তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রগতি সম্বন্ধে আমাকে মাঝে মাঝে লিখবেন।

হরিজন, ৪-৮-১৯৪০

২৪

মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যান

সরকারী কর্মচারীদের বনিয়াদী শিক্ষার বিরুদ্ধে অবিবেচনা-প্রসূত প্রতিকূল সমালোচনার মরুভূমির মধ্যে বনিয়াদী বিদ্যালয় সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত প্রশংসাসূচক মন্তব্যটি পেয়ে আনন্দ হল। প্রশংসাজ্ঞাপক পত্রটি বিহারের ছোটলাট সাহেবের পরামর্শদাতা শ্রীযুক্ত কাজিনস হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত আর্যনায়কমের কাছে পাঠিয়েছেন :

"...বৃন্দাবন-রামাপুরায় ৬টি ও চৌবেটোলা-পারুলিয়ায় ১২টি অর্থাৎ মোট ২৭টির মধ্যে ১৮টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ আমার হয়েছিল এবং সেই সব বিদ্যালয়ে আমি যা দেখেছি তার দ্বারা খুবই আকৃষ্ট হয়েছি। অবশ্য সপ্তম মান পর্যন্ত পুরো না দেখলে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে যথাযথ বিচার করতে পারব না। তবে বিদ্যালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং যেরকম আনন্দ সহকারে তারা কাজ করে তা দেখে আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জেগেছে যে আমরা সঠিক পন্থায় চলছি এবং চৌদ্দ বছর বয়স্ক যে ছেলে বনিয়াদী শিক্ষার সম্পূর্ণ পাঠ গ্রহণ করেছে সে অনুরূপ বয়সের সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের তুলনায় কোন অংশে ন্যূন নয়।

বনিয়াদী বিদ্যালয় সম্বন্ধে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এবং যে বিষয়টির উপর আমি সর্বাধিক জোর দিতে চাই তা হল এই যে বিদ্যালয়গুলি গ্রামবাসীদের শুভেচ্ছা ও সাগ্রহ সমর্থন অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। যতক্ষণ এই শুভেচ্ছা ও আগ্রহ থাকবে ততক্ষণ এ পদ্ধতি সফল না হয়ে যায় না। চৌবেটোলা-পারুলিয়ার গ্রামবাসী ও জমির মালিকেরা বিদ্যালয়ের জন্য চমৎকার একটি খেলার মাঠ ছেড়ে দিয়ে এবং বিদ্যালয়ের জন্য রাস্তা করে দিয়ে ও স্কাউটদের (এত বড় স্কাউটের দল আমি কদাচিৎ দেখেছি) জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিয়ে যে সমাজ-সেবামূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিশেষ করে গ্রামের ছেলেদের নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে আসতে প্রবুদ্ধ করার

ব্যাপারটিও অতীব প্রশংসার্হ। শুনেছি অন্য যেসব বিদ্যালয় দেখে উঠতে পারি নি সেখানেও এমনি জনসমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে গ্রামবাসীদের এই প্রচেষ্টার ফল খুব ভাল হবে এবং প্রচলিত অর্থে শিক্ষা পাওয়া ছাড়াও ভবিষ্যতে গ্রামের ছেলেরা বিদ্যালয়ে এমন মানসিক তৎপরতা শারীরিক দক্ষতা স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে যোগ্যতা অর্জন করবে যার ফলস্বরূপ ভবিষ্যতে গ্রামগুলি আরও স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি ও জ্ঞানের আকর হবে।"

হরিজন, ২২-২-১৯৪২

২৫

হাতের কাজের সপক্ষে

শ্রীনরহরি পারিখ লিখেছেন ঃ

"আমার মনে হয় যে আমাদের বহু খাদি ও অন্যবিধ বিদ্যালয়ে সাহিত্যকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর যে জোর দেওয়া হয় তা একেবারে ভুল। শিল্প ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য সময় পৃথক পৃথক করা থাকলেও বিদ্যালয়ে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে কেবল বই পড়লেই জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। আমি মনে করি যে বই-এর তুলনায় হাতের কাজের মাধ্যমে আমাদের ছাত্ররা বেশী জ্ঞান পেতে পারে। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত ব্যক্ত করলে আমি কৃতজ্ঞবোধ করব।"

লেখকের অভিযোগ যুক্তি-যুক্ত। সর্বদা সাহিত্যকেন্দ্রীক শিক্ষার অর্থ বুদ্ধির বিকাশ নয়। মূলতঃ একটা মুখস্ত করার ব্যাপার। যে-কোন ছবির মত শিশুর মস্তিষ্কে অক্ষরেরও ছাপ পড়ে। তবে সাহিত্যকেন্দ্রীক শিক্ষা নিছক পড়ার চেয়ে কিছু বেশী। হাতের কাজের বেলায়ও এ কথা খাটে। হস্তশিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান কেবল সেই বিশেষ শিল্পটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর বিজ্ঞানের জ্ঞানও এর অন্তর্ভুক্ত। এ হলে উচ্চ বিদ্যালয় বা কলেজের চেয়েও ছাত্রের বুদ্ধির বিকাশ বেশী হয়। সুতরাং হাতের কাজের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন অথবা বিদ্যালয়ের কর্মসূচিতে একে গৌণ স্থান দেওয়া খুবই খেদজনক ব্যাপার। এরকম হলে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের ব্যাপারে হাতের কাজের

ভূমিকা সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে সম্যক্ ধারণা জন্মাবে না। কেতাবী শিক্ষা চোখের ক্ষতি করে এবং চিন্তা ও মৌলিকতাকে করে ব্যাহত। হাতের কাজ ও তার বিজ্ঞান শিক্ষায় এরকম বিপদের কোন আশঙ্কা নেই। এর জন্যও অবশ্য কিছুটা বইপত্র পড়তে হয়। কিন্তু এই পড়া হাতের কাজের সঙ্গে সম্বন্ধিত এবং সেইজন্য এ পড়ার সময় বুদ্ধি খাটাতে হয়। বনিয়াদী প্রশিক্ষণ বলতে আমি এই বুঝি। কালে নিশ্চয় এ যথার্থ স্বরূপ গ্রহণ করবে—কারণ এ অতীব সত্য। তবে ইতিমধ্যে কেতাবী শিক্ষা ও শিল্পশিক্ষার মধ্যে যেন কোন পার্থক্য করা না হয়। শিল্পশিক্ষাকে যেন শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিবেচনা করা হয় এবং অপর যে-কোন বিষয়ের সমান মর্যাদা একে দেওয়া হয়। অন্ততঃ জাতীয় বিদ্যালয়সমূহে যেন এই সুস্পষ্ট সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

হরিজন, ৫-৪-১৯৪২

২৬

হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা

শ্রীমতী আশাদেবী নিম্নলিখিত চিত্তাকর্ষক পরিসংখ্যানগুলি পাঠিয়েছেন :

"বিহারের চম্পারণ জেলার বেতিয়া থানার অন্তর্ভুক্ত ছোট সখন এলাকার ২৭টি বনিয়াদী বিদ্যালয়ের ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিন বছর পূর্ণ হবে। এই সব বিদ্যালয়ের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ১৯৪১-৪২ খ্রীস্টাব্দের আর্থিক চার্ট বনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রের সব কর্মিদের কাছে উৎসাহব্যঞ্জক মনে হবে। চার্টটি বনিয়াদী শিক্ষার মাসিক মুখপত্র "নয়ী তালিম" পত্রিকায় সবিস্তারে প্রকাশিত হবে। এখানে বনিয়াদী শিক্ষার প্রগতি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুদের জন্য আমরা তার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম সঙ্কলন করে দিচ্ছি। ২৭টি বিদ্যালয়ের গড় উপস্থিতি প্রথম শ্রেণীতে শতকরা ৭০, দ্বিতীয় শ্রেণীতে শতকরা ৭৬ এবং তৃতীয় শ্রেণীতে শতকরা ৭৯। গড় ব্যক্তিগত উপার্জন প্রথম শ্রেণীতে ৬৮ পয়সা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২ টাকা ২৬

পয়সা ও তৃতীয় শ্রেণীতে ৬ টাকা ৬ পয়সা। সবগুলি বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ৩৯০ জন (গড় উপস্থিতির ভিত্তিতে নিধারিত সংখ্যা) ছাত্রের মোট ১০২৬৪ ঘণ্টা কাজের সাকুল্য আয় হয় ২৬৭ টাকা ৫৩ পয়সা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৩৫৬ জন (গড় উপস্থিতির ভিত্তিতে নির্ধারিত সংখ্যা) ছাত্রের মোট ১৪০৮২ ঘণ্টার কাজের আয় হয় ৮০৪ টাকা ৮৫ পয়সা, তৃতীয় শ্রেণীর ৩১৯ জন (গড় উপস্থিতির ভিত্তিতে নির্ধারিত সংখ্যা) ছাত্রদের মোট ১৪৩৬২ ঘণ্টার কাজের আয় হয় ১৯৩৫ টাকা ৯৩ পয়সা। অর্থাৎ ১০৬৫জন ছাত্রের সমগ্র বৎসরের মোট রোজগার হল ৩০০৮ টাকা ৩১ পয়সা। বিদ্যালয়গুলিতে গড় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত উপার্জন তৃতীয় শ্রেণীতে ১৫ টাকা ৭৫ পয়সা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৬ টাকা ১২ পয়সা প্রথম শ্রেণীতে ২ টাকা ৬৩ পয়সা। চরখা ও তকলীর গড় সর্বোচ্চ গতি তৃতীয় শ্রেণীতে ঘণ্টায় যথাক্রমে ৪৮০ ও ২৮১ তার, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৩৫০ ও ২৪২ তার। প্রথম শ্রেণীতে তকলীর গড় সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১৬৪ তার।"

উৎপাদন ও রোজগারের পরিসংখ্যানের নিজস্ব মূল্য থাকলেও এখানে কেবল তাই দেখানর জন্য পূর্বোক্ত পরিসংখ্যানগুলি দেওয়া হয় নি। শিক্ষার উৎপাদন ও উপার্জনের স্থান গৌণ। যুবসম্প্রদায়কে প্রশিক্ষিত করার ব্যাপারে হস্তশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত পরিসংখ্যান প্রদত্ত হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট যে পরিশ্রম ও যত্ন না করলে এবং খুঁটিয়ে নজর না দিলে এমন সুন্দর কাজ করা যেত না।

২৭

কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল ও বনিয়াদী শিক্ষা

২৯শে ও ৩০শে জুলাই পুণায় বালাসাহেব খের-এর আমন্ত্রণে এবং তাঁর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের শাসনাধীন প্রদেশসমূহের শিক্ষা-মন্ত্রীরা এক সম্মেলনে মিলিত হন। সকল প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীদেরই আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। ২৯শে বিকেলে এক ঘণ্টার জন্য গান্ধীজী উপস্থিত ছিলেন।

করামুক্তির পর ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে তালিমী সঙ্ঘের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের সময় গান্ধীজী তাঁদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে ছিলেন যে বনিয়াদী শিক্ষার পরিধিকে বিস্তৃততর করার সময় এসে গেছে। উত্তর বনিয়াদী এবং পূর্ব বনিয়াদী শিক্ষাকেও বনিয়াদী শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বনিয়াদী শিক্ষাকে যথার্থ ই সমগ্র জীবনের শিক্ষা হতে হবে। পুণা সম্মেলনেও গান্ধীজী সেইখান থেকেই আরম্ভ করলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী সম্মেলনে উপস্থিত মন্ত্রীবর্গের কাছে বনিয়াদী শিক্ষার এই ব্যাপ্তির গতি-প্রকৃতি ও সেই উদ্দেশ্যসাধনে তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করলেন···

"আমি যদি মন্ত্রী হতাম"

গান্ধীজী বললেন যে কি করতে হবে সে সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট ধারণা আছে কিন্তু কেমন ভাবে করতে হবে সে সম্বন্ধে তাঁর ঠিক জানা নেই। এযাবত ছকে দেওয়া পথে তাঁরা চলেছেন কিন্তু এবার অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিতে হবে। তিনি তাঁদের অসুবিধার কথা জানেন। পুরাতন পদ্ধতিতে যিনি মানুষ তাঁর পক্ষে এক মুহূর্তে তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। —আমি যদি মন্ত্রী হতাম তবে আমি এই মর্মে বিশেষ নির্দেশ জারী করতাম যে ভবিষ্যতে সরকারের সঙ্গে সম্বন্ধিত শিক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম বনিয়াদী শিক্ষার পদ্ধতি অনুসারে চলবে। কয়েকটি প্রদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা দেবার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। আমার ক্ষমতা থাকলে আমি এ কার্যও কোন বনিয়াদী কারুশিল্পের মাধ্যমে চালাতাম। আমার মতে সূতা কাটা ও তৎসংশ্লিষ্ট হস্তকর্ম এর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প বলে সিদ্ধ হবে। তবে কোথায় এর ভিতর কোন্ শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে, সে কথা নির্ণয় করার ভার আমি স্থানীয় কর্মীর উপরই ছেড়ে দেব। কারণ আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, যে শিল্পের ভিতর প্রয়োজনীয় উৎকর্ষ থাকবে, শেষ পর্যন্ত

সেই শিল্পই টিঁকে থাকবে। স্কুলসমূহের পরিদর্শক মহাশয় এবং শিক্ষাবিভাগীয় অন্য সব উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কর্তব্য হবে শিক্ষকদের কাছে গিয়ে প্রেমপূর্বক সরকারী শিক্ষা-বিভাগের নবীন নীতির মূল্য ও তার সম্ভাব্য সুফল যুক্তি দিয়ে তাঁদের বোঝান। এর জন্য জবরদস্তী কখনই করা উচিত নয়। এ নীতির প্রতি যদি তাঁদের শ্রদ্ধা না থাকে বা তাঁরা যদি সততা সহকারের এই কর্মসূচিকে রূপ দিতে অনিচ্ছুক হন, তাহলে আমি তাঁদের ইস্তফা দিয়ে চলে যাবার অধিকার দেব। কিন্তু মন্ত্রী যদি নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হন এবং এই নীতিকে বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যান্বিত করার প্রচেষ্টা করেন, তাহলে এর প্রয়োজন ঘটবে না। কেবল হুকুম জারী করলে কাজ হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

বয়স্কদের শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যাপারেও ঐ একই কথা খাটে। ভারতবর্ষের মাটীর সঙ্গে এর জীবন্ত সম্পর্ক থাকা চাই। সুতরাং এ হবে বনিয়াদী শিক্ষার পরবর্তী অধ্যায় ও এরই সম্প্রসারণ। এই হল মূল কথা। এ বিষয়ে তাঁরা যদি গান্ধীজীর সঙ্গে পূর্ণ মাত্রায় সহমত না হন তাহলে তাঁর পরামর্শের বিশেষ দাম হবে বলে মনে হয় না।

পক্ষান্তরে তাঁরা (মন্ত্রীরা) যদি তাঁর সঙ্গে সহমত হন যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রচলিত শিক্ষা ছাত্রদের স্বাধীনতার উপযুক্ত করার পরিবর্তে তাদের দাসত্ব নিগড়ে আবদ্ধ করছে, তাহলে মন্ত্রীরা তাঁরই মত প্রচলিত শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে জাতীয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে শিক্ষার পুনর্গঠন করার জন্য তাঁরই মত ব্যগ্র হয়ে উঠতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা আজকে হয় সরকারী চাকরীর কাঙাল আর নচেৎ ভ্রান্ত পথে পড়ে নিজেদের হতাশার অভিব্যক্তির জন্য অশান্তি সৃষ্টি করে। তারা এমন কি ভিক্ষা করতে

বা অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকতে লজ্জা বোধ করে না। এই রকম দয়নীয় দশার মধ্যে আজকের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ছাত্ররা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য হবে দেশের সত্যকার সেবক সৃষ্টি করা যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনধারণ করবে ও প্রাণ দেবে। এইজন্য তিনি মনে করেন যে তালিমী সঙ্ঘ থেকে অধ্যাপক গ্রহণ করে বনিয়াদী শিক্ষার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সমন্বয় সাধন করতে হবে।

জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রীরা তাঁদের পদ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং জনসাধারণকে স্বমতে দীক্ষিত করতে না পারলে তাঁদের কর্তৃত্ব পরিষদ গৃহের চার দেওয়ালের বাইরে যাবে না। বোম্বাই ও আহমেদাবাদে আজ যা ঘটছে তার তাৎপর্য যদি এই হয় যে জনসাধারণের উপর থেকে কংগ্রেসের প্রভাব চলে গেছে তাহলে একে এক বিপজ্জনক লক্ষণ বলতে হবে। নয়ী তালিম এখনও কচি চারাগাছ হলেও এর বিপুল সম্ভাবনা বিদ্যমান। গণসমর্থন না পেলে কেবল মন্ত্রীদের পরোয়ানার বলে বনিয়াদী শিক্ষা চলবে না। সুতরাং মন্ত্রীরা যদি তাঁদের শিক্ষানীতির সমর্থনে গণসমর্থন না পান তাহলে গান্ধীজী তাঁদের পদত্যাগ করার পরামর্শ দেবেন। অরাজকতাকে তাঁরা যেন ভয় না পান। তাঁদের কর্তব্য হল নিজ বিবেকের নির্দেশে নিজ কর্তব্য পালন করা ও বাদবাকী সব ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দেওয়া। জনসাধারণ ঐ জাতীয় অরাজকতার অভিজ্ঞতারও মাধ্যমেও যথার্থ স্বাধীনতার পাঠ পাবে।

হরিজন, ২৫-৮-১৯৪৬

২৮

মন্ত্রীদের সম্মেলনে

প্রশ্ন : স্বাবলম্বনের ভিত্তি বর্জন করে কি বনিয়াদী শিক্ষা চালান যায়?

উত্তর : আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তবে

যদি আমার মতামত জিজ্ঞাসা করেন তাহলে বলব যে স্বাবলম্বনের ভিত্তি বর্জন করার পরিস্থিতি এলে বরং বনিয়াদী শিক্ষার কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। স্বাবলম্বন অবশ্য কোন স্বতঃসিদ্ধ শর্ত নয়। তবে আমার কাছে এ হল বনিয়াদী শিক্ষার অগ্নি-পরীক্ষা। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে বনিয়াদী শিক্ষা শুরু থেকেই স্বাবলম্বী হবে। বনিয়াদী শিক্ষার সাত বছরের হিসাব একসঙ্গে ধরলে আয় ব্যয় সমান সমান হওয়া উচিত। নচেৎ তার অর্থ এই হয়ে দাঁড়াবে যে শিক্ষা সমাপ্ত হবার পরও বনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্ররা জীবনের উপযুক্ত হবে না। এ অবস্থা বনিয়াদী শিক্ষার অস্বীকৃতির সমতুল্য। সুতরাং স্বাবলম্বন-বিহীন বনিয়াদী শিক্ষা নিষ্প্রাণ দেহের মত।

প্রশ্ন ঃ কোন বনিয়াদী হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার নীতি আমরা গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু মুসলমানেরা কেন জানি চরখার বিরুদ্ধে। যেসব এলাকায় তূলা উৎপন্ন হয় সেখানকার জন্য সূতা-কাটার উপর আপনি যে জোর দেন তা হয়ত ঠিক। তবে আপনি কি মনে করেন না যে যেসব এলাকায় তূলা জন্মায় না সে সব এলাকায় সূতা কাটার উপর জোর দেওয়া অপ্রয়োজনীয়? সেই সব জায়গার জন্য কৃষির মত অন্য কোন শিল্প প্রবর্তন করা উচিত নয় কি?

উত্তর ঃ এ অতি পুরাতন প্রশ্ন। যে-কোন বনিয়াদী হস্তশিল্পকে শিক্ষার মাধ্যম হতে হলে বিশ্বজনীন হতে হবে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দেই আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে তার কুটীরে কুটীরে চরখার গুঞ্জন তুলতে হবে। ইংলণ্ড একমুঠো তূলোও উৎপাদন না করে যদি ভারতসহ বিশ্বের সর্বত্র কার্পাসজাত বস্ত্র রপ্তানী করতে পারে তাহলে কোন প্রতিবেশী প্রদেশ বা জেলা থেকে তূলা সংগ্রহ করে আমাদের কুটীরে কুটীরে সূতাকাটা প্রবর্তনে কি অসুবিধা আমি তা বুঝে উঠতে পারি না। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের এমন কোন এলাকা নেই যেখানে কোন না কোন সময়ে তূলার চাষ হত না। 'কার্পাস উৎপাদনকারী এলাকায়' তূলার

চাষ কেন্দ্রীত করা সাম্প্রতিক ঘটনা এবং এ হল অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের নিদর্শন। ভারতবর্ষের দরিদ্র করদাতা ও কাটুনীদের ক্ষতি সাধন করে বস্ত্রকলের সঙ্গে স্বার্থসম্বন্ধে আবদ্ধ ব্যক্তিরা এ পরিস্থিতি জোর করে দেশের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। আজও ভারতবর্ষের সর্বত্র বৃক্ষ কার্পাস উৎপন্ন হয়। আপনাদের এই জাতীয় যুক্তি আমাদের অভিক্রম প্রকাশের ক্ষমতা, আমাদের উদ্যম ও সহস্রবুদ্ধির প্রতি কটাক্ষের দ্যোতক। কাঁচা মালের আমদানীকে যদি অনতিক্রম্য বাধা মনে করা হয় তাহলে সব রকমের উৎপাদন কার্যই বন্ধ হয়ে যাবে।

তাছাড়া নিজের কাপড় নিজে উৎপাদন করে না নিলে মানুষকে যেখানে নগ্ন থাকতে হবে সেখানে তাকে কাপড় তৈরী করে নিতে প্রবুদ্ধ করা স্বয়ং একটি শিক্ষা। আর মাথা খাটিয়ে সুতাকাটার বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেখা উচ্চ স্তরের শৈক্ষণীক গুণ সমন্বিত। প্রত্যুত মানুষের সমগ্র শিক্ষা এর ভিতর পড়ে এবং সম্ভবতঃ এ ক্ষমতা অন্যকোন হস্তশিল্পের নেই। আজ হয়ত আমরা মুসলমানদের সন্দেহ দূর করতে পারব না কারণ তাঁরা এক মোহাবর্তের মধ্যে পড়েছেন এবং মোহগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে মোহ এক বাস্তব জিনিস। তবে আমাদের যদি বিশ্বাস স্পষ্ট ও দৃঢ় হয় এবং আমাদের পদ্ধতির সাফল্য যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি তাহলে মুসলমানরা স্বয়ং আমাদের কাছে এসে আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠির সন্ধান চাইবেন। তাঁরা আজ একথা বোঝেন না যে মুসলীম লীগ বা অপর যে-কোন মুসলীম প্রতিষ্ঠানের চেয়ে চরখা দরিদ্রতম মুসলমানদের অধিক সেবা করেছে। বাঙলাদেশের অধিকাংশ তাঁতীই মুসলমান। আর একথা ভুলে গেলে চলবে না যে ঢাকার যে শবনম্-এর বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল তার মূলে ছিল মুসলমান মহিলা কাটুনী ও মুসলমান তাঁতীদের দক্ষতা ও হস্তকুশলতা।

মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা খাটে। এই মোহ নিরসনের

শ্রেষ্ঠ পন্থা হল নিজ কর্তব্য যথাযথ ভাবে সম্পাদনের উপর মনযোগ নিবদ্ধ করা। শেষ অবধি একমাত্র সত্যই টিকে থাকবে, বাদবাকি সবকিছু কাল-প্রবাহে ধুয়ে মুছে যাবে। সুতরাং সবাই যদি আমাকে ছেড়ে চলেও যায় তবু আমি সত্যের ধ্বজা দুই হাতে ধরে থাকব। আজ আমার কথা অরণ্যে রোদনের মত মনে হতে পারে কিন্তু এতে যদি সত্য থাকে তাহলে আর সবার কণ্ঠ যখন নীরব হয়ে যাবে তখনও আমার বক্তব্য গুঞ্জরিত হবে।

প্রশ্ন : নয়ী তালিমের যোগ্য শিক্ষক তৈরী করা সময়সাপেক্ষ। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য কি করা যায় ?

উত্তর : আপনারা যদি অনুভব করেন যে বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি দেশকে স্বাধীনতার নিকটবর্তী না করে অধিকতর মাত্রায় পরাধীনতার অভিমুখে নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে আপনারা এই শিক্ষা-পদ্ধতিকে প্রোৎসাহিত করতে অস্বীকার করুন। এর পরিবর্তে দেশবাসী অন্য কোন শিক্ষা গ্রহণ করুক বা নাই করুক, তার জন্য আপনাদের ভ্রূক্ষেপ করার কারণ নেই। বনিয়াদী শিক্ষার গণ্ডীর ভিতর যতটুকু করা সম্ভব, তাই করে আপনাদের সন্তুষ্টিবোধ করতে হবে। জনসাধারণ যদি এই শর্তে মন্ত্রীদের ঐ পদে রাখতে না চায়, তবে তাঁরা পদত্যাগ করুন। তাঁরা যদি জনসাধারণকে জীবনদায়িনী আহার্য দিতে না পারেন বা জনসাধারণ যদি সে আহার্য গ্রহণে অস্বীকৃত হয়, তবে তাদের বিষ দেবার কাজে মন্ত্রিবর্গ যেন অংশ গ্রহণ না করেন।

প্রশ্ন : আপনি বলে থাকেন যে নয়ী তালিমের জন্য আমাদের টাকা চাই না, চাই মানুষ। কিন্তু এইসব মানুষদের প্রশিক্ষিত করতে হলে প্রতিষ্ঠান গড়তে হয় এবং তার জন্য চাই টাকা। এই দুষ্টচক্রের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় কি ?

উত্তর : এর উপায় আপনাদের নিজেদের হাতে। নিজেকে দিয়ে শুরু করুন। কথায় বলে, 'আপনি আচারি ধর্ম অপরে শিখায়।'

কিন্তু আপনারা নিজেরা আরাম কেদারায় সাহেবদের মত গা এলিয়ে দিয়ে যদি আশা করেন যে 'নিকৃষ্টতর কেউ' এই কাজ করার জন্য প্রস্তুত হবে, তাহলে কোন কিছু হবে না। আমার পন্থা এ নয়। ছেলেবেলা থেকেই আমার অভ্যাস হল যত ক্ষুদ্র ভাবেই হক না কেন নিজেকে এবং নিজের চারপাশের সবাইকে দিয়ে শুরু করা। অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে আমরা যেন ইংরেজদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি। গোড়াতে মুষ্টিমেয় ইংরেজ এদেশে বসতি স্থাপন করেন এবং তারপর তাঁরা নিজেদের জন্য এক সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেন। রাজনৈতিক দিকের তুলনায় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই সাম্রাজ্যের প্রভাব আরও ভীষণ। এর প্রভাব এত মারাত্মক যে আজ ইংরাজী ভাষা আমাদের অণু পরমাণুতে প্রবেশ করেছে এবং তার ফলে মাতৃভাষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা কৃতদাস যেমন ভাবে তার লৌহ শৃঙ্খলের প্রতি অনুরক্ত হয় তেমনি ভাবে ইংরাজী ভাষার প্রতি আসক্ত হয়েছি। ভেবে দেখুন এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য ইংরেজদের কী পরিমাণ বিশ্বাস একাগ্রতা আত্মত্যাগ ও স্থৈর্যের পরিচয় দিতে হয়েছিল। এর থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে ইচ্ছা থাকলে পথ বেরোয়। আমরা যেন কটিবদ্ধ হই এবং এই দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করতে থাকি যে যা-ই হক না কেন আমরা আমাদের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হব না। তাহলে সব অসুবিধা দূর হবে।

হরিজন, ২৫-৮-১৯৪৬

২৯

শারীরিক শ্রম ও বুদ্ধির বিকাশ

গান্ধীজী বললেন, "আপনাদের মতে একজন এই অভিযোগ করেছেন যে (বনিয়াদী শিক্ষায়) শারীরিক শ্রমের উপর বড় বেশী জোর দেওয়া হয়। আমি শারীরিক শ্রমের শিক্ষাগত মূল্যের উপর খুবই বিশ্বাসী। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হল ভারতবর্ষে

বৈদেশিক শাসনকে শক্তিশালী করে তাকে চিরস্থায়ী করা। আপনাদের মধ্যে যাঁরা এই শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় লালিত পালিত তাঁরা তাই স্বভাবতই একে পছন্দ করেন এবং দৈহিক শ্রম তাঁদের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। সরকারী স্কুল কলেজে কেউ ছাত্রদের রাস্তা বা পায়খানা পরিষ্কার করতে শেখানর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। এখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সাফাই হল আপনাদের প্রশিক্ষণের বনিয়াদ। সাফাই এক সুন্দর চারুকলা এবং সযত্নে এ শেখা উচিত। যে-কোন রকমের জ্ঞান উপার্জনের প্রথম সোপান হল নিয়মিত ভাবে প্রশ্ন করা ও সুস্থ কৌতূহল-বৃত্তি জাগরুক রাখা। কৌতূহল-বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য শিক্ষকের প্রতি যথোচিত বিনয় ও শ্রদ্ধাভাব থাকবে। এ যেন ঔদ্ধত্যে পরিণত না হয়। ঔদ্ধত্য মনের গ্রহণশীলতার শত্রু। বিনয় ও শেখার ইচ্ছা ছাড়া কোন জ্ঞান অর্জিত হতে পারে না।

"বুদ্ধি প্রয়োগে প্রয়োজনীয় শরীর-শ্রম করা বুদ্ধির বিকাশের শ্রেষ্ঠতম পন্থা। অন্য উপায়েও অবশ্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু সেসব পন্থায় বুদ্ধির সুসম বিকাশ হবে না, হবে বিসম বিকৃত পরিণতি। এর ফলে মানুষ সহজেই শয়তান বা শঠ-এ পরিণত হতে পারে। সুসম বুদ্ধির অর্থ হল শরীর মন ও আত্মার সঙ্গতিপূর্ণ বিকাশ। এইজন্য আমাদের এখানকার প্রশিক্ষণে দৈহিক শ্রমকে আমরা প্রধান স্থান দিয়ে থাকি। সামাজিক দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় শ্রমের মাধ্যমে যে বুদ্ধির বিকাশ হবে তা হবে সেবার উপাদান এবং সহজে তাকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করা যাবে না অথবা তা উন্মার্গগামী হবে না।..."

হরিজন, ৮-৯-১৯৪৬

৩০

বনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বৈশিষ্ট্য

শ্রীযুক্ত আর্যনায়কম্ সপ্তম শ্রেণীর নয়টি বালককে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য এনেছিলেন। ছেলেগুলি সেবাগ্রামের বনিয়াদী বিদ্যালয়ের সাত বছরের পাঠ্যক্রম প্রায় শেষ করেছিল। ছেলেগুলির বাড়ী সেবাগ্রাম ও আশেপাশের গ্রামে। ক্ষেতে যেসব ছেলেরা কাজ করে এবং যারা কখনও স্কুলে যায় নি তাদের সঙ্গে তুলনা করলে এই ছেলেগুলিকে প্রথম প্রচেষ্টার আশাজনক ফল বলতে হবে। এরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ফিটফাট পোষাক-পরা সুশৃঙ্খল ও ভব্য ছিল। গান্ধীজী তাদের সঙ্গে কয়েকটি রসিকতা করলেন এবং তারাও সপ্রসন্ন হাস্যে তাতে যোগ দিল। তাদের মধ্যে একজন সাহস করে গান্ধীজীকে প্রশ্ন করল যে বনিয়াদী বিদ্যালয়ে সাত বছরের পাঠ সমাপ্ত করার পর কি ধরণের চৌদ্দ বছর বয়সের ছেলে বেরোবে বলে তিনি মনে করেন? এই প্রশ্নের সুযোগ নিয়ে গান্ধীজী তাদের বললেন যে বিদ্যালয় যদি ছাত্রদের প্রতি করণীয় কর্তব্য পালন করে থাকে তাহলে চৌদ্দ বছরের ছেলেরা সত্যবাদী শুদ্ধচিত্ত ও স্বাস্থ্যবান হবে। তাদের মনও হবে গ্রামাভিমুখী। তাদের মস্তিষ্ক ও হাত সমান ভাবে বিকশিত হবে। তাদের ভিতর ছলনার স্থান থাকবে না। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি হবে তীক্ষ্ণ যদিও টাকা পয়সা রোজগার করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে দুশ্চিন্তা থাকবে না। যে-কোন সৎ কাজ পেলে তারা তাতে হাত লাগাবে। তারা শহরে যেতে চাইবে না। বিদ্যালয়ে সহযোগীতা ও সেবার পাঠ পাবার কারণ তারা তাদের পরিবেশকে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুলবে। তারা কখনও ভিখারী বা পরশ্রমভোজী হবে না।

হরিজন, ৮-৯-১৯৪৬

৩১
বনিয়াদী শিক্ষার মূল তত্ত্ব

দেশে আমাদের চতুর্দিকে যে পরিবেশ তাকে কেন্দ্র করে এবং তার চাহিদা মেটাতে বনিয়াদী শিক্ষার জন্ম। সুতরাং এর লক্ষ্য হল পরিবেশের চাহিদা মেটান। এই পরিবেশ দেশের সাত লক্ষ গ্রামে তার কোটি কোটি অধিবাসীদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এদের ভুলে গেলে ভারতবর্ষকেও ভুলে যেতে হয়। ভারতবর্ষকে তার শহরগুলিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভারতবর্ষ ছড়িয়ে রয়েছে তার অসংখ্য গ্রামে।

বনিয়াদী শিক্ষার মূল তত্ত্ব নিম্নরূপ ঃ

১. সব রকমের শিক্ষাকে শিক্ষা নামের যোগ্য হতে হলে স্বাবলম্বন ভিত্তিক হতে হবে। অর্থাৎ শেষ অবধি এর জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি ছাড়া পৌনপৌনিক ব্যয় উপার্জন করতে হবে। অবশ্য পুঁজি শেষ পর্যন্ত অস্পৃষ্ট থেকে যাবে অর্থাৎ খরচ হবে না।

২. এতে এমন কি শেষ পর্যায়ে পর্যন্ত হস্তকুশলতাকে কাজে লাগান হবে। অর্থাৎ দিনের কিছুটা সময় ছাত্ররা নিজ হাতে দক্ষতা সহকারে কোন শিল্পে কাজ করবে।

৩. প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে সব রকমের শিক্ষা দিতে হবে।

৪. এতে সাম্প্রদায়িক ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার কোন অবকাশ নেই। অবশ্য মূল বিশ্বজনীন নীতিশাস্ত্রের সম্যক্ চর্চা হবে।

৫. শিশু অথবা বয়স্ক, পুরুষ বা নারী যারাই এই শিক্ষার আওতায় আসুক না কেন তাদের মাধ্যমে এই শিক্ষা তাদের ঘরে অনুপ্রবেশ করবে।

৬. এই শিক্ষাপ্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ ছাত্র যেহেতু নিজেদের সমগ্র ভারতবর্ষের অঙ্গ স্বরূপ বিবেচনা করবে সেইজন্য তারা একটি আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা শিখবে। এই আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হতে

পারে কেবল হিন্দুস্থানী যা নাগরী যা উর্দু লিপিতে লেখা যায়। ছাত্রদের তাই উভয় লিপিই শিখতে হবে।

হরিজন, ২-১১-১৯৪৭

৩২

শিক্ষাবিদ্‌দের সঙ্গে

পাটনায় ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২২শে এবং ২৩শে এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের সভায় উপস্থিত সদস্যদের কাছে গান্ধীজী তাঁর হৃদয় উজাড় করে দিলেন।

স্বাবলম্বন

শুরুতেই বাজেট সম্পর্কে আলোচনার সময় গান্ধীজী সদস্যদের সরকারের উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভর করার প্রবণতা সম্বন্ধে সতর্ক করে দেন। "তাঁরা হয়ত আমরা যা চাইব তা-ই দিতে রাজী হবেন। কিন্তু আমরা যদি তাঁদের উপর নির্ভর করা শুরু করি তাহলে তার অর্থ হবে নয়ী তালিমের বিলুপ্তি।" আগামী তিন বছরের বাজেট উপস্থাপিত করা হয়েছিল। তিন বছরের পর সঙ্ঘের সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী হওয়া কর্তব্য। এই আদর্শকে সামনে রেখে বাজেট তৈরী করা উচিত। আর তিন বছর পরও যদি তাঁরা এই লক্ষ্য সাধনে সমর্থ না হন তবে দেশবাসীর কাছে নিজেদের দেউলিয়া হবার কথা ঘোষণা করা উচিত। যথোচিত ভাবে স্বীকার করলে ব্যর্থতা সাফল্যের সোপান হয়ে থাকে।

ত্রিমুখী বিকাশ

অতঃপর গান্ধীজী বললেন, "আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা মন শরীর ও আত্মার বিকাশের অনুকূল। সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা কেবল মনের দিকে নজর দেয়। কিছুটা সূতাকাটা ও কিছুটা সাফাই-এর

মধ্যেই নয়ী তালিম সীমাবদ্ধ নয়। এসব যতই অপরিহার্য হক না কেন পূর্বোক্ত সুসমঞ্জস বিকাশ সংসাধন করতে না পারলে এসবের কোন মূল্য নেই।”

খাদির স্থান

এরপর গান্ধীজী নয়ী তালিমে খাদির স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। গান্ধীজী বললেন, “১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা থাকা কালেই খাদি আমার মনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে।” তবে খাদির থেকে শ্রেয় কোন সর্বাঙ্গীণ গ্রামীণ শিল্প পেলে তিনি খাদিকে কেন্দ্র করে নয়ী তালিমকে গড়ে তোলার উপর জোর দিতেন না। তিনি বিশ্বাস করেন যে ভারতবর্ষের সবাই যদি দিনে এক ঘণ্টা সূতা কাটে তাহলে দেশের প্রয়োজনীয় বস্ত্র তার দ্বারাই উৎপন্ন হতে পারে। অবশ্য যদি দেখা যায় যে দিনে ছয় ঘণ্টা সূতা না কাটলে বস্ত্র সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় তাহলে খাদির কোন স্থান নেই বলতে হবে। কারণ মানুষকে অন্যান্য কাজও তো করতে হবে। তাদের খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করতে হবে। কিছু কিছু বৌদ্ধিক কাজেরও প্রয়োজন আছে। নয়ী তালিমে দাস-শ্রমের কোন স্থান নেই। সূতাকাটার জন্য যে এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয় তাকে কাটুনীর আত্মবিকাশের সময় বিবেচনা করতে হবে।

খাদি ও উত্তর বনিয়াদী

“সৈয়দীন সাহেব বলেন যে অন্ততঃ উত্তর বনিয়াদী পর্যায়ে কাপড়ের কলের কর্মপদ্ধতি শেখান উচিত। আমি কিন্তু তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি না। সূতাকাটা যে কেবল উত্তর বনিয়াদী পর্যায়ের এক উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যম তা-ই নয়, এই প্রয়োজনীয় হস্তশিল্প থেকে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রকে দূরে রাখা

চলতে পারে না। তকলী ও ঝাঁটা সম্বন্ধে দেবপ্রকাশ যা লিখেছে কাল আমাকে সে তা দেখাচ্ছিল। দেবপ্রকাশ যা লিখেছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে যে এই দুটি উপকরণের সাহায্যে যথেষ্ট জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে। বনিয়াদী পর্যায়ে এর সবটুকু শেষ করা সম্ভবপর নয়। মুস্কিল হচ্ছে এই যে এইসব অপরিহার্য হাতের কাজের সঙ্গে যে বিজ্ঞান জড়িয়ে আছে তা এখনও আমরা সকলের হিতার্থ বিকশিত করতে সক্ষম হই নি। কলে সূতাকাটা ও কাপড় বোনার মূলেও আছে তকলী ও তাঁত। আমাদের শোষণ করা প্রয়োজন ছিল বলে পাশ্চাত্য দেশে কাপড়ের কল তৈরী হয়েছিল। আমরা কাউকে শোষণ করতে চাই না। আমাদের তাই কাপড়ের কলের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে তকলী ও তাঁতের বিজ্ঞান আমরা অবশ্যই জানব। এ ব্যাপারে ভারত যদি ইউরোপের অনুকরণ করে তাহলে ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের ধ্বংস অনিবার্য।”

খাদি বনাম মিল

ডঃ জাকির হোসেন জানালেন যে শিক্ষাবিদ্‌দের এইভাবে চিন্তা করা মুস্কিল। কারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে ছাত্রেরা চাকুরীর জন্য কাপড়ের কলের দারস্থ হয়। এর উত্তরে গান্ধীজী বললেন, “আমার পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের ছাত্ররা শিক্ষা সমাপনান্তে চাকুরীর জন্য মিলের মুখাপেক্ষী হবে না। প্রত্যুত খাদির পাশাপাশি কলের কাপড় বিক্রিত হওয়া উচিত নয়। আমাদের দেশের কাপড়ের কলগুলি তাদের উৎপন্ন বস্ত্র ভারতবর্ষের বাইরে বিক্রি করতে পারে। ইংলণ্ডে ল্যাঙ্কাশায়ারের তৈরী কাপড় বিক্রি হয় না। এর সমস্তটাই রপ্তানী হয়। তবে এ দেশের কাপড়ের কলগুলি খুব বেশীদিন বিদেশের বাজার পাবে না।”

আমাদের পথ

"কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করার কথা দেশের সমগ্র পরিবেশে পরিব্যাপ্ত বলে আমি আপনাদের অসুবিধার কথা বুঝতে পারি। এমন কি আমাদের মন্ত্রীরাও কেবল কলের কথা বলেন। নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী চলতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করাই আমাদের সম্মুখে একমাত্র পথ। খাদির সত্যে বিশ্বাসী হলে আমরা এতদানুযায়ী চলব এবং এর কথা প্রচার করব ও মন্ত্রীদের বোঝাব যে জাতীয় কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ঠিক কাজ করছি।

"কংগ্রেস হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘর সৃষ্টি করলেও কখনও এর কাজকর্মের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে নি। অনুরূপ ভাবে চরখা সঙ্ঘ কংগ্রেসের সন্তান হলেও কংগ্রেস কখনও একে আপনার করে নেয় নি। এইসব প্রতিষ্ঠানের দিকে কে আর নজর দেয়? কংগ্রেস কর্মিদের অর্থসঞ্চয় ও অভিজ্ঞতার পুঁজি যখন কম ছিল তখন তাঁরা গঠনমূলক কাজের প্রতি কিছুটা নজর দিতেন। আজ অবশ্য পুরো সরকার আমাদের হাতে এসেছে। এর দ্বারা যে ক্ষমতাপ্রাপ্তি হয়েছে কংগ্রেস কর্মীরা এখনও তাকে পরিপাক করতে সক্ষম হন নি। এতে সময় লাগবে।"

আর সে প্রভাব নেই

গান্ধীজী উপলব্ধি করেন যে নয়ী তালিমের কাজ করা মানে এক নূতন সমাজব্যবস্থার পক্ষে প্রচার। ক্ষমতাধীশ মন্ত্রীরা সম্ভবতঃ তালিমী সঙ্ঘের এই অভিমতের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় সহমত নন। ডঃ জাকীর হোসেন প্রস্তাব করলেন যে গান্ধীজী হয় সরকার ও সঙ্ঘের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সাহায্য করুন আর নচেৎ সঙ্ঘকে বনবাসে যেতে দিন। গান্ধীজী স্বীকার করলেন যে তাঁর আর পূর্বের মত প্রভাব নেই। "এই অনীহার জন্য সরকারকে আমি দোষ দিই না। তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে যে যন্ত্র পেয়েছেন তাই দিয়েই

কাজ নিতে হবে। মন্ত্রী হলে সম্ভবতঃ আমিও তাঁদের পথে চলতাম। তবুও আমি পণ্ডিত জওহরলাল ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি। শিক্ষাবিদ্-এর অন্যতম কাজ হল লোককে বোঝান। তাই না ?"

ডঃ জাকীর হোসেন ঃ "আমি মনে করি যে কংগ্রেস নিজ শিক্ষা-নীতি কখনও তার মন্ত্রীদের বোঝায় নি বলেই আজকের এই সমস্যা। এখানে আসার পূর্বে আমি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকট করেছেন এবং বলেছেন যে সঙ্ঘের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। সঙ্ঘও তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।"

গান্ধীজী ঃ "সরকারের উচিত ছিল শুরুতেই আমাদের আমন্ত্রণ জানান। শ্রীযুক্ত সার্জেণ্ট-এর সঙ্ঘের নির্দেশে কাজ করা উচিত। আমি সরকারকে পরামর্শ দিয়েছি যে তাঁরা যেন আপনাদের আমন্ত্রণ করেন।"

প্রশংসালেখ প্রসঙ্গে

বনিয়াদী শিক্ষায় উত্তীর্ণদের প্রশংসালেখ (Certificate) দেওয়ার প্রসঙ্গে গান্ধীজী বললেন যে উত্তীর্ণ মানের একটা সংক্ষিপ্ত অথচ সুনিশ্চিত নাম থাকা উচিত এবং কোনরকম অতিরঞ্জন না করে প্রশংসালেখে ছাত্রের সত্যকার যোগ্যতা স্পষ্ট হিন্দুস্থানীতে লেখা উচিত। গান্ধীজী আরও বললেন, "উপযুক্ত যোগ্যতা না থাকলে কোন কিছুকে খুব একটা বড়গোছের মর্যাদা দিলে মর্যাদাদানকারীর নিজেরই অপযশ হয়।"

খাদি ও স্বাবলম্বন

স্বাবলম্বনের প্রশ্নে শ্রীযুক্ত বাজুজী বললেন যে ছুতারের কাজ প্রমুখ অন্য অনেক হাতের কাজের তুলনায় সূতাকাটা ও কাপড় বোনার রোজগার কম। সুতরাং সাত বছরের শিক্ষণক্রম সমাপ্ত

করার পরও ছাত্ররা স্বাবলম্বী হতে পারবে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। ছাত্ররা বড় বেশী হলে চরখা সঙ্ঘ নির্ধারিত দরে দৈনিক সাঁইত্রিশ থেকে পঞ্চাশ পয়সা রোজগার করতে পারবে। গান্ধীজী বললেন, "টাকার অঙ্কে আমাদের চিন্তা করা উচিত নয়। আমাদের সকলের বস্ত্র প্রয়োজন বলে খাদি আমাদের কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু। দেশের সাত লক্ষ গ্রামের অধিবাসীদের পরিধেয়-এর প্রশ্ন আমাদের সামনে রয়েছে। আজ আমাদের সূতা বুনাবার জন্য তাঁতীদের উচ্চ হারে মজুরী দিতে হয়। সুতা কাটার বেলায় আমি যেমন সবাই এটা শিখুক—এর উপর জোর দিয়েছি তেমনিভাবে সবাই বুনাই শিখুক—এর উপর জোর না দিয়ে আমি অন্যায় করেছি। অবশ্য এটা দেখতে হবে যে এর জন্য যতটা সময় দেওয়া সম্ভব এ কাজ শিখতে তার বেশী সময় যেন না লাগে। এর জন্য যদি ছাত্রদের সবটুকু সময় লাগে তাহলে এ ব্যাপারে আমাদের পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

মূল শিল্প হিসাবে কৃষি

"অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন যে কৃষিকে কেন মূল শিল্প করা হয় না? এর উত্তর হল এই যে কৃষির সূতা কাটার মত শিক্ষাগত গুণ নেই। উদাহরণ স্বরূপ কৃষি সূতা কাটার মত হস্তকুশলতা শিক্ষা দিতে পারে না। নয়ী তালিমের লক্ষ্য কেবল কোন বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া নয়, কোন বৃত্তির মাধ্যমে গোটা মানুষটির বিকাশ-এর কাম্য।

"তবে কৃষি দিয়ে শুরু না করলেও শেষ অবধি এ আসতে বাধ্য। কারণ নয়ী তালিমের ক্ষেত্র ব্যাপক। আমার পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের মিলে তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু জোগাড় করে নিতে হবে। নয়ী তালিমের শিক্ষককে প্রথম শ্রেণীর কারিগর হতে হবে। গ্রামের সব শিশুরা নিজে থেকে বিদ্যালয়ে আসবে। এইভাবে স্বতঃই শিক্ষা অবৈতনিক ও সার্বজনীন হবে।

"আজ ভারতবর্ষের অবস্থা এমন যে গ্রামে উৎপন্ন শাকসব্জী গ্রামের লোক খেতে পায় না। ত্রিবাঙ্কুরের (কেরল-এর অঙ্গ—সঙ্কলক) নারকেল সেখানকার গ্রামবাসীদের ভোগে লাগে না। এক জায়গায় জড় করে সেসব শহরে পাঠান হয়। বনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এ জাতীয় বিসদৃশ ব্যাপারের অবসান ঘটবে। আজ আমরা আফিং তামাক ও কাপাস ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের চাষ করি। নয়ী তালিমে শিক্ষিতরা নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের আবাদ করবে।"

হরিজন, ৯-১১-১৯৪৭

ষষ্ঠ খণ্ডঃ প্রাথমিক শিক্ষা

১

আজকের প্রাথমিক শিক্ষা

চতুর্দিকেই আজ নজরে পড়ে যে দুর্বল ভিত্তির উপর বিশাল সৌধের কাঠামো তোলা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যেসব শিক্ষকদের বাছাই করা হয় নিছক ভদ্রতার খাতিরেই তাঁরা শিক্ষক নামের অধিকারী। আসলে তাঁদের শিক্ষক নামে অভিহিত করা শিক্ষক শব্দটির অপপ্রয়োগ। শৈশব মানবজীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই সময় যে জ্ঞান লাভ করা যায় মানুষ তা কখনও ভোলে না! কিন্তু (আমাদের দেশে) শিশুরা শৈশবে বিশেষ কিছুই শেখার সুযোগ পায় না এবং তাদের যে-কোন তথাকথিত বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। আমার বিশ্বাস এই যে আমাদের দেশে উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে সাজসজ্জা ও আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করতে যে বিরাট খরচ হয় আমাদের মত দরিদ্র দেশ তার বোঝা বহন করতে অসমর্থ। এর পরিবর্তে স্বাস্থ্যকর ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পীঠভূমি স্থানসমূহে সুশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে যদি **প্রাথমিক শিক্ষা** দেবার ব্যবস্থা করা যেত তাহলে স্বল্পতর সময়ে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল দৃষ্টিগোচর হত। এই পরিবর্তন সংসাধনের উদ্দেশ্যে বর্তমানের শিক্ষককূলের বেতন দ্বিগুণ করে দিলেও আমাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হবে না। এজাতীয় স্বল্প পরিবর্তনে বৃহৎ ফললাভ করা যায় না। প্রাথমিক শিক্ষার চরিত্রধর্মেই রূপান্তর ঘটাতে হবে।...

এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দোষ দেখান আমার উদ্দেশ্য নয়। বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয় এবং তাহলেও সময় সময় তাঁরা আশাতীত সুফলের পরিচয় দেন। আমাদের মহান সংস্কৃতি ও

ঐতিহ্য এই বিস্ময়ের মূলে ক্রিয়াশীল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যথোচিত প্রোৎসাহন পেলে তাঁরা এমন সুন্দর ফল দেখাবেন যার কথা আমরা এখন চিন্তাও করতে পারি না।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে **সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনের দ্বারা এইসব ত্রুটী দূর হবার নয়।** শাসকরা কখনও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পরিবর্তন সংসাধন করতে পারেন না। জনসাধারণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এ জাতীয় পথিকৃৎ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। ব্রিটিশ সংবিধানে জনসাধারণের এ জাতীয় প্রচেষ্টায় বিশেষ সহায়তাদানের ব্যবস্থা আছে। আমরা যদি মনে করি যে কেবল সরকারই এইসব কাজ করবেন তাহলে বহুদিনেও আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। ইংলণ্ডের মত আমাদের দেশেও প্রথমে আমাদের এ ব্যাপার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে এবং সরকারকে কোন কিছু করতে বলার পূর্বে নিজেদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল সরকারের সামনে রাখতে হবে।…পথিকৃৎ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে দেশে এরকম কয়েকটি বিশেষ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনা করা প্রয়োজন।

এ কাজ করার পথে একটি বড় বাধা আছে এবং সেটি হল ডিগ্রীর মোহ। জীবিকার জন্য আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার উপর নির্ভর করি। এর ফলে জনসাধারণের অপ্রমেয় ক্ষতি হয়। আমরা ভুলে যাই যে যাঁরা সরকারী চাকুরী করতে চান কেবল তাঁদের ডিগ্রীর প্রয়োজন। কিন্তু মুষ্টিমেয় যে কয়জন সরকারী চাকুরী খুঁজবেন তাঁদের দ্বারা জনসাধারণের জীবনসৌধ গড়ে উঠবে না। প্রায় নিরক্ষর লোক যখন নিজের বুদ্ধি ও চাতুর্যের বলে লক্ষপতি হতে পারে তখন শিক্ষিতরা কেন ধনোপার্জন করতে পারবেন না তার কারণ নেই। শিক্ষিতসম্প্রদায় যদি কেবল তাঁদের মনের ভয়কে ত্যাগ করতে পারেন তাহলে তাঁরা নিঃসন্দেহে অন্ততঃ নিরক্ষরদের সমান যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবেন।

বিচারসৃষ্টি, ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ

২
শিশুদের শিক্ষা

বহু বৎসর যাবত আমার মনে হচ্ছে যে পড়তে জানা এবং লিখিত বাক্যের উপর আমরা মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছি। এইজন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তকের ক্রমবর্ধমান স্থান।

আমরা এই মোহের শিকার হয়ে পড়েছি যে শিশু পড়তে না শেখা পর্যন্ত তাকে কোন জ্ঞান দেওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় কোন ভ্রমাত্মক ধারণা আছে কিনা বলতে পারব না। এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে এই মিথ্যা বিশ্বাসের পরবশ হয়ে আমরা শিশুর বিকাশের গতিরোধ করি। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে শিশু লিখতে পড়তে শেখার পূর্বেই তার মানসিক বিকাশ হতে পারে এবং হয়েও থাকে। লেখা ও পড়া বরং কতকাংশে তার বিকাশকে ব্যাহত করে। বাস্তব পরীক্ষার দ্বারা যে-কোন শিক্ষক এই উক্তির সত্যতা নির্ধারণ করতে পারেন। অক্ষরজ্ঞান অথবা বিধিবদ্ধ শিক্ষা ছাড়াই শিশুকে মুখে মুখে শিক্ষা দিন, দেখবেন তাড়াতাড়ি সে শেখে। মুখে মুখে আলোচনা করার সময় শিক্ষক ইতিহাস ভূগোল ও বিজ্ঞানসংক্রান্ত তথ্য শেখাতে পারেন। এক বছরের মধ্যেই কোন শিশু রামায়ণ ও মহাভারতের গল্পগুলি শিখে নিতে পারে। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে চার পাঁচ বছর পড়ার পর তারা এসব শিখে থাকে। "মা আমাকে খাবার জল দাও"—এই জাতীয় একটি সাধারণ বাক্য পড়তে ও লিখতে শেখার জন্য শিশুর পুরো একটি বছর লাগা কী অনাবশ্যক ব্যাপার! শিশুকে প্রথমেই পড়া ও লেখা শিখতে বাধ্য করে আমরা তার স্বাভাবিক বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করি, অন্য উপায়ে সহজে সে যেসব বিষয় শিখতে পারত সে সম্বন্ধে তাকে অজ্ঞ রাখি, তার স্মরণশক্তির উপর চাপ দিই, তাড়াহুড়া করে তার হাতের লেখা বিশ্রী করে দিই এবং শৈশব থেকে তাকে

পাঠ্যপুস্তকের দাস করে শেষ অবধি দরিদ্র ভারতবর্ষের উপর অনাবশ্যক বই কেনার মারাত্মক বোঝা চাপিয়ে দিই।

শিক্ষকদের যদি আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গী বোঝাতে পারতাম তাহলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তরে পাঠ্যপুস্তক সমূহকে আমি কেবল শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য রাখতাম, ছাত্রদের জন্য নয়। অবশ্য পাঠ্যপুস্তককে তখন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লিখতে হত। অক্ষর ও বাক্য লিখতে শেখার পূর্বে শিশুদের আঁকতে শেখান উচিত যাতে তারা নিখুঁতভাবে মাত্রাজ্ঞানসম্পন্ন চিত্র ও ছবি অঙ্কন করতে পারে। এর জন্য অক্ষর চিনতে শিশুর যদি এমন কি তিন বছরও সময় লাগে তার জন্য চিন্তার কারণ নেই। এই সময়ে তাকে যথেষ্ট পরিমাণ বাস্তব ও ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে। তাকে গীতা থেকে নির্বাচিত শ্লোক শেখান যেতে পারে যাতে তার স্মরণশক্তির অনুশীলন ও পরিপুষ্টি হয় এবং তার ভিতর ছন্দ ও শ্রুতির জ্ঞান সৃষ্টি হয়। তাকে সঠিক উচ্চারণ আচার ব্যবহারবিধি ও নিখুঁতভাবে কাজ করার কলা শেখান যেতে পারে। এইভাবে তার ক্ষমতার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ-সাধন হবে আমাদের লক্ষ্য। এর সঙ্গে সঙ্গে একটি শিল্পকলার অনুশীলনের মত তার হাতের লেখার উন্নতিসাধনে তাকে প্রোৎসাহিত করতে হবে। আজকে অধিকাংশ ছাত্রের হাতের লেখা এত বিশ্রী যে তা পড়তে ও পড়ে তার পাঠোদ্ধার করতে মানুষের বিরক্তি ও অনিচ্ছা হয়। একথা আমি বলছি অভিজ্ঞতা থেকে। কারণ আমার নিজের হাতের লেখা এত খারাপ যে আমি এর জন্য লজ্জা-বোধ করি ও কারও কাছে লিখতে ইচ্ছা করে না। নিজের হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষর দেখে আমার দুঃখ হয়। ভালভাবে সিদ্ধ না হওয়া খাবার যেমন কেউ খেয়ে হজম করতে পারেন না সেইভাবে কাঁচা হাতের লেখাও বরদাস্ত করা যায় না। যার হাতের লেখা খারাপ তাকে সভ্য বলা চলে না। অনেক সময় আমার মনে হয়েছে যে এই জাতীয় লোকের হাতের লেখা পড়তে অস্বীকার করা উচিত।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রথম ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে পারলে আমরা অনেক অপ্রয়োজনীয় অর্থব্যয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পাব। শুধু তাই নয়। এই পরিবর্তনের ফলে শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ অধিকতর মাত্রায় হবে বলে আমরা শিশুদের জীবনকে সমৃদ্ধতর ও দীর্ঘতর করতে পারব।

নবজীবন, ২৬-১০-১৯২৪

৩

শিক্ষার এক অভিনব মাধ্যম

একজন ব্যারিস্টারের ঘরে যতটা অনাড়ম্বরতা প্রবর্তন করা সম্ভব আমি তা করলাম।...এই পরিবর্তন যতটা না বাহ্য তার চেয়ে বেশী আভ্যন্তরীণ। সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় যাবত শরীরশ্রম নিজেরাই করে নেবার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকল। আমি তাই আমার ছেলেমেয়েদেরও এ কাজে ডাকতে লাগলাম।

রুটি-কারখানার রুটির বদলে বাড়ীতে রুটি তৈরি করে নেওয়া স্থির করলাম।...সুতরাং সাত পাউণ্ড মূল্যে আমি একটি হাতে-চালান আটা-পেষাই যন্ত্র কিনলাম। এর লোহার চাকাটি বেশ ভারী হওয়ায় একজনের পক্ষে চালান সম্ভবপর ছিল না, তবে দু'জন হলে সহজেই চাকাটি ঘুরত। সাধারণতঃ পোলক আমি ও ছেলেমেয়েরা এই কলে আটা পেষাই করতাম।...আটা পেষাই করার ফলে ছেলেমেয়েদের সুন্দর ব্যায়াম হত। এই কাজ বা অপর কোন কাজ কখনও তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় নি। এ কাজ তাদের কাছে ছিল খেলার মত। যখন ইচ্ছা তারা এসে কাজ করত আবার তারা ক্লান্তিবোধ করলেই কাজ ছেড়ে দেওয়ার স্বাধীনতা তাদের ছিল। তবে সাধারণতঃ শিশুরা...আমার আশানুরূপ কাজ করেছে। অবশ্য কোন শিশুই যে অলস বা ঢিলাঢালা ছিল না এমন কথা আমি বলব না; কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই যথেষ্ট উৎফুল্লতা সহকারে

নিজেদের কাজ করেছে। সে সময়কার এমন কয়েকটি শিশুর কথা আমার মনে আছে যারা কাজ এড়াতে চাইত এবং খালি খালি ক্লান্তির দোহাই দিত।

ঘর দেখাশুনা করার জন্য আমাদের একটি চাকর ছিল। আমাদের পরিবারের একজনের মত সে আমাদের ঘরে থাকত এবং ছেলেমেয়েরা তার কাজে তাকে সাহায্য করত। মিউনিসিপ্যালিটির মেথর পায়খানা পরিষ্কার করলেও ভৃত্যকে পরিষ্কার করতে না বলে বা সে করবে তার অপেক্ষা না করে আমরা নিজেরাই পায়খানা-ঘরটি পরিষ্কার করতাম। এর ফলে শিশুরা একটি ভাল শিক্ষা পেল। এর পরিণামস্বরূপ আমার কোন ছেলের মনেই মেথরের কাজ করা সম্বন্ধে কোনরকম বিরূপতার সৃষ্টি হয় নি এবং সাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধেও স্বভাবতঃ তাদের বেশ ভাল রকম বোধ হয়েছিল। আমাদের জোহান্‌সবার্গের বাড়ীতে কদাচিৎ কারও অসুখ বিসুখ হত। কিন্তু হলে ছেলেমেয়েরা সানন্দে তার সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব নিত। আমি একথা বলব না যে ওদের কেতাবী শিক্ষার প্রতি আমার খেয়াল ছিল না তবে একথা সত্য যে প্রয়োজনবোধে কেতাবী শিক্ষাকে বাদ দিতে আমি দ্বিধা করি নি। এইজন্য আমার ছেলেদের আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কিছুটা কারণ আছে। প্রত্যুত সময় সময় তারা একথা বলেওছে এবং এ ব্যাপারে আমাকে কিছুটা আমার দোষ স্বীকার করতে হবে। ছেলেমেয়েদের কেতাবী শিক্ষা দেবার ইচ্ছা আমার ছিল। এমন কি আমি স্বয়ং তাদের এ শিক্ষা দেবার চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু প্রায়ই কোন না কোন ঝামেলা বাধত। তাদের পড়াবার জন্য আর কোন ব্যবস্থা করে না উঠতে পারার কারণ রোজ আমি তাদের পদব্রজে আমার কর্মস্থল পর্যন্ত নিয়ে যেতাম এবং সেখান থেকে তারা পদব্রজেই বাড়ী ফিরত। এর জন্য রোজ তাদের মোট পাঁচ মাইল হাঁটতে হত। এই হাঁটায় তাদের ও আমার ভালরকম ব্যায়াম হত। এই সময় সঙ্গে বাইরের

কেউ না থাকলে মুখে মুখে আমি তাদের নানা বিষয় শেখাতাম আমার বড় ছেলে হরিলাল ভারতবর্ষেই থেকে গিয়েছিল। তাকে ছাড়া আর সব কয়টি ছেলেকেই জোহান্‌সবার্গে এইভাবে মানুষ করেছিলাম। এর উপর নিয়মিতভাবে এক ঘণ্টা করে সময় যদি তাদের কেতাবী শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যয় করতে পারতাম তাহলে আমার মতে ওদের আদর্শ শিক্ষার ব্যবস্থা হত। কিন্তু তাদের এবং আমার উভয়পক্ষেরই খেদের বিষয় এই যে তাদের আমি যথেষ্ট কেতাবী শিক্ষা দিতে পারি নি।... তবে তাদের কেতাবী শিক্ষার অবহেলা আমি করেছিলাম আমি যাকে আন্তরিক ভাবে (কেউ কেউ হয়ত একে অন্যায় ভাবে আখ্যা দিতে পারেন) জনসেবা মনে করি, তারই কারণ। অবশ্য এ বিষয়ে আমার মনে কোন সংশয় নেই যে তাদের চরিত্র গঠনের জন্য যা কিছু করণীয় তা করতে আমি কখনও অবহেলা করি নি। আমি বিশ্বাস করি যে এটা প্রতিটি অভিভাবকের অপরিহার্য দায়িত্ব। আমার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমার ছেলেদের ভিতর কোন ত্রুটি দেখা গেলে আমার মতে তার কারণ আমার যত্ন বা প্রচেষ্টার অভাব নয়—এ হল ওদের বাবা মা-এর ত্রুটির প্রতিফলন।

শিশুরা কেবল মাতাপিতার দেহাকৃতিই পায় না, তারা তাঁদের গুণাগুণেরও উত্তরাধিকারী হয়। পরিবেশের ভূমিকা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু যে মূল পুঁজি সম্বল করে শিশু তার জীবনারম্ভ করে তা উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্বজদের কাছ থেকে পাওয়া। তবে শিশুরা সাফল্যসহকারে বংশানুক্রমিকতার কুপ্রভাব কাটিয়ে উঠছে—এরকম দৃষ্টান্তও আমি দেখেছি। এর কারণ হল এই যে পবিত্রতা আত্মার এক অন্তর্নিহিত বিভূতি।

ছেলেদের ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সময় সময় পোলক ও আমার মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হত। বরাবরই আমি মনে করি যে যেসব মাতাপিতা তাঁদের সন্তানকে শৈশবকাল থেকে

ইংরাজীতে চিন্তা ও বার্তালাপ করতে শেখান তাঁরা তাঁদের সন্তান ও স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। নিজ সন্তানদের তাঁরা জাতির আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত করেন ও তাদের স্বদেশের সেবার পক্ষে অনুপযুক্ত করে ফেলেন। এই বিশ্বাসের কারণ ইচ্ছা করে আমি আমার ছেলেদের সঙ্গে গুজরাতীতে কথাবার্তা বলতাম। কিন্তু পোলক এটা মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি মনে করতেন যে আমি ওদের ভবিষ্যত নষ্ট করছি। তাঁর হৃদয়ের সবটুকু তেজ ও ভালবাসা দিয়ে তিনি বলতেন যে আমার ছেলেরা যদি শৈশব থেকে ইংরাজীর মত বিশ্বজনীন ভাষা শেখে তাহলে জীবনযুদ্ধে তারা সহজেই অপরের তুলনায় অনেক বেশী সুবিধা করতে পারবে। তবে তিনি আমাকে তাঁর মতে দীক্ষিত করতে পারেন নি। এতদিন পরে আমার মনে পড়ছে না যে আমার অভিমতের যথার্থতা সম্বন্ধে আমি তাঁকে বোঝাতে পেরেছিলাম না আমাকে একেবারে একগুঁয়ে ভেবে তিনিই আমার সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিশ বৎসর পূর্বে এ ঘটনা ঘটেছিল এবং আজ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার পূর্বোক্ত ধারণা দৃঢ়তর হয়েছে। সম্যক্ কেতাবী শিক্ষার অভাবে আমার ছেলেদের অসুবিধা হলেও স্বাভাবিক ভাবেই তাদের নিজ মাতৃভাষার যে জ্ঞান হয় তা তাদের ও তাদের মাতৃভূমির কাজে লেগেছে। কারণ এ না হলে তারা নিজ দেশে বিদেশীর মত হয়ে যেত। পরিবারের বহুল সংখ্যক ইংরেজ বন্ধুদের দৈনিক সাহচর্যে ও প্রধানতঃ ইংরাজীভাষী দেশে বসবাস করার কারণ স্বাভাবিক ভাবেই তারা দ্বিভাষী হয়েছিল ও বেশ সহজভাবেই ইংরাজী বলতে ও লিখতে পারত।

আত্মকথা, চতুর্থ খণ্ড, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, ১৯২৬

৪

প্রাথমিক শিক্ষা

বহু চিন্তা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে অন্ততঃ এক বছর বই ছাড়াই প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে এবং এক বছর পরও বই-এর ব্যবহার হবে যথাসম্ভব কম।

শুরু থেকেই যদি বই-এর ব্যবহার করা হয় এবং শিশুদের যদি অক্ষর-জ্ঞান দেওয়া হয় তাহলে তাদের বিভিন্ন যোগ্যতা বিকশিত হতে পারে না ও তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ রুদ্ধ হয়। অথচ এই সময়ে শিশুর যোগ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তির দ্রুত বিকাশ হওয়া উচিত। জন্মের অব্যবহিত পরেই শিশু শিখতে আরম্ভ করে। অবশ্য এ শিক্ষা সে পায় তার চোখ কান ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রামের মাধ্যমে। আর কথা বলতে অর্থাৎ শব্দের ধ্বনি অনুকরণ করতে শেখা মাত্রই সে দ্রুতগতিতে ভাষার প্রয়োগ আয়ত্ত করে। শিশু স্বভাবতই তার পিতামাতার ভাষাই শিক্ষা করে। পিতামাতা যদি সুরুচি ও সংস্কৃতির অধিকারী হন শিশুও নিজের ভিতর সেইসব বৃত্তির বিকাশ ঘটায়। সে শুদ্ধভাবে বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করে ও পিতামাতার সৎ বৃত্তি ও আচরণের অনুকরণ করে। এই হল তার যথার্থ শিক্ষা। আর আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যদি ধ্বংস না হয়ে যায় তাহলে নিজের গৃহেই শিশু সেরা ধরনের শিক্ষা পেতে থাকবে।

কিন্তু আজ আমরা যে শোচনীয় অবস্থার মধ্যে রয়েছি তাতে এ সম্ভব নয় এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠান ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে শিশুকে যদি বিদ্যালয়ে যেতেই হয় তাহলে দেখতে হবে যে বিদ্যালয় যেন তার ঘরের মত হয় এবং শিক্ষকরা যেন পিতামাতার মত হন। বিদ্যালয়ে যেন সংস্কৃতিসম্পন্ন গৃহ-পরিবেশের ধরনে শিক্ষা দেওয়া হয়। এর অর্থ হল এই যে প্রথম দিকে মুখে মুখে সব শিক্ষা দিতে হবে। এইভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশু

এক বছরে অন্য ভাবে অর্থাৎ অক্ষরজ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষিত শিশুর চেয়ে দশ গুণ বেশী শিখবে।

গল্প শেখার মত করেই প্রথম বছরে শিশুরা খুব সহজে মুখে মুখে প্রারম্ভিক ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি শিখবে। বেশ কিছু-সংখ্যক কবিতা তারা মুখস্থ করতে পারে। আর কোন প্রচেষ্টা বিনাই একরকম স্বতঃই তারা গুণতে শিখবে। আর তাদের উপর অক্ষর-জ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে না বলে তাদের মনের বিকাশ অবরুদ্ধ হবে না ও তাদের দৃষ্টিশক্তির অপব্যবহারও হবে না।

বিভিন্ন অক্ষর নকল করার জন্য তারা তাদের হাতকে কাজে লাগাবে না। কারণ এর ফলে তাদের হাতের লেখা চিরতরে খারাপ হয়ে যায়। এর পরিবর্তে তারা জ্যামিতির চিত্রসমূহ ও সহজ সরল ছবি আঁকবে। হাতের পক্ষে এ সুন্দর প্রাথমিক অনুশীলন হবে কারণ এর দ্বারা সমন্বয় ও কুশলতা—উভয় বৃত্তিরই অভিবৃদ্ধি হবে।

গুজরাত ও ভারতের কোটি কোটি শিশুকে যদি আমরা প্রাথমিক শিক্ষা দিতে চাই তাহলে এই তার একমাত্র পন্থা।

আজকে দেশের যা অবস্থা তাতে সব শিশুর হাতে বই তুলে দেওয়া অসম্ভব। আমি স্বীকার করছি যে যদি মনে হয় যে প্রাথমিক পর্যায়েও শিশুদের হাতে বই দেওয়া উচিত বলে মনে হয় তাহলে যা-ই খরচ পড়ুক না কেন বই দেবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে এটা কেবল অপ্রয়োজনীয় নয় ক্ষতিকারকও বটে তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে বই বাদ দেবার জন্য আমার এই যুক্তি খাটে। আমার এ পরিকল্পনাকে একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপ্রয়োজনীয় জিনিস বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকেও সর্বদা অবাঞ্ছিত প্রতীয়মান হয়। আদর্শ সভ্যতায় নৈতিকতা ও তথাকথিত বাস্তব নীতি দুই পরস্পরবিরোধী জিনিস হয় না।

সর্বশেষে আমি বলতে চাই যে এখানে যে শিক্ষা-পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করা হল আজকের শিক্ষক সম্প্রদায় তাকে রূপায়িত করতে পারবেন না। শিশুদের তাঁরা হয়ত বর্ণ পরিচয় করাতে ও সাধারণ গণিত শেখাতে পারবেন। কিন্তু আমার এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রথম বছরেই ছাত্রদের যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া উচিত তাঁরা স্বয়ং সে সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাঁরা নিজেরা শুদ্ধভাবে কথা বলতে পারেন না বলে শিশুদের কি করে শুদ্ধ করে কথা বলা শেখাবেন?

নবজীবন, ১৩-৫-১৯২৮

৫

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা

শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রসঙ্গে সম্ভবতঃ আমাদের ইউরোপের অভিজ্ঞতার কথা জানতে হবে। তবে এই ধারণাপরবশ হয়ে আমরা বলব না যে ইউরোপীয় সব কিছুই ভাল অথবা ইউরোপের পরিবেশে ইউরোপীয়দের জন্য যা মঙ্গলজনক এখানে ভারতবর্ষেও তা আমাদের পক্ষে শুভ হবে। পূর্বোক্ত যুক্তি যথার্থ স্বীকার করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে সরকারী বিদ্যালয় সমূহে যা চলছে তার বিস্তারিত মূল্যায়ন করা উচিত। সরকারী শিক্ষা স্বরাজের পরিপন্থী এবং আমাদের সভ্যতার পক্ষে ক্ষতিকারক। সুতরাং সরকারী বিদ্যালয়ে যা করা হয় তার বিপরিত জিনিসটি করলেই বোধহয় আমরা সঠিক সমাধানে উপনীত হব। এর কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক:

সেখানে শিক্ষার মাধ্যম হল ইংরাজী। এর থেকেই আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে জাতীয় শিক্ষায় কদাচ এরকম হওয়া উচিত নয়।

ওখানে বড় বড় ব্যয়বহুল ঘরবাড়ী আছে। আমাদের জানা

দরকার যে এটা অবাঞ্ছিত। আমাদের বিদ্যালয়ের ঘরবাড়ী দরিদ্রদের উপযুক্ত সাদাসিধে হবে।

ওখানে কেতাবী শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। দেশীয় হস্তশিল্পের উপর বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আরোপ না করে কেবল ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করা হয়। বলা বাহুল্য এটা ঠিক নয়।

ওখানে ধর্মশিক্ষার স্থান নেই। ধর্মশিক্ষা বলতে আমি বিশেষ কোন ধর্মমত বা সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের কথা বলছি না, সকল ধর্মের ভিতর যে সর্বসামান্য মূলনীতি বিদ্যমান তার প্রতি ইঙ্গিত করছি। প্রচলিত শিক্ষা সাধারণতঃ ছাত্রদের যেটুকু মঙ্গলবিধান করতে পারত আমরা জানি যে এর ফলে তাও নষ্ট হয়ে যায়। সরকারী বিদ্যালয়ে যে ইতিহাস শেখান হয় তা যদি পূর্ণ মাত্রায় মিথ্যা নাও হয় তা হল ইংরেজ সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশিত। জার্মান ফরাসী বা আমেরিকান ঐতিহাসিকরা ঐ একই বিষয়কে ভিন্ন ভাবে লিখতেন ও তার ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা করতেন। উদাহরণ স্বরূপ এমনকি পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের মত সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে সরকার এক ধরনে লিখছেন এবং জাতীয়তাবাদীরা লিখছেন ভিন্ন ধরনে।

সরকারী বিদ্যালয়ে যেভাবে অর্থশাস্ত্র শেখান হয় তা সরকারী-নীতির সমর্থক। অথচ আমরা এসব দেখি সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে চরিত্র সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা না করেই শিক্ষক নিয়োগ করা হয় আমাদের বিদ্যালয়ে সেখানে শিক্ষকদের সুউচ্চ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিজ কাজ সম্বন্ধে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকে এবং তাঁদের মাইনেও সবচেয়ে কম। পক্ষান্তরে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। অবশ্য মাইনে তাঁরাও কম পাবেন। তবে তার কারণ তাঁদের অসহায় অবস্থা নয়, স্বার্থত্যাগ বৃত্তি।

আমাদের ছাত্ররা দেশের গ্রামীণ সভ্যতার ভিত্তি দৃঢ় করা ও এর পুনরুজ্জীবন করার জন্য কাজ করবে। গ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তারা জ্ঞান অর্জন করবে, গ্রামবাসীদের মধ্যে যে ত্রুটি বিচ্যুতি দেখতে পাবে তা দূর করার জন্য তারা প্রয়াস করবে এবং নিজেদের ছেলেমেয়েদের শহরের চাকচিক্যে সম্মোহিত না হয়ে ভাল কৃষক ও ভাল গ্রামবাসী হবার শিক্ষা দেবে। এইভাবে যতদিন না আমরা শহরের প্রচলিত শিক্ষার রূপ ও চারিত্রধর্মে মৌলিক পরিবর্তন সংসাধন করতে পারি, আমরা এই বিদ্যাপীঠের (গুজরাত বিদ্যাপীঠ) অন্যতম আদর্শের পরিপূর্তি করতে সক্ষম হব না।

নবজীবন, ২০-৫-১৯২৮

৬

প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ

পাছে লোকে কিছু বলে অথবা ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাবে কিংবা প্রতিষ্ঠান লোকচক্ষে হেয় হবে—এইসব কারণে আমরা আজ প্রচলিত ব্যবস্থার কোনরকম পরিবর্তন করতে ইতস্তত করি। কিন্তু সাহস করে আমরা যদি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সংসাধন করি তাহলে এইসব বিদ্যালয় থেকে গ্রামের সেবা করতে সঙ্কল্পবদ্ধ একদল কর্মী বেরোবে যারা অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে শহরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।

এইসব বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ ছাত্ররা প্রথম শ্রেণীর ধুনুরী কাটুনী ও তাঁতী হবে। কাপাস চাষে তারা হবে বিশেষজ্ঞ। গ্রামের পক্ষে প্রয়োজনীয় সূত্রধরের কাজ তারা জানবে। অর্থাৎ তারা ভাল চরখা তৈরি করতে পারবে এবং গরুর গাড়ী ও লাঙ্গল ইত্যাদি তৈরি করতে না পারলেও অন্ততঃ মেরামত করতে পারবে। এছাড়া গ্রামজীবনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন সীবন-বিদ্যা তারা জানবে। তাদের হাতের লেখা ভাল হবে এবং সরল অথচ শুদ্ধ

গদ্য তারা লিখতে শিখবে। এছাড়া তারা সাধারণ হিসাব-কিতাবও জানবে। রামায়ণ মহাভারতের মত পুরাণ-গ্রন্থ সম্বন্ধে তাদের সম্যক্ জ্ঞান থাকবে ও এইসব পুরাণকে বর্তমানের পটভূমিকায় ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা তাদের জন্মাবে। গ্রামের খেলাধূলা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি সম্বন্ধে তারা জানবে। সাধারণ রোগ নির্ণয়ক্ষমতা ও টোটকা চিকিৎসা দ্বারা তার নিরাময় পদ্ধতিও তাদের জানা চাই। গ্রামের কূপ পুষ্করিণী ও আবর্জনাস্তূপ পরিষ্কার করার প্রক্রিয়া তাদের শিখতে হবে। তালিকা আরও দীর্ঘ করতে পারতাম কিন্তু তা না করে কেবল এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্রদের এইভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তারা গ্রামবাসীদের সর্বাধিক প্রকারে সেবা করতে পারে। ছাত্রদের এইভাবে প্রশিক্ষিত করতে যে ব্যয় হবে তাকে শিক্ষাব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। একমাত্র এই জাতীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হলেই আমরা গ্রামে প্রবেশ করে গ্রাম্যজীবনের সংস্কার সাধন করার যোগ্যতা অর্জন করব।

আমি জানি যে আপনাদের কারও কারও মনে এই আশঙ্কা আছে যে আমরা যদি এইসব পরিবর্তনের প্রবর্তন করি এবং পূর্বোক্ত প্রকারে আমাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে ঘোষণা করি তাহলে আমাদের বিদ্যালয়গুলি শূন্য হয়ে যাবে। কিন্তু এ আশঙ্কা যদি বাস্তবে পরিণতও হয় তবু সত্যের খাতিরে আমি এর সম্মুখীন হতে প্রস্তুত হব।...

পুস্তক প্রকাশনের ব্যাপারে আজকাল খুবই বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়। প্রত্যহ কিছু না কিছু পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে। যাঁরই কিছুটা ভাষাজ্ঞান আছে অথবা আছে বলে মনে হয় অথবা যিনিই কোন বিষয়ে কিছুটা অধ্যয়ন বা চিন্তা করেছেন বলে বিবেচনা করেন তিনিই নিজ বিচারধারা লিখিতভাবে ব্যক্ত করার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। তারপর সেই লিখিত বিষয় ছাপান এবং ভাবেন যে এর দ্বারা

তিনি জাতির সেবা করছেন। এর ফলে ছাত্রদের মন ও অভিভাবকদের অর্থ-সঙ্গতির উপর খুব চাপ পড়ছে। ছাত্রদের বৌদ্ধিক বিকাশ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। তাদের মন উদ্ভট ও অসংবদ্ধ তথ্যের গুদামঘরে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, মৌলিক চিন্তাধারার কোন স্থান থাকে না সেখানে। আর সেসব তথ্যও সুসংবদ্ধ ভাবে নিজের জায়গায় সাজান-গোছান থাকে না, সেগুলি থাকে কুঁড়ে লোকের ঘরের জিনিসের মত এলোমেলো ভাবে। ছাত্ররা না এর কোন সম্যক্ ব্যবহার করতে পারেন আর না জনসাধারণের এর ফলে কোন উপকার হয়।

সুতরাং ক্ষমতা থাকলে আমি আজকে জনসাধারণের হাতে যে বহুসংখ্যক পুস্তক দেওয়া হচ্ছে তা বন্ধ করতাম, এমন কি যেসব ছাত্র লিখতে পড়তে জানে তারাও অধিকাংশ বিষয় শিক্ষকদের মুখ থেকে শেখে। আমি তাই ছাত্রদের কয়েকটি বাছাই করা বই পড়তে দেব। তবে তারা যা পড়বে তা নিয়ে চিন্তা করবে এবং তার মধ্যে যা কাজের মনে হবে তদনুযায়ী আচরণ করবে। এরকম করলে তাদের জীবন সুন্দর ও পবিত্র হবে এবং তারা সর্বদা শক্তি ও উদ্যম অনুভব করবে। এর ফলে তারা শিক্ষার খাঁটি লক্ষণ—চিন্তা করতে ও সত্যাসত্যের বিচার করতে শিখবে। এই শিক্ষাই আমাদের দেশের দরিদ্র অধিবাসীদের উপযুক্ত ও তাদের পক্ষে লাভজনক। এর ফলে ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণ উভয়েরই কল্যাণ হবে।

নবজীবন, ২৭-৫-১৯২৮

৭

কয়েকটি প্রশ্ন

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত তিনটি প্রবন্ধ লেখার পর এবার আমার পক্ষে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ।

"একবার আপনি লিখেছিলেন যে ইংরাজীর বোঝা হাল্‌কা করে

দিলে ছাত্রদের জীবনে যে কয়েকটি বছরের মূল্যবান সময় বর্তমানে নষ্ট হচ্ছে তা বাঁচান যেত। আপনার মতে সময়ের এই অপচয় বছরের হিসাবে কতটা এবং এর ফলে সমাজের কতটা ক্ষতি হয় ?"

ইংরাজীর বোঝা হাল্‌কা করা বলতে আমি কি বুঝি প্রথমে তা ব্যাখ্যা করি। আমি একথা বলতে চাই না যে ছাত্ররা আদৌ ইংরাজী শিখবে না। আমরা এ ভাষা শিখব ও তার ব্যবহার করব, তবে একজন ফরাসী যতটুকু শেখে ততটুকু। অর্থাৎ লোকে কোন বিদেশী ভাষা যতটুকু শেখে আমরাও ততটুকু ইংরাজী শিখব। আমাদের ইংরাজী শেখার পরিধি যদি আমরা এইভাবে নির্ধারণ করি তাহলে আমাদের আর ইংরাজীতে চিন্তা করার কথা ভাবতে হবে না অথবা নিখুঁত উচ্চারণে ইংরাজী বলার জন্য সচেষ্ট হতে হবে না কিংবা ইংরেজেদের মত শুদ্ধভাবে ইংরাজী লেখার কথা ভাবতে হবে না। আমার মনে হয় যে এই নিরর্থক প্রচেষ্টার জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে অন্ততঃ তরে জীবনের পাঁচ বছর সময় নষ্ট করতে হয়। শুধু এই নয়, যে বিষয় শিখতে তার মন চাইছে না তা শেখার জন্য জোর করে চেষ্টা করতে হয় বলে তার মৌলিক চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। তার শরীর হয়ে পড়ে ক্ষীণ এবং সে অলীক জিনিসের অনুকরণকারী প্রায় ব্লটিং কাগজের মত হয়ে পড়ে। মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করলে এই পাঁচ বছরে মানুষ আরও কত শিখতে পারত। কতটা সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হত এতে ? নিজের ভাষার মাধ্যমে সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক বিদেশী ভাষার কঠিন উচ্চারণবিধি আয়ত্ব করার হাঙ্গামার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে।

২. প্রথমের দিকে শিশুদের শিক্ষা ও শেষের দিকে কলেজের শিক্ষা—দুই-ই খুব ব্যয়বহুল। জাতীয় শিক্ষায় কি এই দুই-ই ঠাঁই পাবে ? এই দুই পর্যায়ে অল্পব্যয়ে সমপরিমাণ উচ্চমানের শিক্ষার ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা কি আপনার আছে ?

পূর্ববর্তী প্রবন্ধ তিনটিতে আমি এই কথা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে শিশুদের শিক্ষাকে কিভাবে সস্তা এবং এমনকি প্রায় স্বাবলম্বী করা যায়। কলেজের শিক্ষার ক্ষেত্রেও যদি একই দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তন করা যায় তাহলে একেও সস্তা করা যেতে পারে এবং সে ব্যবস্থায় ছাত্ররা এমন শিক্ষা পাবে যার দ্বারা জাতি বলিষ্ঠ হবে। 'সমপরিমাণ উচ্চমানের শিক্ষা' বলতে পত্রলেখক যদি সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষার কথা মনে করে থাকেন তাহলে এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। কারণ আমি সরকারী ধরনের শিক্ষাকে আদৌ বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি না। জাতীয় কলেজ বা বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা সরকারী বিদ্যায়তনের শিক্ষা থেকে পৃথক এবং বহুদিক থেকে মৌলিক। সুতরাং জাতীয় বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষা নিজস্ব মানদণ্ডে ভাল।

:. আপনি তো বর্ণব্যবস্থা অর্থাৎ সমাজের চারিটি বিভাগের যথার্থতায় বিশ্বাসী। তাহলে আপনি কি বিশ্বাস করেন যে ছাত্রদের শিক্ষাব্যবস্থা বর্ণ অনুযায়ী পৃথক পৃথক হবে ?

শিক্ষা বর্ণ অনুযায়ী পৃথক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। বিভিন্ন বর্ণের ভিতর বহু বিষয়ে ঐক্য আছে এবং প্রত্যেক বর্ণের শিক্ষাব্যবস্থা একই ধরনের হওয়া উচিত। শিক্ষার মুখ্য লক্ষ্য হল ছাত্রছাত্রীদের সুন্দর পুরুষ বা নারীতে পরিণত করা। আর যিনি সুন্দর মানুষে পরিণত হবেন সহজেই তিনি মানব-সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী আচরণবিধি—যার দ্বারা মানুষের গৌরবের অভিবৃদ্ধি হয়—সে সম্বন্ধে জানবেন। বর্ণ বলতে আমি এই কথা বুঝি যে বৃত্তি বা কর্মের বিভিন্নতার উপর যখন বর্ণব্যবস্থার আধার এবং প্রত্যেক বর্ণকে যখন তার নির্দিষ্ট বৃত্তি থেকে জীবিকা অর্জন করতে হয় তখন দেখা যাবে যে সাধারণতঃ কোন এক বিশেষ বর্ণের মানুষ স্ব-শ্রেণীর স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারী হবেন। তবে আমি একথা বলতে চাই না যে কোন বিশেষ বর্ণ অন্য তিনটি বর্ণের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য পায় না বা পেতে পারে না। কারও কাছে নিজেকে ভাড়া খাটিয়ে কোন ব্রাহ্মণ নিজ

জীবিকা উপার্জন করবেন না। কিন্তু তিনি যদি সেবার কলা না জানেন বা সেবা করতে লজ্জিত হন তাহলে তিনি মোটেই ব্রাহ্মণ নন। নিঃস্বার্থ সেবা বিনা শুদ্ধ জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। অনুরূপ ভাবে কোন শূদ্র হয়ত বেদাদির অধ্যাপনা না করতে পারেন এবং জনসাধারণ কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রদত্ত ভিক্ষায় নিজ জীবন নির্বাহ করতে পারেন। কিন্তু যে-কোন সুসংগঠিত সমাজে বেদাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান তাঁকে দেবার ব্যবস্থা থাকবে।

৪. একথা কি সত্য যে প্রয়োজনীয় হস্তশিল্পের সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ পেলে সব রকমের শিক্ষা হয়ে যায় এবং বৌদ্ধিক শিক্ষা কি অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য ছাড়া আর কিছু নয়? একথা যদি সত্য হয় তাহলে আপনি মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাকে অনুমোদন ও সমর্থন করেন কেন?

পূর্বোক্ত অভিমত যতটা সত্য ততটাই আবার ভ্রান্ত। লোকে যেখানে বৌদ্ধিক শিক্ষাকে শিরোভূষণ করেছে সেখানে আমি বলি যে শিল্প-শিক্ষায় সব রকমের শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত। কারণ তথাকথিত বৌদ্ধিক শিক্ষা ও শিল্প-শিক্ষার ভিতর কোন দুরতিক্রম্য বাধা নেই। এরা পরস্পর সম্পর্কবিহীন কোন পৃথক বিষয় নয়। পক্ষান্তরে শিল্প ও হাতের কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের পূর্ণ অবকাশ বিদ্যমান। আর সাহস সহকারে আমি এই দাবী পেশ করতে চাই যে শিল্প-শিক্ষা ও হাতের কাজ ব্যতিরেকে বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ বিকাশ অসম্ভব। কোন রাজমিস্ত্রি যদি কেবল তার পেটের ভাতের সংস্থান করতেই শিখে থাকে তাহলে একথা বলা যায় না যে সে শিক্ষা পেয়েছে। সুতরাং রাজমিস্ত্রির শিক্ষায় সমাজ-জীবনে তার শিল্পের স্থান, ইঁট পাতার বিজ্ঞান, গৃহের ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, ভাল ঘর তৈরি করতে কি কি প্রয়োজন এবং মানবের বাসগৃহ ও সভ্যতার পারস্পরিক সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। বৌদ্ধিক শিক্ষা বলতে কোন কোন বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া আর কিছু

বোঝায় না মনে করা নিতান্ত ভ্রমাত্মক ধারণা। এসব বিষয়ের জ্ঞান ছাড়াই বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হতে পারে। যে শিক্ষক ছাত্রের মনকে সব রকমের তথ্য জমা করার তাক-এ পরিণত করতে চান তিনি শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রথম পাঠ-ই পান নি। উপরি-উক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এবারে নিশ্চয় পাঠক বুঝতে পেরেছেন যে কেন আমি পত্রলেখকের অভিমতকে যুগপৎ সত্য ও ভ্রমাত্মক আখ্যা দিয়েছি। শিল্প ও বৌদ্ধিক শিক্ষা সম্বন্ধে আমার অভিমতকে উপরি উপরি ভাবে স্বীকার করে নিলে এ মিথ্যা। তবে বৌদ্ধিক শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণকে যদি দুটি পৃথক পৃথক বিষয় মনে করা হয় তাহলে পত্রলেখকের অভিমত সত্য।···আমার পরিকল্পিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে রাজমিস্ত্রি সূত্রধর ও তাঁতী পেটের ভাত রোজগার করার জন্য যতটুকু কাজ না জানলে নয় এমন ধরনের মজুর হবেন না, তাঁরা হবেন বুদ্ধিমান সমাজসেবক। আমি আশা করি যে মহাবিদ্যালয়ের তাঁতী মুচি স্বর্ণকার ও কৃষক ছাত্রদের ভিতর থেকে কবীর, ভোজা ভগত, আখা ও গুরুগোবিন্দের মত মহাপুরুষের সৃষ্টি হবে। আর কারই বা একথা বলার সাহস আছে যে কবীর, ভোজা ভগত, আখা ও গুরুগোবিন্দ বৌদ্ধিক শিক্ষাবিহীন ছিলেন?

৫. হস্তশিল্পের জ্ঞানই যদি শিক্ষার সার কথা হয় তাহলে মহা-বিদ্যালয়ের দায়িত্ব আপনি কেন সূত্রধর কর্মকার ও তাঁতীদের দ্বারা গঠিত একটি সমিতির উপর অর্পণ করেন না? তারপর তাঁরা ইচ্ছা করলে বৌদ্ধিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়োগ করবেন।

আমার মনে হয় পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরের ভিতর এই প্রশ্নের উত্তরও নিহিত। কবীরের মত তাঁতী পেলে আমি নিঃসন্দেহে তাঁর হাতে বিদ্যাপীঠ পরিচালনার দায়িত্ব দেব এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস 'বৌদ্ধিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা' এ জাতীয় পরিচালকদের অধীনে কাজ করাকে সম্মানজনক ব্যাপার বিবেচনা করেবন। চারুকলা ও হস্তশিল্পকে আমরা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত করি নি বলেই আজ আমাদের

সমাজে শিল্পী ও কারিগরদের হীন অবস্থা এবং এইজন্য আমাদের সমাজসবার প্রয়াসে তাঁদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না।

৬. বিদ্যাপীঠের লক্ষ্য ঘোষণার বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে দেশের উন্নতি নির্ভর করে গ্রামের উপর, শহরের উপর নয়। তা যদি সত্য হয় তাহলে কেন আপনি শহরের ছেলেদের নষ্ট করছেন? গ্রামীণ শিক্ষা যদি দিতেই হয় তবে গ্রামের ছেলেদের তা দিন। কিন্তু শহরের ছেলেরা তো শহুরে জীবন যাপন করতে চায়। তাহলে কেন তাদের এমন শিক্ষা দেন না যা তাদের শহরের উপযুক্ত করে গড়ে তোলে? আর বিদ্যাপীঠের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সবটাই কি আপনি শহর থেকে পান না? অবশ্য আপনি যদি বিদ্যাপীঠকে কোন আদর্শ গ্রামে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বিদ্যাপীঠের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ শস্য ও কাপাস ইত্যাদি সেখান থেকেই সংগ্রহ করেন তাহলে আমাদের বলার কিছু নেই।

সৌভাগ্যক্রমে বহুলসংখ্যক শহরবাসী ও শহরের ছাত্রদের মনে এ প্রশ্ন ওঠে না। গ্রামের প্রতি অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রায়শ্চত্ত করার অভিলাষ যেসব শহরবাসী ব্যক্ত করেছেন তাঁরা কেমন করে বলবেন যে গ্রামের ছেলেদের গ্রামের ব্যয়ে গ্রামীণ শিক্ষা দেওয়া হক? শহরের লোকেদের মনযোগ গ্রামের প্রতি আকৃষ্ট হবার ফলে বিদ্যাপীঠের জন্ম হয়েছে। শহরের লোকেদের চোখ খোলার পরই তাঁরা বিদ্যাপীঠ স্থাপনা করার সিদ্ধান্ত করেন। বিশেষ ভাবে গ্রামের উন্নতিবিধান বিদ্যাপীঠের লক্ষ্য বলেই কেন গ্রামবাসীদের এর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতে বলা হবে? অন্ততঃ সাময়িকভাবে গ্রামবাসীদের শিক্ষাব্যয়ের সংস্থান করা শহরবাসীদের কর্তব্য। সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের যে অভিযোগ গ্রামবাসীরা শহরবাসীদের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ করতে পারেন। তাঁরা বলতে পারেন "শহরবাসী আপনারা অতীতে আমাদের শোষণ করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন।

দয়া করে এবার এ অত্যাচার বন্ধ করুন। আমরা তাহলে অতীতের কথা ভুলে যাব।" আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করেছি এবং নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি। এই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হল সরকারের সঙ্গে অসহযোগীতা করা—যে সরকারের ছত্রছায়ায় ও যার সাহায্যে অতীতে আমরা গ্রামবাসীদের প্রাণরস অপহরণ করেছি এবং এখনও করে চলেছি। দ্বিতীয় ধাপে অসহযোগের গভীরতর তাৎপর্য উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সহযোগীতার অনুচিত সুযোগ সুবিধা বর্জন করতে শিখলাম। অসহযোগ শুরু করে আমরা যদি চুপচাপ বসে থাকতাম তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠত যে আমরা অসহযোগের অর্থ বুঝি নি। কেউ যদি আমাদের ঘর লুঠ করতে আসে তাহলে তাকে সাহায্য না করাই যথেষ্ট নয়। তার হীন কার্য থেকে তাকে নিবৃত্ত করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে লুঠের বখরা নেওয়াও ছাড়তে হবে। তাহলেই কেবল বলা যাবে যে লুণ্ঠনকারীর সঙ্গে যথার্থ অসহযোগীতা করা হয়েছে। এই অসহযোগ হিংস বা অহিংস, উদ্দণ্ড অথবা শান্তিপূর্ণ, পশুশক্তি কিংবা আত্মশক্তি ভিত্তিক হতে পারে। আমরা আত্মশক্তি আধারিত অহিংস ও শান্তিময় অসহযোগের পথ অবলম্বন করেছি। আর এরই প্রক্রিয়ায় আমরা উপলব্ধি করেছি যে অতীতে বহু শহরবাসী গ্রামের সম্পদের যে শোষণ করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমরা অন্ততঃ গ্রামবাসীদের কিয়ৎপরিমাণ সেবা করব। আমাদের এই উপলব্ধিই বিদ্যাপীঠের জন্মের মূলে রয়েছে।··· শহরবাসীরা যে অর্থ দান করেছেন তার একটা বড় অংশ কেন গ্রামবাসীদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে এই হল তার যথেষ্ট কারণ। আর এখনকার মত গ্রামবাসীদের কাছে শিক্ষার আলোক-বর্তিকা নিয়ে যাওয়া হবে বিদ্যাপীঠে প্রশিক্ষিত কেবল শহরের ছাত্রদের মারফত।

৭। আমরা স্পষ্টতঃ দেখতে পাচ্ছি যে ব্রহ্মচর্যের অভাবে জাতি

দৈহিক ও মানসিক—উভয় দিক থেকেই দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং দুঃসাহসিক কার্যকলাপ উদ্যম ও ধৈর্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এর অধোগতি হয়েছে। তাহলে আপনি কেন বিদ্যাপীঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ঘোষণাপত্রের শেষ ধারায় ব্রহ্মচর্যকে অন্তর্ভুক্ত করেন নি?

প্রশ্নটি ভাল। তবে একথা প্রমাণ করা যায় না যে কেবল ব্রহ্মচর্যের অভাবের কারণই জাতির দুঃসাহসিক বৃত্তি এবং উদ্যমের অপহ্নবকারী দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা জাতির উপর ভর করেছে। আর একথাও প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে ব্রহ্মচর্যের কারণ সর্বদা দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। এইজন্য ব্রহ্মচর্যকে দৈহিক শক্তি বা দুর্বলতার সঙ্গে জড়িয়ে এই পারমার্থিক বিষয়টির গুরুত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টিভ্রম ঘটান উচিত নয়। কারণ ঐগুলি হল ঐহিক ব্যাপার। পাশ্চাত্যবাসীরা ব্রহ্মচারী নন অথচ দৈহিক বা মানসিক দিক থেকে তাঁরা দুর্বলও নন। তাঁদের ধৃতিশক্তি ও উদ্যম চমৎকার এবং আদর্শস্থানীয়। সৈন্যবাহিনীর গুর্খা পাঠান শিখ ডোগরা এবং ইংরেজরা ব্রহ্মচারী নন; কিন্তু তাঁদের শরীরের গঠন মজবুত। দৈহিক শক্তির প্রতিযোগীতায় তাঁরা সহজেই আমাদের ব্যায়ামশালার ছাত্রদের পরাভূত করে দেবেন। সুতরাং ব্রহ্মচর্য ব্যতিরেকে দৈহিক ক্ষমতা, এমনকি এক ধরনের মানসিক শক্তি, অবিরত প্রচেষ্টা করার প্রবণতা এবং উদ্যম আয়ত্ত করা যায় না—এই উক্তি সপ্রমাণ করা যায় না, একথা বলা যেতে পারে। আমার ধারণার ব্রহ্মচর্য, যে ব্রহ্মচর্য মানুষকে ব্রহ্মের উপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে তা দৈহিক ও মানসিক দক্ষতার ঊর্ধ্বে। এ ব্রহ্মচর্য স্বয়ং লক্ষ্য ও সেই লক্ষ্যসাধনের মাধ্যম। আমি তাই এই লক্ষ্যসাধনের জন্য দেহকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। দেহে আসক্ত ব্যক্তি কদাচিৎ অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারে। ভীষ্ম ইত্যাদি অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন—এ উদাহরণ দিলে এক্ষেত্রে আমরা বিভ্রান্ত হব। রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলীর শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করলে আমরা ভুল করব। এসবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

উপলব্ধি করে তদনুযায়ী আচরণ করতে হয়। যথার্থ সত্যানুসন্ধান ও তত্ত্বান্বেষী বৃত্তি চালিত হয়ে এরকম করলে নিঃসন্দেহে আমরা এগিয়ে যাব।

আমাদের এ দেহ অবহেলাভরে ফেলে দেবার জিনিস নয়। একে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। দেহ কখনও কখনও রাবণের বাসভূমি হলেও অযোধ্যার রামচন্দ্রের লীলাক্ষেত্রও বটে। এ যদি কর্মের কুরুক্ষেত্র হয় তাহলে কর্তব্যের ধর্মক্ষেত্রও বটে। সুতরাং একে উপেক্ষা করা চলে না। একে সবল ও কর্মক্ষম রাখতে হবে। সুতরাং শরীরচর্চা করা প্রয়োজন। তবে শরীরচর্চা সম্বন্ধে এর বেশী প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করা যায় না এবং ছাত্রদের মধ্যে একে জনপ্রিয় করার জন্য এই যথেষ্ট হওয়া উচিত। শরীরচর্চা ও ব্রহ্মচর্যের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে—এমন কথা আমরা জোর করে বলতে পারি না। এ কেবল অতিরঞ্জনই হবে না, এতে আর একটি বিপদের আশঙ্কা আছে। এ বিপদ হল এই যে দুর্বল স্বাস্থ্যের কোন মানুষ এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে ব্রহ্মচর্যের অনুশীলন ছেড়ে দিতে পারে যে ব্রহ্মচর্য পালনের কারণই তার এই ব্যর্থতা।

ব্রহ্মচর্যের শারীরিক শক্তির সমর্থনের প্রয়োজন নেই। এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অন্যত্র। পাশ্চাত্য দেশবাসীর হয়ত দৈহিক শক্তি ও মানসিক উদ্যম আছে; কিন্তু চিৎশক্তি তাঁদের নেই। সুতরাং যখন দেখতে পাচ্ছি যে প্রতি মুহূর্তে তাঁরা নিম্নপ্রকৃতির প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করছেন, বাসনার বিন্দুমাত্র বিরোধ করতে পারছেন না এবং অপরাপর জাতিকে লুণ্ঠন করার জন্য তাঁরা নিজেদের কর্মশক্তি উদ্যম ও দক্ষতাকে নিয়োগ করছেন তখন তাঁদের দৈহিক শক্তি ও মানসিক উদ্যম সম্বন্ধে ঈর্ষার ভাব পোষণ করার কি আর কারণ থাকতে পারে? তাঁদের অনুকরণ করার কথাই বা কি করে আমরা চিন্তা করতে পারি? তাঁদের শক্তি ও উদ্যমে ব্রহ্মচর্যের অভাবের নিদর্শন

সুপরিস্ফুট। এই কারণে তাঁদের এই শক্তি পৃথিবীর যথার্থ প্রগতির পরিপন্থী বিবেচিত হয়েছে এবং এইজন্যই আমি একে শয়তানীর দ্যোতক আখ্যা দিয়েছি। আমি পাশ্চাত্য দেশের নিন্দা করছি না কিংবা সে দেশকে খাট করতে চাই না। সে দেশে এমন অনেকে আছেন যাঁরা সত্য ও অপরাপর নৈতিক গুণাবলীর অনুগামী। পাশ্চাত্য দেশে অনেক ব্রহ্মচারীও আছেন। পাশ্চাত্য দেশের যেসব অবাঞ্ছনীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমি বললাম সে সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন। সুতরাং পশ্চিম সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও আমরা তার ভয়ঙ্কর প্রচেষ্টার কুপরিণাম সম্বন্ধে বলতে পারি। পাশ্চাত্য সভ্যতা যদি ব্রহ্মচর্যের দৃঢ় বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হত তাহলে পৃথিবীর চেহারা আজ পাল্টে যেত। পৃথিবীর তাহলে আজকের মত শোচনীয় দশা হত না, পৃথিবী হত মহৎ নরনারীর আবাসভূমি, সুখ ও রমণীয়তার আকর। ব্রহ্মচর্য পালন না করার এই কুফল সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আমরা জনসাধারণের সামনে ব্রহ্মচর্যের আদর্শকে তুলে ধরব। ব্রহ্মচর্য ব্যতিরেকে চিত্তের পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। ব্রহ্মচর্যব্রত-বিহীন মানুষ বল্গাবিহীন উদ্দণ্ড ঘোড়ার মত আচরণ করতে পারে কিন্তু সংস্কৃতির নিদর্শন শিষ্টাচার ও পবিত্রতা তার অধিগত হবে না। ব্রহ্মচর্য ব্যতিরেকে কোন সাত্ত্বিক প্রচেষ্টা বা প্রয়াস হতে পারে না। এমন মনে হতে পারে যে ব্রহ্মচর্য ব্যতিরেকেই কেউ সবল ও উদ্যমী মনের অধিকারী। কিন্তু দেখা যাবে যে সে মন হাজার রকমের কামনা বাসনা ও প্রলোভনের শিকার। অনুরূপভাবে ব্রহ্মচর্য ছাড়াই কেউ সুগঠিত ও সবল দেহের অধিকারী হতে পারে কিন্তু সে-দেহ যথার্থ সুস্থ হবে না। স্বাস্থ্যের জন্য পেশীর শক্তি বা মেদবাহুল্য অপরিহার্য নয়। বাঁশের কঞ্চির মত সরু কোন দেহ শীত রোদ বৃষ্টি বরদাস্ত করেও সুস্থ থাকতে পারে। অথচ ব্রহ্মচর্য ব্যতিরেকে এরকম স্বাস্থ্যলাভ অসম্ভব। এ বিশ্বাস আমার আজ হয়নি ; আমার এ বিশ্বাস অতি পুরাতন এবং

অভিজ্ঞতাভিত্তিক। প্রতিটি অপবিত্র চিন্তা কিভাবে মানুষের উত্তম বিনষ্ট করে এবং তার আত্মার সর্বনাশ সাধন করে এর অসংখ্য উদাহরণ আমি আমার নিজের এবং বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মিদের জীবন থেকে দিতে পারি। আমি তাই বলব যে আত্মোপলব্ধিকামীকে শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে।

আমাদের ছাত্রসমাজের ভিতর শরীর ও মনের যে দুর্বলতা দেখা যায় তার কারণ অন্যত্র নিহিত। বাল্যবিবাহ, সংসারের চাপ ও দারিদ্র্যের কারণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ইত্যাদি এর মূলে বিদ্যমান। পাঠকেরা যেন এই ভুল না করেন যে বাল্যবিবাহ মানেই ব্রহ্মচর্যের অভাব। এইসব কুপ্রথার অবসানের জন্য কঠিন ও নিরন্তর প্রয়াস প্রয়োজন।

৮। বিদ্যাপীঠের শিক্ষা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর—এই তিনটি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত। এই তিন ভাগকে গ্রামীণ শিক্ষা, শহরের শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক শিক্ষা নাম দেওয়া কি সঙ্গত হবে?

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার যে অর্থ পত্রলেখক এখানে করেছেন আমার তা মনঃপুত নয়। কেন আমরা চাইব যে গ্রামবাসীরা কেবল প্রাথমিক শিক্ষাতেই সন্তুষ্ট থাকবেন? তাঁরাও—অন্ততঃপক্ষে তাঁদের মধ্যে যাঁরা ইচ্ছুক মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা পাবার অধিকারী। আর শহরের ছেলেদেরও প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া চলবে না। উপরি-উক্ত তিন পর্যায়ের শিক্ষারই লক্ষ্য হবে গ্রামের সমৃদ্ধি।

৯। সঙ্গীতের উপর আপনি সর্বদা এত গুরুত্ব আরোপ করেন কেন?

বলা হয়ে থাকে যে আমাদের দেশে আজকে সঙ্গীত-শিক্ষা উপেক্ষিত। সঙ্গীত-শিক্ষা ব্যতিরেকে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাই আমার কাছে অপূর্ণ বলে মনে হয়। সঙ্গীত ব্যক্তিজীবনে ও জনসমষ্টির সামাজিক জীবনে মাধুর্য সৃষ্টি করে। শ্বাস-প্রশ্বাস সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য যেমন প্রাণায়াম প্রয়োজন স্বরনিয়ন্ত্রণের জন্য তেমনি প্রয়োজন

সঙ্গীতের। আমাদের দেশের জনসভায় গোলমাল ও হট্টগোল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। জনসাধারণের ভিতর সঙ্গীতচর্চার পরিব্যাপ্তি ঘটলে এইসব গোলযোগ নিয়ন্ত্রণে তা অনেকটা সহায়ক হবে। সঙ্গীত ক্রোধের উপশম ঘটায় এবং বিচারবুদ্ধি সহকারে এর প্রয়োগ হলে মানুষের ঈশ্বরোপলব্ধির খুবই সহায়ক হয়। সঙ্গীত বলতে অবশ্য যেমন-তেমনভাবে কোন সুর নিয়ে গলাবাজী করা অথবা সিনেমার গান গাওয়া বোঝায় না। সঙ্গীতের সাধারণ অর্থ আমি পূর্বেই বলেছি। তবে এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল এই যে আমাদের সমগ্র জীবন সঙ্গীতের মত মধুর ও সুর সুষমামণ্ডিত হবে। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য যে সত্য সততাপ্রমুখ সদ্‌গুণাবলীর অনুশীলন ব্যতিরেকে জীবন ঐ রকম সঙ্গীতময় হতে পারে না। জীবনকে সঙ্গীতময় করার অর্থ একে ঈশ্বরের অঙ্গীভূত করা, তাঁর মধ্যে জীবনকে বিলীন করে দেওয়া। যিনি রাগ দ্বেষ অর্থাৎ পছন্দ অপছন্দের ঊর্ধ্বে ওঠেন নি, যিনি সেবার আনন্দধারার রসাস্বাদন করেন নি তিনি কখনও ঐশী সঙ্গীত বুঝতে পারবেন না। যে সঙ্গীত অনুশীলনের সঙ্গে এই ঐশী শিল্পের নিগূঢ় তত্ত্বের সম্বন্ধ নেই আমার কাছে তার কিঞ্চিৎমাত্র মূল্য নেই।

১০। চিত্রকলার অর্থ হল রেখা ও রঙের মাধ্যমে শিল্পীর আবেগসমূহের অভিব্যক্তি। চিত্রকলার এই সংজ্ঞার্থ স্বীকার করে নিলে আপনি কি চিত্রকলাকে জাতীয় শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করবেন ও সবাইকে এই বিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা করবেন ?

চিত্রাঙ্কন বিদ্যাকে আমি কখনও হতোৎসাহিত করি নি। তবে চিত্রশিল্পের নামে কালি আর রঙের যে নিরর্থক অপপ্রয়োগ চলছে তার হাত থেকে অবশ্যই পরিত্রাণ চেয়েছি। চিত্রকলার যে সংজ্ঞার্থ শিল্পীরা দিয়ে থাকেন তাকে মানতে হলে এই বিদ্যাকে সার্বজনীন করা যায় কি না সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। সঙ্গীত ও চিত্রকলার মধ্যে এই হল পার্থক্য। চিত্রাঙ্কনকলা শিখতে পারে অল্প

কয়েকজন, যাদের এর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। আর সঙ্গীত সবাই শিখতে পারে এবং সকলের শেখা উচিতও। অবশ্য চিত্রকলার ক্ষেত্রেও সরল রেখা এবং জীবিত ও প্রাণহীন প্রাণী ও বস্তুর আকৃতি অঙ্কন করার কলা সকলকে শেখান যায়। এটা নিঃসন্দেহে উপকারী ও প্রয়োজনীয় এবং আমি চাই যে অক্ষর লিখতে শেখার পূর্বে প্রত্যেক শিশু যেন এতটা চিত্রাঙ্কনবিদ্যা শেখে।

১১। অনেকের অভিমত হল এই যে ব্যাকরণ, চক্রবৃদ্ধি সুদের অঙ্ক ও উচ্চতর জ্যামিতি ইত্যাদি যেসব বিষয় ছাত্র কয়েক বছর পর ভুলে যেতে বাধ্য সেইসব বিষয়কে জাতীয় শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নেই। আপনি কি এর সঙ্গে সহমত? তা যদি হন তাহলে উর্দু ভাষাকেও এই পর্যায়ে ফেলা হবে না? হিন্দু ও মুসলমানেরা যখন পরস্পরের নিকটে আসার ও একে অপরের সংস্কৃতির মর্মগ্রহণ করার প্রেরণা অনুভব করবেন তখনই কেবল উর্দু ও সংস্কৃতের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্থায়ীভাবে অনুভূত হবে। উর্দু যে সংস্কৃতির বাহন তার প্রতি শ্রদ্ধা জাগলে এবং সে সম্বন্ধে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হলে তবেই উর্দুর ব্যবহার সক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে। তা না হওয়া পর্যন্ত গণেশ পূজার মত এ একটা ধর্মীয় আচারের পর্যায়ে থেকে যেতে বাধ্য—নিছক একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার, যার কোন বাস্তব মূল্য নেই।

আমি বুঝতে পারছি না যে ব্যাকরণ, চক্রবৃদ্ধি সুদের অঙ্ক এবং উচ্চতর জ্যামিতিকে কেন সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। চিরকালই আমার বিশ্বাস যে কোন ভাষা ভালভাবে শিখতে হলে ব্যাকরণ অপরিহার্য এবং ব্যাকরণ ও উচ্চতর জ্যামিতি অতীব চিত্তাকর্ষক বিষয়। উভয়ের দ্বারা নির্দোষ বৌদ্ধিক আনন্দ পাওয়া যায়। তাছাড়া ভাষাবিজ্ঞান শিখতে হলেও ব্যাকরণ অপরিহার্য। সুতরাং জাতীয় শিক্ষায় আমি এই উভয় বিষয়েরই স্থান রাখব। অনুরূপভাবে যে ভাল হিসাবনবীশ হতে চায় তাকে চক্রবৃদ্ধি সুদের হিসাব শিখতেই

হবে। অতএব পত্রলেখক যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন জাতীয় শিক্ষায় তাদের যথোপযুক্ত স্থান থাকবে। আসল কথা হল এই যে সব রকমের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যেই এমন কতকগুলি বিষয় আছে যা সর্বসামান্য। আজকে আমরা জাতীয় ও সরকারী শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য এইজন্য করছি যে সরকারী শিক্ষা জাতীয় বিকাশের পরিপন্থী। তাহলেও সরকারী বিদ্যালয়ে এমন বহু বিষয় আছে যা আমাদের বিদ্যালয়েও থাকবে।

উর্দুর স্থান পূর্বোক্ত বিষয়গুলি থেকে পৃথক। তাই উর্দু পঠন-পাঠনের বিষয় পৃথক পটভূমিকায় বিচার করতে হবে। শেষ অবধি হিন্দু ও মুসলমানদের মিলিত হতেই হবে। আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়সমূহে তাদের পরস্পরের কাছে আনার অবিরাম চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য আমাদের পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে জানতে হবে। ছাত্ররা যেটুকু উর্দু শেখে তাও যদি পরে ভুলে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে তারা এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহান্বিত নয় এবং বাধ্য হয়েছে বলেই তারা উর্দু শিখছে। কিন্তু হিন্দীর সম্বন্ধেও তো একথা প্রযোজ্য। ছাত্রদের মধ্যে হিন্দী বা উর্দু শেখার আগ্রহ কি করে সৃষ্টি করা যায় তা ঈশ্বরই বলতে পারেন। তবে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে জাতির প্রগতির জন্য এই দুই ভাষাই তাদের শেখা উচিত।

১২। ছাত্রদের পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা থাকা উচিত। তাদের বিকাশের গতি রুদ্ধ হতে পারে এমন কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এর জন্য তাদের শিক্ষকদের মধ্যে কোন কিছুর পক্ষে বা বিপক্ষে কোনরকম পূর্ব সংস্কার থাকা অনুচিত। শিক্ষাদান কালে তাঁদের আচরণ এমন হওয়া উচিত যাতে কোন বিশেষ নিয়ম আচার বা বিধানের প্রতি পক্ষপাত লক্ষিত না হয়। বহু জায়গায় শিক্ষকদের এই আদর্শ স্বীকৃত হচ্ছে। আপনি কি এই আদর্শ স্বীকার করেন?

উপরে যা বলা হয়েছে তার সমর্থন ও বিরোধ—দুই-ই করা যায়। এ যদি বিদ্যানিকেতনের যথার্থ সারতত্ত্ব রক্ষায় সহায়ক না হয় তাহলে এর বিরোধীতা করতে হবে। আর এ যদি পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক সিদ্ধ হয় তাহলে ছাত্রদের পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে এবং শিক্ষকরাও যদৃচ্ছ অসম্পৃক্ত ও নিরপেক্ষ থাকতে পারেন। ছাত্রদের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা যা ইচ্ছা করতে পারেন। কেবল একটি মাত্র শর্ত থাকবে এই যে, তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশা করবেন যাতে তাদের একজন হয়ে যেতে পারেন। আখার ভাষায় আমি শিক্ষকদের বলব ঃ "পৃথিবীতে যেমন ইচ্ছা থাক ; কিন্তু যে-কোন উপায়ে ঈশ্বরপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য যেন সর্বদা মনের মধ্যে জাগরুক থাকে।"

অতীতে আদর্শ শিক্ষকের অপর কোন লক্ষ্য ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকতে পারে না।

নবজীবন, ৩-৬-১৯২৮ থেকে ১-৭-১৯২৮

৮

একটি আদর্শ শিশু বিদ্যালয়

শিশুদের শিক্ষা দেওয়া সাধারণতঃ সবচেয়ে সহজ কাজ হওয়া উচিত কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক এ সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে অথবা একে কঠিন ব্যাপার করা হয়েছে। অভিজ্ঞতা এই কথা বলে যে আমাদের নজরে পড়ুক বা না-ই পড়ুক অথবা ভালমন্দ যা-ই হক, শিশুরা সর্বদাই কিছু না কিছু শিখছে। কথাটা অনেক পাঠকের কাছে অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু শিশু বলতে কাদের বোঝায়, শিক্ষা কাকে বলে এবং শিশুদের শিক্ষা দেবার যোগ্যতম ব্যক্তি কে—এইসব প্রশ্ন যদি গভীরভাবে বিবেচনা করা যায় তাহলে পূর্বোক্ত বক্তব্যকে অদ্ভুত তো মনেই হবে না, তাকে তখন হয়ত একান্ত যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হবে।

শিশু বলতে আমরা দশ বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়ে বুঝি। আর শিক্ষা বলতে কেবল অক্ষরজ্ঞান অর্থাৎ লিখতে পড়তে জানা বোঝায় না। অক্ষরজ্ঞান শিক্ষার একটি মাধ্যম মাত্র। আসল কথা হল এই যে, মন সহ মানুষের যাবতীয় অনুভূতি-ইন্দ্রিয়ের যথাযথ ব্যবহারের প্রক্রিয়া জানার নাম হল শিক্ষা। অর্থাৎ শিশু নাসিকা চক্ষু প্রমুখ তার জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে হস্ত পদ ইত্যাদি কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যবহার সম্বন্ধেও শিখবে। যে ছেলেটি একথা জানে যে তার হাতকে চুরি করা, মাছি অথবা ছোট ভাইবোন ও বন্ধুদের মারার কাজে ব্যবহার করা অনুচিত, সে তার নিজস্ব পন্থায় শিক্ষার পথে বেশ কিছুটা অগ্রগতি করেছে বলতে হবে। যে ছেলেটি তার দাঁত জিভ কান চোখ নখ ইত্যাদি পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানে এবং তদনুযায়ী কাজ করে তার সম্বন্ধেও পূর্বোক্ত কথা প্রযোজ্য। খাওয়া-দাওয়ার সময় যে দুষ্টুমি করে খাদ্য বা পানীয় নষ্ট করে না, পাঁচজনের সঙ্গে অথবা একা খেতে বসলে যে নিয়ম মোতাবেক খাওয়া-দাওয়া সারে, পুষ্টিকর ও অপুষ্টিকর খাদ্যের পার্থক্য যে জানে এবং প্রথমোক্ত ধরনের খাদ্য যে নিজের জন্য বেছে নেয়, যে প্রয়োজনের বেশী খায় না এবং যখন যা দেখে তা-ই চায় না অথবা তা না পেলে গণ্ডগোল করে না সে নিজের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রগতি করেছে বলা চলে। যার উচ্চারণ ভাল, যে নিজের এলাকার ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে বলতে পারে (ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি শব্দগুলির অর্থ তার না জানলেও চলবে), মাতৃভূমি বলতে কি বুঝায় তা যে জানে সে শিক্ষার পথে বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে বলতে হবে। অনুরূপ ভাবে যে সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ বুঝতে শিখেছে, শিখেছে ভাল ও মন্দের পার্থক্য এবং যে অবিসংবাদী রূপে যা সত্য ও ভাল তা-ই বেছে নেয় তাকে আর এ বিষয়ে শেখাতে যাওয়া নিরর্থক। সুতরাং

পাঠকেরা ব্যাপারটা বুঝে নেবেন। আমি কেবল একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিতে চাই ঃ উপরে আমি যেসব বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছি সেগুলি শেখার জন্য লিখতে পড়তে জানা অপরিহার্য নয়। শিশুদের বাধ্যতামূলকভাবে বর্ণ পরিচয় করানোর অর্থ হল তাদের কোমল মনের উপর অহেতুক চাপ দেওয়া এবং তাদের চোখ ও হাতের অপব্যবহার। সঠিকভাবে শিক্ষিত শিশু প্রায় একরকম বিনা প্রয়াসেই লিখতে পড়তে শেখে—আর এর চেয়েও বড় কথা হল এই যে এটা শেখে যথাসময়ে এবং সানন্দে। কিন্তু আজ যে বয়সে তাদের বর্ণ পরিচয় করান হয় সেটা তাদের কাছে বিরাট বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। যে মহামূল্যবান সময় এর জন্য অপচয় করা হয় তার অধিকাংশ অন্যভাবে ভাল কাজে লাগান যেত। এর ফলে শেষ অবধি সুগঠিত অক্ষর লেখা বা সঠিক উচ্চারণে পড়ার বদলে শিশুরা আঁকা বাঁকা হরফে বিশ্রী হাতের লেখা লিখতে শেখে। পড়ার ব্যাপারে এই হয় যে তারা যা পড়তে শেখে তার অধিকাংশ না শিখলেই ভাল হত আর এইটুকুও পড়ে উচ্চারণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে বেপরোয়া ভাবে। একে শিক্ষা বলার অর্থ শিক্ষা নামক মহান শব্দটির অপব্যবহার। লিখতে পড়তে শেখার পূর্বে শিশুকে প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হবে। এটা করা হলে আমাদের দেশে শিশুদের নানারকম পাঠ্যপুস্তকের খাতে যে বহুল পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় অর্থব্যয় হয় তার এবং আরও বহুবিধ কুপ্রথার হাত থেকে মুক্তি পাবে। শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তক যদি একান্তই প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় তাহলে সেগুলি এই বয়সের বালকদের জন্য না লিখে শিক্ষকদের সহায়ক পুস্তকরূপে রচনা করতে হবে।

আমি যে শিক্ষার কথা বললাম শিশুরা এ শিক্ষা পেতে পারে কেবল তাদের বাড়ীতে এবং তাও শুধু মায়ের কাছে। একদিক থেকে দেখতে গেলে সব শিশুরাই মায়ের কাছ থেকে কোন না

কোন রকমের শিক্ষা পায়। আজ কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বাড়ী একরকম তছনছ হয়ে গেছে এবং অধিকাংশ মাতাপিতাই এই শিক্ষাদান কার্যের অনুপযুক্ত। এই অবস্থায় তাই শিশুদের এমন পরিবেশে রাখতে হবে যেখানে তারা বাড়ীর মত পরিবেশ পাবে। সবার মধ্যে মা-ই যেহেতু শিশুকে শিক্ষা দেবার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা যোগ্য সেই কারণে এ দায়িত্ব মহিলাদের উপর দিতে হবে। ভালবাসা ও ধৈর্যগুণের ব্যাপারে সাধারণতঃ পুরুষ নারীর চেয়ে অনেক পিছনে পড়ে থাকে। একথা যদি সত্য হয় তাহলে যুগপৎ নারীদের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান না করে শিশুদের শিক্ষার সমস্যার সমাধান মিলবে না। আর একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে আমাদের শিশুদের সুযোগ্যতা সহকারে যথার্থ শিক্ষা দেবার জন্য যতদিন না আমরা খাঁটি মাতা-শিক্ষয়িত্রী পাচ্ছি ততদিন বিদ্যালয়ে যাতায়াত করলেও শিশুরা অশিক্ষিত থেকে যাবে।

এবার আমি সংক্ষেপে শিশুদের শিক্ষার রূপরেখা সম্বন্ধে বলব। ধরুন কোন মাতা-শিক্ষয়িত্রীর হাতে পাঁচটি শিশুর দায়িত্ব দেওয়া হল। ছাত্ররা আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কোন শিক্ষাই পায় নি। স্পষ্টভাবে তারা কথাও বলতে পারে না। ঠিকভাবে চলা বা বসার ধরনও তারা জানে না। তাদের নাক চোখ কান এবং নখ ময়লা। বসতে বললে তারা পা ছড়িয়ে বসে আর কথা বলার সময় বিড়বিড় করে। দিক সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞানগম্যি নেই। তাদের পোষাক পরিচ্ছদ নোংরা এবং পকেটে রাজ্যের টুকরো টুকরো জিনিসপত্র রয়েছে যা ক্ষণে ক্ষণে বার করে তারা মুখে পুরছে। তাদের মাথার টুপির কিনারা কালচে ও চিটচিটে হয়ে গেছে এবং তার থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। এইরকম ছাত্রদের মানুষ করতে হলে পূর্বোক্ত শিক্ষয়িত্রীটিকে মাতৃ-হৃদয়সম্পন্না হতে হবে। সর্বপ্রথমে তিনি এদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পাঠ দেবেন। তিনি এইসব ছাত্রদের তাঁর হৃদয়ের ভালবাসায় নিসিক্ত করে দেবেন এবং

মায়ের মত—কৌশল্যা যেভাবে রামকে রাখতেন সেইভাবে তাদের হাসিখুশী রাখবেন। এইভাবে তিনি তাদের এমনভাবে নিজের সঙ্গে ভালবাসার বন্ধনে জড়িয়ে নেবেন যার ফলে এমন একটা অবস্থা হবে যখন তিনি তাদের দিয়ে হাসিমুখে যা ইচ্ছা তাই করিয়ে নিতে পারবেন। যতক্ষণ না তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকছে, যতক্ষণ না তাদের দাঁত কান হাত পা পরিষ্কার হচ্ছে, যতদিন না তারা নিজেদের কাপড়চোপড় সামলাতে শিখছে ও তাদের উচ্চারণের উন্নতি হচ্ছে ততদিন তাঁর মনে শান্তি আসবে না। এসব করার জন্য তিনি তাদের রামনাম শেখাবেন। ঈশ্বরের অসংখ্য নাম তাই তাঁকে কোন্ নামে ডাকা হচ্ছে—এটা কোন বড় প্রশ্ন নয়। ধর্মের পর হল অর্থ বা ঐহিক জ্ঞান। সুতরাং আমাদের মাতা-শিক্ষয়িত্রী এবার তাদের গণিত শেখাবেন। মুখে মুখে যতটা সম্ভব তাদের নামতা ও যোগ বিয়োগ শেখাবেন। ছেলেরা যেখানে থাকে তার কথা তাদের জানতে হবে। সুতরাং তিনি তাদের স্থানীয় নদী-নালা পাহাড়-পর্বত এবং উল্লেখযোগ্য ঘর-বাড়ী সম্বন্ধে বলবেন এবং এই প্রক্রিয়ায় তাদের দিক সম্বন্ধে শিক্ষা দেবেন। শিশুদের জন্য তিনি নিজের জ্ঞান-বৃদ্ধি করবেন। এ পদ্ধতিতে ইতিহাস ও ভূগোলকে পৃথক বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা চলবে না। গল্পচ্ছলে উভয় বিষয় শেখান হবে। অবশ্য কেবল এইটুকুতে তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। হিন্দু মাতা তাঁর সন্তানদের কাছে ছেলেবেলা থেকেই সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করবেন যাতে তারা সংস্কৃত উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়। ঈশ্বরের স্তবমূলক সংস্কৃত স্তোত্র তিনি তাদের শেখাবেন। স্বদেশ-প্রেমী মাতা এর উপরন্তু তাদের হিন্দীও শেখাবেন। শিশুদের তিনি হিন্দী বই-এর নির্বাচিত অংশ পড়ে শোনাবেন ও এইভাবে তাদের দ্বিভাষী করে গড়ে তুলবেন। এখনও পর্যন্ত তাদের অক্ষর পরিচয় তিনি শুরু করবেন না, তবে তাদের হাতে ছবি আঁকার তুলি দেবেন। তাদের দিয়ে তিনি জ্যামিতিক চিত্র নকল করাবেন

এবং সরলরেখা ও বৃত্ত আঁকাবেন। যে শিশু ফুল জলপাত্র বা ত্রিভুজ ইত্যাদি আঁকতে পারে না তাকে শিক্ষাপ্রাপ্ত বলা যায় না। এছাড়া তিনি তাদের ভাল সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত করাবেন। তারা জাতীয় সঙ্গীত বা মন্ত্র ইত্যাদি সমস্বরে গাইতে না শেখা পর্যন্ত তিনি তাদের ছাড়বেন না। তিনি তাদের ঠিক তালে তালে গাইতে শেখাবেন। সম্ভব হলে তাদের হাতে একতারা বা ঝাঁজ দেওয়া হবে। তাদের শরীর গড়ে তোলার জন্য তিনি তাদের দিয়ে দৌড় ঝাঁপ ইত্যাদি দৈহিক কসরৎ করাবেন। এছাড়া ছেলেদের সেবার আনন্দ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের পূর্বোক্ত শিক্ষয়িত্রী গাছ থেকে কাপাস তোলা থেকে শুরু করে সূতা কাটার যাবতীয় প্রক্রিয়া তাদের শেখাবেন। আর এই ছেলেগুলি রোজ অন্ততঃ আধ ঘণ্টা স্বেচ্ছায় সূতা কাটবে।

বর্তমানে দেশে যেসব পাঠ্যপুস্তক রয়েছে তার অধিকাংশই এই দৃষ্টিকোণ থেকে নিরর্থক। মাতা-শিক্ষয়িত্রী তাই উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক খুঁজে বার করবেন অথবা স্বয়ং নূতন পাঠ্যপুস্তক লিখবেন। শিশুদের প্রতি তাঁর প্রেম তাঁকে এই কার্যসাধনে সাহায্য করবে। প্রত্যেক গ্রামের নিজস্ব ইতিহাস ও ভূগোল আছে। তাই স্বভাবতই প্রত্যেক গ্রামের নিজস্ব ইতিহাস ও ভূগোল বই থাকবে। গণিত অনুশীলনের উদাহরণগুলিও নূতন হবে। ছাত্রদের যে পাঠগুলি মাতা-শিক্ষয়িত্রী প্রত্যহ শেখাতে চান সেগুলি তিনি স্বয়ং প্রথমে শিখবেন। শেখার সময় তিনি ঐ প্রণালীতে নূতন নূতন অঙ্ক তৈরি করে শিক্ষণীয় আরও নূতন নূতন কথার সঙ্গে নিজের নোট বই-এ লিখে রাখবেন। এইভাবে ক্লাসে তাঁর পাঠন কোন যান্ত্রিক ক্রিয়া বলে মনে হবে না, এ হবে প্রাণবন্ত ও সর্জনাত্মক ব্যাপার।

শিশুদের পাঠপ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যক্রমে ইতরবিশেষ করা হবে। সুতরাং প্রত্যেক তিন মাসের ব্যবধানে পাঠ্যক্রম তৈরি করতে হবে। একই ক্লাসের ছেলেরা বিভিন্ন বাড়ী থেকে আসে—প্রত্যেকের

পটভূমিকা এবং স্বভাব পৃথক পৃথক। সুতরাং সকলের জন্য একই রকম পাঠ্যক্রম করা চলতে পারে না। সময়ে সময়ে হয়ত তাদের অতীতের শেখা বিষয় ভুলে যেতে অনুপ্রাণিত করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ছয় সাত বছরের কোন শিশু যদি অপরিচ্ছন্ন ভাবে হরফ নকল করতে অথবা বোঝার চেষ্টা না করে পড়তে শিখে থাকে মাতা-শিক্ষয়িত্রী তাহলে দেখবেন যে সে যেন তা ভুলে যায়। তাঁকে এই ভ্রান্ত ধারণা ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে যে একমাত্র পড়ার মাধ্যমেই শিশু জ্ঞান পেতে পারে। এ কথা বোঝা খুবই সহজ যে জীবনে কখনও কিছু পড়ে নি এমন লোকও জ্ঞানী হয়।

এ প্রবন্ধে আমি শিক্ষক শব্দটি ব্যবহার করি নি, এর পরিবর্তে আগাগোড়া আমি মাতা-শিক্ষয়িত্রী শব্দটি ব্যবহার করেছি। এর কারণ হল এই যে শিক্ষাদানকারীকে বাস্তব পক্ষে তাঁর ছাত্রের মা হতে হবে। যিনি মায়ের ভূমিকা নিতে পারবেন না তিনি শিক্ষণ কার্য করতে পারবেন না। শিশু যেন একথা অনুভবই না করে যে তাকে শেখান হচ্ছে। শিক্ষাদানকারী কেবল ছাত্রের উপর নজর রাখবেন এবং প্রয়োজনমত তাকে সাহায্য করবেন। যে শিশুটি দৈনিক ছয় ঘণ্টা বিদ্যালয়ে থাকে সম্ভবতঃ তার অনেকটা সময়েরই অপব্যয় হয়। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত শিশুটি যথার্থ শিক্ষার পরিভাষায় সর্বদাই কিছু না কিছু শিখছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্ভবতঃ আমরা ভাল শিক্ষয়িত্রী পাব না। অগত্যা পুরুষদের একাজে লাগাতে হবে। সে অবস্থায় পুরুষ শিক্ষকদের মায়ের স্থান নিতে হবে। অবশ্য শেষ অবধি মায়েদেরই এ দায়িত্ব নিতে হবে। তবে আমার কথা যদি সত্য হয় তাহলে শিশুপ্রেমী যে-কোন মাতাই নিজেকে একাজের যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারেন। এবং নিজেকে প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিশুদেরও গড়ে তুলতে পারেন।

নবজীবন, ২-৬-১৯২৯

৯

মন্তেসরী প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়

[মাদাম মন্তেসরী গান্ধীজীকে তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাজ কর্ম দেখান ও তারপর বিদ্যালয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে এক সম্বর্ধনা-ভাষণ দেন। তার উত্তরে গান্ধীজী যা বলেন তার বিবরণ এখানে দেওয়া হল।—সম্পাদক]

মাদাম, আপনার অভিভাষণ আমাকে অভিভূত করেছে। যথোচিত বিনয় সহকারে আমি একথা স্বীকার করছি যে যতটা ক্ষীণ ভাবেই হক না কেন আমার সত্তার অণু পরমাণুতে আমি প্রেমশক্তির প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা করছি—আপনার এ বক্তব্য অতীব সত্য। আমার স্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধি করার জন্য আমি অধীর এবং আমার কাছে তিনি সত্যস্বরূপ। আমার জীবনের প্রথম দিকে আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে এই সত্যকে যদি আমার উপলব্ধি করতে হয় তাহলে এমন কি আমার জীবনের বিনিময়েও আমাকে প্রেমশক্তির অনুশীলন করতে হবে। আর ঈশ্বরেচ্ছায় আমি কয়েকটি সন্তানের জনক বলে আমি বুঝতে পারলাম যে ছোট ছোট শিশুর মাধ্যমেই এই প্রেমনীতি সবচেয়ে ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, শেখা যায়। আমাদের মত অজ্ঞ ও দুর্ভাগা পিতামাতার সান্নিধ্য পেতে না হলে আমাদের সন্তান-সন্ততিরা সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ হয়েই গড়ে উঠত। আমি দৃঢ়-ভাবে বিশ্বাস করি যে কোন শিশু দুষ্ট হয়ে জন্মায় না। শিশুদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতা যদি যথাযথ আচরণ করেন, তাদের জন্মের পূর্বে ও পরে তাঁদের আচরণ যদি আদর্শ স্থানীয় হয় তাহলে শিশু সহজপ্রবৃত্তিবশেই সত্য ও প্রেমনীতির অনুগামী হবে। আমার জীবনের গোড়ার দিকে যখন আমি এই শিক্ষা পেলাম তখন থেকেই ধীর হলেও নিশ্চিত গতিতে আমার জীবনে একটা পরিবর্তন সাধনের প্রয়াস আরম্ভ করলাম।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করে সর্বপ্রথম আমি

আপনার কার্যকলাপের পরিচয় পাই। আমরিলি নামক একটি জায়গায় দেখি যে মন্তেসরী পদ্ধতিতে একটি ছোট্ট বিদ্যালয় চলছে। অবশ্য বিদ্যালয়টি দেখার পূর্বেই আপনার নাম আমার কানে এসেছিল।

এর পর আমি আরও অনেক মন্তেসরী বিদ্যালয় দেখেছি এবং যতই এ জাতীয় বিদ্যালয় দেখেছি ততই মনে হয়েছে যে এর বনিয়াদ ভাল ও চমৎকার। শিশুদের এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় প্রাকৃতিক বিধানের মাধ্যমে—যে প্রাকৃতিক বিধান মানুষের মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত, পশুপ্রবৃত্তির নিয়ামক নয়। যেভাবে শিশুদের এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় তা দেখে আমার সহজপ্রবৃত্তিবশে আমি বুঝতে পারলাম যে, কোন কোন মন্তেসরী বিদ্যালয়ে হেলায় ফেলায় শিক্ষা দিলেও এই শিক্ষাপদ্ধতির মূল নীতি প্রাকৃতিক বিধানরূপী পূর্বোক্ত মৌলিক বিধিব্যবস্থার অনুযায়ী। এর পর আপনার একাধিক ছাত্রের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়। এঁদের মধ্যে একজন আবার ইতালীতে তীর্থযাত্রা করেছিলেন ও আপনার কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। সেই থেকে এখানকার শিশুদের এবং আপনাদের সকলের সঙ্গে দেখা করার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে ছিল আর তাই আজ এখানকার শিশুদের দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি। এইসব ছোট ছোট শিশুদের সম্বন্ধে কিছুটা জানার জন্য আমি চেষ্টা করেছি। এখানে যা দেখলাম বার্মিংহামের একটি বিদ্যালয়েও ইতঃপূর্বে তার কিছুটা স্বাদ পেয়েছি, যদিচ এখানকার সঙ্গে তার কিছুটা পার্থক্য আছে। তবে এখানকার মত সেখানেও লক্ষ্য করেছি যে মানব-প্রকৃতি আত্মপ্রকাশের জন্য চেষ্টা করছে। এখানেও তাই দেখছি এবং এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করে আমি খুব খুশী হয়েছি যে ছেলেবেলা থেকেই শিশুদের এখানে মৌনতার গুণ-সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা হচ্ছে ও শিক্ষকের অস্ফুট ইঙ্গিতে তারা কী সুন্দর একেবারে নীরবে একের পর এক এগিয়ে এল। শিশুদের এইসব তালে তালে

শরীর সঞ্চালন দেখেও আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। এ দেখার সময় অর্ধাশনে দিনযাপনকারী ভারতবর্ষের গ্রামের লক্ষ লক্ষ শিশুর কথা মনে পড়ল। তাদের কথা ভাবতে ভাবতে নিজেকেই আমি নিজে প্রশ্ন করলাম, "আপনার পদ্ধতিতে এখানকার শিশুদের যে পাঠ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে আমার পক্ষে ভারতবর্ষের গ্রামের শিশুদের কি এই রকম শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে?" ভারতবর্ষের দরিদ্রতম শিশুদের মধ্যে আমরা একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা কতটা সফল হবে তা আমি জানি না। ভারতবর্ষের পর্ণকুটীর সমূহের নিবাসী শিশুদের প্রাণবন্ত সত্যকার শিক্ষা দেবার সমস্যা আমাদের সামনে রয়েছে, অথচ এর সঙ্গতি আমাদের নেই।

শিক্ষকদের স্বতঃপ্রণোদিত সাহায্যের উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে কিন্তু শিক্ষক খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় যে শিক্ষক—বিশেষ করে যে ধরনের শিক্ষক প্রয়োজন তাঁদের সংখ্যা অতীব অল্প। আমাদের এমন শিক্ষক প্রয়োজন যাঁরা ছাত্রদের ভালভাবে বুঝে তাদের ভিতরকার শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ফুটিয়ে তুলবেন, ছাত্রের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অধ্যয়ন করে একরকম তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ছাত্রকে তার নিজের গুণের উপর খাড়া করবেন। আর আমার যে শত শত (হাজার হাজার বলতে যাচ্ছিলাম) ছাত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার ভিত্তিতে আমি বলতে পারি যে তাদের মান-সম্মান-জ্ঞান আপনার আমার চেয়ে সূক্ষ্ম। একটু নত ও নম্র হলে আমরা জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা পাব তথাকথিত অজ্ঞ শিশুদের কাছ থেকে, বয়স্ক পণ্ডিতদের কাছ থেকে নয়। শিশুর মুখ থেকে জ্ঞানের প্রকাশ হয়—এর থেকে বড় ও মহান সত্য যীশুখ্রীস্ট আর বলেন নি। আমি যীশুর ঐকথা বিশ্বাস করি এবং আমার অভিজ্ঞতায় আমি লক্ষ্য করেছি যে নম্রভাবে নিষ্কলুষ চিত্তে যদি শিশুদের কাছে যাওয়া যায় তাহলে আমরা তাদের কাছ থেকে জ্ঞান পেতে পারি।

....ইদানিং আমার মনে যে বিষয় নিয়ে আড়োলন চলছে অর্থাৎ

আমি যে শিশুদের কথা আপনাকে বললাম, তাদের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর বিকাশের দুরূহ সমস্যা সম্বন্ধে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। …শিশুদের প্রতি আপনার ঐকান্তিক ভালবাসার কারণ আপনি যেমন আপনার অসংখ্য প্রতিষ্ঠান মারফৎ শিশুদের শিক্ষা দেবার ও তাদের সদগুণাবলীর পূর্ণতম বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টা করছেন, তেমনি আমিও আশা করি যে শুধু সম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্তান-ই নয়, নিতান্ত দরিদ্রের ঘরের শিশুও ঐ জাতীয় শিক্ষা পাবে। আপনি যথার্থই বলেছেন যে, আমরা যদি এই বিশ্বে সত্যকার শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে সত্যকার যুদ্ধ করা যদি আমাদের অভীষ্ট হয়, তাহলে শিশুদের নিয়ে আমাদের কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত করতে হবে। শিশুরা যদি তাদের স্বাভাবিক সারল্যের ভিতর বেড়ে ওঠে, তাহলে আমাদের এত সব বাদ-বিসম্বাদের সম্মুখীন হতে হবে না বা নিষ্ফল দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করারও প্রয়োজন পড়বে না। প্রেম হতে উচ্চতর প্রেমে এবং শান্তি হতে অধিকতর শান্তিতে উত্তরণ করতে পারব এবং শেষ অবধি পৃথিবীর কোণে কোণে সেই শান্তি ও প্রেম পরিপূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করবে যার জন্য সচেতন ভাবে হোক অথবা অজ্ঞাতসারে সমগ্র বিশ্ব ব্যাকুলভাবে প্রযত্ন করেছে।

ইয়ং-ইণ্ডিয়া, ১৯-১১-১৯৩১

১০

শিশুদের শিক্ষারম্ভ

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আমার দৃঢ় অভিমত হল এই যে বর্ণ-পরিচয় ও লিখতে পড়তে শেখানোর মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষার সূত্রপাত হওয়ার প্রথা তাদের বৌদ্ধিক বিকাশকে ব্যাহত করে। শিশুরা ইতিহাস ভূগোল মানসাঙ্ক এবং কোন হস্তকলা (ধরুন সূতা কাটা) সম্বন্ধে একটু প্রাথমিক জ্ঞান না পাওয়া পর্যন্ত আমি তাদের বর্ণপরিচয় করাব না। এইগুলির মাধ্যমে আমি তাদের বুদ্ধির

বিকাশ করার ব্যবস্থা করব। প্রশ্ন উঠতে পারে যে তকলি বা চরখার মাধ্যমে কি করে বুদ্ধির বিকাশ ঘটান সম্ভব? নিছক যান্ত্রিকভাবে শেখান না হলে এর দ্বারা চমৎকার ভাবে বুদ্ধির বিকাশ করান যায়। শিশুকে যখন সূতা কাটার প্রতিটি প্রক্রিয়ার কারণ সম্বন্ধে বলা হয়, তকলি বা চরখার কার্যকৌশল যখন তাকে ব্যাখ্যা করা যায়, কাপাসের ইতিহাস ও মানবসভ্যতার সঙ্গে এর সম্বন্ধের কথা যখন তাকে বলা হয় এবং যখন তাকে প্রত্যক্ষভাবে গ্রামে নিয়ে গিয়ে কাপাসের ক্ষেত দেখান হয়, কত তার সূতা সে কাটল তা গুণতে যখন তাকে শেখান যায় এবং সূতার সমানতা ও জোর পরিমাপের পদ্ধতি যখন তাকে শিক্ষা দেওয়া হয় তখন তার আগ্রহকে জাগরূক রাখা হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে তার হাত চোখ ও মনের অনুশীলন হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের এই শিক্ষার জন্য আমি ছয় মাস সময় দেব। তারপর শিশুর বর্ণ পরিচয়ের সময় হবে এবং ভাল মত অক্ষর জ্ঞান হলে সে সহজ অঙ্কন শেখার যোগ্য হয়ে উঠবে। যখন সে জ্যামিতিক চিত্র এবং পশুপক্ষীর ছবি ইত্যাদি আঁকতে পারবে তখন সে বর্ণমালার চিত্রগুলি মোটামুটি লেখার ক্ষমতা অর্জন করবে। ছেলেবেলায় যখন আমার অক্ষরজ্ঞান হয় তখনকার কথা আমার মনে আছে। ব্যাপারটা কি রকম বিরক্তিকর ছিল তার কথা আমার স্মরণ আছে। আমার বুদ্ধি কেন কাজ করছিল না তা বোঝার জন্য কেউ ভ্রূক্ষেপ করেন নি। লেখাকে আমি এক সুকুমার চারুকলা মনে করি। ছোট্ট শিশুদের উপর অক্ষরজ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে এবং অক্ষরজ্ঞানকে শিক্ষার প্রথম সোপান বিবেচনা করে আমরা এই সুকুমার চারুকলাকে নষ্ট করে ফেলি। এইভাবে লিখন-কলার উপর আমরা অত্যাচার করি এবং সময় হবার পূর্বেই শিশুকে অক্ষরজ্ঞান দিতে গিয়ে আমরা শিশুর বিকাশকে ব্যাহত করি।

হরিজন, ৬-৬-১৯৩৭

সপ্তম অধ্যায়ঃ উচ্চ শিক্ষা

১

জাতীয় বিদ্যালয়

আজ জাতীয় বিশ্বদ্যিালয় *ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও জাতীয় মর্যাদা রক্ষার প্রতীকস্বরূপ। তবে এ প্রতিষ্ঠান স্থায়ী হবেই হবে। সংযুক্ত ভারতের জাতীয় আদর্শ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় আজ প্রেরণা পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় এমন এক ধর্মের প্রতীক যা হিন্দুদের কাছে ধর্ম এবং মুসলমানদের কাছে ইসলাম। বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূকে অগৌরবজনক বিস্মৃত-সাগর-গহ্বর থেকে উদ্ধার করে তাদের ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুভ্যুত্থানের গঙ্গোত্রীর মর্যাদা দিতে ইচ্ছুক। গুজরাত বিদ্যাপীঠ মনে করে যে জীবনের পূর্ণ শিক্ষণের জন্য এসিয়ার সংস্কৃতিসমূহ সম্বন্ধে ধারাবাহিক জ্ঞানার্জনের প্রয়াস পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অধ্যয়ন অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় নয়। সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, পালি এবং মাগধী সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করতে হবে ও দেখতে হবে যে জাতির বল-বীর্যের উৎস কোথায়! প্রাচীন সংস্কৃতি ভাঙ্গিয়ে খাওয়া বা শুধু তারই পুনরাবৃত্তি গুজরাত বিদ্যাপীঠের লক্ষ্য নয়। পক্ষান্তরে এর ধ্যেয় হচ্ছে অতীতের ঐতিহ্য-ভূমির উপর পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতার সম্পদ-পুষ্ট এক নবীন সংস্কৃতির অভিনব হর্ম্য রচনা করা। যে সব বিভিন্ন সংস্কৃতি এদেশের জনজীবনকে প্রভাবিত করেছে ও স্বয়ং ভারতভূমির আত্মার আলোকে জ্যোতিষ্মান হয়েছে, তাদের ভিতর সমন্বয় সাধন করাই এ প্রতিষ্ঠানের কাম্য। এ সমন্বয় স্বভাবতই স্বদেশী ধরনের হবে এবং এ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি সংস্কৃতিকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হবে। আমেরিকায় যে ধরনের সমন্বয়

* আহমেদাবাদের গুজরাত বিদ্যাপীঠ

হয়েছে, আমরা তা চাই না। সেখানে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সংস্কৃতি বাকীগুলিকে গ্রাস করেছে ও সেখানে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হবার পরিবর্তে একপ্রকার অস্বাভাবিক ও বাধ্যতামূলক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেইজন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় চায় যে ছাত্ররা প্রত্যেকটি ভারতীয় ধর্মমত সম্বন্ধে অধ্যয়ন করুক। এইভাবে হিন্দু ছাত্রদের কোরাণ শরিফ পাঠ করার সুযোগ হবে এবং মুসলমান ছাত্ররাও জানতে পারবে যে হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থে কি লিখিত আছে? বিশ্ববিদ্যালয় যদি কোন কিছু বর্জন করে থাকে, তবে তা হচ্ছে ভেদমূলক মনোবৃত্তি—যে মনোভাবানুসারে মানব-সমাজের কোন এক অংশ স্থায়ী অস্পৃশ্য বিবেচিত হয়। সংস্কৃতের দেশজ রূপ হিন্দী এবং ফার্সীর লোকায়ত রূপ উর্দুর সমন্বয়ে সৃষ্ট হিন্দুস্থানী ভাষা ছাত্রদের পক্ষে অবশ্যপাঠ্যরূপে নির্ধারিত হয়েছে। শুধু ধর্ম রাজনীতি ও ইতিহাসের মাধ্যমে নয়, বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমেও স্বাধীনতার স্পৃহাকে লালন করতে হবে। একমাত্র এই বৃত্তিমূলক শিক্ষাই দেশের যুব শক্তিকে আর্থিক স্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদামূলক দৃঢ় মেরুদণ্ডের অধিকারী করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় আশা করে যে মফস্বল শহরগুলিতেও উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং এইভাবে যথাসম্ভব শীঘ্র জনগণের ভিতর শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ করতে পারবে। গুজরাতী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করাতে এই আদর্শে উপনীত হওয়া সহজতর হবে এবং আজ শিক্ষিত ও অশিক্ষিতবর্গের ভিতর যে মারাত্মক ব্যবধান সৃষ্ট হয়েছে, তাও দূর হবে। হুজুরদের মজুরীর কলা শেখানর ফলে এবং মজুরদের লেখা-পড়া শেখানর পরিণাম-স্বরূপ ধন-বৈষম্য ও তার ফলে সৃষ্ট সামাজিক অসন্তোষ বহুলাংশে হ্রাস পাবে। বিদেশী নিয়ন্ত্রণ ও "ভবিষ্যৎ" গড়ার মিথ্যা মূল্যমান—এই হচ্ছে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিকটতম ত্রুটী। গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের সঙ্গে অসহ-যোগিতা করায় তার ভিতর থেকে আপনা আপনি-ই উভয় ত্রুটী

দূর হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সহায়কবর্গ সরকারের জাতীয়করণ হওয়া পর্যন্ত যদি এই সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, তাহলে তাঁদের এ দৃঢ়তা জাতীয় লক্ষ্য ও জাতীয় প্রয়োজন সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টির কার্যে সহায়তা করবে।

টেগোর, পৃঃ ৪৫৫-৫৭ ; ১৭-১১-২০

২

রাষ্ট্রের ব্যয়ে কলেজী শিক্ষা চলবে না

আমি কলেজী শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করব ও জাতির প্রয়োজনের সঙ্গে একে সম্বন্ধিত করব। মেকানিক্যাল ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিংএর উপাধি দান ব্যবস্থা থাকবে। এসব বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকবে এবং এইসব শিল্পের জন্য যে-সব স্নাতক প্রয়োজন, শিল্পগুলি স্বয়ং তার ব্যয় নির্বাহ করবে। এইভাবে টাটাদের রাষ্ট্রীয় পর্যবেক্ষণাধীনে ইঞ্জিনিয়ারদের শিক্ষা দেবার জন্য কলেজ চালাতে হবে। মিল-মালিকসঙ্ঘও এইভাবে তাদের প্রয়োজনীয় স্নাতকদের শিক্ষিত করার জন্য নিজ ব্যয়ে কলেজ চালাবে।

এইভাবে যদি অন্যান্য শিল্প ও ব্যবসায়ের নাম করতে হয়, তবে বলব বাণিজ্যের জন্য পৃথক কলেজ থাকবে। এর পর বাকি থাকে কলা, চিকিৎসা ও কৃষির কথা। আজ একাধিক কলার কলেজ স্বাশ্রয়ী। সুতরাং রাষ্ট্রের তরফ থেকে কলার কলেজ চালান হবে না। চিকিৎসা বিদ্যার কলেজ অনুমোদিত হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। চিকিৎসা বিদ্যা শেখার কলেজ বিত্তবান সম্প্রদায়ের ভিতর বেশ জনপ্রিয়। সুতরাং তাঁরা নিজেদের চাঁদায় এ জাতীয় কলেজ চালাবেন ধরে নেওয়া যেতে পারে। কৃষি-কলেজকে নিজ নামের যোগ্য হতে হলে স্বাবলম্বী হতেই হবে। একাধিক কৃষি-বিদ্যার স্নাতক সম্বন্ধে আমার বড়ই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা আছে।

তাঁদের জ্ঞান একেবারে ভাসাভাসা। তাঁদের ভিতর বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব দেখেছি। কিন্তু তাঁরা যদি কোন স্বাবলম্বী কৃষি-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবীশ থাকতেন ও দেশের প্রয়োজন বুঝে কাজ করতেন, তাহলে ডিগ্রী নেবার পরও নিয়োগকর্তার অর্থের অপচয় করে তাঁদের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হত না।

হরিজন, ৩১-৭-৩৭

৩

উচ্চ শিক্ষা

জাতির প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন শ্রমশিল্প, যন্ত্রবিজ্ঞান, রম্য-রচনা বা চারুকলা ইত্যাদি যাবতীয় উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর ছেড়ে দিতে হবে।

প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবল পরীক্ষা গ্রহণের প্রতিষ্ঠান হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে গৃহীত অর্থের দ্বারা সেগুলি স্বাবলম্বী হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রের উপর দৃষ্টি রাখবে এবং শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগের জন্য পাঠ্যক্রম রচনা ও নির্ধারণ করবে। ক্ষেত্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিগত বিদ্যালয় চলবে না। যে-কোন সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীকে উদারভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী সরবরাহ করা হবে। তবে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগ পরিচালন করা ছাড়া রাষ্ট্রকে বিশ্ববিদ্যালয় বাবদ আর কিছু খরচ করতে হবে না।

অবশ্য পূর্বোক্ত প্রস্তাবের অর্থ এ নয় যে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্রের ব্যয়ে প্রয়োজনীয় সেমিনার চালান যাবে না।

হরিজন, ২-১০-৩৭

৪

উচ্চ শিক্ষা প্রসঙ্গে

১। আমি বিশ্বের উচ্চতম শিক্ষারও বিরোধী নই।

২। রাষ্ট্রের কাছে এর কোন নিশ্চিত প্রয়োজন থাকলে তবে রাষ্ট্র এর জন্য অর্থব্যয় করবে।

৩। আমি সর্বসাধারণ-প্রদত্ত রাজস্ব থেকে যাবতীয় উচ্চ শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ প্রথার বিরোধী।

৪। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমাদের কলেজগুলিতে তথাকথিত কলাশিক্ষার নামে যে অজস্র অর্থব্যয় করা হয়ে থাকে, তা একেবারেই বাজে খরচ এবং এর ফলে শিক্ষিত সমাজ বেকার হয়ে পড়েছে। আর তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে এই যে, যে সব ছেলেমেয়েদের এই শিক্ষার যাঁতাকলের ভিতর পেষাই হবার দুর্ভাগ্য হয়েছে, তাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য একেবারে শেষ হয়ে গেছে।

৫। ভারতবর্ষে এক বিদেশী ভাষার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বলে এর পরিণামে জাতির ভীষণ বৌদ্ধিক ও নৈতিক হানি হয়েছে। আমরা এই কালেরই মানুষ বলে এই ক্ষতির সর্বনাশা গভীরতা পরিমাপ করতে পারব না। এ ছাড়া আমরা স্বয়ং এ শিক্ষা পেয়েছি বলে ক্ষতির হিসাব নিকাশ করার সময় আমাদের এক অসম্ভবপ্রায় কার্য সম্পন্ন করতে হবে। এই শিক্ষার শিকার হওয়া সত্ত্বেও আমাদের আবার এর পরিণামের বিচারক হতে হবে। অতএব আমাদের পক্ষে এই সর্বনাশের ভয়াবহতা পরিমাপ করা এক রকম অসম্ভব।...

অতএব আমার দাবী হচ্ছে এই যে, আমি উচ্চ শিক্ষার বৈরী নই। তবে আমাদের দেশে যেভাবে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, অবশ্যই আমি তার শত্রু। আমি যে পরিকল্পনা করেছি, তাতে আজকের তুলনায় বহুগুণ অধিক ও উঁচুদরের গ্রন্থাগার, বিজ্ঞান-

মন্দির ও গবেষণাগার থাকবে। মৎ পরিকল্পিত স্থিতিতে দেশে দলে দলে রসায়নশাস্ত্রী, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ বাহিনী থাকবে। নিজেদের অধিকার ও অভাব সম্বন্ধে ক্রমসচেতন জনগণের বহুমুখী এবং নিত্যবর্ধনশীল প্রয়োজন পূর্তি করা দেশের সেবক এইসব বিশেষজ্ঞের কাজ হবে। এইসব বিশেষজ্ঞ বিদেশী ভাষায় কথা বলবেন না। তাঁরা জনগণের ভাষায় বাক্যালাপ করবেন। তাঁরা যে জ্ঞান অর্জন করবেন তা সর্বসাধারণের সম্পত্তি হবে। তখন স্রেফ অনুকরণের পরিবর্তে মৌলিক কাজ হবে এবং এর ব্যয়ভার সবার উপর সমান ও ন্যায়সঙ্গতভাবে পড়বে।

হরিজন, ৯-৭-৩৮

৫

নিজের সমর্থনে

জনৈক ভূতপূর্ব অধ্যাপক উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধীয় উপরি-উক্ত প্রবন্ধটি সম্বন্ধে এক দীর্ঘ পত্র লিখেছেন। তার প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করছি :

"সর্বসাধারণ-প্রদত্ত রাজস্ব সম্বন্ধীয় আপনার তৃতীয় সিদ্ধান্ত এবং উচ্চশিক্ষার দাবী ও তার অনুসিদ্ধান্ত অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বাবলম্বী হবে—এ আমি মেনে নিতে পারলাম না। আমি বিশ্বাস করি যে প্রগতিশীল রাষ্ট্র হতে হলে প্রতিটি দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের যথোচিত সুযোগ থাকা চাই। শুধু রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-ই নয়, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজশাস্ত্র ইত্যাদি সর্ববিধ বিজ্ঞান ও ফলিত বিষয় সম্বন্ধে অধ্যয়ন করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় উচ্চস্তরে বিহার করতে হলে বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রীয় সহায়তা ছাড়া এ সুবিধা পাওয়া সম্ভব নয়। কোন দেশকে এর জন্য কেবল বে-সরকারী প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করতে

হলে নিঃসন্দেহেই পিছিয়ে পড়তে হবে ও তার ফলে দুর্ভোগ সইতে হবে। সে দেশ কখনই স্বাধীন হতে পারে না এবং স্বাধীন হলে সে দেশ স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারবে না। সর্ববিধ উচ্চশিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে রাষ্ট্রকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখতে হবে। অবশ্য বে-সরকারী প্রচেষ্টাও থাকবে। আমাদের দেশেও আমরা ন্যুফিল্ড ও রকফেলার চাই। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না বা এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে নিশ্চেষ্ট থাকতে দেওয়া যায় না। উচ্চশিক্ষা সংগঠন এবং একে সহায়তা দান ও পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রকে সক্রিয়ভাবে অগ্রণী হতে হবে। আমার অনুরোধ যে আপনি এই বিষয়টি একটু পরিষ্কার করুন।

আপনার প্রবন্ধের শেষে আপনি বলেছেন: 'আমি যে পরিকল্পনা করেছি তাতে আজকের তুলনায় বহুগুণ অধিক উঁচুদরের গ্রন্থাগার থাকবে।' আপনার ঐ প্রবন্ধটিতে তো আপনার পরিকল্পনা খুঁজে পেলাম না এবং এ কথাও আমি বুঝে উঠতে পারছি না যে সে পরিকল্পনা গৃহীত হলে কিভাবে 'বহুগুণ অধিক ও উঁচুদরের গ্রন্থাগার ও গবেষণা-মন্দির' সৃষ্ট হবে। আমিও চাই যে ঐ রকম গ্রন্থাগার ও গবেষণা-মন্দির অবশ্যই চালান হক। তবে যথেষ্টসংখ্যক দাতা বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান এর জন্য প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্র এর দায়িত্ব এড়াতে পারে না।"

আমার প্রবন্ধটির "নিশ্চিত প্রয়োজন" কথাটিতে ব্যাপক অর্থ আরোপ করলে দেখা যাবে যে রচনাটি যথেষ্ট প্রাঞ্জল। আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দারিদ্র্য-পীড়িত ও অজ্ঞ জনসাধারণের বাসভূমি ভারতবর্ষের চিত্র নেই। আমার ধ্যানের ভারত নিজ প্রতিভার পথরেখা অনুসরণ করে ক্রমাগত প্রগতি করে চলেছে। তবে আমি এ দেশকে পশ্চিমের মরণোন্মুখ সভ্যতার তৃতীয় শ্রেণীর বা এমন কি প্রথম শ্রেণীরও প্রতিচ্ছবি রূপে কল্পনা করি না। আমার স্বপ্ন সফল হয়ে ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের প্রত্যেকটি যদি এমন সুসমৃদ্ধ

সাধারণতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে যেখানে কেউ নিরক্ষর বা কাজের অভাবে বেকার থাকবে না এবং যেখানে প্রত্যেকে সমাজোপযোগী পেশায় নিযুক্ত ও প্রত্যেকে পুষ্টিকর আহার স্বাস্থ্যসম্মত বাসগৃহ ও দেহ আবরণ করার জন্য যথেষ্ট খাদি পায়, যেখানে প্রতিটি গ্রামবাসী স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও সাফাই বিজ্ঞানের নিয়মাবলী জানে ও পালন করে, সেখানে রাষ্ট্রের বহুমুখী ও নিত্যবর্ধনশীল প্রয়োজন থাকবে। রাষ্ট্রকে এই প্রয়োজন পূর্তি করতেই হবে, নচেৎ দেশ জড় হয়ে যাবে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে পত্রলেখক শিক্ষার যে সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অর্থ-সাহায্যের কথা উল্লেখ করেছেন, আমি তার কথা ভালভাবেই স্মরণ রেখেছি এবং আমার সূচি পত্রলেখকের চেয়েও বৃহত্তর হতে পারে। রাষ্ট্রের প্রয়োজন যদি এই পরিমাণে হয়, তাহলে অবশ্যই সমপরিমাণ দায়ভারও রাষ্ট্রের উপর পড়বে।

তবে আমার মতে রাষ্ট্রের উপর বি. এ. ও এম. এ.-র এই বিপুল বাহিনীর বোঝা পড়া উচিত নয়। মুখস্থ বিদ্যায় মগজ ঠাসাই এবং ইংরেজদের মত ইংরাজী লেখা ও বলার অসম্ভব প্রচেষ্টায় প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত মনবিশিষ্ট এইসব ডিগ্রীধারীর দল সমাজে অপ্রয়োজনীয়। এঁদের অধিকাংশেরই কোন কাজ নেই ও তাঁরা বেকার। এবং এঁরা যখন অতীব কষ্টে কাজ পান, তখন সাধারণতঃ তা হয় কেরানীগিরির চাকরী। এখানে উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজী শিক্ষায় বার বৎসরে অর্জিত জ্ঞান তাঁদের কোন কাজে আসে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা রাষ্ট্রের কাজে লাগলে তা স্বাবলম্বী হয়। যে শিক্ষা জাতি বা শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কারও কাজে লাগে না, তার ব্যয় নির্বাহ করা ভীষণ পাপ। আমার মতে যা জাতির পক্ষে উপকারী বলে সিদ্ধ হয় না, তা কখনও ব্যক্তির পক্ষেও হিতকর হতে পারে না। এবং আমার অধিকাংশ সমালোচকগণই যখন সম্ভবতঃ এ কথা স্বীকার করেন যে প্রচলিত উচ্চশিক্ষা ও এমন কি প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব জগতের সম্পর্ক নেই, তখন এ কথা অবশ্যই বলা চলতে

পারে যে এ শিক্ষা রাষ্ট্র-হিতকরও নয়। শিক্ষা যখন প্রত্যক্ষভাবে বাস্তব আধারিত হবে ও আগাগোড়া যখন মাতৃভাষাই এর মাধ্যম হবে, তখন বোধহয় আমার এর বিরুদ্ধে কিছুই বক্তব্য থাকবে না। বাস্তব আধারিত হবার অর্থ হচ্ছে জাতীয় অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনানুগ হওয়া। তখন রাষ্ট্র এর ব্যয়ভার নির্বাহ করবে। তবে পূর্বোক্ত প্রকারের সুদিন এলেও আমরা বহু স্বয়ং-প্রণোদিত দান দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দেখব। সেগুলি রাষ্ট্রের কাজে আসতেও পারে আবার নাও আসতে পারে। আজ ভারতে শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, তার অধিকাংশ পূর্বোক্ত ধরনের। সুতরাং ক্ষমতা থাকলে সর্বসাধারণ-প্রদত্ত রাজস্ব থেকে তার জন্য ব্যয় করা আমি বন্ধ করতাম।

হরিজন, ৩০-৭-৩৮

৬
পাঠান্তে কিংকর্তব্যম্

একটি ছাত্র যথোচিত গুরুত্ব সহকারে প্রশ্ন করেছেন, "পড়াশুনা শেষ হলে আমি কি করব ?"

আজ আমরা পরপদানত জাতি এবং আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়েছে শাসকদের সুবিধার্থে। কিন্তু চরম স্বার্থপর ব্যক্তিও যেমন যাদের শোষণ করতে চায় তাদের কিছু না কিছু লোভ দেখায়, তেমনি আমাদের শাসকবর্গও তাঁদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে প্রলুব্ধ করার জন্য একাধিক প্রলোভন আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে আসছেন। তাছাড়া প্রতিটি সরকারী ব্যক্তিই একরকম নন। এঁদের ভিতর এমন অনেক উদারপন্থী আছেন, যাঁরা শিক্ষা-সমস্যাকে গুণাগুণের ভিত্তিতে বিচার করেন। সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বর্তমান ধারাতে কিছু ভালও আছে। তবে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে কারণেই হক, প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির অসদ্ব্যবহার হচ্ছে। অর্থাৎ একে অর্থ ও মান-মর্যাদা প্রাপ্তির সাধন বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

"সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে" অর্থাৎ যা মুক্ত করে তার নাম বিদ্যা—এই যে প্রাচীন প্রবাদ, এ সেকালের মত আজও সত্য। এখানে শিক্ষার অর্থ শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞান নয় বা মুক্তি বলতে শুধু পারলৌকিক মোক্ষ বোঝায় না। মানব-সমাজের সেবার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় শিক্ষার নামই জ্ঞান এবং মুক্তির অর্থ হচ্ছে এমন কি ইহজাগতিক যাবতীয় বন্ধনপাশ ছিন্ন করা। বন্ধন হয় দুরকমের। এক বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া দাসত্ব বন্ধন এবং দ্বিতীয়তঃ নিজের মনগড়া প্রয়োজনের জালে আবদ্ধ হওয়া। এই লক্ষ্যাভিমুখী অভিযানে চলার পথে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তাই হচ্ছে সত্যকার অধ্যয়ন।

বিদেশী শাসকবর্গ রচিত শিক্ষাব্যবস্থা শুধু জাতির স্বার্থহানি করবে একথা বুঝতে পেরে কংগ্রেস অন্যান্য কার্যক্রমের সঙ্গে শিক্ষায়তন বয়কট করার কর্মসূচী গ্রহণ করে। তবে মনে হয় যে সে যুগ পার হয়ে গেছে। সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অনুরূপ পদ্ধতিতে পরিচালিত বিদ্যায়তনে প্রবেশ লাভ করার আকাঙ্ক্ষা ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার চেয়ে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। বর্তমান শিক্ষার এই মোহিনীরূপ পরিদৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমার বিশ্বাস যে সত্যকার শিক্ষার ব্যাখ্যা পূর্বোক্ত ধরনে।

যে ছাত্র আমার শিক্ষাদর্শের প্রতি নকল আকর্ষণের টানে নিজের পড়াশুনা ছেড়ে দেবেন তিনি পরে অনুতাপ করতে বাধ্য হবেন। আমি তাই আরও নিরাপদ ব্যবস্থা অবলম্বন করার সুপারিশ করি। যে প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষাগ্রহণ করছেন সেখানে থাকতে থাকতেই তিনি মৎকথিত সেবার আদর্শ গ্রহণ করুন এবং অর্থোপার্জনের বাসনা থেকে নিবৃত্ত হয়ে ঐ আদর্শের পরিপূর্তির জন্য নিজ জ্ঞান নিয়োগ করুন। তাছাড়া অবসরকালে এই আদর্শ অনুযায়ী কাজ করে তিনি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অভাব মোচন করতে পারবেন। তাই

তিনি যতটা পারেন গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করার চেষ্টা করবেন।

হরিজন, ১০-৩-১৯৪৬

৭

ছাত্রদের বিলাতে পাঠান

বন্ধুটি বললেন, "সেকালের শ্রেষ্ঠ লোকেরা ইংলণ্ডে শিক্ষা পেয়েছিলেন। আপনিও এর এক উদাহরণ। আপনি কি চান যে স্বাধীনতা পাবার পর ভারত তার ছাত্রদের পূর্বের মত বিলাতে শিক্ষা নিতে পাঠাক?"

গান্ধীজী জবাব দিলেন, "না, এখনই নয়। বছর চল্লিশেক পরে অবশ্য ভারতীয় ছাত্রদের বিলাতে যাবার পরামর্শ দিতে আমার আপত্তি নেই। বন্ধুটি মন্তব্য করলেন, "তাহলে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে আগামী দুই পুরুষ পাশ্চাত্যদেশের সম্পর্কে আসার উপকার থেকে বঞ্চিত হবে।"

গান্ধীজী বললেন, "দুই পুরুষ কেন? এমন কি কোন ব্যক্তির জীবনেও চল্লিশ বা ষাট বছর খুব একটা বড় কথা নয়। আজকে দুর্ভাগ্যক্রমে অনেকেই যেমন এদেশে ষাট বছর বয়সে বুড়িয়ে যান ঠিকমত চলতে জানলে তা হবার কথা নয়। আমি আবার বলছি যে বুদ্ধি পরিণত হবার পরই ছাত্রদের বিদেশে যাওয়া উচিত। কারণ নিজেদের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ গুণাবলী সম্বন্ধে জানার পরই কেবল তারা ইংলণ্ড বা আমেরিকার কাছ থেকে গ্রহণযোগ্য শ্রেষ্ঠ গুণাবলী যথাযথভাবে উপলব্ধি ও গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। আমার মত সতের বছরের যে ছেলে বিলাতে যাচ্ছে তার কথা কল্পনা করুন। সে তো নিছক ডুবে মরবে।"

হরিজন, ২৩-৬-১৯৪৬

৮

বিদেশে যান কেন?

দেশে ফিরে যাতে স্বদেশবাসীর অধিকতর সেবা করতে পারেন সেইজন্য জনৈক ভারতীয় চিকিৎসক আমেরিকায় নিউরো সার্জারী শিখতে গিয়েছিলেন। অনেক কষ্টে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্থান সংগ্রহ করেছেন এবং হাউস সার্জনের কাজ করছেন।

আমি যাতে ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে যেতে নিষেধ করি সেইজন্য তিনি আমাকে নিম্নলিখিত কারণগুলি জানিয়েছেন ঃ

(ক) আমাদের দরিদ্র দেশের দশটি ছাত্রকে বিদেশে পাঠিয়ে শিক্ষা দিয়ে আনতে যা খরচ হয়, তা দিয়ে চল্লিশজন ছাত্রকে শিক্ষা দেবার উপযুক্ত প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক ও গবেষণাগারের সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(খ) এখানে যেসব ছাত্র আসেন তাঁরা গবেষণাকার্যে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করেন। কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে একটি গবেষণাগার সাজাবার শিক্ষা তাঁরা পান না।

(গ) ধারাবাহিক ভাবে কাজ করার সুযোগ তাঁরা পান না।

(ঘ) আমরা যদি বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসি তাহলে আমাদের গবেষণাগারগুলিও নিখুঁত হয়ে উঠবে।

আমাদের ছাত্ররা বিদেশে যান, এ আমি কখনও চাই নি। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে এসব যুবক দেশে ফিরে শেষকালে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেন না। দেশের মাটিতে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় তাই সর্বাধিক মূল্যবান এবং আত্মবিকাশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী। কিন্তু আজ বিদেশে যাবার মোহ ছাত্রসমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। উপরি-উক্ত উদ্ধৃতি যেন ঐসব ছাত্রদের কাছে সতর্কবাণী স্বরূপ হয়।

হরিজন, ৮-৯-১৯৪৬

৯

নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে

বিভিন্ন প্রদেশে যেন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়েছে। গুজরাত গুজরাতী ভাষার বিশ্ববিদ্যালয় চায়, মহারাষ্ট্র, মারাঠীর, কর্ণাটক কন্নড় ভাষার, ওড়িষা ওড়িয়া ভাষার এবং আসামের লোক অসমীয়া ভাষার বিশ্ববিদ্যালয় চান। আমিও বিশ্বাস করি যে এইসব সমৃদ্ধ প্রাদেশিক ভাষা-ভাষীদের যদি পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে হয়, তবে এ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে এই আশঙ্কাও উঠছে যে উপরি-উক্ত লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য আমরা যেন অহেতুক ব্যগ্রতা প্রকাশ করছি। প্রথমে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলির রাজনৈতিক পুনর্গঠন প্রয়োজন। ভাষাভিত্তিক প্রদেশগুলি পৃথক পৃথক ভাবে শাসিত হলে স্বভাবতই যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় নেই, সেখানে তা প্রতিষ্ঠিত হবে। বোম্বাই প্রদেশে গুজরাতী মারাঠী ও কন্নড়—এই তিনটি ভাষা চলেছে। ফলে তিনটিরই বিকাশের সম্ভাবনা ব্যাহত হচ্ছে। মাদ্রাজে তামিল তেলেগু মালায়লম্ ও কন্নড়—এই চার ভাষা। এখানে ঐ একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি। এ কথা ঠিক যে অন্ধ্রদেশে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় আছে। আমার মতে বিদেশীর প্রভাবমুক্ত এক পৃথক শাসনবিভাগীয় একম্ রূপী অন্ধ্রে এর যে মর্যাদা হত এখন তা নেই। ভারত মাত্র দুই মাস পূর্বে সেই স্বাধীনতা অর্জন করেছে। আন্নামালী বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। কে এ কথা বলতে পারে যে সেখানে তামিলের যথাযোগ্য স্থান হয়েছে?

নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার উপযুক্ত পৃষ্ঠভূমি প্রস্তুত থাকা চাই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সরবরাহকারী যথেষ্ট সংখ্যক স্কুল ও কলেজ থাকা প্রয়োজন এবং সেখানে বিভিন্ন প্রদেশের নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। শুধু তাহলেই যথার্থ পরিবেশ সৃষ্ট

হবে। বিশ্ববিদ্যালয় থাকে সবার শীর্ষে। মজবুত ভিত্তিভূমিই মহতী শীর্ষ ধরে রাখতে পারে।

আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্তি পেলেও পশ্চিমের প্রচ্ছন্ন অধীনতাপাশ থেকে মুক্ত হই নি বলে মনে হয়। যে সব রাজনীতিবিদ্ মনে করেন যে শুধু পশ্চিম থেকেই জ্ঞান আসতে পারে, তাঁদেরকে আমার বলার কিছু নেই। আর আমি একথা মানতে রাজী নই যে পাশ্চাত্য দেশ থেকে কল্যাণকর কিছু আসতে পারে না। তবে আমার আশঙ্কা হয় যে এখনও আমরা এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম নই। অবশ্য আমার বিশ্বাস যে কারও মনে এরকম ধারণা নেই যে আমরা বিদেশের শাসনবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি বলে শুধু সেই কারণেই বিদেশী ভাষা ও চিন্তাধারার গোপন ও সূক্ষ্ম প্রভাব থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। তবে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করতে যাবার পূর্বে একটু দাঁড়িয়ে আমাদের শ্বাসযন্ত্রকে নবলব্ধ স্বাধীনতার প্রাণবায়ুতে ভরে নেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়? স্বদেশের প্রতি কর্তব্যবুদ্ধিও কি আমাদের এই নির্দেশ দেয় না? বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য কখনই বিশাল সৌধমালা বা স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার প্রয়োজন হয় না। জাগ্রত ও বুদ্ধিযুক্ত জনমতের সমর্থন এর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বিরাট এক শিক্ষক-বাহিনী চাই। এর প্রতিষ্ঠাতৃবর্গকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে।

আমার মতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থব্যয় করা উচিত নয়। জনসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় চাইলে প্রয়োজনীয় অর্থ-সাহায্য তারাই করবে। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় স্বীয় দেশের শোভা বর্ধন করবে। শাসন-ব্যবস্থা যে দেশে অপরের কবলিত, সেখানে জনসাধারণের কাছে সবকিছু উপর থেকে আসে বলে তারা ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় পর-নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আর শাসন-ব্যবস্থা যেখানে গণসমর্থনের সুপ্রশস্ত ভিত্তিভূমি

আধারিত, সেখানে সবকিছু নীচে থেকে জন্ম নিয়ে উর্ধ্বাভিমুখে অভিযান করে এবং সেইজন্য তা স্থায়ী হয়। এরূপ ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও জনগণের শক্তিবর্ধক হয়। উর্বর ভূমিতে বপিত বীজ থেকে যেমন প্রচুর শস্য পাওয়া যায়, তেমনি পূর্ব-বর্ণিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে শিক্ষাখাতে ব্যয়িত অর্থ দশগুণ ফল প্রসব করে। বিদেশী শাসনকালে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একেবারে বিপরীত ব্যাপার ঘটিয়েছে। হয়ত তাদের কাছে অন্যরকম পরিণাম আশা করাই অন্যায়। অতএব ভারতবর্ষ নবলব্ধ স্বাধীনতা ভালভাবে পরিপাক না করা পর্যন্ত সতর্কভাবে পদক্ষেপ করার সর্ববিধ কারণ বিদ্যমান।

এর পর হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের কথা ধরুন। এই গরল এত ভীষণভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে যে, এ যে আমাদের কোন্ সর্বনাশের ঘূর্ণিপাকে নিয়ে যাবে, অগ্রিম তা বলা অসম্ভব। সেই অচিন্ত্যনীয় অবস্থার কথা কল্পনা করুন, যখন ভারতীয় ইউনিয়নে আর একটি মুসলমানেরও সম্মান ও নিরাপত্তা-সহকারে থাকার উপায় নেই এবং পাকিস্তানেও হিন্দু ও শিখেদের ঐ একই অবস্থা হয়েছে। সে সময়ে আমাদের শিক্ষা এক বিষাক্ত আবরণে আচ্ছাদিত হবে। পক্ষান্তরে উভয় ডোমিনিয়নেই যদি হিন্দু মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মমতাবলম্বীরা সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পারে, তাহলে স্বভাবতই আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা অতীব প্রীতিপ্রদ রূপ পরিগ্রহ করবে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা বহুদিন সখ্যতাসহকারে একত্র বসবাস করার ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে মনোহর সমন্বয় ঘটেছে, হয় আমরা তাকে ক্রমাগত শক্তিশালী করে স্থায়ী করার চেষ্টা করব, আর নচেৎ আমরা আকুল আগ্রহে সেইদিনের জন্য অপেক্ষা করব, হিন্দুস্থানে যখন একটি মাত্র ধর্ম ছিল ও অবশেষে আমরা সেই অন্য-নিরপেক্ষ সংস্কৃতির যুগে ফিরে যাব। খুব সম্ভব আদৌ আমরা ইতিহাসে ঐরকম কোন যুগের নজীর পাব না। তবে যদি এ রকম যুগের নজীর পাওয়াও যায় এবং আমরা পিছু হটে যদি

সেই যুগে ফিরে যাই, তাহলে আমাদের সংস্কৃতিকে অন্ধকার যুগে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলব এবং এরূপ করার জন্য আমরা সমগ্র বিশ্বের অভিশাপ কুড়াব। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা যদি মুসলমান যুগ বিস্মৃত হবার বৃথা চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের ভুলে যেতে হবে যে দিল্লীতে পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় জুম্মা মসজিদ ছিল, আলিগড়ে মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বা আগ্রাতে বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম তাজ ছিল, অথবা মোগল আমলে দিল্লী ও আগ্রায় বিরাট বিরাট দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। আমাদের তাহলে এই উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিহাসকে নূতন করে লিখতে হবে। আমরা কোন্ পথ বেছে নেব সে সম্বন্ধে মতানৈক্য অপরিহার্য এবং আজ নিশ্চয় দেশের বায়ুমণ্ডল এমন নয় যে আমরা এ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। আমাদের দুই মাস বয়স্ক স্বাধীনতা রূপ পরিগ্রহ করার চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত এর আকৃতি কেমন হবে, তা আমরা জানি না। স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ রূপ আমাদের সম্মুখে ভাস্বর না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির ব্যবস্থাতে সম্ভবত অল্প-বিস্তর পরিবর্তন করে তাদের ভিতর স্বাধীনতার প্রাণচাঞ্চল্য সঞ্চার করাই এখনকার মত যথেষ্ট। এইভাবে অর্জিত অভিজ্ঞতা নবীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার সময় এলে কাজে লাগবে।

হরিজন, ২-১১-৪৭

অষ্টম অধ্যায়ঃ বয়স্কদের শিক্ষা

১

সামাজিক শিক্ষা

সামাজিক শিক্ষা বা জনসাধারণের শিক্ষার সমস্যা শিশুদের শিক্ষা-সমস্যার চেয়েও দুরূহ। শিশুশিক্ষার ফলিত রূপ সম্বন্ধে কিছু কিছু উদাহরণ দেশে আছে। কিন্তু দেশের জনসাধারণের শিক্ষার ব্যাপারে সেটুকু সহায়ক দৃষ্টান্তও নেই। এ ব্যাপারে বিদেশ থেকে আমরা সামান্য মাত্রই শিখতে পারি। সেসব দেশের থেকে ভারতবর্ষের পরিস্থিতি ভিন্নতর।

ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ও আমাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতির কারণ আমাদের দেশে সামাজিক শিক্ষার প্রগতি তেমন সবলভাবে হয় নি। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত থাকায় দেশে প্রায়ই আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ হয়ে থাকে। আর হিন্দু মুসলমান পার্শী খ্রীস্টান ইত্যাদি সকলের জন্য একই ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থাও চলতে পারে না।

উদাহরণ-স্বরূপ গোরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হিন্দুর কাছে যে যুক্তি পেশ করা যায় মুসলমানের কাছে তা করা চলে না। অথচ তবুও উভয়কে হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষের অপকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে।

সমাজ সংস্কার বহু ব্যাপক এবং দুরূহ কার্য। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, প্রত্যেকের ভিতর বহু উপ-সম্প্রদায়ের অস্তিত্বজনিত সমস্যা আছে। একথা কেউ যেন মনে না করেন যে মুসলমান ও খ্রীস্টানদের মধ্যে কোন জাতিভেদ প্রথা নেই। হিন্দুরা সকল সম্প্রদায়ের ভিতরই এই পাপ সংক্রামিত করেছেন।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব সাফাই ও রাজনীতি—একমাত্র এই তিনটি বিষয়

সবাইকে সমানভাবে শেখান যেতে পারে। আমি ধরে নিয়েছি যে রাজনীতির ভিতর অর্থশাস্ত্রের জ্ঞানও অন্তর্নিহিত।

আশ্চর্য মনে হলেও আমাদের ভারতবর্ষে রাজনীতি ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের গভীর সম্বন্ধ বিদ্যমান। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে বিভিন্ন ধর্মের সবাই রাজনীতির প্রতি সমান দৃষ্টিতে দেখেন না। তাছাড়া রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বিবেচনা করাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। জনগণের শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মিরা অসুস্থতার পর আরোগ্যকামী সবাইকে বীফ-টি খাবার পরামর্শ দিতে পারেন না। আর মুসলমানদের তাঁরা জল পান করার ব্যাপারে স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোঝাতে পারবেন না।

এই অবস্থায় কোথা থেকে সামাজিক শিক্ষার সূত্রপাত করতে হবে এবং এর পরিধি ও গণ্ডিই বা কতটা হবে? সামাজিক শিক্ষার অর্থ হল সমগ্র জনসাধারণের শিক্ষা। এর অর্থ কেবল একটি নৈশ বিদ্যালয় খুলে কর্মক্লান্ত শ্রমিকদের অক্ষর পরিচয় করান নয়।

তাহলে সামাজিক শিক্ষায় আত্মনিয়োগকারী শিক্ষক কি করবেন?

এখনকার মত আমি কেবল তাঁর সামনে খোলা দুটি উপায়ের কথাই চিন্তা করতে পারি: প্রথমটি হল তিনি কোন গ্রামের বাসিন্দা হবেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাঁদের সেবা করবেন। তিনি তাঁদের যে-পরিমাণ সেবা করবেন সেই পরিমাণ তাঁদের শিক্ষাদান কার্য হবে। দ্বিতীয় পন্থা হল জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার করার উপযুক্ত সহজ পুস্তক লিখে স্বল্পমূল্যে প্রকাশ করতে হবে এবং তারপর জনসাধারণের মধ্যে এইসব পুস্তকের বহুল প্রচারের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করতে হবে। এই কাজে উৎসাহী ব্যক্তিরা নিরক্ষর জনসাধারণদের একসঙ্গে বসিয়ে এইসব বই পড়ে শোনাবেন এবং ক্রমশঃ এ একটা স্থায়ী প্রথায় পরিণত হবে।

গণশিক্ষার এই ধারণা যদি যথার্থ হয় তাহলে সর্বপ্রথম আমাদের উপযুক্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। সামাজিক শিক্ষা বলতে কি বোঝায় তার সঠিক ধারণা এখনও জনসাধারণের হয় নি। এক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষভাবে হলেও কংগ্রেস কিছু কাজ করেছে। অবশ্য চরিত্রগঠনেচ্ছুক শিক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে কংগ্রেস একাজ করে নি। রাজনৈতিক কর্মী প্রধানতঃ রাজনৈতিক শিক্ষা অর্থাৎ স্বরাজের দাবীতে সোচ্চার হবার শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহশীল। তিনি মনে করেন যে স্বরাজ অর্জিত হলে জনসাধারণের সাধারণ শিক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই রূপায়িত হতে বাধ্য। পক্ষান্তরে শিক্ষক মনে করেন যে একমাত্র চরিত্রবলে বলীয়ান্ হলেই স্বরাজ অর্জন সম্ভব। বর্তমানে অবশ্য আমরা কেবল শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করছি। চরিত্রবল না থাকলেও রাজনৈতিক কর্মী নিজ লক্ষ্য-সাধনে সফলকাম হতে পারেন ; কিন্তু চরিত্রবল ছাড়া গণশিক্ষকের চলবে না। এ ব্যাপারে কোন ন্যূনতা থাকলে তিনি নোন্‌তা স্বাদবিহীন নূনের মত হবেন।

বিনয়, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা

২

বয়স্কদের শিক্ষা

আমার মতে দেশবাসীর নিরক্ষরতার জন্য নয়, বরং অজ্ঞতার জন্য আমাদের লজ্জিত ও দুঃখিত হবার সঙ্গত কারণ আছে। অতএব বয়স্কদের শিক্ষা দেবার জন্য আমি সযত্নে নির্বাচিত শিক্ষকদল এবং সমপরিমাণ যত্নের সহিত নির্ধারিত পাঠ্যতালিকা দ্বারা গ্রামস্থ বয়স্কদের মন গড়ে তুলে অজ্ঞতা দূরীকরণের এক ব্যাপক কার্যক্রম আরম্ভ করতে চাই। এর অর্থ এ নয় যে আমি তাদের অক্ষরজ্ঞান দিতে অনিচ্ছুক। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে এর মূল্য আমি খুবই স্বীকার করি এবং তাই অক্ষরজ্ঞান শিক্ষার পরিকল্পনা বর্জন করা বা

একে ছোট করে দেখার প্রশ্ন ওঠে না। অক্ষরপরিচয়-পর্ব সহজ করার জন্য অধ্যাপক লুবাক্‌-এর অসীম প্রচেষ্টা ও ঐ আদর্শাভিমুখে অধ্যাপক ভাগবতের মহান্‌ এবং বাস্তব অবদান আমি প্রশংসা করি। আমি তো সেগাঁওবাসী নরনারী এবং এমন কি শিশুর উপরও তাঁর কলা প্রয়োগ করার জন্য অধ্যাপক ভাগবতকে সুবিধা পেলেই সেগাঁওএ আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছি।

হরিজন, ৫-৬-৩৭

৩

বয়স্ক-শিক্ষার লক্ষ্য

প্রশ্ন: আমাদের বয়স্ক-শিক্ষার পরিকল্পনার লক্ষ্য অক্ষরজ্ঞানের প্রসার, না "প্রয়োজনীয় জ্ঞান" দানের প্রচেষ্টা হবে?

উত্তর: যাঁরা বয়স্ক এবং কোন না কোন পেশায় নিযুক্ত, তাঁদের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে লিখতে পড়তে জানা। ব্যাপক নিরক্ষরতা ভারতের পাপ ও লজ্জার বিষয় এবং তাই এর নিরাকরণ অবশ্য কর্তব্য। তবে সাক্ষরতার আন্দোলন বর্ণপরিচয়ে শুরু ও শেষ হবে না। প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ কার্য চলবে।

হরিজন, ১৮-২-১৯৩৯

৪

বয়স্কদের অক্ষরজ্ঞান

তিরু ভেন্নাইনাল্লুরের গান্ধী মিশন সোসাইটি তাঁদের বয়স্ক শিক্ষণ-কার্যের ষাণ্মাসিক কার্য-বিবরণ আমাকে পাঠিয়েছেন। মোট ১৯৭ জন প্রাপ্তবয়স্ককে শিক্ষিত করা হয়েছে। তবে তাঁদের সামনের জ্বলন্ত সমস্যা হচ্ছে, "কিভাবে প্রাপ্তবয়স্করা এইভাবে অর্জিত জ্ঞানকে স্থায়ী করতে পারে।" কার্য-বিবরণে বলা হয়েছে: "প্রথম দফায় যেসব লোকেরা শিক্ষা নিতে আসতেন, তাঁদের প্রায়

অর্ধেকেই কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মীকে পুনরায় পুরাতন পাঠ পড়াতে বলেছেন। বস্তুতঃ আবার তাঁরা নিরক্ষরের পর্যায়ে ফিরে গেছেন। এই জাতীয় বিস্মৃতির পালা বন্ধ করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য কর্মীরা মাথা ঘামিয়ে সারা হচ্ছেন।" কর্মীদের মাথা ঘামিয়ে মরার প্রয়োজন নেই। যে যৎসামান্য সময়ের জন্য ওদের পড়ান হয়, তারপর অধীত পাঠ ওদের পক্ষে ভুলে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে পঠিতব্য বিষয়ের অনুবন্ধ করার পরই মাত্র এই জাতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির হাত এড়ান যেতে পারে। শুধু মোটামুটি লিখতে পড়তে ও হিসাব করতে জানা আজ তো গ্রামীণ জীবনের স্থায়ী অঙ্গ নয়-ই এবং ভবিষ্যতেও কোনদিন এ মর্যাদা পাবে না। গ্রামবাসীদের জ্ঞান দানের পদ্ধতি তাঁদের নিত্যকার জীবনের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্বন্ধিত হবে। এটা তাঁদের উপর চাপিয়ে দিলে চলবে না। তাঁদের ভিতর এর জন্যে আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা দরকার। আজ তাঁদের যা দেওয়া হয়, তার জন্য তাঁদের মনে চাহিদাও নেই এবং তাঁরা এর প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেন না। গ্রামবাসীদের গ্রাম্য গণিত, গ্রাম্য ভূগোল, গ্রাম্য ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দিন। যেটুকু সাহিত্য-জ্ঞান তাদের নিত্য প্রয়োজন, অর্থাৎ চিঠিপত্র লিখতে পড়তে জানা ইত্যাদি—তা-ই তাদের শেখাবার ব্যবস্থা করুন। এই ধরনের জ্ঞান তাঁরা সযত্নে রক্ষা করবেন ও শিক্ষার পরবর্তী ধাপের দিকে এগিয়ে যাবেন। যেসব পুস্তক তাঁদের নিত্যকার জীবনে গ্রহণীয় কিছু দিতে পারে না, তাঁদের তার প্রয়োজন নেই।

হরিজন, ২২-৬-৪০

৫

যথার্থ বয়স্ক-শিক্ষা

চরখা জয়ন্তী উপলক্ষে যেসব চিঠিপত্র ও তারবার্তা পেয়েছি তার মধ্যে ইন্দোরের বয়স্ক-শিক্ষা সমিতির কাছ থেকে প্রাপ্ত হিন্দুস্থানীতে লেখা একটি পত্র আমার সর্বাধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে। চিঠিটির মর্ম হল এই যে পূর্বোক্ত সমিতি চরখা জয়ন্তী উপলক্ষে আমার উদ্দেশ্যে স্তুতিবাক্য উচ্চারণের কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সময় নষ্ট না করে জয়ন্তী সপ্তাহে একটি জরুরী ও প্রয়োজনীয় কাজ করে। কাজটি হল বালবৃদ্ধ, ধনী নির্ধন, সরকারী ও বেসরকারী লোক নির্বিশেষে সকলে মিলে মানুষ ও পশুর পক্ষে ক্ষতিকারক একটি বিষাক্ত আগাছার বিনষ্টি-সাধন। এই জাতীয় সহযোগীতা যদি কোন জনপদের বিশিষ্ট চারিত্রধর্ম হয়ে ওঠে তাহলে তা-ই হবে বালবৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের উপযুক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা। এবং এর ফলে সেই সমাজের চেহারা পাল্টে যাবে।

হরিজন, ২৬-১০-১৯৪৭

নবম অধ্যায়ঃ গ্রামের শিক্ষা

১

গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে

বিহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হল যে যথাযথ গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ব্যতিরেকে স্থায়ী ধরনের কোন কাজ করা সম্ভবপর নয়। রায়তদের অজ্ঞতা ছিল শোচনীয় ধরনের। হয় তারা তাদের ছেলেমেয়েদের ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে দিত আর না হয় কয়েকটা পয়সার বিনিময়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নীলচাষের কাজে খাটতে পাঠাত। সেকালে পুরুষ শ্রমিকের দৈনিক মজুরী দশ পয়সা, মেয়েদের মজুরী ছয় পয়সা ও শিশুদের মজুরী তিন পয়সার বেশী হত না। রোজ যে চার আনা রোজগার করতে পারত সে তো একেবারে ভাগ্যবান পুরুষ।

আমার সহকর্মিদের সঙ্গে পরামর্শ করে ছয়টি গ্রামে আমি প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলতে মনস্থ করলাম। গ্রামবাসীদের সঙ্গে আমরা এই শর্ত করেছিলাম যে শিক্ষকদের থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব তাঁরা নেবেন এবং তাঁদের বাদবাকী প্রয়োজনীয়তা মেটাবার দায়িত্ব আমাদের। গ্রামবাসীদের হাতে নগদ টাকা পয়সা থাকত না বললেই চলে। তবে শিক্ষকদের খাওয়ানর শক্তি তাঁদের ছিল। প্রত্যুত বিদ্যালয় খোলার পূর্বেই তাঁরা ধান চাল ও অন্যান্য কাঁচা মাল দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

তবে কেবল প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। গ্রামগুলি ছিল অপরিচ্ছন্ন, গ্রামের পথঘাট নোংরায় পরিপূর্ণ। গ্রামের কূপগুলির চতুর্দিকে কাদা ও দুর্গন্ধের রাজত্ব ছিল আর গ্রামবাসীদের কুটীরের অঙ্গণগুলি ছিল অসহনীয় আবর্জনায় আকীর্ণ। বয়স্ক লোকেদেরও পরিষ্কার

পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না। তাদের সবাই নানারকম চর্মরোগে ভুগতেন। সুতরাং যতটা সম্ভব সাফাই-এর কাজ করা ও যতটা সম্ভব তাঁদের জীবনের প্রত্যেক বিভাগে অনুপ্রবেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আত্মকথা, ১৯২৬

২

শিক্ষা ও গ্রামসেবা

বিদ্যাপীঠের আসল কাজ গ্রামে। বিদ্যাপীঠের আরম্ভ থেকেই আমি একথা বলে আসছি। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বে বিদ্যাপীঠ বেআইনী প্রতিষ্ঠান রূপে ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আমাদের অধিকাংশ অধ্যাপক ও ছাত্র গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত আমরা এই ধারণাপরবশ হয়ে চলেছিলাম যে বিদ্যাপীঠের কাজ বুঝি কেবল গুজরাতের রাজধানী-শহরে স্থাপিত একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই চলতে পারে। তবে এখন অবস্থা পাল্টে গেছে এবং বর্তমানে শ্বাস নেবার মত একটু অবকাশও পাওয়া গেছে। এখন তাই সবাই একত্র হয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনার একটা সম্মিলিত রূপ দিতে হবে। সুতরাং এবারে বিদ্যাপীঠের মূল ধারণায় ফিরে গিয়ে তারই আলোকে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করলে তা কল্যাণকর হবে। যে-কোন প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি সদস্য যেখানেই থাকুন না কেন, সেই প্রতিষ্ঠানের আদর্শের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হবেন। আর যখন এই অবস্থা হয় তখন প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকেন্দ্র অথবা সম্মিলিত অস্তিত্ব থাকুক বা না-ই থাকুক, প্রতিষ্ঠান বেঁচে আছে স্বীকার করতে হবে।

সুতরাং আপনাদের মধ্যে যাঁরা বিদ্যাপীঠকে ভালবাসেন এবং এর সেবার জন্য যাঁরা অঙ্গীকারবদ্ধ, তাঁদের কাছ থেকে আমি এই আশা করব যে তাঁরা সোজা গ্রামে চলে গিয়ে সেখানে বিদ্যাপীঠের

আদর্শানুযায়ী থাকা শুরু করবেন। এইভাবে আপনারা প্রত্যেকেই ভ্রাম্যমাণ বিদ্যাপীঠে পরিণত হবেন এবং নিজেদের ব্যক্তিগত উদাহরণের মাধ্যমে বিদ্যাপীঠের আদর্শ সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষা দেবেন। একদল কর্মী বিদ্যাপীঠের আদর্শে গ্রামে বাস করার পর কোন্ গ্রামে আবার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলবেন—একথা কল্পনা করা খুব একটা দুরূহ ব্যাপার নয়। আজ অবশ্য আমাদের সে অবস্থা হয় নি।...

এই গ্রামসেবকের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হবে চরখা। চরখার সম্পূর্ণ তাৎপর্য আজ পর্যন্ত আমি কাউকে বোঝাতে পারি নি—এটা দুঃখের কথা। এর কারণ হল এই যে আমার নিজের জীবন এখনও এই বাণীর প্রতিধ্বনি হয়ে ওঠে নি। তবে আমার সাম্প্রতিক নয় মাসকালীন ভারত ভ্রমণের সময় এ সত্য আমি বারংবার উপলব্ধি করেছি। আমরা এখনও একথা ভাল করে বুঝি নি যে চরখায় সূতা কাটা এমন একটি অনুপূরক শিল্প ভারতবর্ষে যার সার্বত্রিক হবার সম্ভাবনা বিদ্যমান। চরখা না হলে গ্রামের তাঁতী বাঁচতে পারে না। একথা সত্য যে আজ গ্রামের তাঁতীরা কলের সূতা পেয়ে থাকেন, তবে চিরকাল কলের উপর নির্ভরশীল থাকলে তাঁদের সর্বনাশ অবধারিত। বর্তমানে চরখা আমাদের আর্থিক জীবনে এইটুকু স্থান অধিকার করেছে যে, বিগত দশ বৎসরে সৃষ্ট নূতন এক শ্রেণীর খাদির সূতা বয়নকারীদের প্রয়োজনীয়তা এ পূর্ণ করছে। কিন্তু চরখা সঙ্ঘের মত একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান কেবল ঐটুকু সীমিত আদর্শের রূপায়ণের জন্য নিজের অস্তিত্বের সার্থকতা সপ্রমাণ করতে পারে না।...

গ্রামসেবক কেবল নিয়মিতভাবে চরখায় সূতা কাটবেন না, জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি প্রয়োজন মত বাটালি কোদাল অথবা জুতা মেরামতের লাশ ধরবেন। শোবার জন্য আট ঘণ্টা বাদ দিলে দিনের বাকী সময় তিনি কোন না কোন কাজ করতে থাকবেন। অপচয় করার মত কোন সময় তাঁর থাকবে না। তিনি স্বয়ং

আলস্য করবেন না এবং আর কাউকেও তার সুযোগ দেবেন না। প্রতিবেশীদের কাছে তাঁর জীবন হবে নিরলস ও আনন্দে উদ্বেল কর্মপ্রয়াসের নিদর্শন। দেহের খোরাক জোটাতে হবে দৈহিক শ্রম থেকে আর বৌদ্ধিক শ্রমের প্রয়োজনীতা মনের অনুশীলনের জন্য। শ্রমবিভাজন অবশ্যই থাকবে, তবে এ বিভাজন হবে বিভিন্ন ধরনের দৈহিক শ্রমের মধ্যে। আজকের মত কেবল একটি শ্রেণীর জন্য বৌদ্ধিক শ্রমের এলাকাকে সুরক্ষিত করা চলবে না। আমাদের বাধ্যতামূলক অথবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আলস্য পরিহার করতে হবে। এর নিরাকরণ করতে না পারলে কোন ওষুধেই কোন কাজ হবে না এবং আজকের এই অর্ধাশনের অবস্থা চিরকালীন সমস্যা হয়ে থেকেই যাবে। যিনি দুই দানা শস্য খান তাঁকে চার দানা উৎপাদন করতে হবে। এই নিয়মকে বিশ্বজনীন নীতি হিসাবে গ্রহণ না করা পর্যন্ত জনসংখ্যা যতই কমান যাক না কেন, তা দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। আর এই নীতিকে গ্রহণ করে তদনুযায়ী আচরণ করলে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্যও খাওয়া-পরার অভাব হবে না।

এইভাবে গ্রামসেবক হবেন কর্মচাঞ্চল্যের জীবন্ত প্রতীক। কাপাসের চাষ থেকে আরম্ভ করে কাপাস তোলা ও বুনাই পর্যন্ত খাদির সব প্রক্রিয়ায় তিনি দক্ষ হবেন এবং তাঁর চিন্তা-ভাবনা নিয়োজিত হবে এইসব প্রক্রিয়ার উন্নয়নের জন্য।...গ্রামে যদি তিনি শিক্ষকরূপে গিয়ে থাকেন তাহলে নিজেকে শিক্ষার্থীও মনে করবেন। শীঘ্রই তিনি দেখতে পাবেন যে সাদাসিধে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে তাঁর অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। গ্রাম-জীবনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তিনি পরিচিত হবেন। গ্রামের হস্তশিল্পগুলিকে খুঁজে বার করে তিনি তাদের বিকাশ ও উন্নতির কতটা সম্ভাবনা আছে তা দেখবেন।...অবশ্য নিজের শক্তির সীমা সম্বন্ধে বিস্মৃত হওয়া তাঁর চলবে না এবং তাই তাঁর পক্ষে সাধ্যাতীত—কৃষকদের ঋণভারের সমস্যা নিজের হাতে তিনি নিতে যাবেন না।

তাঁর মনযোগের অনেকটাই গ্রামের সাফাই ও স্বাস্থ্য সমস্যার পিছনে যাবে। তাঁর নিজের নিবাস ও তার চতুর্দিক কেবল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার আদর্শস্বরূপ হবে না। তিনি নিজের হাতে ঝাঁটা ও বালতি নিয়ে সমগ্র গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার প্রচেষ্টা করবেন।

তবে নিজেই গ্রামে হাসপাতাল খাড়া করতে বা স্বয়ং গ্রামের ডাক্তার হবার চেষ্টা তিনি করবেন না। এগুলি হল ফাঁদ বিশেষ এবং এর হাত এড়াতেই হবে। হরিজন-সফরের সময় আমি এমন একটি গ্রামে গিয়েছিলাম যেখানে আমাদের একজন কর্মী একটি তথাকথিত হাসপাতাল-ঘর তুলে চারপাশের গ্রামবাসীদের বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করতেন। বস্তুতঃ স্বেচ্ছাসেবকেরা বাড়ী বাড়ী ঔষধ পৌঁছে দিতেন এবং হাসপাতালে মাসে ১২০০ রোগীকে ঔষধ দেওয়া হয় বলে কর্মিদের মনে গর্ব ছিল। স্বভাবতই আমাকে এ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করতে হয়। কর্মীটিকে আমি বললাম যে এভাবে গ্রামসেবা হয় না। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে রোগের চিকিৎসা নিয়ে মাথা ঘামানর পরিবর্তে রোগ প্রতিষেধের জন্য গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য ও সাফাই সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। কর্মীটিকে আমি সেই প্রাসাদোপম হাসপাতাল বাড়ীটিকে লোকাল বোর্ডকে ভাড়া দিয়ে কোন কুঁড়ে ঘরে গিয়ে থাকার পরামর্শ দিলাম। গ্রামসেবক বড় বেশী হলে কুইনাইন কেস্টর অয়েল আইওডিন জাতীয় কয়েকটি ঔষধ নিজের কাছে রাখবেন। গ্রামসেবকের প্রচেষ্টা হবে জনসাধারণকে ব্যক্তিগত ও গ্রামের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সচেতন করা ও এই কার্য সাধনে তাঁদের তৎপর করে তোলা।

এরপর তিনি গ্রামস্থ হরিজনদের কল্যাণসাধনের চেষ্টা করবেন। তাঁর নিবাস হরিজনদের কাছে সদা উন্মুক্ত থাকবে। প্রত্যুত হরিজনরা নিজেদের দুঃখকষ্টের সময় স্বভাবতই তাঁর কাছে আসার কথা ভাববেন। তাঁর ঘরে হরিজনরা আসছেন এটা যদি গ্রামবাসী

পছন্দ না করেন তাহলে গ্রামসেবক হরিজন পল্লীতেই বসবাস আরম্ভ করবেন।

কর্মীর জীবন গ্রাম-জীবনের সঙ্গে সমরস হবে। তিনি এমন ভাবে থাকবেন না যাতে মনে হয় যে তিনি পুঁথিপত্রের মধ্যে সমাধিস্থ এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার প্রতি যিনি বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করেন না। বরং জনসাধারণ যখনই তাঁকে দেখবেন তখনই তাঁকে চরখা তাঁত বাটালি কোদাল ইত্যাদি তাঁর হাতিয়ার পত্র নিয়ে ব্যস্ত দেখতে পাবেন এবং তাঁদের মনে হবে যে গ্রাম-সেবক তাঁদের তুচ্ছতম প্রশ্নটি সম্বন্ধেও সচেতন। গ্রামসেবক সর্বদাই নিজের পেটের অন্নের জন্য কাজ করতে চাইবেন। ঈশ্বর প্রত্যেককে তার নিজের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তার চেয়ে বেশী উৎপাদন করার শক্তি দিয়েছেন এবং সবাই যদি নিজ নিজ প্রতিভার সদ্ব্যবহার করেন তাহলে নিজ যোগ্যতা যতই সীমিত হক না কেন, একটা কাজের অভাব হবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনসাধারণ গ্রামসেবকের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে চাইবেন। তবে কোথাও কোথাও তাঁকে হয়ত উপেক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। তবুও তিনি হাল ছাড়বেন না। কোন কোন গ্রামে হয়ত তাঁর হরিজন-প্রেমের জন্য তাঁকে একঘরে হয়ে থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে তিনি হরিজনদেরই কাছে যাবেন এবং নিজের ভরণপোষণের জন্য তাঁদের উপর নির্ভর করবেন। মজুরকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তা সব সময়েই পুষিয়ে যায়। তাই গ্রামসেবক যদি ধর্মতঃ হরিজনদের সেবা করেন তাহলে তাঁদের কাছ থেকে খোরাকী নিতে সঙ্কোচবোধ করার কারণ নেই। শুধু এইটুকু দেখতে হবে যে তিনি যা নিচ্ছেন, দিচ্ছেন তার চেয়ে বেশী। প্রথম দিকে অবশ্য যেখানে সম্ভব নিজের যৎসামান্য হাত খরচের টাকাটা তিনি কোন কেন্দ্রীয় অর্থকোষ থেকে নেবেন।

গরুর প্রশ্ন আমি ইচ্ছা করেই ছেড়ে দিয়েছি। গ্রামসেবকের পক্ষে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা কঠিন হবে। সুতরাং গ্রামের

লোককে নীতিগত ভাবে এ সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা ছাড়া এ ব্যাপারে তিনি হাত দেবেন না। গোরক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা এখনও আমরা আবিষ্কার করতে পারি নি। তেমনি মৃত গবাদি পশুর চামড়ার সদ্ব্যবহার বা সেই চামড়াকে পাকানোর ব্যবস্থাও করে উঠতে পারি নি। গুজরাতে আছে এর উপর আবার মহিষের সমস্যা। জনসাধারণকে এই কথা বোঝাতে হবে যে মহিষের পৃষ্ঠপোষকতা করার অর্থ গরুকে মরতে দেওয়া।...

স্মরণ রাখবেন আমাদের অস্ত্র হল আধ্যাত্মিক। এ কাজ করে সূক্ষ্ম অথচ অপ্রতিরোধ্য ভাবে। এর প্রগতি গাণিতিক হারে হয় না, হয় জ্যামিতিক হারে।...সুতরাং আপনাদের সকল কার্যকলাপের পটভূমিকা হবে আধ্যাত্মিক। আর সেইজন্য আচার ব্যবহারে চরিত্রের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা একান্ত অপরিহার্য।

হরিজন, ৩১-৮-১৯৩৪

৩

গ্রামের শিক্ষার লক্ষ্য

যে কার্যক্রম ও জীবনের আদর্শ সম্মুখে রেখে আপনারা কাজ করবেন তার সম্বন্ধে আমি আপনাদের কিছু বলতে চাই।

ভবিষ্যৎ গড়া বলতে সচরাচর যা বোঝায়, আপনারা তার জন্য এখানে আসেন নি। আজ টাকা আনা পয়সা দিয়ে মানুষের মূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং তার শিক্ষা এক অর্থকরী পণ্যে পর্যবসিত। আপনারাও যদি এই মানদণ্ড স্বীকার করে এসে থাকেন তাহলে নিশ্চয় হতাশ হবেন। আপনাদের প্রশিক্ষণ শেষ হলে হয়ত দশ টাকা মাসোহারায় কর্মজীবনের সূত্রপাত হবে এবং এর অবসান হবে ঐ টাকাতেই। কোন বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা উচ্চ পদারূঢ় রাজকর্মচারী যা পান তার সঙ্গে আপনারা যেন নিজেদের অবস্থার তুলনা না করেন।

আমাদের প্রচলিত মানদণ্ডের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। জাগতিক অর্থে কোনরকম ভবিষ্যৎ গড়ার প্রতিশ্রুতি আমরা আপনাদের দেব না এবং প্রত্যুত আপনাদের মনকে আমরা ঐরকম ইচ্ছা থেকে ফিরিয়ে আনতে চাই। মাসিক ছয় টাকায় আপনাদের খাবার খরচ চলে যাবে এই হচ্ছে আমাদের কাম্য। একজন সিভিল সার্ভিসের অফিসার হয়ত ঐ বাবদে মাসে যাট টাকা খরচ করেন। তবে এইজন্য শারীরিক মানসিক বা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি যে আপনাদের চেয়ে শ্রেয়ঃ, একথা মনে করার কারণ নেই। এই জাতীয় ব্যয়বহুল জীবনযাত্রার কারণে তিনি হয়ত ঐ সব দিক থেকে বিচার করলে আপনাদের থেকে নিম্নস্তরের বলে প্রতিপাদিত হবেন। আমার মনে হয় আপনারা নিজেদের যোগ্যতার পরিমাণ কাঞ্চনমূল্যে করবেন না বলেই এই প্রতিষ্ঠানে এসেছেন। দুবেলা দু মুঠো কেবল খেতে পাবার বিনিময়ে দেশের সেবা করাতেই আপনাদের আনন্দ। ফাটকা খেলে কেউ হাজার হাজার টাকা রোজগার করতে পারেন কিন্তু আমাদের কাজের পক্ষে তিনি হয়ত নিতান্ত অযোগ্য হবেন। আমাদের এই অনাড়ম্বর পরিবেশে এসে তাঁরা অস্বস্তি বোধ করবেন এবং তাঁদের পরিবেশে আমরা অস্বস্তি বোধ করব। দেশের সেবার জন্য আমরা আদর্শ শ্রমিক চাই। যেসব গ্রামবাসীদের সেবা করতে হবে তাঁরা তাঁদের খাওয়া-দাওয়া বা অন্যবিধ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কি ব্যবস্থা করল এ নিয়ে এইসব আদর্শ শ্রমিক মাথা ঘামাবেন না। নিজেদের প্রয়োজন-পূর্তির জন্য তাঁরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করবেন এবং সকল রকম দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়েও তাঁরা উল্লাস বোধ করবেন। আমাদের দেশের মত যেখানে সাত লক্ষ গ্রাম নিয়ে চিন্তা করতে হয় সেখানে এই রকমটাই স্বাভাবিক। এ কাজের জন্য নিয়মিত বেতনবৃদ্ধি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং পেন্‌সন্‌ ইত্যাদির প্রতি মনযোগ নিবদ্ধকারী বেতনভোগী কর্মচারী রাখা পোষায় না।

গ্রামবাসীদের বিশ্বস্ততা সহকারে সেবা করাই একাজের স্বাভাবিক পুরস্কার।

আপনাদের ভিতর কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে গ্রামবাসীদের জীবনমানও কি এই রকম হবে? না, তা কখনই নয়। এই জাতীয় ভবিষ্যৎ আমাদের মত সেবকদের, আমাদের প্রভু গ্রামবাসীদের নয়। অনেকদিন আমরা তাঁদের কাঁধে চড়ে কাটিয়েছি। তাই আমাদের প্রভুদের ভাগ্য যাতে আজকের চেয়ে অনেক ভাল হয় তার জন্য স্বেচ্ছায় আমরা এই ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য বরণ করে নিতে চাই। আজ তাঁদের যে আয় তার চেয়ে বহুগুণ বেশী আয় তাঁরা যাতে করতে পারেন তার ব্যবস্থা আমাদের করে দিতে হবে। আর গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের লক্ষ্যও তাই। তবে পূর্বে আমি যেরকম সেবকের কথা বর্ণনা করেছি অধিক সংখ্যায় সেই রকম সেবক না পেলে একাজ করা সম্ভবপর নয়। প্রার্থনা করি আপনারা যেন সেই রকম সেবক হতে পারেন।

হরিজন, ২৩-৫-১৯৩৬

দশম অধ্যায়ঃ নারীদের শিক্ষা

১

নারীদের শিক্ষা

নারীদের শিক্ষা পুরুষদের শিক্ষার মতই ত্রুটিপূর্ণ। শিক্ষা-পরিকল্পনা নির্বাচনের পূর্বে পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সম্বন্ধ ও ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয় নি।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে বালক ও বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার অধিকাংশই এক রকম হবে। এটা বাদ দিলে উভয়ের শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে পৃথক। প্রকৃতি যেভাবে পুরুষ ও নারীকে পৃথকভাবে গড়েছে, পুরুষ ও নারীর শিক্ষার ভিতর সেইরকম পার্থক্য থাকা প্রয়োজন। একথা সত্য যে উভয়েই সমান। কিন্তু তাদের বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্যে পার্থক্য বিদ্যমান। গৃহের অভ্যন্তরে নারীই সর্বেসর্বা। আর পুরুষ বাইরের প্রভু। পুরুষ জীবিকা উপার্জন করে, নারী তার থেকে সঞ্চয় ও ব্যয় করে থাকে। নারী শিশুদের মানুষ করে, তাকে মা হতে হয়। শিশুদের চরিত্রগঠনের দায়িত্ব নারীর। নারী শিশুদের শিক্ষয়িত্রী এবং সেই কারণে সমগ্র জাতিরও মাতা। এই অর্থে পুরুষ সমগ্র জাতির পিতা নয়। একটা বয়সের পর পিতা আর সন্তানকে প্রভাবিত করতে পারেন না কিন্তু মায়ের বেলা তা ঘটে না। সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হলেও মায়ের কাছে শিশুর মতই আচরণ করে। অথচ বাবার কাছে এমন করতে পারে না।

এই ব্যবস্থাকে যদি স্বাভাবিক ও উচিত বিবেচনা করা হয় তাহলে নারীদের জীবিকা অর্জন করতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যে সমাজ-ব্যবস্থায় নারীদের তার বিভাগের কেরাণী টাইপিস্ট বা কম্পোজিটারের কাজ করতে হয় আমার মতে তা সুব্যবস্থিত রীতি

নয়। এরকম সমাজব্যবস্থা নৈতিক ও আর্থিক দেউলিয়াবৃত্তির দ্যোতক এবং এ অবস্থা এই কথা প্রমাণ করে যে সেই সমাজের অধিবাসীরা নিজেদের পুঁজি ভেঙ্গে খাওয়া আরম্ভ করেছেন।

এই জন্য নারীদের অজ্ঞানতার অন্ধকারে বা অবদমিত করে রাখা যেমন অন্যায় তেমনি তাদের দিয়ে পুরুষের কাজ করানও অনুচিত। কারণ এসব সমাজ-ব্যবস্থার দুর্বলতার লক্ষণ ও নারীদের প্রতি অত্যাচারের সমতুল্য।

সুতরাং একটা বয়সের পর মেয়েদের জন্য এমন শিক্ষাব্যবস্থা করা উচিত যা পুরুষদের থেকে পৃথক। গৃহস্থালী পরিচালনা, প্রসূতি-বিজ্ঞান ও শিশুপালন সম্বন্ধে নারীদের শিক্ষা দেওয়া উচিত।

…দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে এমন বহুসংখ্যক মেয়ে আছেন যাঁদের শৈশবেই বিবাহ হয়ে যায়।…আর একবার তাঁদের বিবাহ হয়ে গেলে তাঁরা যেন সামাজিক জীবন থেকে একদম অদৃশ্য হয়ে যান। এ সম্বন্ধে "ভগ্নি পুস্তকমালার" ভূমিকায় আমি আমার অভিমত ব্যক্ত করেছি এবং এখানে তা আবার উদ্ধৃত করছি ঃ

"কেবল বালিকাদের শিক্ষা দিয়ে আমরা নারীদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করতে পারব না। বাল্যবিবাহের দৈত্যের কবলে পড়ে হাজার হাজার মেয়ে বার বছর বয়সের পূর্বেই অদৃশ্য হয়ে যায়। এক ধাক্কায় তারা মেয়ে থেকে গৃহিণীতে পরিণত হয়ে যায়। এই কুপ্রথা যতদিন চলবে ততদিন একটি মাত্র বিকল্প ব্যবস্থাই হতে পারে এবং তাহল পুরুষদের নারীর শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেকটা এই জাতীয় পুরুষ শিক্ষকদের কর্তব্য সম্পাদনের উপর নির্ভরশীল। আজকের মত নারীদের আমাদের কৃতদাসী ও সম্ভোগের পাত্রী করে রাখা চলবে না। এর পরিবর্তে তাদের আমাদের যথার্থ জীবন-সঙ্গিনী, জীবন-যুদ্ধের সহকর্মী ও সুখ-দুঃখের সাথীর ভূমিকা দিতে হবে। এই লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া

পর্যন্ত আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা একেবারেই নিরর্থক। এমন অনেক পুরুষ আছেন যাঁরা বাড়ীর মেয়েদের পশু বলে মনে করেন। ...এই মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করে মেয়েদের হীন মনে করার প্রথার মূলোচ্ছেদ করতে হবে। অপর দিকে আবার কামনায় অন্ধ অনেক পুরুষ নারীদের মাথায় তুলে রাখেন এবং দেবমূর্তিকে যেমন আমরা অলঙ্কার পরাই তেমনিভাবে নারীদের অলঙ্কারে সজ্জিত করেন। এই কুপ্রথা থেকেও আমাদের দূরে থাকতে হবে। মহাদেবের কাছে পার্বতী যা, রামের কাছে সীতার যে স্থান এবং নলের কাছে দময়ন্তী যা—আমাদের নারীরা আমাদের কাছে সেই রকম না হওয়া পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হবে না। এরকম হলে নারীরা আমাদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন, সমানাধিকারের ভিত্তিতে কোন বিষয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে বিতর্ক করবেন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী উপলব্ধি করে তাকে শক্তিশালী করবেন, সংবেদনাজাত তাঁদের চমৎকার অন্তর্দৃষ্টির বলে আমাদের অসুবিধার কথা উপলব্ধি করবেন, এইসব অসুবিধা দূরীকরণের সংগ্রামে আমাদের ভাগীদার হবেন এবং প্রয়োজনকালে আমাদের স্নিগ্ধ শান্তির পরশ দেবেন। কেবল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনা করলে এ আদর্শ সংসাধিত হবে না। বাল্যবিবাহের ফাঁস যতদিন আমাদের গলায় থাকবে ততদিন পুরুষকেই নারীর শিক্ষক হতে হবে। আর পুরুষরা এই যে শিক্ষা নারীদের দেবেন তা কেবল সাহিত্যমূলক হবে না—এর পরিধি সমাজসংস্কার ও রাজনীতি পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে। অক্ষর ও ভাষাজ্ঞান হবে পূর্বোক্ত বিষয়সমূহ শেখাবার সোপান স্বরূপ। এমন কি ভাষাজ্ঞান ছাড়াই ঐসব বিষয় শেখান যেতে পারে। নিজ স্ত্রীকে যে পুরুষ এইভাবে শিক্ষা দিতে যান স্ত্রীর প্রতি তাঁর নিজ মনোভাবের পরিবর্তন সাধন করতে হবে। স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বয়ং ছাত্র হবেন এবং স্ত্রী প্রাপ্ত বয়স্কা না হওয়া পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়-সংযম পালন করবেন। কোন অবস্থাতেই

তিনি বার থেকে পনের বছরের মেয়ের উপর সন্তানধারণের বোঝা চাপাবেন না। ব্যাপারটি কল্পনা করতেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই শর্ত পালন করলে আমরা বর্তমানের মত আর জড়তার চাপে পিষ্ট হব না।”

বিচার স্বষ্টি, ১৯১৭

২

নারীদের শিক্ষাব্যবস্থা

পুরুষদের মত নারীদের জন্যও শিক্ষা প্রয়োজন। তবে একথার অর্থ এই নয় যে নারীদের পুরুষদের ধরনের শিক্ষা দিতে হবে।……পুরুষ ও নারী উভয়ে সমশ্রেণীর; তবে দৈহিক ও মানসিক গঠনের দিক থেকে পরস্পরের হুবহু অনুরূপ নয়। পুরুষ ও নারী এক অনবদ্য যুগল ও একে অপরের পরিপূরক। একে অপরকে সাহায্য করে বলে একজন বিনা অপরের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। অতএব এই ঘটনা থেকে স্বতঃসিদ্ধ অনুসিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে, এদের কারও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলে উভয়ের-ই ধ্বংস অনিবার্য। নারী-শিক্ষার যে কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন-কালে এই জ্বলন্ত সত্য সদা সর্বদা হৃদয়ে জাগরূক থাকা প্রয়োজন। বিবাহিত দম্পতির ভিতর পুরুষের উপর বাইরের কার্যকলাপের সর্বাধিক দায়িত্ব। সুতরাং স্বভাবতই এক্ষেত্রে তার অধিকতর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে গৃহস্থালীর ভিতর নারীর একচ্ছত্র আধিপত্য। অতএব গৃহস্থালীর ব্যাপারে ও শিশুপালন এবং তাদের শিক্ষা সম্বন্ধে নারীর অধিকতর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। জ্ঞানকে অবশ্য পরস্পর সম্পর্ক-রহিত ক্ষুদ্র কুঠরীতে বিভক্ত করার কথা বলা হচ্ছে না। একথাও বলা হচ্ছে না যে জ্ঞান-রাজ্যের বিশেষ বিশেষ অংশ কারও কাছে অনধিগম্য থাকবে। তবে

পূর্বোক্ত মৌলিক নীতি অনুসরণে পুরুষ এবং নারীর জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষাক্রম নির্ধারিত না হলে নর বা নারীর জীবনের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়।

মেয়েদের ইংরাজী শেখার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সে বিষয়ে তুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমার মতে সাধারণতঃ পুরুষ বা নারী কারও ইংরাজী শেখার দরকার নেই। তবে জীবিকা অর্জনের জন্য অথবা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের জন্য পুরুষদের হয়ত ইংরাজী শিখতে হতে পারে। কিন্তু জীবিকা অর্জনের জন্য নারী চাকরী বা ব্যবসা করুক—এ নীতিতে আমার বিশ্বাস নেই। যে সামান্য কয়জন নারীর ইংরাজী শিক্ষা প্রয়োজন বা যাঁদের এ ইচ্ছা আছে, তাঁরা পুরুষদের বিদ্যালয়ে যোগদান করে সহজেই নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারেন। মেয়েদের বিদ্যালয়েও ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন করার একমাত্র অর্থ হচ্ছে আমাদের অসহায় অবস্থার মেয়াদ বৃদ্ধি করা। সময় সময় এই কথা কানে আসে যে ইংরাজী সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ নরনারী নির্বিশেষে সকলের কাছে সহজলভ্য হওয়া প্রয়োজন। আমার বিনম্র নিবেদন এই যে, এ জাতীয় মনোভাব গঠিত হবার পিছনে কিছুটা ভ্রান্তি ক্রিয়াশীল। কেউ-ই চায় না যে এই সম্পদের দ্বার পুরুষদের জন্য উন্মুক্ত রেখে তার উপর নারীদের জন্য প্রবেশ নিষেধের বিজ্ঞপ্তি টাঙ্গিয়ে দেওয়া হক। সাহিত্যিক রুচি থাকলে পৃথিবীতে কারও এমন শক্তি নেই যে সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য অধ্যয়ন থেকে আপনাকে প্রতিনিবৃত্ত করে। তবে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনের কথা স্মরণ রেখে পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হবার কালে সাহিত্যিক রুচিসম্পন্ন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের প্রয়োজন পূর্তি করা যায় না।

বোম্বাই ভগ্নী সমাজের সভাপতির অভিভাষণ, ১৯১৮

৩

নারী-শিক্ষার নানা দিক

[আহমেদাবাদের গুজরাত সাহিত্যসভা নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু সংখ্যক নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে কয়েকটি প্রশ্ন পাঠিয়েছিল। এখানে গান্ধীজী কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরের কয়েকটি দেওয়া হল।]

প্রাথমিক শিক্ষার পর একটি মেয়ে আরও চার পাঁচ বৎসর মাধ্যমিক শিক্ষা পেয়ে থাকে। এই কয় বৎসর তাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে না ইংরাজীর মাধ্যমে—এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন : আমার মনে হয় এ অবস্থায় তাদের ইংরাজী শেখার অর্থ তাদের মেরে ফেলা। দেশের লক্ষ লক্ষ নারী কখনও ইংরাজীর মাধ্যমে চিন্তা করতে বা সেই চিন্তা ব্যক্ত করতে পারবেন না। আর এরকম সম্ভবপর হলেও তা অবাঞ্ছিত।

"যেসব মহিলাদের জন্য আমরা এই শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করছি তাঁদের যদি মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে তাঁরা নিজেদের ঘর গৃহস্থালীকে সোনার মত উজ্জ্বল ও সুন্দর করে তুলতে পারবেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা তাহলে তাঁদের শিক্ষা-লাভে বঞ্চিত ভগ্নীদেরও এর দ্বারা প্রভাবিত করতে পারবেন এবং তাঁদের মূল্যবান সেবা দিতে পারবেন।"

সংস্কৃত সম্বন্ধে গান্ধীজী নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন : "আমার মতে মেয়েদের সংস্কৃত শেখান উচিত এবং সম্ভব হলে এটা তাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তবে এই চার পাঁচ বছর সময়কে সবচেয়ে বেশী কাজে লাগাতে হবে বলে এসময় সংস্কৃত শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায় না।"

নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

"নৈতিকতা ও ধর্মের মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখি না। আমার মনে হয় যে ধর্মীয় শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে হিন্দুধর্মের মূল নীতি এত প্রচ্ছন্ন যে কি ভাবে এ ধর্ম শেখান

যেতে পারে হঠাৎ তা বলা যায় না। তবে মোটামুটি এই কথা বলা যায় যে গীতা রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতকে হিন্দুরা সবাই শ্রদ্ধা-দৃষ্টিতে দেখেন এবং এইসব ধর্মগ্রন্থের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের সঙ্গে ছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে যদি মেয়েদের এগুলি পড়ান হয় তাহলে যথেষ্ট কাজ হবে বলে মনে হয়। তবে এক্ষেত্রে পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ করার চেয়ে শিক্ষক বাছাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

"আখা ভগত-এর বাণী ছিল যে পৃথিবীতে নিজ নিজ পরিস্থিতি অনুসারে যেমন ভাবেই থাক না কেন সর্বদা নিজের সম্মুখে ঈশ্বর প্রাপ্তির লক্ষ্য জাগরূক রাখ। এই আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন থাকলে তবে ধর্মীয় শিক্ষার লক্ষ্য পরিপূর্তি হবে।

আত্মোদ্ধার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৫

৪

নারীদের ভিতর নিরক্ষরতা

পুরুষদের মত নারীদের ভিতর নিরক্ষরতার কারণ আলস্য ও জাড্য নয়। যে হীন অবস্থার বোঝা নারীকে স্মরণাতীত কাল থেকে অন্যায়ভাবে নিষ্পিষ্ট করে মারছে, নারীর বর্তমান অবস্থার প্রত্যক্ষ কারণ তাই। পুরুষ নারীকে তার কর্ম-সহচরী ও অর্ধাঙ্গীর মর্যাদা দেবার পরিবর্তে তাকে গৃহস্থালীর নীরস কৃত্য সম্পাদন-যন্ত্র ও সম্ভোগ-পাত্রে পরিণত করেছে। ফলে সমাজ প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছে। নারীকে অতি সঙ্গত কারণেই জাতির মাতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের প্রতি আমরা যে মহা অবিচার করেছি, তাঁদের ও আমাদের উভয়ের খাতিরে তার নিরাকরণ করতে হবে।

হরিজন, ১৮-২-৩৯

একাদশ অধ্যায়ঃ হরিজনদের শিক্ষা

১

হরিজন-ছাত্রাবাস

একটি হরিজন-ছাত্রাবাসের পরিচালক লিখেছেন ঃ

"...বর্তমানে পনেরটি ছাত্র এখানে আছে এবং তাদের জন্য একজন পাচক নিয়োগ করা হয়েছে। ছাত্রাবাসের আর সব কাজ কর্ম এখানকার ছেলেদের করতে হয়। কাজের ভাগ বাঁটারা সম্বন্ধে আলোচনার সময় রান্নার বাসনপত্র পরিষ্কার করার ভার ছুটি ছেলের উপর দেবার কথা ভাবছিলাম। এতে আমার জনৈক সহকর্মী বললেন যে এমনিতেই হরিজন ছাত্রদের মনোভাব নীচু, এর উপর তাদের বাসন মাজতে দিলে তা আরও শোচনীয় হবে। বন্ধুটিকে আমি 'সাতারা হোম' ও মাদ্রাজের 'রামকৃষ্ণ স্টুডেন্টস হোম'-এর উদাহরণ দিলাম। 'সাতারা হোম'-এ এমন কি রান্নার কাজও ছাত্ররা করে এবং 'রামকৃষ্ণ স্টুডেন্টস্ হোম'-এর ১২০ জন অধিবাসীর জন্য ছুজন পাচক ছাড়া অপর কোন ভৃত্য নেই। তবে আমার বন্ধুটি আমার যুক্তিতে সন্তুষ্ট হন নি। তিনি এইজন্য এ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছেন যে এখনকার মত আর একজন লোক রাখার সঙ্গতি আমাদের নেই। ছাত্রদের দিয়ে প্রত্যেক দিন সকালে রান্নার বাসনপত্র মাজান কি আপনি অনুচিত মনে করেন?

এ এক পুরাতন কাহিনী। আমার মনে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে প্রতিটি ছাত্রাবাসে ময়লা পরিষ্কার করা সহ যাবতীয় শ্রমমূলক কাজ ছাত্রাবাসের অধিবাসীদের দিয়েই করান উচিত। এর কারণ ছাত্রাবাসের অধিবাসীদের পড়াশুনার ক্ষতি হবে না। প্রত্যুত এর ফলে অধ্যয়নের সঙ্গে বাস্তবতা যুক্ত হবে, ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে এবং তাদের অর্থের সাশ্রয় হবে। সুতরাং

যেসব ছাত্রাবাস পরিচালক সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের মোহে অথবা আলস্যের কারণ ছাত্রদের সঙ্গে এসব বিষয়ে আলোচনা করবেন না তাঁরা ছাত্রদের নিজ নিজ ছাত্রাবাসের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় শ্রমমূলক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন না। এর দ্বারা তাঁরা তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের অধীন ছাত্রদের সুস্পষ্ট অপকার করবেন। এ জাতীয় শ্রমকে ছাত্রদের শিক্ষার অঙ্গ স্বরূপ বিবেচনা করা উচিত। তবে ছাত্রদের দিয়ে এজাতীয় শ্রমমূলক কাজ করানর একটি শর্ত আছে। ছাত্রাবাসের পরিচালকেরা নিজেরা এসব শ্রমমূলক কাজে ভাগ নিয়ে স্বয়ং আদর্শ পেশ করবেন। তাহলে আর নীচু মনোভাব আরও শোচনীয় হবার বিপদ থাকবে না।

হরিজন, ৩০-৯-১৯৩৩

২

হরিজন শিশুদের শিক্ষা

প্রচলিত বিদ্যালয়সমূহের হরিজন ছাত্রছাত্রীদের আমরা ছাত্রবৃত্তি ও অন্যান্য সুবিধা দিতে বাধ্য হলেও আমাদের পরিচালনাধীন বিদ্যালয়গুলিতে কৃতদাসের মত ঐসব বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন পদ্ধতির অনুকরণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

আমাদের বুঝতে হবে যে অনেক কষ্ট করলে তবে পড়ুয়া হরিজন শিশু পাওয়া যায়। তারা নিয়মিত ভাবে বিদ্যালয়ে আসবে—একথা আশা করা যায় না। আর আমাদের অতীতের শোচনীয় উপেক্ষার কারণ তারা আজ এতটা যে রুক্ষ প্রথমাবস্থায় তাদের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে দেখাশুনা করতে হবে।

বিদ্যালয়ে ভর্তি করার পর তাদের শরীরকে ভাল করে দেখে নিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। হয়ত তাদের

কাপড় চোপড় কেচে দিয়ে জায়গায় জায়গায় সেলাই করে দিতে হবে। সুতরাং কিছু দিনের জন্য তাদের প্রথম পাঠ হবে ফলিত-স্বাস্থ্যতত্ত্ব সাফাই-বিজ্ঞান এবং সেলাই-ফোঁড়াই। সমগ্র প্রথম বছরে সম্ভবতঃ কোন বই-এর প্রয়োজন হবে না। তারা যে সব বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত তাই নিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে এবং এই সময় তাদের উচ্চারণ সংশোধন করে তাদের ব্যাকরণ ও নূতন নূতন শব্দ শিক্ষা দিতে হবে। রোজ তারা যেসব নূতন নূতন শব্দ শিখছে সেগুলি আমি লিখে রাখব এবং সেগুলি আমি তাদের মনে গেঁথে না যাওয়া পর্যন্ত থেকে থেকে সেগুলি ব্যবহার করব। এই এই পদ্ধতিতে শিক্ষক বক্তৃতা না দিয়ে কথাবার্তার প্রক্রিয়ার শরণ নেবেন। এই কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই তিনি তাঁর ছাত্রদের ক্রমশঃ ইতিহাস ভূগোল ও অঙ্ক শেখাবেন। ইতিহাসের সূত্রপাত হবে আমাদের বর্তমান কাল থেকে। তারপর আমরা আমাদের কাছাকাছি সময়ের ও নিকটস্থ ব্যক্তিদের ইতিহাস শেখাব। আর বিদ্যালয়ের নিকটস্থ এলাকা থেকে ভূগোল শেখানর পালা শুরু হবে। ছাত্রের বাড়িতে যেসব হিসাব-কিতাবের প্রয়োজন ঘটে তার থেকে অঙ্ক শেখানর সূত্রপাত হবে। এই পদ্ধতিতে আমি নিজে হাতে কলমে কাজ করেছি বলে আমি জানি যে এই পদ্ধতিতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে বেশী পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং এর জন্য ছাত্রের উপর কোন বেশী চাপ পড়ে না। অক্ষরজ্ঞানকে একেবারে পৃথক বিষয় বলে বিবেচনা করা উচিত। অক্ষরগুলিকে ছবির মত মনে করা দরকার, যা ছাত্ররা প্রথমে চিনতে ও তার নাম বলতে শিখবে। আর লেখাটা চিত্রাঙ্কণ শেখার অঙ্গ স্বরূপ হবে। অক্ষর নিয়ে হিজিবিজি না কেটে ছাত্ররা যেন তাদের সামনে রাখা কোন জিনিস ভাল ভাবে আঁকতে শেখে। সুতরাং শিশুরা নিজের আঙ্গুল ও কলমের উপর পূর্ণমাত্রায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে যেন তাদের দিয়ে অক্ষর লেখান না হয়, এলোমেলো

ভাবে একটি বই পড়ে সারা বছরে যতটুকু শিখতে পারে কেবল ততটুকুই শিশুকে শেখানর অর্থ হল তার মানসিক বিকাশকে শোচনীয় ভাবে অবরুদ্ধ করে রাখা। আমরা একথা উপলব্ধি করি না যে কোন শিশুকে যদি তার গৃহ-পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে আটক করে রাখা যায় তাহলে কয়েক বছরের জন্য সে নিছক মূর্খে পরিণত হয়। বিদ্যালয়ের ভিতরে নয়, ঘরের পরিবেশে সে অজ্ঞাতসারে তথ্য ও ভাষা শিক্ষা করে। এইজন্য আমরা সংস্কৃতিসম্পন্ন বাড়ি ও সংস্কৃতির সম্পর্কবিহীন বাড়ির—যাকে আসলে বাড়িই বলা চলে না—ছেলেদের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাই।

হরিজন, ১০-১১-১৯৩৩

৩

হরিজন ছাত্রদের প্রয়োজনীয়তা

...অন্ততঃ প্রথমাবস্থায় হরিজন ছাত্রদের প্রয়োজনীয়তা অপরের থেকে পৃথক।

আমি তাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে এক্ষেত্রে বই-এর প্রয়োজনীয়তা ছাত্রদের চেয়ে শিক্ষকদের কাছেই বেশী। আর প্রত্যেক শিক্ষককে নিজের ছাত্রদের প্রতি দায়িত্ব পূর্ণমাত্রায় পালন করতে হলে তাঁর কাছে উপলব্ধ মালমশলার সাহায্যে দৈনিক পাঠ্য-বিষয়ের নোট তৈরি করতে হবে। আর এও তিনি করবেন তাঁকে যে ক্লাসে পড়াতে হবে তার বিশেষ প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে।

যথার্থ শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীকে উদ্ভাসিত করে তুলবে। এলোমেলো ভাবে বাছা ও অপ্রয়োজনীয় তথ্য ছাত্রদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়ে এ আদর্শের রূপায়ন করা যাবে না। এরকম করলে তাদের উপর মারাত্মক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে যা ছাত্রদের যাবতীয় স্বকীয়তাকে নষ্ট করে তাদের নিছক জড় যন্ত্রে পর্যবসিত

করবে। স্বয়ং আমরা এই কুপ্রথার শিকার না হলে অনেক দিন আগেই বুঝতে পারতাম যে আজকালকার পাইকারী হারে শিক্ষা দেবার প্রথা বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মত দেশের ক্ষেত্রে কী সর্বনাশ সাধন করছে।

কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবশ্যই নিজ নিজ পাঠ্যপুস্তক রচনা করার অল্পাধিক চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমার মতে তার দ্বারা দেশের আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তার পরিপূর্তি হয় নি।

আমি এখানে যা কিছু বলেছি তা আমার মৌলিক চিন্তার ফল—এমন দাবী আমি করছি না। হরিজন-বিদ্যালয়সমূহের পরিচালক ও শিক্ষকদের সুবিধার জন্য এখানে এসব কথার পুনরুক্তি করা হল। কারণ তাঁদের সম্মুখে গুরুভার কর্তব্য রয়েছে। নিজেদের কর্তৃত্বাধীন ছেলেদের যেন তেন প্রকারেণ বেছে নেওয়া পাঠ্যপুস্তক থেকে কতকটা অংশ যেমন তেমন করে তোতা পাখীর মত মুখস্থ করালেই তাঁদের কাজ হয়ে গেল—এমন কথা ভেবে যেন তাঁরা আত্মতুষ্টি লাভ না করেন। তাঁদের উপর এক মহান্ দায়িত্ব বর্তিয়েছে যা তাঁদের সাহস বুদ্ধি ও সততা সহকারে পালন করতে হবে।

এ কর্তব্য কঠিন। তবে হরিজন-বিদ্যালয়ের পরিচালক ও শিক্ষকবৃন্দ নিজেদের সমগ্র হৃদয় দিয়ে এ কাজ করলে এ কাজ তত কঠিন বলে মনে হবে না। তাঁরা যদি তাঁদের ছাত্রদের পিতা হতে পারেন তাহলে তাদের কি প্রয়োজন তা নিজে থেকেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন এবং তারপর তার ব্যবস্থা করার প্রয়াস করবেন। আর এ দেওয়ার ক্ষমতা যদি তাঁর না থাকে তাহলে তিনি নিজেকে এর যোগ্য করে গড়ে তুলবেন। ছেলেমেয়েদের কি চাই তাই বুঝে তদনুযায়ী শিক্ষা দেবার নীতি গ্রহণ করলে দেখা যাবে যে হরিজন বা যে কোন শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষকের কোন রকম অস্বাভাবিক বুদ্ধিচাতুর্য বা বাহ্যবিষয়ের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা নেই।

আর এ কথা যদি খেয়াল রাখা যায় যে যাবতীয় শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য হল ছাত্রদের চরিত্রগঠন তাহলে চরিত্রবান শিক্ষকদের হতাশ হবার কোন কারণ নেই।

হরিজন, ১-১২-১৯৩৩

৪

হরিজনদের জন্য প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

[দিল্লীর নিকটস্থ শ্রদ্ধানন্দ বস্তির হরিজনেরা গান্ধীজীকে একটি অভিনন্দনপত্র দেন। তাতে তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, "আমাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় ও কূপ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা কি? এর দ্বারা কি আমাদের আলাদা রাখার ব্যবস্থাকে স্থায়ী করা হবে না?" নিম্নে গান্ধীজীর উত্তর দেওয়া হল:]

আপনাদের জন্য যে সব কূপ ও বিদ্যালয় খোলা হচ্ছে তা আপনাদের আর সবার কাছ থেকে পৃথক করবে না। কথা হচ্ছে এই যে আপনারা খাওয়ার ও অন্যান্য কাজের জন্য বিশুদ্ধ পরিষ্কার জল পান না। এ অবস্থার অবিলম্বে প্রতিকার চাই।···বিদ্যালয় সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য যদিও ধীরে ধীরে সর্বসাধারণের বিদ্যালয়সমূহের দ্বারও হরিজনদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে। তবে যত দিন না দেশের সবগুলি বিদ্যালয়ের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে ততদিন হয় হরিজনদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় খোলা আর নচেৎ তাদের নিরক্ষর রাখার সমস্যা থেকেই যাবে। এই কারণে তাদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় খোলা হচ্ছে। তবে এখানে অন্যান্য জাতির ছাত্রদেরও নেওয়া হবে। কিন্তু হরিজনদের এখানে ভর্তি হবার পূর্ণ অধিকার থাকবে।

হরিজনবন্ধু, ২৪-১২-১৯৩৩

৫

হরিজনদের শিক্ষা

হরিজনদের শিক্ষার ব্যাপার সর্বাপেক্ষা দুরূহ। যতই স্থূল বা অসংস্কৃত হক না কেন, বর্ণ-হিন্দুদের ঘরের শিশু পরিবারের প্রভাবে

কিছু না কিছু সংস্কারের উত্তরাধিকারী হয়। হরিজন শিশু সমাজ থেকে একেবারে তফাৎ থাকার জন্য কোনরকম সংস্কৃতির ধার ধারে না। শীঘ্র বা বিলম্বে হক, যখনই প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হরিজন শিশুদের প্রবেশাধিকার হবে (আমার মতে এ অবসর সত্বর আসবে, এতে বিলম্ব হবে না) তখনও তাদের জন্য প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন পড়বে। নচেৎ হরিজন শিশুদের চিরস্থায়ী প্রতিবন্ধকের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। ভারতের সর্বত্র হরিজন সেবক-সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে যে অসংখ্য হরিজন বিদ্যালয় চলছে, সেখানে এই প্রারম্ভিক শিক্ষা-পদ্ধতি উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগ করতে হবে। হরিজন শিশুদের সদাচার শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখান ও সুশীল করে তোলা এই প্রারম্ভিক শিক্ষার কর্তব্য হবে। হরিজন শিশু যেমন তেমন ভাবে বসে, তার বেশভূষার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তার চোখ, মুখ, দাঁত, কান, নখ, চুল এবং নাকে প্রায়ই ময়লা থাকে। অনেকে তো স্নান করা কাকে বলে তা-ই জানে না। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে আশ্রম কোচরবে থাকাকালীন তামিলনাদের ট্রানকুইবার থেকে একটি হরিজন বালককে সেখানে নিয়ে গিয়ে যা করেছিলাম, তা স্মরণ হচ্ছে। প্রথমে তার মস্তক মুণ্ডন করা হল। তারপর তাকে ভাল করে স্নান করান হল ও পরিধানের জন্য একটি সাধারণ ধূতি, মেরজাই ও টুপি দেওয়া হল। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার এবং ভদ্রঘরের শিশুদের মধ্যে কোন বাহ্য পার্থক্য রইল না। তার মাথা, চোখ, কান, নাক ইত্যাদি সুন্দরভাবে পরিষ্কার করা হয়েছিল। তার নখগুলি ছিল ময়লার ভাণ্ডার বিশেষ। সেগুলিকে কেটে সাফ করা হয়েছিল। তার পদযুগল ধূলি-সমাকীর্ণ ছিল। সেগুলিকে ঘসে ঘসে পরিষ্কার করা হয়েছিল। যে সব হরিজন শিশু বিদ্যালয়ে আসে, প্রয়োজন বুঝলে তাদের নিয়ে প্রত্যহ এইভাবে দলাই-মলাই করতে হবে। প্রথম তিন মাস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শেখানর দ্বারা তাদের পাঠ-পর্বের

সূচনা হবে। সুষ্ঠুভাবে আহার করার পদ্ধতিও তাদের শেখাতে হবে; কিন্তু এই বাক্যটি লেখার সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যার পাদ-পরিক্রমা-কালে যে দৃশ্য আমার চোখে পড়েছে, তার কথা মনে আসছে। যাত্রাপথে কোথাও কোথাও যখন সকলে একসঙ্গে বসে খাবার অবকাশ এসেছে, তখন দেখেছি যে বালক ও বয়স্ক হরিজনেরা অন্যান্যদের চেয়ে পরিষ্কারভাবে খেয়েছে। অন্যে গায়ে হাতে ভাত-মাখামাখি করেছে, উচ্ছিষ্ট এদিক ওদিকে ছড়িয়েছে এবং খাওয়ার জায়গাকে একেবারে নরককুণ্ডে পরিণত করে খেয়ে উঠেছে। হরিজনরা পাতে বা তার চারপাশে কিছু ফেলে রাখে নি। তাদের পাত একেবারে পরিষ্কার ছিল। খাবার সময় প্রতিটি গ্রাস মুখে দেবার পর তারা আঙ্গুল চেটে-পুটে পরিষ্কার করে খেয়েছে। অবশ্য এ কথা আমি জানি যে আমি যাদের কথা বর্ণনা করলাম, প্রত্যেকটি হরিজন শিশু তাদের মত পরিষ্কার করে খায় না।

প্রত্যেকটি হরিজন বিদ্যালয়ে এই প্রারম্ভিক শিক্ষা দিতে হলে প্রথমতঃ শিক্ষকদের মাতৃভাষায় এতৎসম্বন্ধীয় বিস্তৃত নির্দেশনামা পুস্তিকাকারে ছেপে তাদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। তারপর বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক মহাশয়ের কাজ হবে ঐ সব বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে শিক্ষক ও ছাত্ররা এতদনুযায়ী কাজ করছে কিনা দেখা এবং এই দিকে কতটা প্রগতি হচ্ছে সে সম্বন্ধে বিবরণ দাখিল করা।

এই কার্যক্রম সফল করার জন্য সতর্কভাবে নূতন শিক্ষক নির্বাচন করা প্রয়োজন এবং এখন যে সব শিক্ষক আছেন, তাঁদেরও এতৎ-সম্বন্ধীয় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তবে সঙ্ঘের উপর যে সহস্র সহস্র হরিজন ছাত্রের দায়িত্বভার ন্যস্ত, তা সম্যক্‌ভাবে পালন করার জন্য এ কার্যে এইভাবে সতর্ক মনোযোগ দেবার সার্থকতা আছে।

হরিজন, ১৮-৫-৩৫

৬

আদর্শ হরিজন বিদ্যালয়

হরিজন সেবক সঙ্ঘের সভাপতি শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লা লিখছেন ঃ

"বিশেষভাবে হরিজন ছেলেদের শিক্ষার জন্য আমরা কয়েকটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনা করার কথা চিন্তা করছি। অবশ্য এসব বিদ্যালয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছাত্রদেরও প্রবেশাধিকার থাকবে। এযাবত হরিজন ছাত্রাবাস বা হরিজন বিদ্যালয় বলতে বুঝিয়েছে সস্তার বিদ্যালয় বা ছাত্রাবাস। এগুলি পরিচালিত হয় স্বল্প শিক্ষিত ও অল্প বেতনের শিক্ষক এবং ছাত্রাবাস পরিচালকের দ্বারা ও এখানকার ছাত্ররাও আধপেটা খেয়ে থাকে। যতদিন আমরা হরিজন অথবা গরীব ছেলেমেয়েদের এজাতীয় সস্তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেব ততদিন তারা তাদের আজকের হীনমন্যতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। আর এই সব অযোগ্য ও হত দরিদ্র শিক্ষকদের কাছ থেকেই বা তারা কি শিখবে? এইসব ছেলেরা অন্য ছেলেপিলেদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ কখনও পায় না। দরিদ্র ও সম্পন্ন, হরিজন ও সবর্ণ ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগের অভাবে উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমি তাই প্রস্তাব করছি যে মনোরম পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত আমাদের কয়েকটি বিদ্যালয় থাকা চাই। এগুলির মান যে কোন সুপরিচালিত পাবলিক স্কুলের সমকক্ষ হওয়া উচিত। প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে এরকম কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপনা করতে হবে।

এগুলি হবে প্রবেশিকা মানের এবং কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত। অবশ্য এর অধিকাংশই হবে আবাসিক। এখানকার বৈশিষ্ট্য হবে ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগত মনযোগ। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে। ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হবে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে। ছেলেদের এই সময় প্রয়োজনীয় হাতের কাজ শেখান হবে এবং এই হাতের কাজ বাছা হবে তার শৈক্ষণীক মূল্যের জন্য।

এই শিক্ষাব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ ও স্বাবলম্বী করার জন্য বর্তমানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে যে সময় লাগে, তার থেকে দু বছর বেশী সময়

লাগবে। প্রবেশিকা পর্যন্ত ছাত্ররা যা শেখে তার চেয়ে বেশী শেখানর জন্য এই দুই বছরের অতিরিক্ত সময়কে কাজে লাগান হবে।

এখানে আমরা তিনটি হস্তশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে চাই যার মধ্যে থেকে ছাত্র তার নিজ অভিরুচি অনুযায়ী একটি বেছে নেবে। এগুলি হল : হয় (১) তুলা ধুনাই, সূতা কাটা, বুনাই, রঙাই ও ধোলাই ; অথবা (২) ছুতার-কামারের কাজ ; কিংবা (৩) কাগজ তৈরী, বই বাঁধাই ও ছাপাখানার কম্পোজ করার কাজ।

আমরা ভাবছি যে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক পাবার জন্য আমরা ভাল মাইনেতে লোক নিয়োগ করব। আমাদের মনের কল্পনা হল এই যে ছাত্ররা যেন কলেজী শিক্ষার অভাব বোধ না করে। আমরা আশা করছি যে এখানকার শিক্ষা সমাপনান্তে ছেলেরা সৎভাবে রোজগার করে খেতে অসুবিধা বোধ করবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও হাতের কাজ শেখান ছাড়া তাদের সাধারণ জ্ঞান বাড়ানর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। এছাড়া স্বাস্থ্যতত্ত্ব সঙ্গীত খেলাধুলা শরীর চর্চা ঘোড়ায় চড়া সাঁতার দেওয়া ইত্যাদি শেখানরও ব্যবস্থা থাকবে। ধর্ম বা নীতিশিক্ষাকেও উপেক্ষা করা হবে না। সকল ধর্মমতের প্রতি সমান শ্রদ্ধাভাবের অনুশীলন করা হবে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের মূল আদর্শ ও আমাদের নিজেদের সংস্কৃতির বিশিষ্ট সৌন্দর্য সম্বন্ধেও তাদের সচেতন করে তোলা হবে।

প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের অর্ধেক ছাত্র হবে হরিজন যাদের কাছ থেকে শিক্ষা বা ছাত্রাবাস বাবদ কোন খরচ নেওয়া হবে না। বাকী অর্ধেক অর্থাৎ বর্ণহিন্দু ছাত্রদের কাছ থেকে মাইনে নেওয়া হবে।

ভাল উচ্চ বিদ্যালয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই হল আমার মোটামুটি ধারণা।

তবে এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে মত-পার্থক্য আছে। কেউ কেউ বলেন : প্রবেশিকা মান পর্যন্ত পড়াবার প্রয়োজন কি? কারও কারও বক্তব্য হল : আমাদের ব্যয়বহুল শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা অনুচিত কারণ এর দ্বারা খারাপ উদাহরণ পেশ করা হবে। অনেকের সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করতে আপত্তি নেই কিন্তু শর্ত হচ্ছে এই যে তাঁরা কেবল হাত খরচটুকু নিয়ে কাজ করবেন এবং ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে একাজ

করবেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে এজাতীয় বিদ্যালয়ে ত্যাগমূলক সরল জীবন যাপনে ইচ্ছুক ব্যতীত অপর কোন শিক্ষকের স্থান নেই। অনেকে এও বলেন যে অতীব ত্যাগশীল শিক্ষক না পাওয়া পর্যন্ত বরং কোন বিদ্যালয় না খোলাই ভাল।

এজাতীয় অভিমতকে আমি অবাস্তব মনে করি। কেন করি তার কারণ বলার দরকার নেই। সেটা দিবালোকের মত স্পষ্ট।

এ ব্যাপারে আপনি কি আপনার অভিমত ব্যক্ত করবেন?"

শেঠ ঘনশ্যামদাসের পরিকল্পনাকে আমি সর্বান্তঃকরণেই সমর্থন করি। এর বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে তাতে নীতির পরিবর্তে একটা সতর্কতামূলক মনোভাবের প্রতিচ্ছবিই বেশী। পরিকল্পনাটিকে যদি হরিজন বোর্ডের যৎকিঞ্চিৎ টাকার দ্বারা রূপায়িত করার কথা ভাবা হয় তাহলে অবশ্য আমি বিরোধীদের দিকে হব। তবে আমি ধরে নিচ্ছি যে পরিকল্পাটিকে রূপায়িত করা হবে এর জন্য পৃথকভাবে অর্থ সংগ্রহ করে। আমি দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কাল দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলাম যেখানে প্রত্যেকটি ভারতবাসীকে প্রায় পরিয়া বা অস্পৃশ্য বিবেচনা করা হয়। আমি তাই জানি যে অস্বাভাবিক ব্যবহার পেলে মানুষের মন কেমন স্পর্শকাতর হয়ে যায়। আমি নিজে যদিও আমার অনুভূতিপ্রবণতাকে কখনও হারাই নি তবু ধাতস্থ হতে আমার কিছুটা সময় লেগেছিল। ইউরোপীয়দের ভিতর নিজেকে আমার কেমন যেন মনে হত। ভারতবর্ষের হরিজনদের আরও বেশী দুর্দশা ভোগ করতে হয় কারণ তাদের অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্য আরও বেশী। সুতরাং হরিজনদের এই দ্বিমুখী হীনমন্যতা যদি দূর করতে হয় তাহলে যথেষ্ট সংখ্যক হরিজন ছেলেদের এমন পরিবেশে মানুষ করতে হবে যা কোন অংশেই সম্পন্ন ঘরের ছেলেদের পরিবেশের চেয়ে খারাপ নয়। প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটির লক্ষ্য কেরাণী তৈরি করা নয়—এমন কেরাণী যাদের জুতার চেয়ে পায়ের মাপ বড়। এ জাতীয় হবু কেরাণী স্বভাবতই অসন্তুষ্ট থাকবেন কারণ এত

খাকতিওয়ালা কেরাণীকে কেউ কাজ দিতে সাহস করবেন না। অপরাপর প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ ছেলেদের তুলনায় প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের ছাত্ররা জ্ঞানের দিক থেকে কোন অংশে হীন হবে না। পক্ষান্তরে এইসব ছাত্ররা আরও ভাল ফল করবে কারণ তাদের শরীরের দিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া হবে এবং হস্তকুশলতাও পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হবে। এসব ছেলেদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তার কোন কারণ থাকবে না। এদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে। নিজেদের আত্মীয় স্বজন থেকে তারা আলাদা হবে না। পক্ষান্তরে তারা নিজেদের হরিজন ভাইদের সেবা করবে ও নিজেরা যে শিক্ষা পেল তার সুফল অপরাপর হরিজনদেরও দেবে—এইটাই এইসব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে আশা।

আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠতে পারে যে আমার মনোভাব অসংগতিপূর্ণ। কারণ ইতিপূর্বে আমি প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলেছি এবং লিখেছি। তবে এ অভিযোগ অমূলক। প্রথমতঃ প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সব চেয়ে খারাপ অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে শিক্ষা দেওয়া হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে এবং ছেলেদের এমন সব হাতের কাজ শেখান হবে যার দ্বারা তারা স্বাধীন ও সম্মানজনক উপায়ে নিজ উদরান্নের সংস্থান করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ভাল ভাবে শিক্ষিত হবার সম্ভাবনা আছে—এমন ছেলেদের ক্ষেত্রে যে অভিযোগ উঠতে পারে সে অভিযোগ কেবল হরিজন না হবার অপরাধে ভাল শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগের সম্ভাবনা বিরহিত ছেলেদের বেলায় উঠতে পারে না। হরিজন ছেলেদের কাছে এই যুক্তি উপস্থাপিত করে আমি তাদের অপমান করতে চাই না যে হাজার হাজার বর্ণ হিন্দুর ছেলেরা যা করছে তা অন্যায় এবং তাই শেঠ ঘনশ্যামদাস ইতিপূর্বে যে হতদরিদ্র অবস্থার কথা বলেছেন তাই নিয়েই হরিজন ছাত্ররা যেন সন্তুষ্ট থাকে।

হরিজন, ২২-২-১৯৪২

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ ধর্মীয় শিক্ষা

১

ধর্মীয় শিক্ষা

ধর্মীয় শিক্ষার প্রশ্ন অতীব জটিল। তবু তাকে বাদ দিলে চলবে না। ভারত কদাপি নিরীশ্বরবাদী হবে না। উৎকট নাস্তিক্যবাদ এদেশের মাটিতে মাথা তুলতে পারবে না। তবে ধর্মীয় শিক্ষার সমস্যা নিঃসন্দেহে কঠিন কার্য। এর কথা চিন্তা মাত্র আমার শিরঃপীড়া আরম্ভ হয়। আমাদের ধর্মগুরুরা সাধারণতঃ ধর্মধ্বজী ও আত্মপরায়ণ। তবু তাঁদের দরবারে উপস্থিত হতে হবে। সমাজের চাবিকাঠি হচ্ছে মোল্লা, দস্তুর এবং ব্রাহ্মণদের হাতে। তবে তাঁদের মনে সৎবুদ্ধির উদয় না হলে ইংরাজী শিক্ষার কারণ প্রাপ্ত আমাদের প্রাণশক্তি ধর্মীয় শিক্ষার পিছনে নিয়োগ করতে হবে। এ কাজ খুব কঠিন নয়। মহাসমুদ্রের ক্ষীণ প্রান্তদেশই মাত্র দূষিত হয়েছে এবং মাত্র যাঁরা ঐ প্রান্তদেশের অধিবাসী, শুধু তাঁদেরই শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন। আমাদের মত যাঁরা এই শ্রেণীভুক্ত, তাঁরা স্বয়ং এ শুদ্ধিক্রিয়া করে নিতে পারেন; কারণ আমার এ মন্তব্য দেশের কোটি কোটি জনগণের জন্য নয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন গরিমা পুনঃ সংস্থাপনার্থ আমাদের প্রাচীন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

হিন্দ স্বরাজ (১৯০৮), পৃঃ ১০৭

২

ধর্মীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে

কয়েকদিন আগে জনৈক মিশনারী বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভারতবর্ষ যদি সত্য সত্যই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অগ্রসর জাতি হয়, তবে অধিকাংশ ছাত্রেরই নিজ

ধর্ম এবং এমন কি ভাগবদ্‌গীতার সম্বন্ধে জ্ঞান নেই কেন ? বন্ধুটি স্বয়ং শিক্ষাব্রতী এবং নিজ বক্তব্যের সমর্থনে তিনি জানালেন যে নূতন ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হলেই তিনি একথা জিজ্ঞাসা করেন যে, তাদের নিজ ধর্ম বা ভাগবদ্‌গীতা সম্বন্ধে জানা আছে কিনা ? দেখা গেছে যে ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই এ সম্বন্ধে অজ্ঞ।

কিছু সংখ্যক ছাত্রের নিজধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান নেই বলে ভারত আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অগ্রসর জাতি নয় বা ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে ছাত্রদের অজ্ঞতার অর্থ যাদের মধ্যে তারা বাস করে, সেই ভারতবাসীর ভিতর যাবতীয় ধর্মীয় ভাবনা ও আধ্যাত্মিকতার অভাবসূচক নয় ইত্যাদি যেসব সিদ্ধান্ত পূর্বোক্ত ঘটনা থেকে করা সম্ভব, এক্ষেত্রে আমি তার আলোচনা করব না। তবে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সরকারী শিক্ষায়তনে যে সব ছাত্র আসেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সম্বন্ধ-বিহীন। আমার মিশনারী বন্ধুটি মহীশূরের ছাত্রদের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন এবং দেখে আমার দুঃখ হল যে মহীশূর রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতেও ছাত্ররা কোন রকম ধর্ম শিক্ষা পায় না। আমি খবর রাখি যে একদল ব্যক্তি মনে করেন যে সর্বসাধারণের বিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা থাকা উচিত। এ কথাও আমি জানি যে, ভারতের মত যে দেশে প্রায় প্রত্যেকটি প্রচলিত ধর্মমত এবং তাদের শাখা প্রশাখা রয়েছে, সেখানে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা কত কঠিন। কিন্তু ভারতকে যদি আধ্যাত্মিক দেউলিয়া বৃত্তি ঘোষণা না করতে হয়, তবে যুব সম্প্রদায়কে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া অন্ততঃ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দেবার মত সমান গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে করতে হবে। একথা সত্য যে ধর্মপুস্তকের জ্ঞান আর ধর্ম—এ দুই এক জিনিস নয়। কিন্তু আমরা যদি ধর্মশিক্ষা না-ই দিতে পারি তবে যেন অন্ততঃ আমাদের ছেলেমেয়েদের তার চেয়ে আর একটু নীচের জিনিস—ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে পারি। তবে বিদ্যালয়ে এ জাতীয় শিক্ষা দেওয়া হক বা না হক, বয়ঃপ্রাপ্ত

ছাত্রদের কর্তব্য হচ্ছে অন্যান্য বিষয়ের মত ধর্ম সম্বন্ধে নিজ প্রচেষ্টায় জ্ঞানার্জন করা। বিতর্ক সভা বা আজকাল যে সূতাকাটার বর্গ চলেছে, তাঁরা তার অনুকরণে এ রকম বর্গ নিজেদের জন্য চালাবেন।

শিমোগা কলেজিয়েট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, শতাধিক হিন্দু ছাত্রের মধ্যে খুব বেশী হলে আটজন মাত্র ভাগবদ্‌গীতা পড়েছেন। যে কয়জন গীতা পড়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ গীতার অর্থ বুঝেছেন কিনা এ প্রশ্ন করা হলে কেউ হাতই তুললেন না। পবিত্র কোরান পড়েছেন কিনা জানতে চাওয়ায় পাঁচ-ছয় জন মুসলমান ছাত্রের মধ্যে প্রত্যেকেই হাত তুলেছিলেন। তবে একজন মাত্র বলেছিলেন যে তিনি এর অর্থ বোঝেন। আমার মতে গীতার অর্থ বোঝা খুবই সহজ। এতে অবশ্য এমন কতকগুলি মৌলিক সমস্যার উল্লেখ পাওয়া যায়, যার সমাধান নিঃসংশয়ে কঠিন। তবে আমার মতে গীতার সাধারণ ভাবধারা গ্রহণ করতে খুব বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। হিন্দুধর্মের অন্তর্গত প্রত্যেকটি সম্প্রদায় একে প্রামাণ্য বলে বিবেচনা করেন। গীতা যাবতীয় গোঁড়ামির স্পর্শ মুক্ত। এতে সংক্ষিপ্ত আয়তনের ভিতর পূর্ণাঙ্গ যুক্তিসঙ্গত নৈতিক বিধান পাওয়া যায়। বুদ্ধি এবং হৃদয় উভয়েরই এ সন্তোষ বিধান করে। সেইজন্য একে দার্শনিক ও ভক্তিমূলক দুই বলা চলে। এর আবেদন সার্বিক। এর ভাষা অতীব সরল। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে করি যে ভারতের প্রত্যেকটি কথ্য ভাষায় এর প্রামাণ্য অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত এবং অনুবাদ কার্য যেন জটিলতার দোষমুক্ত হয়। অনুবাদ যেন এমন হয় যে সাধারণ মানুষকে গীতা পড়ানো সহজসাধ্য হয়। তবে অনুবাদকে মূলের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য এ প্রস্তাব নয়। কারণ আমি আমার অভিমতের পুনরুক্তি করতে চাই যে প্রতিটি হিন্দু বালক-বালিকার সংস্কৃত শেখা উচিত। কিন্তু আগামী বহুদিন পর্যন্ত এমন অনেকে থাকবেন, যাঁরা সংস্কৃত জানবেন না।

শুধু সংস্কৃত না জানার অপরাধে তাঁদের ভাগবদ্‌গীতার জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করে রাখা আত্মহত্যার সামিল হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-৮-১৯২৭

৩

ধর্মীয় শিক্ষার দুটি দিক

প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন যে শিক্ষকদের নিজ অভিরুচি অনুযায়ী তাঁদের অধীনস্থ ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষা দেবার অধিকার আছে?

শিক্ষকরা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন তার নীতি অনুযায়ী তাঁদের চলা উচিত। সুতরাং তাঁরা নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষা দেবার অধিকার দাবী করতে পারেন না। অন্যান্য বিষয়ের মত ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষকদের সেই প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারকদের পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতে হবে। শিক্ষকের অবশ্য শিক্ষাদান পদ্ধতি স্থির করার স্বাধীনতা থাকবে কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে তিনি যা শেখাচ্ছেন তা যেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। একথা সত্য যে দুই চারটি নির্ধারিত পুস্তক পাঠ করে অপরাপর বিষয় পড়ান গেলেও ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এ রকম সম্ভবপর নয়। সত্যি কথা বলতে কি বই-এর মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়াও যায় না। অন্যান্য বিষয়ে প্রধানতঃ বুদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হলেও ধর্মীয় শিক্ষা এক হৃদয় থেকে অপর হৃদয়ে সঞ্চারিত হবার জিনিস। অতএব শিক্ষক স্বয়ং গভীরভাবে ধর্মভাবাপন্ন না হলে ধর্ম-শিক্ষার দায়িত্ব নেবেন না। আর এক্ষেত্রে কিছুটা বাছ বিচার করারও প্রয়োজন আছে। উদাহরণ-স্বরূপ যে বিদ্যালয়ে অহিংসাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মস্বরূপ স্বীকার করা হয়েছে সেখানে হিংসাবৃত্তির প্ররোচক কোন কিছু শেখান উচিত নয়। অনুরূপভাবে যে বিদ্যালয় সকল ধর্ম সম্বন্ধে প্রেম ঔদার্য ও সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করেছে সেখানে অপর কোন

ধর্মের বিরুদ্ধে কোন রকম অপ প্রচারের কোন স্থান নেই। সংক্ষেপে বলতে গেলে কোন বিদ্যালয় যদি ধর্মীয় শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে তাহলে তাকে স্পষ্ট ভাষায় সে শিক্ষার স্বরূপও ব্যাখ্যা করতে হবে। এ ব্যাপার শিক্ষকের অভিরুচির উপর ছেড়ে দিলে চলবে না কারণ তাতে গোলযোগের সূত্রপাত হবে।

প্রশ্ন: প্রত্যেকটি ছাত্রের তিনটি থেকে চারটি ভাষা জানা যদি প্রয়োজনীয় হয় তাহলে আপনি কি মনে করেন না যে ছাত্রদের প্রচলিত সব কয়টি ধর্মমতের মূল তত্ত্ব, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ও সংস্কার ইত্যাদি সম্বন্ধে জানাও সমান প্রয়োজন?

অধর্ম নয়, ধর্ম বলতে যথার্থই যা বুঝায় সেই অর্থে সকল ধর্মমতের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ভাব সৃষ্টি করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের সকল ধর্মমতের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান দিতে হবে। তবে আমি একথা মনে করি না যে এর জন্য বিভিন্ন ধর্মের সংস্কার অথবা তার অন্তর্ভুক্ত আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের মত দেশে চোখ কান খোলা রাখলে যে কেউ এ সব সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে জানতে পারবেন। আমরা যদি সব ধর্মের ভাল দিক সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হই (আর এই রকমই হওয়া উচিত) তাহলে বিভিন্ন ধর্মের সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমরা জানতে চাইব না। এর কোন প্রয়োজনই নেই। আমাদের নিজ নিজ ধর্মের সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে জানাই যথেষ্ট আর তারপর ছাত্রদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এসবের সংস্কার সাধনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করলেই কাজ হবে। আর এতেই অনেক সময় লাগবে।

নবজীবন, ৩-৬-১৯২৮ থেকে ১-৭-১৯২৮

৪

ছেলেরা কি বুঝতে পারে ?

গুজরাত বিদ্যাপীঠের জনৈক ছাত্র লিখছে ঃ

"ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষা সংক্রান্ত আপনার প্রবন্ধগুলির মধ্যে কয়েকটি আমার মনে যে সংশয় সৃষ্টি করেছে তার কথা আপনাকে জানাতে চাই। এগুলি পড়ে আমার মনে হল যে আমাদের মত ছেলেদের সম্বন্ধে আপনার কিছু কিছু অদ্ভুত ধারণা আছে। আমাদের বোধশক্তি সম্বন্ধে আপনার ধারণা এবং আমরা আত্মাকে জানতে সক্ষম—আপনার এই বিশ্বাস আমার একেবারে অমূলক মনে হয়। একটি প্রবন্ধের এক জায়গায় আপনি লিখেছেন ঃ

" 'লিখতে পড়তে শেখার পূর্বে এবং এই পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের আগে আত্মা সত্য ও প্রেম ইত্যাদি সম্বন্ধে ছেলেদের জানা দরকার এবং আত্মার মধ্যে কী অসীম শক্তি নিহিত তাও জানা প্রয়োজন।'

"...পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় ঘটার পূর্বে কোন বালক আত্মা প্রেম ও সত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে জানবে কি করে ? আমার তো মনে হয় এগুলি গূঢ় চিন্তা আধারিত গভীর দার্শনিক তত্ত্ব। তাছাড়া লিখতে পড়তে শেখার পূর্বে কোন ছেলের পক্ষে এসব বিষয় জানা সম্ভবপর নয়। এর সহজ কারণ হল এই যে অত অল্প বয়সে তার বোধশক্তি অবিকশিত থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনার বক্তব্য মেনে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

"এ ব্যাপারে আপনি আর একবার আলোচনা করেছেন ১৮-৭-১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের নবজীবন পত্রিকায় 'একটি কঠিন প্রশ্ন' প্রবন্ধে। ঐ প্রবন্ধে আপনি বলেছেন ঃ

" 'ছেলেদের এটুকু বোঝবার বুদ্ধি আছে যে দশমুণ্ড রাবণ আসলে আমাদের অন্তরস্থিত পাপ এবং তার মাথা দশটি নয়, হাজারটি।'

" 'ছেলেদের এটুকু বোঝার বুদ্ধি আছে'—একথা আপনি বলছেন কি করে ? রাবণের গল্প শুনলে কখনও কোন ছেলের একথা মনে হবে—এ আমি কল্পনা করতে পারি না।

"আমাদের অন্তরের পাপের মাথা দশটি নয় হাজারটি—এটা এমন কি বয়স্ক ব্যক্তিদের ধারণাতেও আসবে না। কেবল কোন সত্যসন্ধানী অথবা

আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন কোন ব্যক্তি এটা বুঝতে পারবেন। যখন সচরাচর কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি এটা বুঝতে পারেন না, তখন ছেলেদের সম্বন্ধে আপনি যে কি করে এতটা আশা করেন তা আমি বুঝে উঠতে পারি না। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে একথা কখনই কোন ছেলের মনে উঠবে না।

"এ ব্যাপারে আপনার ভিত্তিহীন বিশ্বাসের আর একটি বাস্তব উদাহরণ হল আশ্রমের প্রার্থনার সময় ছেলেদের গীতা ও রামায়ণ শেখান।

"আমার মনে হয় না যে ছেলেদের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য অথবা তাদের ভাষা-জ্ঞান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে আপনি তাদের এসব শেখান। মাঝে মাঝে আপনি যখন ছেলেদের গভীর দার্শনিক তত্ত্বরাজি বোঝাবার চেষ্টা করেন তারা তা বুঝতে পারে না এবং তাই ঢুলতে থাকে। এই সময়ে স্বভাবতই তাই প্রশ্ন জাগে যে বাপুজী কেন ছেলেদের খেলাধূলা ছাড়িয়ে এনে স্থিতপ্রজ্ঞ কর্ম ত্যাগ ইত্যাদি বালকবুদ্ধির একেবারে অগম্য বিষয়ে মনোনিবেশ করতে বাধ্য করেন?"

লেখক আমার যে সব প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেগুলি একবার দেখে নেবার সময় আমি পাই নি। সমগ্র প্রবন্ধটির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করলে বিচ্ছিন্ন ভাবে তার একটি অনুচ্ছেদের যথার্থ অর্থ অনুধাবন করা অনেক সময় সম্ভবপর হয় না। যাই হক মূল প্রবন্ধটি আর একবার দেখে না নিলেও ছাত্রটির প্রশ্নের জবাব দিতে আমার অসুবিধা হবে না। কারণ উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের বক্তব্যের মূল অর্থ আমার অভিজ্ঞতাপ্রসূত। তবে বালক বলতে আমি দু বছর বয়সের শিশুর প্রতি ইঙ্গিত করি নি। এখানে বালক শব্দটি সাধারণতঃ যে বয়সের শিশুরা বিদ্যালয়ে যায় তাদের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত।

আমি যখন গীতা পড়াই তখন যদি বালকেরা ঝিমোতে থাকে তাহলে তার থেকে এই কথা বোঝা যায় না যে তাদের বোধশক্তির অপ্রতুলতা আছে।

অবশ্য একথা বলা যেতে পারে যে তাদের ভিতর আমি গীতার প্রতি প্রয়োজনীয় আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারি নি। অথবা এও হতে

পারে যে সে সময় ছেলেরা ক্লান্ত ছিল। আমি দেখেছি যে অঙ্ক লেখা গল্প শোনা অথবা এমন কি নাটকাভিনয় দেখার সময়ও ছেলেরা অনেক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। আবার গীতা পাঠের সময় বয়স্ক ব্যক্তিরাও ঘুমাচ্ছেন—এ দৃশ্যও দেখা গেছে। সুতরাং এ প্রশ্নের পর্যালোচনার সময় ঘুম পাওয়া অথবা ক্লান্তি বোধ করার উদাহরণকে অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞানে পরিহার করতে হবে।

শিশুর জন্মের পূর্বেই আত্মার অস্তিত্ব ছিল। এর আদি নেই এবং শৈশব যৌবন অথবা বার্ধক্যের দ্বারা আত্মা প্রভাবিত নয়। সত্যকে সম্যক্‌ভাবে অনুভবক্ষম ব্যক্তির কাছে এ প্রশ্ন উঠবেই না। নিছক দৈহিক অস্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত ও বাহ্য বস্তুদ্বারা পরিচালিত হবার কারণ এবং গভীর চিন্তার পরিপন্থী আলস্যের ফলে আমরা মনে করি যে খেলাধূলা অথবা বড় বেশী হলে অ আ ক খ অথবা তার উপরে ইউরোপ ও আমেরিকার বিদঘুটে নদী নালার নাম কিংবা ঐ সব দেশের রাজা দস্যু ও খুনেদের তথাকথিত ইতিহাস মুখস্থ করার বাড়া আর কিছুই তারা পারে না।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা এর বিপরীত। ছেলেদের বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করলে অবশ্যই তাদের আত্মা সত্য ও প্রেম ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে একটা ধারণা লওয়া যায়। "এর জীব কোথায় গেল" মৃতদেহ দেখে ছেলেদের এই প্রশ্ন পাঠকেরা নিশ্চয় শুনেছেন। এ প্রশ্ন যে ছেলে করতে পারে তাকে নিশ্চয় আত্মা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। দেশের কোটি কোটি নিরক্ষর শিশু তাদের বোধশক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে। এমন কোন ছেলে আছে যে নিজের মা বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে সহজ প্রবৃত্তির দ্বারা প্রেম ও ক্রোধের পার্থক্য বুঝতে পারে না? প্রশ্নকারী বোধ হয় নিজের ছেলেবেলার কথা ভুলে গেছেন। আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে লিখতে পড়তে শেখার অনেক পূর্বে তিনি তাঁর মা বাবার ভালবাসার স্বাদ পেয়েছিলেন এবং

প্রেমকে চিনতে শিখেছিলেন। ভাষা ছাড়া যদি প্রেম সত্য ও আত্মার বাস্তবতা সম্বন্ধে অপরকে সচেতন করা সম্ভব না হত তাহলে অনেক আগেই এসব অদৃশ্য হয়ে যেত।

ছাত্রটি আমার রচনার যে অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে নীরস ও প্রাণহীন দার্শনিক সত্য আলোচনার কথা বলা হয় নি। ঐ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল নিজেদের আচরণের মাধ্যমে সত্য ইত্যাদি অবিনশ্বর সৎগুণাবলির প্রত্যক্ষ অভিপ্রদর্শন এবং এইভাবে ছেলেদের কাছে প্রমাণ করা যায় যে তাদেরও এই সব সদ্গুণ আছে। জ্ঞানের মূল্য আছে, তবে সচ্চরিত্র করে গড়ে তোলা তার চেয়েও মূল্যবান। চরিত্রের চেয়ে সাহিত্যের জ্ঞানকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করার অর্থ গাড়ীকে ঘোড়ার আগে জোতা। ডারুইনের সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক ওয়ালেস ৯০ বছর বয়সে ঘোষণা করেন যে তথাকথিত অসভ্য নিগ্রোদের সঙ্গে সভ্য ও প্রগতিশীল নামে আখ্যাত জাতিসমূহের লোকেদের আচরণে তিনি কোন পার্থক্য দেখতে পান নি। বর্তমান বিশ্বে যেসব অলীক প্রলোভন ছড়িয়ে আছে তার প্রভাবে আমরা যদি অন্ধ না হই তাহলে আমরা ওয়ালেস-এর বক্তব্যের যথার্থতা প্রণিধান করতে পারব এবং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অন্য রকমের পরিকল্পনা রচনা করব।

দশমুণ্ড রাবণের ব্যাপারে আমি একটি প্রতিপ্রশ্ন তুলব: রাবণ নামে দশটি মাথাওয়ালা একটি মানুষ ছিল (যা অসম্ভব) অথবা মানুষের হৃদয়ে পাপের প্রতীক দশমুণ্ড রাক্ষস লুকিয়ে আছে—এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি ছেলেদের পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ। ছেলেরা কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবিহীন মনে করে আমরা তাদের উপর খুব অবিচার করি। শুধু তাই নয় এরকম করার অর্থ নিজেদের বুদ্ধি সম্বন্ধে আস্থার অভাব।

অবশ্য "ছেলেদের একথা বোঝার বুদ্ধি আছে" কথাটির অর্থ এই নয় যে বুঝিয়ে না দিলেও তারা বুঝতে পারবে। যতই চেষ্টা

করা যাক না কেন মানুষের যে দশটি মাথা হতে পারে—একথা ছেলেদের বোঝান মুস্কিল। কিন্তু আমি খুব ভাল ভাবেই জানি যে গোপনে আমাদের হৃদয়ে বসবাসকারী দশমুণ্ড রাবণের অর্থ তারা চট করে বুঝে নেবে।

আমি আশা করি ছাত্রটি এবার বুঝতে পারবেন যে কেন আমি ছেলেদের কাছে তুলসীদাসের রামায়ণ অথবা ব্যাসদেবের গীতা পাঠ করতে ইতস্তত করি না। কর্ম ত্যাগ অথবা স্থিতপ্রজ্ঞের দর্শন তাদের শেখানর অভিলাষ আমার নেই। আমি এও মনে করি না যে এসব আমি নিজে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি। কর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা পড়লে হয়ত আমি এটা ভাল ভাবে বুঝতে পারব যদিচ সমগ্র বিষয়টিই জটিল ও দুরূহ। আর শেষ অবধি যদি এ বিষয়টি বুঝতেও পারি তাহলেও সম্ভবতঃ আমি ক্লান্তি বোধ করব এবং হয়ত বা আমার ঘুম পাবে। কিন্তু আমার কোটি কোটি মূক স্বদেশবাসীর কল্যাণভাবনা চালিত হয়ে ত্যাগ-ব্রত হিসাবে যখন আমি সূতা কাটার কথা ভাবি এবং তদনুযায়ী যখন আয়েস আরাম বর্জন করি তখন যতই আকর্ষণীয় হক না কেন ঘুমের সম্ভাবনাকে বিষাক্ত সর্পের মত মনে হয় ও আমি অতন্দ্র থাকি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে ছেলেবেলাতে সহজ সরল ভাবে গীতা শেখালে ভবিষ্যত জীবনে তার ফল ভাল হয় এবং তাই গীতা শেখা কল্যাণকর।

নবজীবন, ৯-৯-১৯২৮

৫

ধর্মীয় শিক্ষার প্রশ্ন

আমার কাছে ধর্মের অর্থ হচ্ছে সত্য ও অহিংসা। তাই বা কেন, ধর্ম মানে বোধ হয় শুধু সত্য। কারণ সত্যের ভিতর অহিংসা নিহিত ও অহিংসা হচ্ছে সত্য আবিষ্কারের অতি প্রয়োজনীয় এবং

অপরিহার্য অঙ্গ। সুতরাং যা কিছু এই সদ্‌গুণাবলী আচরণে প্রবুদ্ধ করে, তা-ই ধর্মীয় শিক্ষা দেবার মাধ্যম এবং আমার মতে এই কার্য সাধনের শ্রেষ্ঠতম উপায় হচ্ছে শিক্ষকের নিজ জীবনে এই সব সদাচার মূর্ত করার জন্য কঠোর প্রযত্ন করা। ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ বা অধ্যয়ন-মন্দির—যেখানেই ছাত্ররা শিক্ষকদের সাহচর্যে আসবে, সেখানেই তাঁরা তাহলে এইসব সুচারু বনিয়াদী সদ্‌গুণাবলী সম্বন্ধে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে পারবেন।

ধর্মের বিশ্বজনীন মূল সত্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে এইখানেই ইতি করা যাক। ধর্মীয় শিক্ষার পাঠ্যক্রমে নিজ ধর্ম-পরিধির বহির্ভূত অন্যান্য ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করার পন্থাও থাকবে। এজন্য ছাত্রদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যে, তাদের ভিতর যেন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ও উদার সহিষ্ণুতার সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মমত বোঝার ও তার গুণগ্রাহী হবার অভ্যাস জন্মে। সুষ্ঠুভাবে এ কর্তব্য করতে পারলে এর ফলে তাদের আধ্যাত্মিক ভিত্তিমূল দৃঢ় হবার সহায়তা হবে এবং এর পরিণামে তারা নিজ ধর্মমতকে আরও ভালভাবে বুঝতে পারবে। তবে মহান্ ধর্মমতসমূহ সম্বন্ধে অধ্যয়নকালে একটি নীতির কথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। কথা হচ্ছে এই যে, এই সব ধর্মমত সম্বন্ধে জানতে হবে সেই ধর্মের কোন সুপরিচিত পণ্ডিতের রচনা থেকে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কেউ যদি ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করতে চান, তবে গীতার কোন কটূ সমালোচকের অনুবাদের শরণ নিলে চলবে না, ভগবদ্গীতা-প্রেমীর অনুবাদের সাহায্য নিতে হবে। এইভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করতে হলে কোন ভক্ত খ্রীস্টান-লিখিত ভাষ্য পাঠ করতে হবে। এই পদ্ধতিতে অপরের ধর্মমত সম্বন্ধে অধ্যয়ন করলে সর্বধর্মের ভিত্তিমূলে নিহিত ঐক্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হবে এবং মতবাদ ও শুষ্ক আচার-অনুষ্ঠানের ধূলিজালের অন্তরালে যে বিশ্বজনীন ও শাশ্বত সত্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তারও আভাস পাব।

ক্ষণেকের জন্যও যেন কারও মনে এই আশঙ্কার উদ্রেক না হয় যে শ্রদ্ধাশীল চিত্তে অপরাপর ধর্মমত সম্বন্ধে অধ্যয়ন করলে নিজ ধর্ম-বিশ্বাস শিথিলমূল বা দুর্বল হতে পারে। হিন্দু-দর্শন মনে করে যে, প্রত্যেক ধর্মের ভিতরই সত্যের অংশ আছে এবং তাই প্রতিটি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখার নির্দেশ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্য ধরে নিতে হবে যে, নিজ ধর্মের প্রতি উদ্দিষ্ট ব্যক্তির শ্রদ্ধা বিদ্যমান। অপর ধর্মমত অধ্যয়ন ও তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করার ফলে তাতে কোন দুর্বলতা সৃষ্টি হবার কারণ নেই। এর অর্থ শুধু এই যে, নিজ ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধার পরিধি অপর ধর্মের সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করা।

এই ক্ষেত্রে ধর্ম ও সংস্কৃতি একই ভিত্তিভূমির উপর অধিষ্ঠিত। নিজ সংস্কৃতি রক্ষার অর্থ অপরের সংস্কৃতির প্রতি তাচ্ছিল্য নয়, বরং এর জন্য অপরের সংস্কৃতির সদ্‌গুণাবলী গ্রহণ করা প্রয়োজন। ধর্মের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য। দেশে পারস্পরিক বিদ্বেষ অসূয়া এবং অবিশ্বাসের যে বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে আমাদের বর্তমান ভয় ও আশঙ্কার মূল সেখানে। সর্বদা আমরা এই পরিবেশে রয়েছি যে এই বুঝি কেউ আমাদের নিজের বা আমাদের প্রিয়জনদের বিশ্বাসের উপর গুপ্ত আক্রমণ করবে। অবশ্য অন্যান্য ধর্মমত ও তার অনুগামীদের প্রতি শ্রদ্ধাভাব ও সহনশীলতার অনুশীলন করলে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি কেটে যাবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-১২-১৯২৮

৬

বনিয়াদী শিক্ষা ও ধর্ম

জনৈক মুসলমান পত্রলেখক লিখেছেন ঃ

"বিগত কয়েক মাস যাবত উর্দু সংবাদপত্রসমূহে ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশিত হচ্ছে। সচরাচর যেমন ঘটে থাকে এক্ষেত্রেও তেমনি কেউ এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদনটি যত্ন সহকারে পড়েন নি

অথবা বনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করেন নি। (বনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে) সমালোচকদের দুটি বক্তব্য :

(ক) ধর্মশিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে।

(খ) সকল ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাভাব গড়ে তুলতে হবে।”

ওয়ার্ধা শিক্ষাপরিকল্পনায় সাম্প্রদায়িক অর্থে ধর্মীয় শিক্ষাকে ইচ্ছা করেই বর্জন করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে কোন কিছু না থাকলে সকল সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা একেবারে অসম্ভব না হলেও খুবই দুরূহ। এ শিক্ষা ঘরে সব চেয়ে ভাল ভাবে দেওয়া সম্ভব। ঘরে বা অপর কোথাও এ শিক্ষা নেবার মত যথেষ্ট সময় রাষ্ট্র সকল শিশুকে দেবে। এ কথাও কল্পনা করা যায় যে কোন সম্প্রদায় যদি ব্যয়ভার বহনে রাজী হন তবে রাষ্ট্র তার বিদ্যালয়সমূহে সেই ধর্মমত সম্বন্ধে পৃথক ভাবে শিক্ষা দেবার সুযোগ করে দেবে।

সকল ধর্মমতের প্রতি সমান শ্রদ্ধা সৃষ্টিকারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমার অভিমত খুবই দৃঢ়। সেই সুখকর স্থিতিতে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর যথার্থ ঐক্য প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা আমি দেখি না। শিশুদের যদি এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে তাদের ধর্মমতই সর্বশ্রেষ্ঠ বা সেইটিই একমাত্র সত্যধর্ম তাহলে বিভিন্ন ধর্মমতের শিশুদের মধ্যে বন্ধুভাব প্রতিষ্ঠার পক্ষে তা হবে মারাত্মক। এই জাতীয় বিভেদকারী মনোভাবের দ্বারা জাতি যদি আচ্ছন্ন হয় তাহলে তার পরিণামে হয় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে ও এর প্রত্যেকটিকে পরস্পরকে নিন্দা করার অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে আর নচেৎ ধর্মের নাম নেওয়াই একেবারে নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। এ জাতীয় নীতির কুফল কল্পনা করতেও আতঙ্ক হয়। নীতিশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব সকল ধর্মমতেই উপস্থিত। এগুলি অবশ্যই শিশুদের শিক্ষা দেওয়া উচিত এবং ওয়ার্ধা শিক্ষাপরিকল্পনা অনুসারে পরিচালিত বিদ্যালয়ের পক্ষে ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এ-ই যথেষ্ট।

হরিজন, ১৬-৭-১৯৩৮

৭

রাষ্ট্র ও ধর্মীয় শিক্ষা

আমি একথা বিশ্বাস করি না যে রাষ্ট্র ধর্মীয় শিক্ষা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে অথবা এর দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে। আমার মতে ধর্মীয় শিক্ষা একমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তব্য হওয়া উচিত। তবে ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রকে গুলিয়ে ফেলবেন না। আমি বিশ্বাস করি যে সকল ধর্মমতের মূল নীতিশাস্ত্রই এক। এই মৌলিক নীতিশাস্ত্রের শিক্ষণব্যবস্থা করা অবশ্যই রাষ্ট্রের কর্তব্য। ধর্ম বলতে আমি এখানে মূল নীতিশাস্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত করছি না, সাম্প্রদায়িক ধর্মের নামে যা চলছে তার কথাই এখানে বলছি। রাষ্ট্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় ধর্মসঙ্ঘের হাতে আমরা যথেষ্ট নিগৃহিত হয়েছি। যে সমাজ বা গোষ্ঠী আংশিকভাবে অথবা পূর্ণতঃ নিজেদের ধর্মকে টিকিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয় তাদের ধর্ম নামক কোন কিছু থাকতে পারে না কিংবা নেই-ই।

হরিজন, ২৩-৩-১৯৪৭

৮

সরকারের দায়িত্ব

সরকার ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন—আমি এতে রাজী নই। ভুল ধরনের ধর্মীয় শিক্ষা দেবেন এরকম কিছু লোক যদি থাকেন আপনারা তাতে বাধা দিতে পারেন না। সেকাজ করতে গেলে তার ফল খারাপ হবে। যাঁরা ধর্মীয় শিক্ষা দিতে চান নিজেদের উদ্যোগে তা দিতে পারেন। শর্ত কেবল এইটুকু যে সে শিক্ষা দেশের আইন ও নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ হবে না। সরকার কেবল সকল দলের অনুমোদিত প্রতিটি ধর্মের মূল তত্ত্ব আধারিত নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন। আর প্রত্যুত আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ।

হরিজন, ৯-১১-১৯৪৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ শিক্ষা ও শরীরচর্চা

১

শরীরচর্চা প্রসঙ্গে

নানারকম খেলাধূলাকে শরীরচর্চার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও কেউ এসবের সত্যকার অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয় না এবং আমাদের দেশী খেলাধূলা এর থেকে বাদ পড়েছে। টেনিস ফুটবল ও ক্রিকেট খুব জনপ্রিয় হয়েছে। এ খেলা তিনটি যে চিত্তাকর্ষক এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবে পাশ্চাত্য ধরনের খেলাধূলার জন্য আমরা যদি পাগল না হতাম তাহলে আমরা গেন্দ-বাল্লা, গুলি-ডাণ্ডা, খো-খো, সাত-তালি, কাবাডি ইত্যাদি বিনা খরচের অথচ সমপরিমাণ চিত্তাকর্ষক দেশী খেলা বর্জন করতাম না। সেকালের আখড়া প্রমুখ যেসব জায়গায় কুস্তি ও অন্যান্য ভারতীয় পদ্ধতির শরীরচর্চার অনুশীলন হত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সেগুলি প্রায় উঠে গেছে। আমার মতে এক্ষেত্রে আমরা যে একমাত্র পাশ্চাত্য পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে পারি তাহল ড্রিল বা কুচকাওয়াজ। জনৈক বন্ধু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে আমরা—বিশেষ করে যখন আমরা একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তি থাকি—চলতে জানি না। আমাদের তালে তালে চলতে হবে। আমরা শতখানেক বা হাজারখানেক কোথাও একত্র হলে শান্ত অথচ নিয়মিত পদক্ষেপে চলতে পারি না। পায়ে পা মিলিয়ে দুজন বা চারজনের সারি বেঁধে চলতে গেলে গণ্ডগোল বাধে। একথা ঠিক নয় যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধেই কেবল এরকম ভাবে চলা কাজে লাগে। বহু ধরনের সেবামূলক কাজেও এর প্রয়োজনীয়তা আছে। উদাহরণ-স্বরূপ আগুন নেভানর সময়, জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধারকালে, অসুস্থ বা অক্ষম ব্যক্তিদের ডুলি

ইত্যাদিতে বইবার সময় কুচকাওয়াজের পূর্ব অভিজ্ঞতা খুবই সাহায্যে আসে। সুতরাং আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় খেলাধূলা ব্যায়াম ও পাশ্চাত্য ধরনের কুচকাওয়াজ প্রবর্তন করা উচিত।

বিচারসৃষ্টি, ১৯১৭

২

শরীরচর্চার স্বরূপ

আমার মতে প্রাণায়াম আসন ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের ছাত্রদের শরীরচর্চার ব্যবস্থা করা উচিত। ....প্রাচীন পদ্ধতির মাধ্যমে শরীরচর্চা করার পর যারা আধুনিক যুগের কসরৎ ইত্যাদি শিখতে চায় তাদের সে সুযোগও দেওয়া কর্তব্য। তবে লাঠিখেলা বা অসিযুদ্ধ ইত্যাদি না শিখলেও চলবে। ...শরীরকে চটপটে করে তুলতে অথবা এর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়ে তোলার জন্য লাঠির খুব একটা প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং লাঠি খেলা ও ছোরা চালান ইত্যাদিকে শরীরচর্চার অঙ্গ বলা চলে না। তবে আত্মরক্ষা ও অনুরূপ উদ্দেশ্যে এদের প্রয়োজনীয়তা আছে।

* * *

শরীরচর্চা ও খেলাধূলাকে এখানে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে শুনে সুখী হয়েছি। যা কিছু ভাল তাকে যেন আমরা বাধ্যতামূলক করি।....ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া বাধ্যবাধকতা আমাদের কৃতদাসে পর্যবসিত করে। কিন্তু স্বেচ্ছামূলক বাধ্যবাধকতা আমাদের যথার্থ স্বাধীনতা বৃদ্ধি করে।

১৯২৪-২৫ ?

৩

বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা

এলাহাবাদের জনৈক স্নাতক লিখছেন ঃ

"আমি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক নিবন্ধভুক্ত স্নাতক। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টে নির্বাচনপ্রার্থী কোন্ প্রার্থীকে ভোট দেবার অধিকার আমার আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধে আমার অভিমতের জন্য আপত্তি উঠেছে। আপনি কি এ সম্বন্ধে ইয়ং ইণ্ডিয়া মারফত আপনার অভিমত জানাবেন ?…"

ধর্মে আমি শান্তিবাদী হবার জন্য পত্রলেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার বিরুদ্ধে যা কিছু বলেছেন আমি সর্বান্তঃকরণে তার সমর্থন করছি।…অবশ্য অহিংসায় ষোল আনা বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও কোন বিশেষ অবস্থায় অস্ত্রধারণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের জন্য সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার সার্থকতা আমি বুঝি। তবে সরকার যতক্ষণ না জনসাধারণের প্রয়োজনের ব্যাপারে নিতান্ত দায়িত্বহীন থাকছে ততক্ষণ তার আওতায় দেশের যুবকদের সামরিক শিক্ষা দেবার প্রস্তাব আমি সমর্থন করতে পারি না। আর সর্বাবস্থাতেই এমন কি জাতীয় সরকারের আওতাতেও আমি বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার বিরুদ্ধে যাঁরা সামরিক শিক্ষা নিতে চান না তাঁদের সর্বসাধারণের বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের অধিকার হরণ করা চলবে না। তবে শরীরচর্চা এক ভিন্ন ব্যাপার। অন্যান্য বিষয়ের মত একেও যেকোন আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গ করা যায় এবং করা উচিতও।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৯-১৯২৫

৪

শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তা

শাস্ত্রে বলা হয় যে শরীরকে কর্মঠ ও সবল রেখে তার সদুপযোগ করতে হলে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। আমি সমগ্র দেশে ভ্রমণ করেছি ও এই ভ্রমণকালে যে অন্যতম শোচনীয় দৃশ্য আমার চোখে পড়েছে তাহল যুবকদের জীর্ণ শীর্ণ চেহারা। যতদিন আমাদের দেশে বাল্যবিবাহের অভিশাপ থাকবে এবং যতদিন আমাদের সমাজের এক বিশিষ্ট অংশ হবে এই বাল্যবিবাহের সৃষ্টি ততদিন ভালমত শরীরচর্চা করা অসম্ভব ব্যাপার হয়েই থাকবে। ক্ষয়রোগগ্রস্তদের কে ব্যায়াম করতে বলবে? আমরা যদি তাই চাই যে ভারতের যুবক যুবতীরা শক্তিশালী ও স্বাস্থ্য-সম্পন্ন হক এবং দেশ তেজস্বীতা ও বলবীর্যের পথে আগুয়ান হক তাহলে এই কুপ্রথার মূলে কুঠারঘাত করতে হবে। মনু বলেছেন যে ছাত্রদের অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত। এ শর্ত পালন না করলে সব রকমের শরীরচর্চাই ব্যর্থ হবে।

আর একটি দিকের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনারা জানেন যে পরোক্ষভাবেও হিংসার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এমন ব্যাপারের সঙ্গে আমি কোন সম্বন্ধ রাখি না। অপরে যে যাই বলুন না কেন আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে অহিংসাই একমাত্র পথ এবং আমার কাছে এ-ই সর্বশ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী ধর্ম। তাই কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে আমার মত একজন প্রকাশ্য অহিংসাপ্রেমী কি করে এ জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি? এর কারণ অতীব প্রাঞ্জল। অহিংসার অর্থ হল হিংসা প্রয়োগের শক্তি বর্জন করা। সুতরাং এই হিংসা প্রয়োগের শক্তি যার নেই সে অহিংস আচরণেরও অযোগ্য। অহিংসা এক মহান্ আধ্যাত্মিক শক্তি। কিন্তু অহিংসাপ্রেমীর দৈহিক শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা চাই এবং সচেতন ভাবে ও স্বেচ্ছায় তিনি

এই শক্তি প্রয়োগ থেকে বিরত থাকবেন। অবশ্য তার মানে এই নয় যে হিংস শক্তির যোগ্যতা অর্জনের জন্য শরীরচর্চা করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু অহিংসার যোগ্য হবার জন্য আমাদের যুবকদের ক্ষীণ স্বাস্থ্যের করার কথা আমরা যেন না ভাবি। অস্ত্র কেড়ে নিয়ে কাউকে অহিংস করা যায় না। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান অপরাধ হল আমাদের বাধ্যতামূলক ভাবে নিরস্ত্র করে রাখা। অবশ্য সম্ভবপর হলেও আমাদের অহিংস করার জন্য এরকম করা হয় নি, আমাদের নিরস্ত্র রাখা হয়েছে নিবীর্য করার জন্য। আমি চাই যে ভারতবর্ষ বলশালী এবং প্রয়োজন বোধে সে বল প্রয়োগ করার ক্ষমতাসম্পন্ন হয়েও যেন বল প্রয়োগের পন্থা পরিহার করে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-১২-১৯২৬

৫

সামরিক শিক্ষা প্রসঙ্গে

যে ব্যাপারটিতে আমি বেদনা পেয়েছি তাহল সামরিক শিক্ষার* প্রতি ইঙ্গিত। আমার মনে হয় যে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রব্যাপী

---

* উল্লিখিত সুপারিশগুলি এখানে দেওয়া হল :

কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা সমিতির সুপারিশ

নূতন দিল্লী, ২৭শে জানুয়ারী

"শিক্ষা বিষয়ক কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা সমিতি ন্যাশন্যাল ওয়ার আকাদেমির এই অভিমতকে সমর্থন করছে যে যেখানে ছেলেরা তাদের চরিত্র ও নেতৃত্বশক্তির বিকাশের জন্য যথেষ্ট সুযোগ পাবে এমন সব আবাসিক বিদ্যালয় প্রদেশ ও রাজ্যসমূহে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এগুলি থেকে ন্যাশন্যাল ওয়ার আকাদেমিতে ছাত্র আসবে।

"এই সমিতির অভিমত এই যে জাতীয় যুদ্ধোত্তর শিক্ষাপরিকল্পনায় যে নূতন ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে তা যেন সামরিক

সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে আমাদের বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে। নচেৎ আমরা পৃথিবীর কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ হবার পরিবর্তে পৃথিবীর পক্ষে অভিশাপে পরিণত হব। নেতা সৃষ্টি করা যায় না, যাঁরা নেতা হবার, তাঁরা জন্ম থেকেই হন। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করার পূর্বেই সরকারের এ ব্যাপারে এত ব্যগ্র হবার কি আছে? তাই কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতা সমিতি এ জাতীয় একটি বহুব্যাপক সুপারিশ করেছেন দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত বোধ করছি।

হরিজন, ২৩-৩ ১৯৪৭

কর্তৃপক্ষের স্থলসেনা বাহিনী নৌসেনা বাহিনী ও বিমান বাহিনীতে যে ধরনের নেতৃত্বশক্তি চরিত্র বুদ্ধি শৌর্য ও শারীরিক দক্ষতা প্রয়োজন তার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

"সামরিক কর্তৃপক্ষের মনে যে ধরনের বিদ্যালয়ের কথা আছে নিজেদের অধীনস্থ বিদ্যালয়গুলিকে ঠিক সেই ধাঁচে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হবার জন্য প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃপক্ষদের মনযোগ এই সমিতি নির্দেশ দিচ্ছে।"

—এ. পি. আই.

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ভাষা ও লিপি সমস্যা

১

কোন্ ভাষা শিখব?

প্রতিটি সুসংস্কৃত ভারতবাসীর নিজ মাতৃভাষা ছাড়া হিন্দু হলে সংস্কৃত, মুসলমান হলে আরবী এবং পার্শী হলে ফার্সী ভাষা এবং সকলের পক্ষেই হিন্দী জানা উচিত। কিছু কিছু হিন্দুর আরবী ফার্সী জানা প্রয়োজন এবং কিছু কিছু মুসলমান ও পার্শীর সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া উচিত। ভারতের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের কিছু সংখ্যক অধিবাসীর তামিল ভাষা জানা উচিত। ভারতের সর্বজনমান্য ভাষা হবে হিন্দী এবং নাগরী বা ফার্সী যে কোনও লিপিতে এ ভাষা লেখা চলবে। হিন্দু ও মুসলমানদের ভিতর অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনার জন্য উভয় লিপির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

হিন্দ স্বরাজ, পৃ: ১০৭ (১৯০৮)

২

মাতৃভাষা

আমি আশা করি যে ছাত্ররা যাতে নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে, এই বিশ্ববিদ্যালয় (কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়) তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আমাদের ভাষা হচ্ছে আমাদেরই প্রতিচ্ছবি এবং তোমারা যদি বল যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশের বাহন হিসাবে আমাদের ভাষা দুর্বল, তবে আমার মতে যত তাড়াতাড়ি ধরাপৃষ্ঠ থেকে আমাদের অস্তিত্ব মুছে যায়, ততই মঙ্গল। আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন যিনি মনে করেন যে ভারতে রাষ্ট্রভাষার স্থান ইংরাজী পাবে? (না, না, ধ্বনি)। তবে কেন জাতির চলার পথে এই বাধা সৃষ্টি করা? একবার ভেবে দেখুন যে ইংরাজ ছেলেদের তুলনায় আমাদের ছেলেদের কি রকম প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে।

পুণার জনকয়েক অধ্যাপকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথা জানালেন যে, ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে হয় বলে প্রত্যেকটি ভারতীয় যুবককে জীবনের ছয়টি মূল্যবান বৎসর নষ্ট করতে হয়। প্রতিটি স্কুল ও কলেজে যে সংখ্যক ছাত্র পড়ে, তাকে ছয় দিয়ে গুণ দিলে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে, জাতির কত সহস্র বৎসর সময়ের অপচয় হচ্ছে! আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, আমাদের ভিতর প্রেরণা-শক্তি নেই। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করার জন্য এমন মূল্যবান সময় নষ্ট করলে আর প্রেরণা-শক্তি আসবে কোথা থেকে? সুতরাং এ প্রচেষ্টায় আমরা ব্যর্থতা বরণ করে নিই। গতকাল এবং আজকের বক্তাদের মধ্যে শ্রীহিগিনবুথামের মত আর কারও পক্ষে কি তাঁদের শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় জয় করা সম্ভব হয়েছে? শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে দাগ কাটতে সমর্থ না হবার অপরাধ পূর্বোক্ত বক্তাদের নয়। তাঁদের বক্তৃতায় আমাদের পক্ষে যথেষ্ট মনের খোরাক ছিল; কিন্তু তাঁদের বক্তব্য আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে নি। আমি অনেককে এ কথা বলতে শুনেছি যে ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিরাই তো জাতির নেতৃত্বের দায়িত্ব বহন করছেন। এর বিপরীত ঘটাটাই আশ্চর্যের বিষয়। দেশের একমাত্র শিক্ষা-ব্যবস্থা ইংরাজীর মাধ্যমে পরিচালিত। তাই নিঃসন্দেহেই এর কিছু না কিছু ফল দৃষ্টিগোচর হইবে। কিন্তু আমরা যদি গত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ আমাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পেতাম, তাহলে এর পরিণাম কি হত? আজ তাহলে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হতাম এবং আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজগৃহে পরবাসীর মত হতেন না, জাতির প্রাণ-স্পন্দনের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ থাকত। দেশের দীনতম ব্যক্তিটির মাঝে তাঁরা কাজ করতে সমর্থ হতেন এবং এই অর্ধশতাব্দীতে তাঁরা যা অর্জন করতেন, তাকে সমগ্র জাতির সম্পদ ও ঐতিহ্য আখ্যা দেওয়া যেত (হর্ষধ্বনি)। আজ শিক্ষিতবর্গের অর্ধাঙ্গীরা পর্যন্ত তাঁদের

মহানতম চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত নন। অধ্যাপক (জগদীশচন্দ্র) বসু এবং অধ্যাপক রায়ের (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র) গৌরবময় গবেষণার উদাহরণ নিন। এটা কি লজ্জার বিষয় নয় যে তাঁদের গবেষণা সর্বসাধারণের সম্পত্তি নয় ?

স্পিচেস অ্যাণ্ড রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী, পৃঃ ৩১৮-২০ ; ৪-২-১৬

৩

মাতৃভাষা সম্বন্ধে

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার প্রবর্তনের প্রশ্নটির গুরুত্ব জাতীয় পর্যায়ের। মাতৃভাষার প্রতি অবহেলার অর্থ হল জাতিগত ভাবে আত্মহত্যা। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজীকে বজায় রাখার ঔচিত্যের প্রবক্তারা এই কথা বলে থাকেন যে বর্তমান ভারতে স্বদেশসেবা এবং জনসেবার ক্ষেত্রে ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবাসীদেরই একচেটিয়া আধিপত্য। এরকম না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। কারণ এদেশে ইংরাজীর মাধ্যমে ছাড়া অপর কোন রকম শিক্ষা পাবার সুযোগ নেই। আসল কথা হচ্ছে এই যে এই শিক্ষার পিছনে আমরা যত সময় দিই সেতুলনায় ফল পাই না। জনসাধারণের উপর শিক্ষার কোন প্রভাবই পড়ে নি।

…মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের ইহুদীরা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজন অনুভব করে তাঁরা তাঁদের কথ্য ভাষা ইদ্দিসকে পূর্ণাঙ্গ ভাষায় উন্নীত করেছেন এবং এই ভাষায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরাজি অনুবাদ করায় কৃতকার্য হয়েছেন। এইসব ইহুদীরা বহু বিদেশী ভাষা ভাল ভাবে শিখলেও তাতে তাঁদের অন্তরের তৃষ্ণা মেটে নি। আর তাঁদের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহুদী সমাজ নিজ মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠার পূর্বে তাদের সবাই-এর উপর বাধ্যতামূলক ভাবে কোন বিদেশী ভাষা শেখার বোঝাও চাপিয়ে দেন নি। সুতরাং এক

সময় যাকে কেবল একটি কথ্য ভাষা মনে করা হত এবং ইহুদী শিশুরা যে ভাষা তাদের মায়েদের কাছ থেকে শিখত, সেই ভাষায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তারাজির অনুবাদ করে তাঁরা তাকে সমৃদ্ধ করেছেন। সত্য সত্যই এ এক চমৎকার কৃতিত্ব।

....এক পুরুষ কালের ভিতর ইহুদী পণ্ডিতরা যদি তাঁদের জনসাধারণ গৌরব বোধ করতে পারে এমন একটি ভাষা তাঁদের দিয়ে থাকেন তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে প্রয়োজনারূপ সমৃদ্ধ করে তোলা আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। কারণ এগুলি সবই বিকশিত ভাষা। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেও আমরা একই শিক্ষা পাই। সেদেশে ডাচ ভাষার একটি বিকৃত রূপ তাল ভাষা ও ইংরাজীর মধ্যে বিবাদ ছিল। বুয়র মাতাপিতারা মোটেই চাইতেন না যে তাঁদের যেসব সন্তানের সঙ্গে ছেলেবেলায় তাঁরা তাল ভাষায় কথাবার্তা বলেছেন ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষা পাবার জন্য তারা অসুবিধায় পড়ুক। সেদেশে ইংরাজীর পক্ষ খুবই মজবুত ছিল। এর সপক্ষে যোগ্য প্রবক্তার দল ছিলেন। তবুও বুয়রদের দেশপ্রেমের কাছে ইংরাজীকে নতি স্বীকার করতে হল। এ প্রসঙ্গে খেয়াল করতে হবে যে বুয়ররা এমন কি শুদ্ধ ডাচ ভাষাকেও বাতিল করে দিল। যেসব শিক্ষক ইতিপূর্বে ইউরোপে প্রচলিত শুদ্ধ ডাচ ভাষা শেখাতেন তাঁরা সহজতর তাল ভাষা শেখাতে বাধ্য হলেন। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে যে তাল ভাষা দক্ষিণ আফ্রিকার সরল অথচ সাহসী গ্রামবাসী বুয়রদের পরস্পরের কথোপকথনের ভাষা ছিল বর্তমানে সেই তাল ভাষায় সুন্দর সাহিত্য গড়ে উঠছে। আমাদের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের উপর থেকে আমাদের আস্থা যদি চলে গিয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে নিজেদের উপরই আমাদের ভরসা নেই এবং এটা অবক্ষয়ের নিশ্চিত নিদর্শন। আমাদের মায়েরা যেসব ভাষায় কথা বলেন তার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব না থাকলে যতই ঔদার্য ও শুভেচ্ছা সহকারে যে রকমেরই স্বায়ত্ত্ব শাসন

আমাদের দেওয়া হক না কেন তার দ্বারা আমরা কদাচ স্বয়ং শাসিত জাতিতে পরিণত হতে পারব না।

স্পিচেস অ্যাণ্ড রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী, ১৯১৬

৪

হিন্দী : ভারতের জাতীয় ভাষা

শিক্ষার মাধ্যমের প্রতি যেমন আমরা মনোযোগ দিয়েছি, তেমনি জাতীয় ভাষার সমস্যার প্রতিও আমাদের মনোযোগ আকর্ষিত হওয়া কর্তব্য। ইংরাজীকে যদি জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে হয়, তাহলে একে অবশ্যপাঠ্য বিষয় রূপে পরিগণিত করা উচিত। ইংরাজী কি জাতীয় ভাষা হতে পারে ? অনেক বিদ্বান স্বদেশপ্রেমিক বলে থাকেন যে এ প্রশ্ন উত্থাপন করার অর্থই অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া। তাঁদের মতে ইংরাজী ইতোমধ্যেই সে স্থান অলঙ্কৃত করে রয়েছে। মহামান্য বড়লাট বাহাদুর এক সাম্প্রতিক উক্তিতে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন যে, ইংরাজী যেন সেই পর্যাদা পায়। উৎসাহের আধিক্যে তিনি অবশ্য স্বদেশ-প্রেমিক পণ্ডিতদের মত অতদূর যেতে পারেন নি। মহামান্য বড়লাট বাহাদুর বিশ্বাস করেন যে, ক্রমে ক্রমে ইংরাজী অধিকাধিক মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে, পারিবারিক পরিধির ভিতর অনুপ্রবেশ করবে এবং অবশেষে জাতীয় ভাষার পর্যায়ে উন্নত হবে। বড়লাট বাহাদুরের যুক্তিকে বাহ্যতঃ বিবেচনা করলে সমর্থন জানাইবার ইচ্ছা হবে। আমাদের শিক্ষিত সমাজের দশা দেখে মনে হয় যে, ইংরাজীর ব্যবহার বন্ধ করলে বুঝি আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপের গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। তথাপি গভীর ভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, ইংরাজী কখনই ভারতের জাতীয় ভাষা হতে পারে না বা হওয়া উচিতও নয়। জাতীয় ভাষার লক্ষণ কি ?

(১) রাজকর্মচারীদের পক্ষে এ ভাষা শেখা সহজ হবে।

(২) ভারতের সর্বত্র এই ভাষার মাধ্যমে ধর্মীয়, বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালান সম্ভব হবে।

(৩) এই ভাষা অধিকতম সংখ্যক ভারতবাসীর কথ্য ভাষা হবে।

(৪) সমগ্র দেশবাসীর পক্ষে এ ভাষা শেখা সহজ হবে।

(৫) জাতীয় ভাষা নির্ধারণ কালে সাময়িক বা ক্ষণস্থায়ী অবস্থার উপর জোর দেওয়া চলবে না।

ইংরাজী ভাষা পূর্বোক্ত কোন শর্তই পূর্ণ করে না। প্রথম শর্তটির অবশ্য সর্বশেষ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত ছিল। তথাপি ইচ্ছা করে আমি একে প্রথম স্থান দিয়েছি। এর কারণ হচ্ছে এই যে, মাত্র এই শর্তটি দেখেই মনে হয় যে ইংরাজীর বুঝি রাষ্ট্রভাষা হবার দাবী করার কারণ আছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে বিবেচনা করলেই দেখতে পাব যে, রাজকর্মচারীদের পক্ষেও এই মুহূর্তে ইংরাজী শেখা সহজ নয়। আমাদের কল্পিত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ইংরাজীনবীশ রাজকর্মচারীদের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকবে এবং অবশেষে মহামান্য বড়লাট ইত্যাদি মুষ্টিমেয় জনকয়েক মাত্র ইংরেজ থাকবেন। আজকেও অধিকাংশ রাজকর্মচারী ভারতীয় এবং তাদের সংখ্যা নিশ্চয় বৃদ্ধি পাবে।

প্রত্যেকেই একথা স্বীকার করবেন যে তাঁদের পক্ষে কোন ভারতীয় ভাষার তুলনায় ইংরাজী শেখা নিঃসন্দেহেই বহু কঠিন কাজ। দ্বিতীয় শর্তটি বিচার করলে দেখতে পাব যে দেশের জনসাধারণ ইংরাজী বলতে না পারলে সেই ভাষার মাধ্যমে ধর্মীয় কার্যকলাপ পরিচালনা এক আকাশকুসুমস্বরূপ। আর জনসাধারণের ভিতর সেই পরিমাণ ইংরাজী ভাষার প্রসারের কল্পনা এক অসম্ভব ব্যাপার।

ইংরাজী তৃতীয় শর্তটি পূরণে অক্ষম। ভারতবর্ষের অধিকতম সংখ্যক অধিবাসী এ ভাষায় কথা বলে না।

চতুর্থ শর্তটিও ইংরাজী দ্বারা পূর্ণ হতে পারে না ; কারণ, সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের পক্ষে এ ভাষা শেখা সহজ নয়।

সর্বশেষ শর্তের কথা বিবেচনা করলে দেখতে পাব যে, ইংরাজীর বর্তমান মর্যাদা একেবারে সাময়িক। স্থায়ী অবস্থা হচ্ছে এই যে, জাতীয় জীবনে ইংরাজীর প্রয়োজন অত্যন্ত সামান্য হবে। রাজকীয় কার্যকলাপের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্বন্ধিত বিষয়) অবশ্যই এর সার্থকতা থাকবে। তবে রাজকীয় ভাষা বা কূটনৈতিক ভাষা হওয়া এক ভিন্ন কথা। শুধু এর জন্য কিয়ৎ পরিমাণ লোকের এ ভাষার জ্ঞান থাকলেই চলবে। আমরা ইংরাজীবিদ্বেষী নই। আমরা শুধু এইটুকু চলতে চাই যে, এই ভাষাকে তার সীমার বাইরে যেতে দেওয়া উচিত নয় এবং ইংরাজী রাজকীয় ভাষা হবে বলে আমাদের মাল্যব্যজী, শাস্ত্রী এবং বন্দ্যোপাধ্যায়দের আমরা এ ভাষা শিখতে বাধ্য করব। তারপর আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হব যে তাঁরা বিশ্বের কোণে কোণে ভারতের মহত্ত্বের কথা ঘোষণা করবেন। তথাপি ইংরাজী ভারতের জাতীয় ভাষা হতে পারে না। একে সেই ভাষার মর্যাদা দেওয়া মেকী বিশ্বভাষা প্রবর্তনের চেষ্টার মত। আমার মতে এমন কি ইংরাজী আমাদের জাতীয় ভাষা হতে পারবে ভাবাটাই হচ্ছে অমানুষিক ব্যাপার। এ মেকী বিশ্বভাষা প্রবর্তন-প্রচেষ্টার মত অজ্ঞতার পরিচায়ক। তাহলে কোন্ ভাষা প্রথমোক্ত পাঁচটি শর্ত পূর্ণ করে ? এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে হিন্দীর ভিতরই এর গুণ আছে।

দেবনাগরী বা উর্দু লিপিতে উত্তর ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের দ্বারা লিখিত ও কথিত ভাষাকেই আমি হিন্দী আখ্যা দিয়ে থাকি। এই সংজ্ঞায় কেউ কেউ আপত্তি করেন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, হিন্দী ও উর্দু পৃথক পৃথক ভাষা। এ যুক্তির ভেতর সারবত্তা নেই। উত্তর ভারতের হিন্দু ও মুসলমানেরা একই ভাষায় কথোপকথন করে থাকেন। শিক্ষিত সমাজ একটু বিভেদ সৃষ্টি

করেছেন। শিক্ষিত হিন্দুরা হিন্দীকে সংস্কৃত-ঘেঁষা করে ফেলেছেন। এইজন্য মুসলমানরা এখন এ ভাষা বুঝতে পারেন না। আবার লক্ষ্ণৌএর দিকের মুসলমানরা নিজেদের কথাবার্তাকে একেবারে পার্শীয়ান-ঘেঁষা করে ফেলেছেন বলে সে ভাষা হিন্দুদের বোধগম্য নয়। এ ব্যাপার একই ভাষার দ্বিবিধ বাহুল্যের নিদর্শন। জনসাধারণের বার্তালাপের ভাষায় এই বাহুল্যের ঠাঁই নেই। উত্তর ভারতে আমি থেকেছি, অবাধে আমি হিন্দু-মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি এবং আমার হিন্দী-জ্ঞান অত্যন্ত অগভীর হওয়া সত্বেও তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে কখনও কোন অসুবিধা হয়নি। উত্তরের ভাষাকে ইচ্ছামত হিন্দী বা উর্দু যে নামই দিন না কেন, জিনিস একই। উর্দু লিপিতে লিখলে উর্দু হয় এবং সেই একই কথা দেবনাগরীতে লিখলে তা হয় হিন্দী।

সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যদি কিছু থাকে, তবে তা লিপির। এখনকার মত মুসলমান শিশুরা অবশ্যই উর্দু লিপিতে শিখবে এবং অধিকাংশ হিন্দু ছেলেও এ ভাষা দেবনাগরী লিপিতে শিখবে। হিন্দুদের বেলায় "অধিকাংশ" কথাটি এই জন্য প্রয়োগ করলাম যে সহস্র সহস্র হিন্দু উর্দু লিপিই ব্যবহার করে এবং তাদের ভিতর অনেকে নাগরী লিপির কথা জানেই না। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানরা যখন আর পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখবে না এবং তাদের ভিতর থেকে যখন সন্দেহের কারণসমূহ অপসারিত হবে, তখন অপেক্ষাকৃত অধিক প্রাণশক্তি-সম্পন্ন লিপিই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে ও অবশেষে জাতীয় লিপিরূপে পরিগণিত হবে। ইতোমধ্যে যে সব হিন্দু-মুসলমান উর্দু লিপিতেও দরখাস্ত লিখতে ইচ্ছুক, তাদের সে রূপ করার অবাধ অধিকার থাকবে এবং জাতীয় সরকারও তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে।

পূর্বোক্ত পঞ্চ শর্ত পূরণে সক্ষম অপর কোন ভাষা হিন্দীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। হিন্দীর পরেই বাংলার স্থান। কিন্তু

বাঙ্গালীরা স্বয়ং বাঙ্গালার বাইরে হিন্দী ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। হিন্দীভাষী কোন ব্যক্তি যে কোন জায়গায় গিয়ে হিন্দী ব্যবহার করলে কেউ বিস্মিত হয় না। হিন্দুধর্ম প্রচারক এবং মুসলমান মৌলভীরা ভারতের সর্বত্র তাঁদের ধর্মীয় উপদেশাবলী হিন্দী এবং উর্দু ভাষায় দিয়ে থাকেন এবং এমনকি অক্ষরজ্ঞানহীন জনসাধারণও তাঁদের কথা বুঝতে পারে। শুধু তাই নয়, কোন নিরক্ষর গুজরাতীও উত্তর ভারতে গেলে হিন্দীতে এক-আধটি কথা বলার চেষ্টা করেন; কিন্তু উত্তর ভারতের কোন দরোয়ানও নিজ গুজরাতী মালিকের সঙ্গে গুজরাতীতে কথা বলেন না। পক্ষান্তরে মালিককেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে কাজ চালাতে হয়। দ্রাবিড় দেশেও আমি হিন্দীতে কথা বলতে শুনেছি। ইংরাজী জানা থাকলে মাদ্রাজে কাজ চলে যায় বলা সত্য ভাষণ নয়। সেখানেও আমি হিন্দী প্রয়োগ করে ফল পেয়েছি। রেলওয়ে ট্রেনে মাদ্রাজী যাত্রীদের আমি হিন্দী ব্যবহার করতে শুনেছি। একটা আনন্দের কথা হচ্ছে এই যে, ভারতের সর্বত্র মুসলমানরা উর্দুতে কথাবার্তা বলেন এবং প্রত্যেক প্রদেশেই তাঁদের যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যায়। এইভাবে দেখা যায় যে, হিন্দীই রাষ্ট্রভাষা হওয়া যেন ভারতের বিধিলিপি। অতীত কাল থেকেই আমরা হিন্দীকে এই মর্যাদা দিয়ে আসছি। উর্দু সৃষ্টি হওয়ার কারণও এই। মুসলমান বাদশাহগণ ফার্সী বা আরবীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করতে পারেন নি। তাঁরা রাষ্ট্রভাষার জন্য হিন্দী ব্যাকরণ স্বীকার করে নিয়ে উর্দু লিপি ও ফার্সী শব্দসম্ভার দ্বারা তার রূপায়ণ করেন। কারণ বিদেশী ভাষার মাধ্যমে তাঁদের পক্ষে জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা অসম্ভব ছিল। ইংরেজদের কাছে এসব অবিদিত নয়। সিপাহীদের সম্বন্ধে যাঁদের যৎসামান্য জ্ঞান আছে তাঁরাই জানেন যে তাঁদের জন্য হিন্দী বা উর্দুতে সামরিক নির্দেশনামাসমূহ রচনা করতে হয়।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একমাত্র হিন্দীই জাতীয় ভাষা

হতে পারে। মাদ্রাজের শিক্ষিতবর্গের কাছে এ অবশ্য কিঞ্চিৎ অসুবিধা সৃষ্টি করবে। কিন্তু দাক্ষিণাত্য, গুজরাত, সিন্ধু বা বাঙলার অধিবাসীদের কাছে এ ব্যাপার অতীব সহজ। কয়েক মাসের ভিতরই তাঁরা হিন্দী ভাষায় যথেষ্ট পারঙ্গম হতে পারবেন এবং তখন জাতীয় ক্ষেত্রে তাঁরা এই ভাষায় বার্তালাপ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন। তামিলদের অবশ্য এতটা সুবিধা হবে না। দ্রাবিড় ভাষা-সমূহ গঠন-রীতি ও ব্যাকরণের দিক থেকে তার সংস্কৃতজ ভগ্নীদের থেকে পৃথক। উভয় গোষ্ঠীর ভিতর সংস্কৃতজ শব্দের অস্তিত্বের কারণ যা কিছু ঐক্য আছে। তবে এ অসুবিধা শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর সীমাবদ্ধ। তাঁদের স্বদেশপ্রেমিকতা-বৃত্তির কাছে আবেদন করার অধিকার আমাদের আছে এবং আমরা আশা করতে পারি যে, তাঁরা হিন্দী শেখার জন্য যথোচিত প্রয়াস করবেন; কারণ, ভবিষ্যতে সরকারীভাবে স্বীকৃতি লাভ করার পর অন্যান্য প্রদেশের মত মাদ্রাজেও হিন্দী অবশ্যপাঠ্য বিষয়রূপে প্রবর্তিত হবে এবং তখন অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে মাদ্রাজের আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাবে। ইংরাজী দ্রাবিড় জনসাধারণের ভিতর দৃঢ়মূল হতে পারে নি, কিন্তু হিন্দী অচিরাৎ এ কার্য সাধন করবে।

স্পিচেস এণ্ড রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী, পৃঃ ৩৯৫-৯৯ ; ২০-১০-১৭

৫

ইংরাজীর স্থান

সমগ্র বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাবতীয় কূটনীতিজ্ঞদের ভাষা হচ্ছে ইংরাজী। এ ভাষায় বহু সাহিত্য-সম্পদ বিদ্যমান ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়-সূত্র এই ভাষা। সুতরাং আমাদের ভিতর কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে এই ভাষা জানতে হবে। এঁরা জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক কূটনীতি বিভাগ পরিচালনা করবেন এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ রত্নাবলী

তাঁরা স্বদেশীয়দের জন্য আহরণ করবেন। ভবিষ্যতে এই হবে ইংরাজীর যথাযোগ্য উপযোগ। আজ কিন্তু ইংরাজী আমাদের মাতৃভাষাকে হৃদি-সিংহাসন-চ্যুত করে অন্তরের প্রিয়তম স্থান জোর করে দখল করেছে। ইংরাজীর এ মর্যাদা অস্বাভাবিক এবং ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের এক বিসম সম্বন্ধ এর মূলে ক্রিয়াশীল। ইংরাজী ভাষার জ্ঞান বিনাই ভারতীয় চিত্তের চূড়ান্ত বিকাশ সম্ভবপর হওয়া উচিত। দেশের ছেলেমেয়েরা আজ মনে করে যে ইংরাজী না জানলে সুসংস্কৃত সমাজে প্রবেশ লাভ অসম্ভব। এইভাবে এই মনোভাব আজ ভারতের পুরুষসমাজ এবং বিশেষতঃ নারীকুলের প্রতি ভীষণ হিংসাচরণ করছে। এ মনোবৃত্তি অতীব অপমানজনক ও অসহ্য। স্বরাজের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ইংরাজীর প্রতি এই মূঢ় আকর্ষণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-২-২১

৬

হিন্দুস্থানীর প্রয়োজনীয়তা

প্রতিটি ছাত্রকে আমি বুক ঠুকে এই পরামর্শ দিয়েছি যে তারা যেন এই অগ্নিপরীক্ষার বৎসরটি সূতা কাটা এবং হিন্দুস্থানী শেখার জন্য উৎসর্গ করে। কলকাতার ছাত্রসমাজ অনুগ্রহপূর্বক এই প্রস্তাব স্বীকার করেছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ। হিন্দুস্থানী না জানার জন্য বাঙলা ও মাদ্রাজের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অংশের সংযোগ নেই। ভারতের অন্য কোন ভাষা শেখার বিরুদ্ধে বাঙলার একটা গোঁড়ামী আছে এবং দ্রাবিড়দের হিন্দুস্থানী শেখা শক্ত বলে মাদ্রাজীদের হিন্দুস্থানী শেখা হয়ে ওঠে না। যে কোন সাধারণ বাঙালী দৈনিক ঘণ্টা তিনেক সময় দিলে দুই মাসে হিন্দুস্থানী শিখতে পারবেন এবং ঐ হারে সময় দিলে কোন দ্রাবিড় দেশীয়ের হিন্দুস্থানী শিখতে ছয় মাস সময় লাগবে। বাঙালী বা দ্রাবিড়

দেশীয়—কেউই ঐ সময়ের ভিতর ইংরাজীতে অনুরূপ ফল পাবার আশা করতে পারে না। ইংরাজীতে জ্ঞান হলে মুষ্টিমেয় কতিপয় ইংরাজীনবীশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনার উপায় হয়। পক্ষান্তরে মোটামুটি হিন্দুস্থানী জানলে অধিকতম সংখ্যক স্বদেশবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ করবার পথ খুলে যায়। আমি সর্বান্তঃকরণে আশা করি যে আগামী কংগ্রেসের অধিবেশনে বাঙালী এবং দ্রাবিড় দেশীয়রা মোটামুটি হিন্দুস্থানী শিখে আসবেন। আমাদের সর্ববৃহৎ জাতীয় সমাবেশে দেশের অধিকাংশের বোধগম্য ভাষা ব্যবহৃত না হলে তা জনগণের কাছে আদর্শ শিক্ষাস্থল হতে পারে না। দ্রাবিড়দেশীয়দের অসুবিধা আমি বুঝতে পারি ; কিন্তু মাতৃভূমির প্রতি তাঁদের অসীম ভক্তির কাছে সকল বাধা-বিপত্তি দূর হয়ে যাবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-২-১৯২১

৭

ইংরাজীর সীমাবদ্ধতা

আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়সমূহে যে যথার্থ শিক্ষা পাওয়া উচিত ছিল, আপনি, আমি এবং আমরা সকলেই তা উপেক্ষা করেছি। বাঙলা, গুজরাত বা দাক্ষিণাত্যের যুবকদের পক্ষে মধ্যপ্রদেশ, সংযুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রমুখ ভারতের যে বিশাল অংশ হিন্দুস্থানী ছাড়া অন্য কোন ভাষাতেই কথা বলে না, সেখানে যাওয়া অসম্ভব। এইজন্য আপনাদের অবসর সময়েও আমি হিন্দুস্থানী শিখতে বলছি। মুহূর্তের জন্যও মনে এ চিন্তার ঠাঁই দেবেন না যে ইংরাজীকে জনসাধারণের পারস্পরিক মনোভাব আদান-প্রদানের সাধারণ ভাষা হিসাবে রূপ দিতে পারবেন। বাইশ কোটী ভারতবাসী হিন্দুস্থানী জানেন। তারা অন্য কোন ভাষা জানেন না এবং আপনারা যদি তাঁদের হৃদয়-রাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে চান, তাহলে একমাত্র হিন্দী ভাষার পথই আপনাদের সম্মুখে উন্মুক্ত।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-২-২১

৮

হিন্দী ভাষার বৈভব

আপনারা হিন্দী ভাষার দৈন্যের কথা বলছেন। আধুনিক হিন্দীর দীনতা আপনাদের সমালোচনার লক্ষ্য। কিন্তু আপনারা যদি অভিনিবেশ সহকারে তুলসীদাসের "রামচরিত মানস" অধ্যয়ন করেন, তাহলে আপনারা সম্ভবতঃ আমার সঙ্গে একমত হবেন যে বিশ্বের আধুনিক ভাষাসমূহের কোন গ্রন্থই "রামচরিত মানসের" সঙ্গে তুলনার যোগ্য নয়। ঐ একখানি গ্রন্থ আমাকে যে বিশ্বাস ও আশার জীবন-বারি পান করিয়েছে, অন্য কোন পুস্তকের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা, উপমার চমৎকারিত্ব এবং ধর্মীয় উদ্দীপনা—যে কোন দিক থেকেই এই গ্রন্থখানি সর্ববিধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-২-২১

৯

বিদেশী মাধ্যম

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষার মাধ্যম মস্তিষ্কে অবসাদ সৃষ্টি করেছে, আমাদের শিশুদের স্নায়ুর উপর অহেতুক বোঝা চাপিয়েছে এবং এর ফলে শিশুরা স্রেফ মুখস্থকারী ও নকলনবীশে পর্যবসিত হয়েছে। পরিণাম-স্বরূপ তাদের ভিতর আর মৌলিক কৃতিত্ব ও চিন্তার ক্ষমতা নেই এবং অধীত বিষয় নিজ পরিবার বা জনগণের ভিতর সম্প্রসারণের সাধ্যও তাদের নেই। বিদেশী মাধ্যম আমাদের শিশুদের একরকম নিজভূমে পরবাসী করে দিয়েছে। এই হচ্ছে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির সর্বাধিক বিয়োগান্তক অধ্যায়। বিদেশী মাধ্যম বিভিন্ন দেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে দেয় নি। আমার হাতে স্বৈরতন্ত্রী গণনায়কের ক্ষমতা থাকলে আজই আমি দেশের ছেলেমেয়েদের বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পাবার প্রথা রদ

করতাম এবং পদচ্যুত করার হুমকি দিয়ে প্রতিটি শিক্ষক ও অধ্যাপককে অবিলম্বে এ পরিবর্তন কার্যকরী করতে বাধ্য করতাম। পাঠ্যপুস্তক রচিত হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতাম না। পরিবর্তন হলে এসব আপনি-ই হবে। অবিলম্বে এ অন্যায়ের প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৯-২১

১০

একটি ছাত্রের প্রশ্ন

ছাত্রটির তৃতীয় প্রশ্নটি নিম্নরূপ ঃ

"...রাজনৈতিক ঐক্যের জন্য আমাদের সাধারণ ভাষা কি হওয়া উচিত? ইংরাজীকে এই স্থান দেওয়া যায় না?"

...ইংরাজী যদি আমাদের সাধারণ ভাষা হয় তাহলে ভবিষ্যত কি হবে তা অনুমান করা সহজ। কারণ তখন যে গণতন্ত্র চলবে তা হবে মুষ্টিমেয় লোকের। তবে ভারতের সুবিপুল জনসাধারণের ভিতর রাজনৈতিক ঐক্য সংস্থাপন যদি আমাদের অভিপ্রেত হয় (এবং হওয়া উচিতও) তাহলে ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্বন্ধে এরকম কিছু বলা সম্ভব নয়। কিন্তু বিপুলসংখ্যক জনসাধারণের সাধারণ ভাষা কদাপি ইংরাজী হতে পারে না। এটা হিন্দী এবং উর্দুর একটা সংমিশ্রণ—যাকে আমি হিন্দুস্থানী বলি তা-ই হতে বাধ্য। আমরা ইংরাজীতে কথাবার্তা বলি বলে দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। আমাদের অবস্থা নিজ ভূমে পরবাসীর মত। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষদের ভিতর ইংরাজী ভাষা যে ভাবে অনুপ্রবেশ করেছে আমার বিনম্র অভিমত অনুযায়ী তাহল দেশ—প্রত্যুত সমগ্র মানব-সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ-স্বরূপ। এর কারণ হল এই যে দেশের অগ্রগতির পথে আমাদের মত ইংরাজী শিক্ষিত

সম্প্রদায় বাধা-স্বরূপ। আর ভারতের মত একটা উপ মহাদেশের অগ্রগতি রুদ্ধ হবার অর্থ সমগ্র মানব-সমাজের প্রগতি ব্যাহত হওয়া। ইংরাজী শিক্ষিত যে ভারতবাসীটি গ্রামাঞ্চলে গেছেন তিনিই আমার মত এই জাজ্বল্যমান সত্য উপলব্ধি করেছেন। ইংরাজী ভাষার প্রতি আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা আছে এবং ইংরেজদের বহু সদ্‌গুণাবলীর আমি গুণগ্রাহী। তবে এবিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে ইংরাজী ভাষা ও ইংরেজরা আজ আমাদের জীবনে এমন একটা স্থান দখল করে আছে যার কারণ আমাদের এবং তাঁদের প্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-১২-১৯২৫

১১

সাধারণ লিপি

এক জাতিরূপে আমাদের দাবী সপ্রমাণ করার জন্য আমাদের ভিতর কতিপয় বিষয়ে সমতা থাকা প্রয়োজন। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে নানা শাখা-প্রশাখার অস্তিত্ব সত্ত্বেও আমাদের ভিতর একই সংস্কৃতির স্রোতধারা প্রবাহিত। আমরা একই প্রকার অযোগ্যতায় ভুগি। আমি স্বয়ং এই কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করছি যে, বেশভূষার ক্ষেত্রে একই ধরনের সাজসরঞ্জাম শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, প্রয়োজনও বটে। এ ছাড়া আমাদের একটি সাধারণ ভাষা প্রয়োজন। এই সাধারণ ভাষা আমাদের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের কণ্ঠরোধ করবে না, তাদের পরিপূরক হবে। অধিকাংশ লোকই এ কথা স্বীকার করেন যে, হিন্দুস্থানী এই সাধারণ ভাষা হবে। হিন্দুস্থানী অর্থাৎ হিন্দী ও উর্দুর সমন্বয়। এ ভাষা একেবারে সংস্কৃত-ঘেঁষা বা চূড়ান্ত আরবী ফার্সীগন্ধী হবে না। এ পথের সর্ববৃহৎ বাধা হচ্ছে আমাদের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের বহুবিধ লিপি। এইসব ভাষার জন্য একটি সাধারণ লিপি নির্ধারিত হলে দেশে একটি সাধারণ ভাষা

প্রচলন করার স্বপ্ন সফল হবার পথে একটি বিরাট বাধা দূরীভূত হয়েছে বলা যাবে।

বহুসংখ্যক লিপি একাধিক কারণে বাধা-স্বরূপ পরিগণিত হয়। জ্ঞানার্জনের পথে এ এক বিরাট বিঘ্ন; আর্যভাষা-গোষ্ঠীর ভিতর এতটা সাদৃশ্য আছে যে, বিভিন্ন লিপিশিক্ষার জন্য এত সময়ের অপচয় না হলে অত্যন্ত অল্পায়াসে আমরা প্রত্যেকে কতিপয় ভাষায় দক্ষ হতে পারতাম। উদাহরণ-স্বরূপ অল্পবিস্তর সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা দেবনাগরী হরফে মুদ্রিত হলে বিনা বাধায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতুলনীয় রচনার রসাস্বাদন করতে পারত। কিন্তু অবাঙালীদের কাছে বাঙলা হরফ যেন "প্রবেশ নিষেধ" এর বিজ্ঞপ্তি। এইভাবে বাঙালীরা দেবনাগরী লিপি জানলে অবিলম্বে তুলসীদাস প্রমুখ হিন্দুস্থানী লেখকদের রচনাবলীর অপূর্ব সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিক রস উপভোগ করতে পারতেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে আমি একটি সমিতির কাগজপত্র পাই। সম্ভবতঃ এই সমিতির সদর কেন্দ্র ছিল কলকাতায় এবং এর উদ্দেশ্য ছিল একটি সর্বভারতীয় লিপির প্রচার ও প্রসার করা। সেই সমিতির কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমি বিস্তারিতভাবে বিশেষ কিছু জানি না; তবে এর আদর্শ সুমহান্। এই ক্ষেত্রে মাত্র কয়েকজন নিষ্ঠাবান কর্মী অগ্রণী হলেও অনেক কাজ করা যায়। এ আদর্শ পরিপূর্তির পথে বাধা-বিপত্তি আছে। সমগ্র ভারতের পক্ষে একটি সাধারণ লিপি গৃহীত হওয়া সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার। তবে আমরা শুধু প্রাদেশিকতা বর্জন করতে পারলে সংস্কৃত ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রতিটি ভাষার পক্ষে (এর ভিতর দাক্ষিণাত্যের এই শ্রেণীর ভাষাও পড়ে) একটি সাধারণ লিপি গ্রহণ করা অতীব বাস্তব আদর্শ। উদাহরণ-স্বরূপ বলব যে একজন গুজরাতীর পক্ষে গুজরাতী লিপি আঁকড়ে থাকার কোন অর্থ বোধগম্য হয় না। বৃহত্তর সর্বভারতীয় স্বদেশপ্রেমের পোষক হলে তবেই প্রদেশকেন্দ্রিক

স্বদেশপ্রেম ভাল। এবং এই সর্বভারতীয় স্বদেশিকতা-বোধও যতটুকু সমগ্র বিশ্বরূপী আরও ব্যাপক লক্ষ্য পরিপূরণের সহায়ক হয়, ততটুকুই ভাল। কিন্তু যে প্রাদেশিক স্বদেশিকতা বলে যে, "ভারতবর্ষ কিছুই নয়, গুজরাত-ই সব", তা দুষ্টতা। গুজরাতে লিপির ক্ষেত্রে মোটামুটি একটা আপোষ হয়েছে এবং আমি স্বয়ং গুজরাতী বলে আমি গুজরাতের উদাহরণ নিয়েছি। গুজরাতে যাঁরা প্রাথমিক শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করেছিলেন, সৌভাগ্যবশতঃ তাঁরা দেবনাগরী লিপি বাধ্যতামূলক করেছিলেন। এইজন্য স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি গুজরাতী বালক-বালিকা গুজরাতী এবং দেবনাগরী লিপি জানে। প্রাথমিক-শিক্ষানীতি-নির্ধারকেরা শুধু দেবনাগরী লিপি জারী করলে আরও ভাল করতেন। সে অবস্থায় অবশ্য প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করার জন্য গবেষণা-কার্যে নিযুক্ত পণ্ডিতদের গুজরাতী লিপি শিখতে হত; কিন্তু দুটির বদলে একটি লিপি শেখার জন্য গুজরাতী ছেলেদের কর্মশক্তি অপর কোন প্রয়োজনীয় কার্যে লাগত। মহারাষ্ট্রের শিক্ষা-পরিকল্পনা-রচয়িতারা এতদপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিলেন বলে তাঁরা শুধু দেবনাগরী লিপি বজায় রাখেন। এর পরিণাম-স্বরূপ শুধু যতটুকু পড়ার সঙ্গে সম্পর্ক, যে কোন মারাঠি তুকারামের রচনার মতই সহজে তুলসীদাসের রচনাবলী পাঠ করে। তাই গুজরাতী এবং হিন্দুস্থানীরাও সমপরিমাণ সাবলীলতার সঙ্গে তুকারামের লেখনী-নিঃসৃত গ্রন্থরাজি পাঠ করেন। পক্ষান্তরে বঙ্গদেশের শিক্ষা-নির্ধারণ সমিতি একেবারে বিপরীত পন্থা অবলম্বন করে এবং এর ফল আমরা সকলেই জানি ও এর জন্য অনেক অনুতাপ করি। যেন ইচ্ছা করেই ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ভাষাকে অনধিগম্য করা হয়েছে। আমার মনে হয় দেবনাগরীকে সর্বসাধারণের লিপিতে পরিণত করার যুক্তি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অঞ্চলে

এই লিপি চলে—এই তথ্য এ সমস্যা সমাধানের নিরীখ হওয়া উচিত।

এইসব চিন্তা মনে ওঠার একটা কারণ ঘটেছে। আমার কটক সফরের সময় আমাকে একটি বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিহারের হিন্দীভাষী জনসাধারণ ও ওড়িষার ওড়িয়াভাষী জনসাধারণের মাঝামাঝি অবস্থায় একদল আদিবাসী আছেন। তাঁদের শিশুদের শিক্ষার জন্য কি করা উচিত? তাঁদের ওড়িয়ার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে, না হিন্দীর মাধ্যমে? অথবা তাঁদের নিজ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং সে ভাষার লিপি দেবনাগরী হবে অথবা নূতন কোন লিপি আবিষ্কার করা হবে? উৎকলের বন্ধুরা প্রথমে এদের ওড়িয়াদের ভিতর বিলীন করার কথা ভেবেছিলেন। বিহারীরাও এই ভাবে চাইবেন যে তারা বিহারী সমাজে লীন হোক। এবং ঐ উপজাতীয় প্রবীণ বয়স্কদের মত জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বোধ হয় স্বভাবতঃই বলবেন যে তাঁদের ভাষা ওড়িয়া ও হিন্দীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়, তাই এই ভাষাকে এবার লিখিত রূপ দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। তাঁরা যদি নিতান্ত কোন লিপি গ্রহণ না করেন (এ যুগে অন্ততঃ দুটি ক্ষেত্রে এভাবে নূতন লিপি প্রবর্তিত হয়েছে বলে আমি জানি), তাহলে তাঁদের লটারী করে স্থির করতে হবে যে তাঁরা ওড়িয়া লিপি বজায় রাখবেন, না দেবনাগরী। সর্বভারতীয় পট-ভূমিকায় চিন্তা করে মিত্রবর্গকে আমি পরামর্শ দিই যে, ওড়িয়াভাষী জনসাধারণের ভিতর ওড়িয়া ভাষাকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁদের প্রচেষ্টা সমীচীন বটে, কিন্তু এই উপজাতীয় শিশুদের হিন্দী শেখান উচিত এবং স্বভাবতই এদের দেবনাগরী লিপি শিক্ষা দিতে হবে। যে বর্জনধর্মী ও সংকীর্ণ মনোবৃত্তি কথ্য ভাষার প্রতিটি রূপকে স্থায়ী করতে ও তার সাহিত্যিক রূপ দিতে চায়, তা জাতীয়তা এবং বিশ্বমানবতা-বিরোধী। আমার বিনম্র অভিমত এই যে,

প্রতিটি অবিকশিত ও লেখ্য রূপবিহীন ভাষার স্বতন্ত্র রূপ বিসর্জন দিয়ে তাদের হিন্দুস্থানীর মহাসাগরে বিলীন করে দেওয়া উচিত। একে আত্মহত্যা আখ্যা দেওয়া অন্যায়, এ হচ্ছে মহত্তর লক্ষ্যাভিমুখী আত্মোৎসর্গ। সংস্কৃতিসম্পন্ন ভারতবর্ষের জন্য একটি সাধারণ ভাষা কাম্য হলে আমাদের ভেদ-বিভেদের পন্থা পরিহার করতে হবে এবং ভাষা ও লিপির সংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। আমাদের একটি সাধারণ ভাষা গড়ে তুলতেই হবে। স্বভাবতঃ এর সূত্রপাত করতে হবে লিপি দিয়ে এবং হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়াকে সম্ভবতঃ ভারতের হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আমার কথা চললে আমি প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষার অতিরিক্ত দেবনাগরী ও উর্দুলিপি শিক্ষা করা প্রতিটি প্রদেশে বাধ্যতামূলক করতাম এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার মুখ্য গ্রন্থসমূহ আমি দেবনাগরী লিপিতে মুদ্রণ করিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানীতে তার ভাবানুবাদ দিতাম!

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-৮-২৫

১২

সংস্কৃত ও অপরাপর ভাষার স্থান

তখন আমি যতটুকু সংস্কৃত শিখেছিলাম, তা না শিখলে আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হত। বস্তুতঃ সংস্কৃতে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে না পারার জন্য আজ আমি অত্যন্ত অনুশোচনা করি; কারণ পরে আমি উপলব্ধি করেছি যে প্রতিটি হিন্দু বালক-বালিকার সংস্কৃতে সম্যক্ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

আজ আমার অভিমত এই যে, ভারতের প্রতিটি অঞ্চলের উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যক্রমে মাতৃভাষা ছাড়া হিন্দী, সংস্কৃত, ফার্সী, আরবী ও ইংরাজীর স্থান থাকা প্রয়োজন। এইরূপ দীর্ঘ তালিকা দেখে ভীত হবার কারণ নেই। আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি যদি অধিকতর সুসমঞ্জস

হত এবং ছেলেদের যদি একটি বিদেশী ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে না হত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তাহলে এইসব ভাষা শেখা বিরক্তিকর প্রতীত হত না। পক্ষান্তরে এ অতীব আনন্দের ব্যাপার হত। কোন একটি ভাষা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা করলে অন্যান্য ভাষা শেখা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়।

আত্মকথা, ১৯২৬, পৃঃ ৩০

১৩

বিদেশী মাধ্যমের অভিশাপ

যা কিছু শিক্ষা নামে অভিহিত করা যেতে পারে, তা এবং সর্ববিধ উচ্চশিক্ষা আমরা ইংরাজীর মাধ্যমে পেয়েছি। এ না হলে কোন জাতির যুবসম্প্রদায়ের জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য যাবতীয় শিক্ষা যে (সর্বোচ্চ শিক্ষা এর অন্তর্ভুক্ত) নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে পাওয়া উচিত—এই রকম স্বতঃসিদ্ধ বিষয় প্রমাণ করার প্রচেষ্টার প্রয়োজন-ই ঘটত না। নিঃসন্দেহে এ একটা স্বতঃপ্রতিপাদিত প্রতিজ্ঞা যে, কোন দেশের যুবকদল জনগণের বোধগম্য ভাষাতে শিক্ষা না পেলে এবং সেই শিক্ষা তাদের ভাষায় আত্তীকৃত না হলে দেশের সর্বসাধারণের সঙ্গে প্রাণবন্ত সম্পর্ক স্থাপনা করতে পারে না বা তা বজায় রাখতে পারে না। দেশের যুব-সম্প্রদায় নিজ মাতৃভাষা ও সাহিত্য উপেক্ষা করে দৈনন্দিন জীবনে একেবারে অপ্রয়োজনীয় একটি বিদেশী ভাষার ণত্ব ষত্ব-বিধান পর্যন্ত শেখার জন্য বৎসরের পর বৎসর সময় নষ্ট করতে বাধ্য হয়। এর ফলে যে অপ্রমেয় ক্ষতি হচ্ছে, তার হিসাব করবে কে ? কোন একটি বিশেষ ভাষা সম্প্রসারণক্ষম নয় এবং সে ভাষায় জটিল গূঢ় ভাব বা বৈজ্ঞানিক বিচার-ধারা ব্যক্ত করা সম্ভব নয় মনে করা সর্বকালের প্রচণ্ডতম কুসংস্কার। কোন ভাষা সেই ভাষা-ভাষীর চরিত্র ও বিকাশ-ক্রমের হুবহু প্রতিচ্ছবি।

দেশের যুব-সম্প্রদায়ের উপর এই সর্বনাশা বিদেশী মাধ্যম চাপিয়ে

দেওয়া বিদেশী শাসনের বহুবিধ অন্যায়ের মধ্যে অন্যতম প্রধান অন্যায় বলে ইতিহাসে পরিগণিত হবে। জাতির কর্মোদ্যম এতে ধ্বংস হয়েছে এবং ছাত্রদের আয়ু হয়েছে এর পরিণামে সংক্ষিপ্ত। এর ফলে তারা হয়ে পড়েছে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং শিক্ষা হয়েছে অহেতুক ব্যয়-বহুল। এই পদ্ধতির উপর এখনও যদি জোর দেওয়া হয়, তবে আশঙ্কা হয় যে, জাতির আত্মাকে এ ধ্বংস করবে ; তাই যত শীঘ্র শিক্ষিত ভারত বিদেশী মাধ্যমরূপী এই মায়াজাল থেকে মুক্ত হয়, জনসাধারণ এবং তাঁদের নিজেদেরও ততই মঙ্গল।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-৭-২৮

১৪

ইংরাজী বনাম হিন্দী

আমি জানি যে ইংরাজী ও হিন্দীর ভিতর এই বাদ-বিসম্বাদ এক রকম চিরস্থায়ী ব্যাপার। ছাত্রদের ভিতর বক্তৃতা দেবার সময় ইংরাজীতে বলার জন্য তাদের দাবী শুনে শুনে হতচকিত হয়েছি। আপনারা জানেন এবং জানা উচিতও যে আমি ইংরাজী ভাষার গুণগ্রাহী, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে ভারতের ছাত্র-সমাজের ভবিষ্যৎ দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত ও তাদের সেবাই ছাত্র-সমাজের ব্রত হওয়া উচিত বলে তারা যদি ইংরাজীর বদলে হিন্দী শেখার উপর বেশী জোর দেয়, তবে তারা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে উঠবে। আমি এ কথা বলছি না যে আপনারা ইংরাজী শিক্ষা করবেন না ; ইংরাজী আপনারা অবশ্যই শিখবেন। তবে আমার যতদূর দৃষ্টি যায়, এ ভাষা দেশের কোটি কোটি পর্ণ-কুটীরের ভাষা হবে বলে মনে হয় না। হাজার বা লাখের ভিতর এর গণ্ডি সীমীত হবে, এ ভাষা কখনই কোটির কোঠা ছুঁতে পারবে না।

হরিজন, ১৭-১১ ১৯৩৬

১৫

আমার নিজের অভিজ্ঞতা

নিজ অভিজ্ঞতার একটি অধ্যায় আপনাদের কাছে বিবৃত করব। বার বৎসর পর্যন্ত আমি আমার মাতৃভাষা গুজরাতীর মাধ্যমেই যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করেছিলাম। সে সময় আমি কিছুটা গণিত ইতিহাস ও ভূগোল জানতাম। তারপর আমি একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। এখানেও প্রথম তিন বৎসর আমার মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম ছিল। তবে শিক্ষকেরা সর্বদা ছাত্রদের মগজে ইংরাজী অনুপ্রবিষ্ট করাবার জন্য সচেষ্ট থাকতেন। সুতরাং আমাদের অর্ধেকেরও বেশী সময় ইংরাজী শিখতে ও তার উদ্দণ্ড স্বভাব বানান ও উচ্চারণ-ভঙ্গী আয়ত্ত করার জন্য দিতে হত। কোন ভাষার উচ্চারণ যে তার বানান-পদ্ধতি মেনে চলে না—এটা বহু বিড়ম্বনার ভিতর দিয়ে আবিষ্কার করতে হয়েছিল। ইংরাজীর বানান মুখস্থ করা এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তবে আমি যে কথা বলতে চাইছি, তার সঙ্গে আপাততঃ এর সম্পর্ক নেই। যাই হক, প্রথম তিন বৎসর অপেক্ষাকৃত কম ঝঞ্ঝাটে চালিয়ে দেওয়া গেল।

চতুর্থ বৎসর থেকে শাস্তির পালা শুরু হল। জ্যামিতি, বীজগণিত, রসায়ন শাস্ত্র, জ্যোতিষ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি সব-কিছুই ইংরাজীর মাধ্যমে শিখতে হত। ইংরাজীর অত্যাচার এত ভীষণ ছিল যে এমন কি সংস্কৃত ও পার্শীয়ানও মাতৃভাষার মাধ্যমে নয়, ইংরাজীর মাধ্যমে শিখতে হত। ক্লাসে কোন ছাত্র নিজ বোধগম্য ভাষা গুজরাতীতে কথা বললে তার জন্য তাকে শাস্তি পেতে হত। কোন ছাত্র বিকৃত উচ্চারণে অর্থ না বুঝে ভুল ইংরাজী বললেও শিক্ষকের তাতে আপত্তি ছিল না। আর শিক্ষক মহাশয় দুশ্চিন্তা করবেন-ই বা কেন? তাঁর নিজের ইংরাজীও তো আর ত্রুটীমুক্ত ছিল না। এ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাঁর ছাত্রদেরই মত তাঁর কাছেও ইংরাজী ভাষা বিদেশী। ফলং

বিভ্রাটম্। সম্যক্‌ভাবে অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করে এবং এমন কি অনেক সময় কিছু মাত্র না বুঝেই আমাদের মত ছেলেদের দলকে অনেক কিছু মুখস্থ করতে হত। শিক্ষকমহাশয় যখন তাঁর জ্যামিতি সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা বোঝাবার জন্য প্রাণান্তকর প্রয়াস করতেন, ত্রাসে তখন আমার শিরোঘূর্ণন আরম্ভ হত। ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম খণ্ডের ত্রয়োদশ উপপাদ্য পর্যন্ত না পোঁছান পর্যন্ত আমি জ্যামিতির মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারতাম না। তাছাড়া পাঠকের কাছে আমাকে স্বাকার করতেই হবে যে, মাতৃভাষার প্রতি আমার এবম্বিধ গভীর অনুরাগ সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত আমি জ্যামিতি, বীজগণিত ইত্যাদির যথাযথ গুজরাতী পরিভাষা জানি না। তবে এখন আমি বুঝতে পারি যে ইংরাজীর মাধ্যমে যতটুকু গণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত, রসায়ন শাস্ত্র ও জ্যোতিষ বিজ্ঞান চার বৎসরে শিখেছিলাম, গুজরাতীর মাধ্যমে অতীব সহজে তা এক বৎসরে শিখতে পারতাম। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পেলে অপেক্ষাকৃত সহজে আরও প্রাঞ্জলভাবে আমি বিষয়গুলি বুঝতে পারতাম, আমার গুজরাতী শব্দ-ভাণ্ডার সমৃদ্ধতর হত। নিজগৃহে আমি এই জ্ঞানের উপযোগ করতে পারতাম। আমার পরিবার-পরিজন ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ হওয়ায় এই ইংরাজী মাধ্যম তাদের ও আমার মাঝে এক দুর্ভেদ্য ব্যবধান সৃষ্টি করল। বিদ্যালয়ে আমি কি করতাম, সে সম্বন্ধে আমার পিতা অজ্ঞ ছিলেন। ইচ্ছা থাকলেও আমি যা শিখছিলাম, সে সম্বন্ধে পিতার মনে আগ্রহ সৃষ্টি করা অসম্ভব ছিল। কারণ তাঁর যথেষ্ট বুদ্ধি থাকলেও ইংরাজী ভাষা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না। দ্রুতগতিতে আমি নিজগৃহে বাহরাগতের মত হয়ে পড়ছিলাম। আমি অবশ্যই একজন মাতব্বর ব্যক্তি হয়ে উঠছিলাম। এমন কি আমার পোষাক ও ধরন-ধারনে অভাবনীয় পরিবর্তন হতে লাগল। আমার যে পরিবর্তন ঘটেছিল, তা কোন অসাধারণ অভিজ্ঞতা নয়। অধিকাংশেরই এই অভিজ্ঞতা।

উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথম তিন বৎসর আমার সাধারণ জ্ঞানের ভাণ্ডার বিশেষ কিছু সমৃদ্ধ হয় নি। ঐ সময়টুকু ছাত্রদের ইংরাজীর মাধ্যমে প্রতিটি বিষয় শিক্ষা দেবার প্রস্তুতিকাল। উচ্চ বিদ্যালয়গুলি সংস্কৃতির বিজয়াভিযানের পীঠভূমি। আমাদের উচ্চ বিদ্যালয়ের তিনশত ছাত্র কর্তৃক আহরিত জ্ঞান অবরুদ্ধ সম্পদের মত হয়ে দাঁড়াল। এ জিনিস যেন জনসাধারণের কাছে ছড়িয়ে দেবার মত নয়।

সাহিত্য সম্বন্ধে একটি কথা বলব। আমাদের কতিপয় ইংরাজী গদ্য ও কবিতা-গ্রন্থ পড়তে হয়। বইগুলি যে চমৎকার, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ সাধন করতে বা তাদের সেবা করতে ইংরাজী সাহিত্যের জ্ঞান আমার সহায়ক হয় নি। ইংরাজী গদ্য ও পদ্যের যতটুকু আমি অধ্যয়ন করেছিলাম, তা না করলে যে আমি অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত হতাম—একথা আমি স্বীকার করতে অক্ষম। এর পরিবর্তে এই বহুমূল্য সাত বৎসরকাল যদি আমি গুজরাতী ভাষায় পারঙ্গম হবার প্রচেষ্টা করতাম এবং গণিত, বিজ্ঞান, সংস্কৃত ও অন্যান্য বিষয় যদি গুজরাতীর মাধ্যমে শিখতাম, তাহলে সহজেই আমি এইভাবে অর্জিত জ্ঞান আমার প্রতিবেশীর সঙ্গে বণ্টন করে নিতে পারতাম। আমি তাহলে গুজরাতী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে পারতাম এবং কে জানে স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি আমার অনুরাগ ও আমার প্রয়োগশীল স্বভাবের কারণ আমি হয়ত জনগণের সেবায় মহত্তর অবদান রেখে যেতে পারতাম।

আমি ইংরাজী ভাষা ও তার মহান্ সাহিত্য-সম্পদের নিন্দা করছি বলে যেন মনে না করা হয়। 'হরিজন' পত্রিকাই আমার ইংরাজী প্রেমের যথেষ্ট প্রমাণ। তবে ভারতবাসীদের কাছে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের মহত্ত্ব ইংলণ্ডের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বা দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মতই উপযোগী। ভারতবর্ষের জলবায়ু, নৈসর্গিক দৃশ্য এবং সাহিত্য—এই তিনটিই যদি ইংলণ্ডের তুলনায়

নিকৃষ্ট হয় তবুও এর দ্বারাই ভারতের বিকাশ হবে। আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আমাদের স্বকীয় ঐতিহ্য গড়ে তুলব। অপরের কাছ থেকে ধার করলে নিজেদের সম্পদ ক্ষীণ হবে। আমরা কোন মতেই বিদেশী আহার্য গ্রহণ করে পুষ্ট হতে পারি না। আমি চাই যে জাতীয় ঐতিহ্য সম্পদ তার ভাষায় বিধৃত থাকুক এবং এর জন্য প্রয়োজন বোধে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার সম্পদ আমাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিবেশিত হক। রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় স্বষ্টির রসাস্বাদন করার জন্য আমার বাঙলা ভাষা শেখার প্রয়োজন নেই। সুন্দর অনুবাদের সহায়তায় আমি এর আনন্দ পাই। টলস্টয়ের ছোট গল্প পাঠের আনন্দ পাবার জন্য গুজরাতী ছেলেমেয়েদের রুশভাষা শেখার প্রয়োজন নেই। ভাল অনুবাদ দ্বারা তারা টলস্টয়ের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হবে। ইংরেজ গর্ব করে থাকে যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-কীর্তি মূলগ্রন্থ প্রকাশের এক সপ্তাহের ভিতর সহজ ইংরাজীতে অনূদিত হয়ে জাতির হাতে পৌঁছে যায়। তাহলে শেক্সপিয়র ও মিল্টনের ভাবধারা ও রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আমি ইংরাজী শিখব কেন ?

জাতীয় প্রতিভার সাশ্রয় করার দৃষ্টি থেকে এমন একদল ছাত্রকে বিশেষ ভাবে তৈরী করা প্রয়োজন, যারা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাবলী অধ্যয়ন করনান্তর নিজ মাতৃভাষায় তার অনুবাদ করবে। আমাদের প্রভুরা আমাদের জন্য ভুল পথ নির্বাচন করেন এবং অভ্যাসের ফলে এখন ভ্রান্তিকেই সত্য মনে হচ্ছে।

লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর উপর আমাদের এই ভ্রান্ত অভারতীয়-করণের শিক্ষা ক্রমাগত বর্ধিত হারে যে ভীষণ অন্যায় ও অবিচার করছে, তার প্রমাণ আমি নিত্য পাচ্ছি। আমার পরম আদরণীয় বহু গ্রাজুয়েট সঙ্গী ও সহকর্মী নিজেদের অন্তরতম লোকের ভাব-প্রবাহকে ভাষায় ব্যক্ত করার কালে ছট্‌ফট্‌ করেন। তাঁরা নিজ গৃহে পরবাসী। নিজ মাতৃভাষার শব্দ-সম্পদ তাঁদের এত সীমীত

যে ইংরাজী শব্দ এবং এমন কি সময় সময় ইংরাজী ব্যাক্যের শরণ না নিলে তাঁরা তাঁদের বক্তব্য শেষ করতে পারেন না। ইংরাজী গ্রন্থ ছাড়া তাঁরা টিকে থাকতে পারেন না। নিজেদের মধ্যে তাঁরা ইংরাজীতেই পত্রালাপ করেন। এই পাপ কত গভীরে মূল অনুপ্রবিষ্ট করিয়েছে দেখাবার জন্য আমি আমার সঙ্গীদের উদাহরণ দিলাম। কারণ আমরা নিজেদের এইভাবে পরিবর্তিত করার জন্য সজ্ঞানে প্রযত্ন করেছি।

অনেকে এই যুক্তি দেখিয়ে থাকেন যে কলেজের ছাত্রদের ভিতর থেকে একজনও জগদীশ বসু সৃষ্টি হলে কলেজের কারণ যে বৌদ্ধিক অপচয় হয়, তার জন্য দুঃখ করার কারণ থাকবে না। এই অপচয় যদি অপরিহার্য হত, তাহলে আমি মুক্ত হৃদয়ে এ যুক্তি মেনে নিতাম। আমার মনে হয় আমি প্রমাণ করতে পেরেছি যে, এ দুর্বিপাক এড়ান যেত এবং এখনও এড়ান যায়। তা ছাড়া একজন বসু সৃষ্টি হলেই এ যুক্তি সমর্থনযোগ্য হয় না। কঠোর বাধা-বিপত্তি-জনক পরিস্থিতির মধ্যে তাঁকে কাজ করতে হয় এবং তৎসত্ত্বেও তিনি মাথা তুলে ওঠেন। তা ছাড়া তিনি যে জ্ঞান আহরণ করেন তা দেশের সর্বসাধারণের পক্ষে একপ্রকার অনধিগম্য। আমরা বোধ হয় এই কথা ভাবতে আরম্ভ করেছি যে ইংরাজী না জানলে আর কেউ জগদীশ বসুর মত হবার আশা করতে পারেন না। এর চেয়ে বিকট কুসংস্কারের কথা আমি কল্পনা করতে পারি না। কোন জাপানী নিজেকে আমাদের মত অসহায় বোধ করেন না।

অবিলম্বে যে কোন মূল্যে শিক্ষার মাধ্যমের পরিবর্তন সাধন করে প্রাদেশিক ভাষাসমূহকে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। প্রত্যহ যে মারাত্মক অপচয়ের স্তূপ জমে উঠছে, তার পরিবর্তে উচ্চশিক্ষা-ক্ষেত্রে আমি সামাজিক অরাজকতাকে আবাহন জানাব।

প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মর্যাদা ও বাজার-দর বৃদ্ধির জন্য আমার মতে প্রত্যেকটি প্রদেশের আদালতের কার্যকলাপ সেই প্রদেশবাসীর

ভাষায় পরিচালিত হওয়া উচিত। প্রাদেশিক ভাষাই সেই প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদে ব্যবহৃত ভাষা হবে এবং কোন প্রদেশে একাধিক ভাষা প্রচলিত থাকলে প্রতিটি ভাষা পরিষদে স্বীকৃতি পাবে। ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের আমি বলব যে, কথাবার্তায় প্রয়োগ করতে থাকলে মাসখানেকের ভিতরই তাঁরা নিজ প্রদেশের ভাষা সম্যক্ ভাবে বুঝতে পারবেন। জনৈক তামিল সামান্য চেষ্টা করলেই তামিল ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত তেলেগু, মালায়ালম্ এবং কন্নড় ভাষার সাধারণ ব্যাকরণ ও কয়েক শত শব্দ শিখে নিতে পারেন। কেন্দ্রে অবশ্য হিন্দুস্থানী মুখ্য স্থান পাবে।

আমার মতে এ প্রশ্ন পণ্ডিতদের দিয়ে সমাধান করাবার মত নয়। কোন এক স্থানের বালক-বালিকারা কোন্ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পাবে—তা তাঁরা স্থির করে উঠতে পারবে না। ছাত্ররা যে দেশের অধিবাসী, সেই দেশের প্রয়োজনানুসারে পাঠ্য বিষয় নির্ধারিত হবে। পণ্ডিতরা শুধু দেশের আকাঙ্ক্ষাকে সাধ্যমত সুচারুরূপে রূপদান করতে পারেন। এ দেশ সত্যকার স্বাধীনতা অর্জন করলে শিক্ষার মাধ্যমের প্রশ্নের সমাধান সুসঙ্গত ভাবে হয়ে যাবেই। পণ্ডিতরা তখন তদনুযায়ী পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করবেন ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করবেন। আজ যেমন প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির অবদানরা বিদেশী শাসকের প্রয়োজন পূর্তি করেন, তেমন স্বাধীন ভারতের শিক্ষার ফল মাতৃভূমির ডাকে সাড়া দেবে। আমার মনে গভীর শঙ্কা বিদ্যমান যে যতদিন পর্যন্ত আমাদের মত শিক্ষিত সমাজ এই সমস্যাকে নিয়ে খেলা করবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের ধ্যানের মুক্ত ও সবল ভারত সাকার হবে না। শিক্ষা, অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতি—এর প্রতিটি ক্ষেত্রে বন্ধন ভেঙ্গে অমিত প্রচেষ্টা দ্বারা আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে। প্রচেষ্টাই এই সংগ্রামের তিন-চতুর্থাংশ কার্যক্রম।

হরিজন, ৯-৭-১৯৩৮

১৬

দ্রুত ব্যবস্থা প্রয়োজন

ক্রমে ক্রমে নয়, অবিলম্বে যদি শিক্ষার মাধ্যমের পরিবর্তন সাধন করা যায়, তাহলে অত্যল্প কালের মধ্যেই আমরা দেখব যে প্রয়োজন-পূর্তির জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সৃষ্টি হয়ে গেছে। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে নিজ সংস্কৃতির পরিচয় পেতে গিয়ে জাতির সময় ও কর্মশক্তির যে মর্মন্তুদ অপচয় আমরা এ যাবৎ করেছি, আমরা যদি কাজের কাজ চাই, তবে এক বৎসর কালের মধ্যেই দেখব যে কিছুতেই আমরা এ জাতীয় অন্যায়ের ভাগীদার হতাম না। আদালতগুলির উপর প্রাদেশিক সরকারসমূহের যদি কর্তৃত্ব বা প্রভাব থাকে, তবে নিঃসন্দেহে সাফল্যের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে অবিলম্বে আদালতগুলিতে এবং সরকারী দপ্তরসমূহে প্রাদেশিক ভাষা প্রবর্তন করা। উদ্দিষ্ট সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা যদি আমরা অনুভব করি, তবে অচিরাৎ আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হতে পারে।

হরিজন, ৩০-৭-১৯৩৮

১৭

মাতৃ-ভাষা বনাম ইংরাজী

জনৈক শিক্ষাবিদ লিখেছেন ঃ

> "আপনি যদি সতর্ক না হন তাহলে দেখবেন যে শহরের বনিয়াদী শিক্ষা গ্রামের বনিয়াদী শিক্ষা থেকে পৃথক রূপ ধারণ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে শহরে মাতৃভাষার ক্ষতিসাধন করে ইংরাজী প্রবর্তন করা হবে এবং তার কারণ শহরের ছেলেদের ভিতর একটা উন্নাসিকতার মনোভাব সৃষ্টি হবে।"

আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আমার শিক্ষা-পরিকল্পনা গ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছিল এবং পরিকল্পনা রচনাকালে আমি বলেছিলাম যে একে শহরে প্রয়োগ করার সময় এতে কিছুটা হেরফের করতে হবে। ঐ কথা বলার সময় শহরে শিক্ষার মাধ্যম রূপে ব্যবহার্য ভিন্ন ধরনের শিল্পের কথা আমার মনে ছিল। আমি

কদাচ একথা ভাবি নি যে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ইংরাজীর কোন স্থান থাকবে। আর বনিয়াদী শিক্ষা এযাবত কেবল শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় নিয়েই আলোচনা করেছে। তবে একথা ঠিক যে এই প্রাথমিক পর্যায় হল বর্তমানের প্রবেশিকা মান থেকে ইংরাজী বাদ দিলে যা থাকে ততটা। শিশুদের উপর ইংরাজী চাপিয়ে দেওয়ার অর্থ হল তাদের স্বাভাবিক বিকাশের পথ অবরুদ্ধ করা এবং সম্ভবতঃ তাদের মৌলিকতাকেও বিনষ্ট করা। কোন একটা ভাষা শেখা মূলতঃ স্মৃতিশক্তিকে বিকশিত করার প্রক্রিয়া। শুরু থেকে ইংরাজী শেখা মানে শিশুর উপর অপ্রয়োজনীয় বোঝা চাপিয়ে দেওয়া। শৈশবে ইংরাজী শিখতে হলে মাতৃ-ভাষার জ্ঞান কুণ্ঠিত হতে বাধ্য। আমার মতে শহর ও গ্রাম—উভয় এলাকায় ছাত্রেরই নিজ নিজ বিকাশের আধার মাতৃ-ভাষার মজবুত ভিত্তি-ভূমির উপর রচিত হওয়া উচিত। একমাত্র আমাদের এই হতভাগ্য ভারতবর্ষেই কেবল এজাতীয় একটি প্রত্যক্ষ সত্যকে নূতন করে প্রমাণ করার প্রয়োজন ঘটে।

হরিজন, ৯-৯-১৯৩৯

১৮

সংস্কৃতের প্রতি উপেক্ষা

…আমি এ বিষয়ে….সহমত যে সংস্কৃতের পঠন-পাঠন শোচনীয় ভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে। আমি এমন এক যুগের মানুষ যেকালে প্রাচীন ভারতীয় ভাষার অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হত। আমি একথা মনে করি না যে এসব ভাষা অধ্যয়ন করার অর্থ সময় ও উদ্যমের অপচয়। আমার মতে প্রাচীন ভাষা পড়লে আধুনিক ভাষা-সমূহের অধ্যয়নে সহায়তা মেলে। আর ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সংস্কৃতের বেলায় একথা অপর যেকোন প্রাচীন ভাষার তুলনায় সত্য। প্রতিটি জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিরই তাই সংস্কৃত পড়া উচিত কারণ এর ফলে প্রাদেশিক ভাষাসমূহ অধ্যয়নের পথ সুগম হয়। এই ভাষাতে আমাদের পূর্বপুরুষগণ চিন্তা করতেন এবং লিখতেন। নিজ ধর্মের মূল

তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান পেতে হলে যে কোন হিন্দু ছেলে বা মেয়েকে কিছুটা সংস্কৃত জানতে হবে। গায়ত্রী মন্ত্র ইত্যাদির অনুবাদ হয় না। কোন অনুবাদই গায়ত্রীর মূল সুরের পরশ দিতে পারে না। কারণ আমার মতে মূল গায়ত্রীমন্ত্রের একটা নিজস্ব ব্যঞ্জনা আছে। আর আমি যা বলতে চাইছি তার সপক্ষে গায়ত্রী কেবল একটি উদাহরণ।

হরিজন, ২৩-৩-১৯৪০

১৯

মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিল্প শিক্ষা

মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিল্প শিক্ষা দেবার জন্য যে প্রভূত গবেষণা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন—গান্ধীজী এবম্বিধ অভিমতের নিন্দা করলেন। এই ভাবে তর্ককারীরা আমাদের গ্রামীণ ভাষার প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনা-শক্তি ও শব্দসম্ভার সম্বন্ধে অজ্ঞ। গান্ধীজীর মতে বহু ভাব ব্যক্ত করার জন্য, এমন কি পার্শীয়ান বা সংস্কৃতেরও দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন নেই। গান্ধীজী চম্পারণে থাকাকালীন দেখেছেন যে, একটি মাত্র বিদেশী শব্দ বা বাক্পদ্ধতির সাহায্য ব্যতিরেকেই তত্রস্থ গ্রাম্য জনতা কেমন অবাধে ও সাবলীল ভাবে নিজ ভাব ব্যক্ত করতে পারেন! তাঁদের সহস্র বুদ্ধির নিদর্শনস্বরূপ তাঁরা মোটর গাড়ীর পরিভাষা রূপে "হাওয়া গাড়ী" নামে যে শব্দটি ব্যবহার করেন, গান্ধীজী তার উল্লেখ করলেন।

হরিজন, ১৮-৮-৪৬

২০

হিন্দুস্থানী ও মাতৃ-ভাষা

গান্ধীজী মন্তব্য করলেন যে কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করে থাকেন যে রাষ্ট্রভাষার প্রসারের ফলে প্রাদেশিক ভাষাসমূহের ক্ষতি হবে। এ আশঙ্কার মূল অজ্ঞতার ভিতর। প্রাদেশিক ভাষাসমূহ সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি-স্বরূপ। এবং এরই আধারে জাতীয় ভাষার সৌধ রচিত হবে। এ দুটি পরস্পরের পরিপূরক। এরা কেউ কারও ঘাতক নয়।

হরিজন, ১৮-৮-৪৬

২১
ইংরাজীর সঠিক স্থান

ইংরাজী ভাষা তার ন্যায্য স্থানে থাকলে আমি এ ভাষার পূজারী; কিন্তু যে স্থান এর প্রাপ্য নয়, সেখানে বলপূর্বক অধিষ্ঠিত হলে আমি ঘোরতর ইংরাজী বিরোধী। ইংরাজী আজ নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক ভাষা। সুতরাং ইংরাজীকে আমি দ্বিতীয় ঐচ্ছিক ভাষার মর্যাদা দিতে প্রস্তুত আছি। তবে মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়ে নয়, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ইংরাজীর স্থান হবে। অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ ছাত্রের উপর এ ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবে না, অল্পসংখ্যক বাছাই করা ছাত্র এ ভাষা অধ্যয়ন করবে। আজ আমাদের যখন এমনি প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তন করার সঙ্গতি নেই, তখন ইংরাজী শেখার ব্যয় নির্বাহ করার প্রশ্ন ওঠে কোথা থেকে? রাশিয়া ইংরাজী ছাড়াই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রগতি করেছে। ইংরাজী ছাড়া আমাদের চলবে না বলে ভাবা মানসিক দাসত্বের পরিচায়ক। কিছুতেই আমি এই জাতীয় পরাজিত মনোবৃত্তির সঙ্গে সহমত হতে পারি না।

হরিজন, ২৫-৮-৪৬

২২
রোমান লিপি

উর্দু এবং নাগরী লিপির পরিবর্তে রোমান লিপি প্রবর্তন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এ প্রস্তাব যতই চিত্তাকর্ষক মনে হক না কেন, আমার মতে এই পুনঃসংস্থাপন কার্য এক মারাত্মক ভ্রম বলে প্রমাণিত হবে এবং আমাদের অবস্থা ভাল হবার পরিবর্তে মন্দ হবে।

হরিজন, ২৩-৩-৪৭

পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ শিক্ষকদের প্রতি

১

শিক্ষকের লক্ষণ

...শিক্ষক হবেন চুম্বকের মত। ছেলেরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবে। তিনি এমন হবেন যাতে ছেলেরা তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়তে না চায়। অল্প সময়ের জন্যও তাঁকে ছেড়ে যাওয়া ছেলেদের অসহ্য মনে হবে। ছেলেদের মা বাবা এরকম শিক্ষককে উপেক্ষা করতে পারবেন না। শিক্ষক যদি ধনী হয়ে ওঠেন তাহলে তাঁকে চোর মনে করা হবে। পক্ষান্তরে তিনি যদি নিজের খরচ চালাতে অক্ষম হন এবং তাঁকে যদি বাধ্য হয়ে উপবাসী থাকতে হয় তাহলে তাঁকে বোকা বলতে হবে।

নবজীবন, ২৭-৭-১৯২৪

২

শিক্ষার উপকরণ

দেশের সাত লক্ষ গ্রামে কি ভাবে সরকার উপযুক্ত বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করবে? এই সাত লক্ষ গ্রামের ভিতর তিন লক্ষ গ্রামে কোন বিদ্যালয়ই নেই। অবস্থা যখন এমন শোচনীয় তখন সরকারী বিদ্যালয় খুলে লাভ কি? বিদ্যালয়ের বাড়ীঘর ছাড়াও আমাদের কাজ চলবে, শুধু চাই চরিত্রবান শিক্ষক। প্রাচীনকালের গুরুরা এইরকম শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা ভিক্ষার দ্বারা সংসার প্রতিপালন করে শিক্ষাদান কার্য করতেন। ভিক্ষায় যেটুকু গোধূমচূর্ণ পেতেন তাতেই তাঁরা চালিয়ে নিতেন। অবশ্য পেলে তাঁরা ঘৃতও নিয়ে আসতেন। যেখানে শিক্ষক ভাল জুটত না সেখানকার শিক্ষাও সন্তোষজনক হত না। আর শিক্ষক ভাল হলে শিক্ষার মানও হত উচ্চ। সেই জাতের শিক্ষক আজ অদৃশ্য। কেবল ভাল ঘরবাড়ী হলে শিক্ষার মান উন্নত হয় না।

নবজীবন, ৩-৮-১৯২৪

৩

শিক্ষকের মর্যাদা

...শিক্ষকরা স্বয়ং অথবা জনসাধারণ—কেউই শিক্ষকদের মূল্য বোঝেন না। বেতনের ভিত্তিতে লোকে শিক্ষকদের মূল্যায়ন করে থাকে। আর তাঁদের বেতন কেরানীদের চেয়েও কম বলে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী শিক্ষকদের মর্যাদা কেরানীর চেয়েও কম।...

অতএব শিক্ষকদের মর্যাদাবৃদ্ধির উপায় কি? সাত লক্ষ গ্রামের সাত লক্ষ শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করা কি সম্ভব? বাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে যদি এটা সম্ভবপর না হয় তাহলে অপর একটি বিকল্প প্রস্তাব হল সীমিত সংখ্যক গ্রামে ভাল বেতন দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা এবং বাদ বাকী গ্রামে শিক্ষার ব্যবস্থা না রাখা। প্রত্যুত ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের গোড়া থেকে এই-ই আমরা করেছি। আর আমার বিশ্বাস যে এত দিনে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এ পদ্ধতি ভ্রান্ত। সুতরাং আমাদের এমন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে যাতে সব গ্রামে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। এর জন্য যা করণীয় তা হল এই যে বেতনের ভিত্তিতে শিক্ষকদের মর্যাদার পরিমাপ করলে চলবে না। আর শিক্ষকরাও শিক্ষাকে তাঁদের জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করবেন—পরিশ্রমের বিনিময়ে কি পাচ্ছেন সেটা তাঁদের কাছে গৌণ হবে। সংক্ষেপে শিক্ষা দেওয়া শিক্ষকের কর্তব্য বা ধর্ম হবে, যা তাঁর পক্ষে অবশ্য পালনীয়। যে শিক্ষক এই যজ্ঞ সম্পাদন ব্যতিরেকে অন্ন গ্রহণ করেন তিনি তস্কর রূপে পরিগণিত হবেন। এরকম করলে দেশে শিক্ষকের অভাব হবে না এবং তাঁদের মর্যাদাও লক্ষগুণ বৃদ্ধি পাবে। কেবল দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন সংসাধন করতে পারলে প্রতিটি শিক্ষক আজই এই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন।

নবজীবন, ১০-৮-১৯২৪

৪
দুটি প্রশ্ন

কচ্ছ থেকে জনৈক শিক্ষক আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন যার উত্তর এখানে দিচ্ছি।...

"আমি একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক। শিক্ষকের যতটা চরিত্রগুণ, সত্য প্রেম ও ব্রহ্মচর্য-নিষ্ঠা থাকা উচিত আমার তা নেই, যদিও তার জন্য আমি চেষ্টা করছি। এছাড়া আমার বাবা ঋণগ্রস্ত। এমতাবস্থায় আপনি কি আমাকে পদত্যাগ করার পরামর্শ দেন?"

আমি বিশ্বাস করি যে যথেষ্ট চরিত্রবল না থাকলে আপনার শিক্ষকতা ছেড়ে দেওয়াই ভাল। তবে সব ক্ষেত্রের মত এখানেও বিচার-বিবেচনার অবকাশ আছে। এই সব ত্রুটি সংশোধন হবার সম্ভাবনা যদি থাকে তাহলে পদত্যাগের প্রয়োজন নেই। পৃথিবীতে কেউ-ই নিষ্কলঙ্ক নয়। আজকাল শিক্ষকদের ভিতর বিশেষ সচ্চরিত্রতা দেখা যায় না। কেউ যদি সচেতন ভাবে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করেন এবং নিজেকে উন্নত করার জন্য যদি প্রতিনিয়ত প্রয়াস পান তাহলেই তাঁর সন্তোষ বোধ করা উচিত। তবে এসব ক্ষেত্রে চিন্তা করে যা উচিত তা-ই করতে হবে।

আপনার বাবার ঋণের প্রশ্নটি সহজ। ন্যায়তঃ যে ঋণ নেওয়া হয়েছে তা পরিশোধ করতে হবে। শিক্ষকের কাজ করে যদি এ ঋণ পরিশোধ করা সম্ভবপর না হয় তাহলে কোন অপেক্ষাকৃত বেশী বেতনের চাকুরী নিয়ে অথবা ব্যবসা করে এই ঋণ পরিশোধ করা উচিত।

"আমি বিশ্বাস করি যে চূড়ান্ত শাস্তির দ্বারা কারও উন্নতি হয় না। আমার এই বিশ্বাস সত্ত্বেও যদি আমি আমার ছাত্রদের শাস্তি দিই তাহলে একে আমার হিংস আচরণের নিদর্শন বলে মনে করা হবে, না অপর কিছু? প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাদের দৈহিক শাস্তি দেবেন জেনেও যদি আমি দুষ্টু অথবা বোকা ছাত্রদের নিজে শাস্তি না দিয়ে তাঁর কাছে পাঠাই, তাহলে আমাকে হিংস আচরণের অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করা হবে কি না?"

স্বয়ং নিজে শাস্তি দিন অথবা শাস্তির জন্য প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কাছে পাঠান, ছাত্রদের শাস্তি দেওয়া অবশ্যই হিংসাচরণ। শিক্ষক কোন ছাত্রকে আদৌ শাস্তি দেবেন কিনা প্রশ্নটিতে তা সুস্পষ্ট ভাবে জিজ্ঞাসা না করা হলেও তা মূল প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত। আমি এমন অবস্থার কথা কল্পনা করতে পারি যখন কোন বালককে শাস্তি দেওয়া মানুষের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। জেনে শুনে কোন বালক যদি অন্যায় করে থাকে তাহলে এমনি অবস্থার উদ্ভব হয়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কোন্ পন্থা অবলম্বন করতে হবে তা শিক্ষককে স্বয়ং স্থির করতে হবে। তবে সাধারণ নীতি হল এই যে শিক্ষক কখনও ছাত্রদের চূড়ান্ত শাস্তি দেবেন না। আদৌ যদি শাস্তি দিতে হয় তবে সে অধিকার আছে ছেলের মা-বাবার। ছাত্র যদি স্বেচ্ছায় শাস্তি গ্রহণ করে তাহলেই কেবল শাস্তিকে ন্যায়সঙ্গত বলা যেতে পারে। তবে এরকম অবস্থা সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু তার ন্যায়সঙ্গততা সম্বন্ধে তিল মাত্র সন্দেহের অবকাশ দেখা দিলে আর শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। সর্বশেষে বলব ক্রোধপরবশ হয়ে কোন শাস্তি দেওয়া সমীচীন নয়।

নবজীবন, ২৭-৯-১৯২৫

৫

শিক্ষকদের ভূমিকা

“সনাতন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবক্তারা ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষকদের প্রতি একটা আনুগত্য-ভাবনার সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা করেন। ছাত্রদের মনে তাঁরা এই কথা গেঁথে দেবার চেষ্টা করেন যে অন্য কোনো উপায়ে নয় একমাত্র গুরুকে সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন করে বিদ্যার্জন করা সম্ভবপর। ছাত্র যদি গুরুর প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন না করে বা তাঁর উপযুক্ত সেবা না করে তাহলে শিক্ষক রুষ্ট হন এবং সেক্ষেত্রে তিনি ছাত্রের সব জ্ঞান কেড়ে নিতে পারেন। সেই ভীষণ পরিণামের হাত এড়ানর জন্য ছাত্রের কর্তব্য হল শিক্ষককে তুষ্ট করা। গুরুভক্তির এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত ?”

আমি গুরুভক্তিতে বিশ্বাসী। তবে প্রত্যেক শিক্ষকের গুরু হবার ক্ষমতা নেই। এই অর্থে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক এলাকার অন্তর্ভুক্ত এবং স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এর জন্ম। যাই হক ব্যাপারটা কৃত্রিম নয় অথবা কোন বাহ্য চাপ দ্বারা এটা সৃষ্টি করা যায় না। ভারতবর্ষে এখনও এরকম শিক্ষক আছেন। (এখানে নিশ্চয় এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই যে আমি আধ্যাত্মিক শিক্ষকদের কথা বলছি না যাঁরা তাঁদের অনুগামীদের মোক্ষের পথে চালনা করেন) এ জাতীয় শিক্ষকরা তোষামোদের ধার ধারেন না। তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই ছাত্রদের শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন এবং নিজের ছাত্রদেরও তাঁরা স্বভাবতই ভালবাসেন। এই অবস্থায় শিক্ষক সর্বদাই জ্ঞান দানে প্রস্তুত এবং ছাত্রও অনুরূপ ভাবে গ্রহণ করার জন্য তৈরী। সাধারণ বিষয় আমরা যে কোন লোকের কাছ থেকে শিখতে পারি। উদাহরণ-স্বরূপ কোন ছুতার মিস্ত্রি, যার সঙ্গে আমার কোন রকম সাযুজ্য নেই এবং যার হয়ত বহুবিধ দোষ-ত্রুটি আছে, তার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারি। কোন দোকানদারের কাছ থেকে আমি যেমন প্রয়োজনীয় জিনিস কিনি ঐ ছুতার-মিস্ত্রিটির কাছ থেকেও আমি তেমনি আমার দরকারী জ্ঞানটুকু কিনে নিই। অবশ্য এখানেও এক ধরনের বিশ্বাসের প্রয়োজন। যে ছুতার-মিস্ত্রির কাছ থেকে আমি সূত্রধর-বিদ্যা শিখতে চাই এই বিদ্যায় তার জ্ঞান সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস থাকা দরকার। এই বিশ্বাস আমার না থাকলে আমি যে কিছুই শিখতে পারব না একথা স্পষ্ট। কিন্তু শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা এক ভিন্ন জিনিস। শিক্ষার লক্ষ্য যেখানে চরিত্রগঠন সেখানে এই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ অপরিহার্য। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাভাব না থাকলে চরিত্রগঠন দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

"সত্যি কথা বলতে কি আজকাল শিক্ষকদের কাজ ডাক-পিওনের বেশী নয়। শিক্ষকদের কাজ কেবল ছাত্রদের ভাল ভাল লেখকের নির্বাচিত পুস্তক জোগাড় করে দেওয়া এবং এইটুকু দেখা যে ছাত্ররা সেগুলিকে কাজে লাগায়। এর চেয়ে বেশী আর কি শিক্ষকরা করবেন অথবা জানবেন?

"বিদ্যালয়সমূহে যেভাবে শিক্ষাদান করা হয় তাতে মনে হবে যে যিনি কেবল দুরূহ বাক্যসমূহের অর্থ বুঝিয়ে দিতে পারেন এবং ছাত্রদের সুবিধার জন্য দীর্ঘ অনুচ্ছেদসমূহের সারমর্ম বলে দিতে পারেন তিনিই বুঝি শিক্ষক। শিক্ষকদের সম্বন্ধে প্রচলিত এই ধারণা আমরাও কেন গ্রহণ করব না?"

পাঠ্যপুস্তক যতই ভাল হক না কেন আমার মতে তবুও ভাল শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা থেকে যাবে। কেবল দীর্ঘ অনুচ্ছেদগুলির সারমর্ম বলে দিয়ে অথবা দুরূহ বাক্যসমূহের অর্থ করে দিয়ে তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। প্রয়োজন বুঝলেই তিনি পাঠ্যপুস্তক এক দিকে রেখে দিয়ে ভাল চিত্রকরের মত পড়ানর বিষয়কে ছাত্রের কাছে জীবন্ত করে তুলবেন। ভাল পাঠ্য-পুস্তক বড় বেশী হলে ভাল ফটোগ্রাফের মত। কিন্তু একেবারে উচ্চকোটির না হওয়া সত্ত্বেও যেমন চিত্রকরের হাতে আঁকা ছবি সেরা ফটোগ্রাফের চেয়েও ভাল, তেমনি ভাল শিক্ষক সেরা পাঠ্যপুস্তকসমূহের চেয়েও মূল্যবান। ভাল শিক্ষক ছাত্রকে বিষয়ের মর্মমূলে নিয়ে যান, অধিতব্য বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রের মনে ভালবাসা সৃষ্টি করতে এবং ছাত্রকে স্বয়ং বুদ্ধিপূর্বক তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করেন। আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি কখনও আমরা এই বহুল-প্রচারিত ধারণা স্বীকার করে নেব না যে যিনি দীর্ঘ অনুচ্ছেদসমূহের সারমর্ম বলতে পারেন অথবা দুরূহ বাক্যসমূহের ব্যাখ্যা করতে পারেন তিনিই শিক্ষক। আমাদের প্রচেষ্টা হবে এমন সব ভাল শিক্ষক তৈরী করা যাঁদের লক্ষ্য কেবল নিজ নিজ বিষয়ের একটু একটু তথ্য ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা নয়, তাঁদের লক্ষ্য হবে সেবার মহত্তর ও বৃহত্তর আদর্শ। বিরল সংখ্যাতে হলেও এরকম শিক্ষক যে একেবারে নেই—সেকথা বলা চলে না।

নবজীবন, ৩-৬-১৯২৮

৬

শাস্তিদান প্রসঙ্গে

বিনয় মন্দিরের (জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়) জনৈক শিক্ষক প্রশ্ন করেছেন ঃ

১. বিদ্যালয়ের বিশেষ করে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চূড়ান্ত শাস্তি দেবার কি কোন যৌক্তিকতা আছে ?

২. কোন কোন শিক্ষক বলেন ঃ "পড়াশুনায় ত্রুটি-বিচুতি হলে ছেলেদের শাস্তি না দিতে পারি। কিন্তু ছেলেরা বদমায়েশী অথবা নৈতিক অপরাধ করলে তাদের শাস্তি দেওয়ায় কোন দোষ নেই।" এ অভিমত কি যথার্থ ?

৩. কোন কোন বন্ধু বলেন যে কখনও কখনও তাঁরা ছেলেদের ভালর জন্য শাস্তি দিয়ে থাকেন। তবে শাস্তি দেবার পর তাঁরা এর জন্য দুঃখও বোধ করেন। সুতরাং তাঁদের মতে এই সব ক্ষেত্রে তাঁদের কোন দোষ হয় না। যেসব শিক্ষক ছাত্রদের সাজা দেবার পর এই জাতীয় কৈফিয়ত দেন তাঁদের কি আমরা ক্ষমা করতে পারি ?

৪. প্রহার ছাড়া আর কোন্ ধরনের শাস্তি জাতীয় বিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত ?

৫. কোন্ ধরনের শাস্তি দিলে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক অহিংসার শপথ ভঙ্গ করছেন বলা হবে ?

আমার অভিমত হল এই যে ছাত্রদের যে কোন ধরনের শাস্তি দেওয়াই অন্যায়। শিক্ষকদের মনে ছাত্রদের সম্বন্ধে যে ভালবাসার ভাব ও গর্ববোধ থাকা উচিত শাস্তিদানের ফলে তা হ্রাস পায়। ছাত্রদের শিক্ষা দেবার জন্য প্রাচীন কালে যে শাস্তিদান প্রথা ছিল, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে তা দ্রুত অদৃশ্য হচ্ছে। আমি জানি যে সময় সময় এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যখন সবচেয়ে ভাল শিক্ষকও দুষ্কৃতিকারী ছাত্রকে শাস্তি না দিয়ে পারেন না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এজাতীয় ঘটনা কদাচিৎ ঘটে এবং যাই হক না কেন, ব্যাপারটিকে সমর্থন করা যায় না। কোন শিক্ষক যদি শাস্তি দিতে বাধ্য হচ্ছেন

বলে মনে করেন তাহলে বুঝতে হবে যে নিজ বৃত্তির ক্ষেত্রে তাঁর ঐ পরিমাণ ত্রুটি আছে। স্পেন্সার-এর মত শিক্ষাবিদ্ সর্বদা নিজ অভিমতে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকতে না পারলেও সকল প্রকারের শাস্তিদান প্রথাকে অন্যায় বলে মনে করতেন।

উপরিউক্ত উত্তর দেবার পর আমার মনে হয় যে অপর প্রশ্নগুলির পর্যালোচনা নিরর্থক।

সাধারণতঃ অহিংসা ও শাস্তিদান প্রথা এক সঙ্গে চলতে পারে না। তবে আমি এমন সব পরিস্থিতির কথা কল্পনা করতে পারি শাস্তিদান যখন শাস্তিদান হয় না। তবে সেসব উদাহরণ শিক্ষকদের কাজে লাগবে না। উদাহরণ-স্বরূপ কোন পিতা যদি তাঁর পুত্রের অসদাচরণের জন্য খুব দুঃখিত হন এবং সেই দুঃখ বরদাস্ত করতে না পেরে ছেলেকে প্রহার করেন তাহলে তাঁর সেই প্রহারকে অক্লেশে ভালবাসার শাস্তি বলা যেতে পারে। ছেলেটিও পিতার এরূপ আচরণকে হিংসা বলে মনে করবে না। সময় সময় বিকারগ্রস্ত রোগীর পরিচর্যায় নিযুক্ত ব্যক্তিকে রোগীকে আয়ত্তে রাখার জন্য চপেটাঘাত করতে হয়। একেও হিংসা বলা যায় না, এ হল অহিংসা। তবে শিক্ষকদের কাছে এসব উদাহরণের অর্থ নেই। তাঁরা ছাত্রদের শৃঙ্খলাধীনে আনার কলা আয়ত্ত করবেন এবং শাস্তি না দিয়ে তাদের শিক্ষা দিতে শিখবেন। এমন অনেক শিক্ষকের উদাহরণ আছে যাঁরা জীবনে কখনও শাস্তি দেন নি। প্রহার ছাড়া শাস্তিদানের অপরাপর পদ্ধতি হল : ছাত্রদের দাঁড় করিয়ে রাখা, তাদের উঠবস করান, তাদের গালিগালাজ করা ইত্যাদি। আমার মতে শিক্ষক এর কোন শাস্তিই ছাত্রের উপর প্রয়োগ করবেন না।

ছাত্রদের উন্নতিবিধানের জন্য প্রথমে তাদের শাস্তি দেওয়া ও তারপর দুঃখিত হওয়াকে যথার্থ অনুতাপ বলা চলে না। তাছাড়া শিক্ষকেরা যদি এই প্রথা অবলম্বন করেন এবং এতদানুযায়ী আচরণ করেন তাহলে শেষ অবধি সমাজের সর্বসাধারণের কাছে এটা

আচরণবিধির মর্যাদা পাবে। শাস্তিদান প্রথার কারণ আমরা এই অলীক বিশ্বাসের পরবশ হয়েছি যে হিংসা প্রয়োগে কারও উন্নতি-বিধান করা যায়। আমার মতে যে শিক্ষক স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ছাত্রদের শাস্তি দেন তিনি তাঁর অহিংস আচরণের শপথ ভঙ্গ করেন।

নবজীবন, ২১-১০-১৯২৮

৭
বাধ্যতামূলক শিক্ষকতা

শিক্ষিত পুরুষ ও নারীদের বাধ্যতামূলক ভাবে শিক্ষকতার কাজে নিয়োগ করার যে প্রস্তাব…অধ্যাপক কে. টি. শাহ্ করেছেন, আমি তা পছন্দ করি। এ জাতীয় নর-নারীদের বছর পাঁচেকের জন্য যে বিষয়ে তাঁরা শিক্ষা দিতে সক্ষম সেই বিষয়ের শিক্ষকতার কাজে লাগান যেতে পারে। তার ব্যয় নির্বাহের জন্য দেশের সামান্য আথিক স্তরের অনুরূপ বেতন তাঁদের দেওয়া যেতে পারে। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা যে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ দাবী করেন তার অবসান ঘটাতে হবে। গ্রামের বর্তমান শিক্ষকদের পরিবর্তে অধিকতর যোগ্য শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে।

হরিজন, ৩১-৭-১৯৩৭

৮
মহিলাদের প্রতি

সম্মেলনের জনৈক বক্তার মতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার ব্যাপারে নারীরা পুরুষদের তুলনায় অধিকতর যোগ্য। নারীদের মধ্যেও আবার কুমারীদের চেয়ে মাতাদের যোগ্যতা বেশী। অপর একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও তাঁরা অধ্যাপক শাহ্-এর বাধ্যতামূলক শিক্ষকতা-পরিকল্পনায় পুরুষদের তুলনায় ভাল ভাবে সাড়া দিতে সক্ষম। দেশপ্রেমী যেসব মহিলাদের অবসর আছে তাঁদের কাছে

এ একটি মহান্ সেবার সুযোগ এবং এ সেবাকার্য সর্বাপেক্ষা মহান্। এর জন্য যাঁরা এগিয়ে আসবেন তাঁদের একটা ভালমত প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিতে হবে। অভাবগ্রস্ত যেসব মহিলা জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁরা এ আন্দোলনে যোগ দিলে কোন কাজ হবে না। যেসব মহিলা এ পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য এগিয়ে আসবেন তাঁদের প্রেরণা হবে নিছক সেবাভাব এবং একে তাঁরা জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করবেন। স্বার্থপ্রেরণা-প্রণোদিত হয়ে একাজে আত্মনিয়োগ করলে তাঁরা ব্যর্থ এবং দুরন্ত হতাশার কবলিত হবেন। ভারতবর্ষের সংস্কৃতিসম্পন্ন মহিলারা যদি গ্রামবাসীদের সঙ্গে একাত্ম হন এবং বিশেষ করে গ্রামবাসীর শিশুদের কেন্দ্র করে যদি এই সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, তাহলে তাঁরা ভারতবর্ষের গ্রামজীবনে এক নিঃশব্দ অথচ মহান্ বিপ্লবের জন্ম দেবেন। তাঁরা কি এ ডাকে সাড়া দেবেন ?

হরিজন, ৩০-১০-১৯৩৭

৯

বনিয়াদী শিক্ষার শিক্ষক

অধ্যাপক তাও জানালেন যে কৃষকদের শিক্ষা দেবার কাজ করার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বভার পরিত্যাগ করেছেন এবং বনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি গভীর ভাবে আগ্রহশীল। তিনি প্রশ্ন করলেন, "পরিকল্পনাটির মূল তত্ত্ব কি ?"

"এর মূল কথা হল কোন গ্রামীণ শিল্পের শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর ভিতর যে পূর্ণাঙ্গ পুরুষ বা নারীটি সুপ্ত রয়েছে তাকে জাগিয়ে তোলা।"

অধ্যাপক তাও বললেন যে এ ব্যাপারে তো শিক্ষক পাবার সমস্যা রয়েছে। গান্ধীজী হেসে বললেন যে আমাদেরও তো সেই অসুবিধা। অধ্যাপক তাও প্রশ্ন করলেন, "উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত শিক্ষকদের

কি আপনি হাতের কাজ শেখাবেন না শিল্পী ও কারিগরদের শিক্ষাকলা শেখাবেন ?”

গান্ধীজী উত্তরে বললেন, “গড়পড়তা শিক্ষিত কোন মানুষ সহজেই কোন হাতের কাজ শিখে নেবেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ধরুন আপনার মত শিক্ষিত ব্যক্তি যত সহজে সূত্রধরের কাজ শিখতে পারবেন, আমাদের কারিগরদের প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগবে।”

অধ্যাপক তাও বললেন, “কিন্তু আমাদের শিক্ষিত লোকেরা তো মোটা মাইনের চাকুরির পিছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের কিভাবে এপথে আনা যায় ?”

“পরিকল্পনাটি যদি যুক্তিযুক্ত হয় এবং শিক্ষিত সমাজের মনে ধরে তাহলে এর ভিতর একটা নিজস্ব আকর্ষণ-শক্তি থাকবে এবং এই ভাবে শিক্ষিত যুবকদের সোনার মোহ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে সক্ষম হবে। আর শিক্ষিত যুবকদের ভিতর যথোচিত স্বদেশপ্রেমের ভাবনা সৃষ্টি করতে না পারলে এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। আমাদের একটি সুবিধা আছে। ভারতীয় ভাষাসমূহের মাধ্যমে যাঁরা শিক্ষা পেয়েছেন তাঁদের কলেজে ঠাঁই হয় না। হতে পারে যে তাঁরা এ পরিকল্পনাটিকে আকর্ষণীয় মনে করবেন।”

হরিজন, ২৭-৮-১৯৩৮

১০
শিক্ষকতার প্রেরণা

নয়ী তালিমের শিক্ষক নিছক বেতনের খাতিরে কারিগর ও শিক্ষাব্রতী হবেন না। বেতন বা মাইনে শব্দটি ভাল নয়। তিনি এমন একজন কারিগর যিনি তাঁর পারিশ্রমিক পাবার উপযুক্ত। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানেরাও তাঁরই মত শ্রমিক হবেন। একমাত্র এই ভাবেই যথার্থ সমবায়ের জন্ম হতে পারে। একমাত্র এই ভাবেই ভারতবর্ষের সব গ্রামে নয়ী তালিমের প্রসার ঘটতে পারে।

হরিজন, ৯-১১-১৯৪৭

ষোড়শ অধ্যায়ঃ ছাত্রসমাজ

১

ছাত্রদের ধর্ম

ছাত্রদের ধর্ম বা কর্তব্য সম্বন্ধে আজ আমাকে বলতে হবে। ধর্ম যতটা সহজ ততটাই আবার কঠিন। হিন্দুমতে ছাত্র হচ্ছে ব্রহ্মচারী এবং ছাত্রাবস্থা ব্রহ্মচর্যাশ্রম। কৌমার্য-ব্রত পালন করা ব্রহ্মচর্যের সংকীর্ণ অর্থ। এর মূল অর্থ হচ্ছে ছাত্রাবস্থা বা ছাত্রের জীবন। তার মানে হল ইন্দ্রিয়-সংযম। সংযতেন্দ্রিয় হয়ে সমগ্র অধ্যয়নকালে জ্ঞানার্জন করার নামই ব্রহ্মচর্য। জীবনে এইভাগে প্রতিগ্রহের পরিমাণ বেশী, দান অল্প। এ সময় আমরা মূলতঃ গ্রহীতা। পিতামাতা, অধ্যাপকবর্গ এবং এই বিশ্বের কাছ থেকে যা পাই গ্রহণ করি। কিন্তু গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এখনই যদি প্রতিদানের দায়িত্ব না থাকে, (আর তা নেইও) তাহলে স্বভাবতই ভবিষ্যতে সময় এলে এ ঋণ চক্রবৃদ্ধি সুদসহ পরিশোধ করতে হবে। এই কারণেই হিন্দুরা ধর্মীয় কর্তব্যবোধ দ্বারা চালিত হয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালন করেন।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থেকে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর জীবন সমঅর্থ-সূচক। ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মচারী হতে হলে সন্ন্যাসী হতেই হবে। সন্ন্যাসীর কাছে এটা অভিরুচির প্রশ্ন। হিন্দুধর্মের চতুর্বিধ আশ্রমের আজ আর সে পবিত্র মর্যাদা নেই। থাকলে, এর শুধু আজ নামটুকুই আছে। অঙ্কুরেই ছাত্র ব্রহ্মচারীর জীবনকে বিষাক্ত করে দেওয়া হয়। সেই প্রাচীন আশ্রম-প্রথার আজ অবশ্য এমন কিছু অবশিষ্ট নেই, যা বর্তমান যুগের যুবক-যুবতীদের সামনে অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য আদর্শরূপে তুলে ধরা যেতে পারে। তথাপি সে যুগে যে মূল উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আশ্রমব্যবস্থার জন্ম হয়েছিল তার পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

এযুগে ছাত্রদের কর্তব্য জানার উপায় কি? আদর্শ থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি। ছাত্রদের ভ্রান্তপথে পরিচালিত করার নেতৃত্ব নেন পিতামাতা। তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের সন্তানকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সামনে অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জনের পথ খুলে দেওয়া। এইভাবে শিক্ষা ও জ্ঞানের ব্যভিচার চলছে এবং বৃথাই আমরা ছাত্রজীবনের শান্তি, সারল্য ও মাধুর্য খুঁজে বেড়াচ্ছি। যে সময় আমাদের ছাত্রসম্প্রদায়ের কোন কারণেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কথা নয়, সে সময় চিন্তা-ভাবনার ভারে তাদের ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। অধ্যয়নকাল তাদের কাছে শুধু গ্রহণ ও অধীত বিষয় নিজের করে নেবার সময়। তারা এ সময় শুধু গ্রহণীয় আর বর্জনীয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে শিখবে। শিক্ষকদের কর্তব্য হচ্ছে ছাত্রকে এইভাবে পার্থক্য করতে শেখানো। নির্বিচারে আমরা যদি সব গ্রহণ করে চলি তাহলে আমরা যন্ত্রের চেয়ে উঁচুদরের কিছু হব না। আমরা চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমান জীব। সেইজন্য এই সময়ে সত্য ও অসত্য, মিষ্ট ও রূঢ় ভাষা, পবিত্র ও অপবিত্র জিনিস ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য করতে শিখব। কিন্তু ছাত্রদের চলার পথ আজকে শুধু ভালমন্দ বিচার করার চেয়ে অনেক কঠিন দায়িত্বে পূর্ণ। আজকের ছাত্রদের বিরূপ পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। ঋষি-গুরুর আশ্রমের পূত পরিবেশের পরিবর্তে আজ তারা শতধাবিচ্ছিন্ন গৃহ ও আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিসঞ্জাত কৃত্রিম পরিবেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঋষিরা বই ছাড়াই ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। ঋষিরা ছাত্রদের কয়েকটি মন্ত্র দিতেন এবং ছাত্ররা সেগুলিকে বহু মূল্য-বান জ্ঞানে অন্তরে ধারণ করে বাস্তব-জীবনে তদনুযায়ী চলার চেষ্টা করতো। আজকের ছাত্রদের এত বিপুল সংখ্যক পুস্তকের মধ্যে থাকতে হয় যে সেগুলি তার শ্বাসরোধ করার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের কালে ছাত্রমহলে "রেনল্ডসের" লেখা খুব জনপ্রিয় ছিল; কিন্তু আমি ভাল ছেলের ধার ঘেঁষেও না যাওয়ায় স্কুলপাঠ্য বইএর

বাইরে তাকাই নি। তবে ইংলণ্ডে গিয়ে দেখলাম যে ভদ্রসমাজে এসব উপন্যাস অস্পৃশ্য এবং ওসব না পড়ে আমার কোন লোকসান হয় নি। এইরকম আরও অনেক ব্যাপার আছে যা ছাত্ররা অক্লেশে বাতিল করতে পারে। এই জাতীয় একটি ব্যাপার হচ্ছে নিজ ভবিষ্যৎ গড়ার অশোভন ব্যগ্রতা। এ সম্বন্ধে ভাববে গৃহস্থ। ব্রহ্মচারী ছাত্রের ধর্ম এ নয়। তাকে নিজ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে, সামনে যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ, তার ব্যাপকতা তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে তাকে অবহিত হতে হবে। আমার মনে হয় আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ সংবাদপত্র পড়েন। এ অভ্যাস একেবারে ত্যাগ করতে বলা আমার উচিত নয় বলে আমি মনে করি। তবে স্বল্পকালীন গুরুত্বের সব কিছু আপনারা না পড়েন সে কথা আমি আপনাদের বলব এবং আমার মনে হয় সংবাদপত্রে স্থায়ী গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কিছু থাকে না। চরিত্র গঠনের উপাদান এতে কিছুই পাওয়া যায় না। তবুও সংবাদপত্রের জন্য দেশবাসীর উন্মত্ততার বিষয়ে আমি জানি। এ এক করুণ আতঙ্কজনক অবস্থা।

চরকা অতীব নির্দোষ অথচ এত অধিকমাত্রায় মঙ্গলকারী ক্ষমতা রাখে বলে চরকার বাণী সর্বদা এবং সর্বত্র প্রচার করতে আমি ক্লান্তি বোধ করি না। চরকার বাণী হয়তো খুব রুচিকর মনে না হতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক মুখরোচক ম লাযুক্ত খাদ্যের চেয়ে স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য স্বাদিষ্ট নয়। সুতরাং গীতার একটি সুন্দর শ্লোকে প্রত্যেকটি বিচারশীল ব্যক্তিকে বলা হয়েছে যে প্রথমাবস্থায় বিস্বাদ অথচ পরিণামে অমরত্বপ্রসূ দ্রব্যই যেন তারা গ্রহণ করে। আজ চরকা এবং তা থেকে উৎপন্ন দ্রব্যকে এই আখ্যা দেওয়া যায়। অশান্ত চিত্তে শান্তিবারি সেচনকারী, পথভ্রান্ত ছাত্রজীবনকে কল্যাণ-স্পর্শে সঞ্জীবিত-করণক্ষম ও তাদের জীবনকে আধ্যাত্মিকতার পরশদায়ী শক্তির উৎস হচ্ছে সূতা কাটা এবং তাই এর চেয়ে বড়

যজন আর নেই। বাস্তবের পূজারী এই যুগ অবিলম্বে ফললাভাকাঙ্ক্ষী বলে দেশকে আমি চরকার চেয়ে শ্রেয় কোন ব্যবস্থাপত্র দিতে পারি না, এমন কি গায়ত্রীর কথাও এখন তুলতে পারি না। গায়ত্রীমন্ত্র অবশ্য সানন্দে আমি আপনাদের দেব; কিন্তু তাতে অবিলম্বে কোন ফললাভ হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না। পক্ষান্তরে আমি যে জিনিসটির কথা বলছি তা গ্রহণ করলে যুগপৎ মুখে ঈশ্বরের নাম এবং হাতে কাজ চলবে ও আপনারা অবিলম্বে এ দ্বারা উপকৃত হবেন। জনৈক ইংরেজ বন্ধু লিখেছেন যে তাঁর ইংরেজসুলভ সাধারণ বিচার-বুদ্ধি তাঁকে বলেছে যে সূতাকাটা নিঃসন্দেহে একটি সুন্দর শখ। তাঁকে আমি বলি, "আপনাদের কাছে এ একটি সুন্দর অবসর বিনোদনের উপায় হতে পারে; কিন্তু আমাদের কাছে এ কল্পতরু"। পশ্চিমের অনেক কিছু আমি পছন্দ করি না; কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন অনেক গুণ আছে, যার প্রতি আমার অনুরাগ গোপন করতে পারি না। তাঁদের 'অবসর বিনোদন' সম্যক্ অর্থসূচক। সুদক্ষ শল্য-চিকিৎসক কর্ণেল মেড্ডক নিজকার্যে অসীম তৃপ্তি পেলেও সদাসর্বদা ঐ নিয়ে থাকতেন না। দু ঘণ্টা তিনি বাগান করার শখের জন্য ব্যয় করতেন এবং এই বাগান করা তাঁকে সাহস ও উদ্দীপনা দিত ও তাঁর জীবনকে রূপে রসে গন্ধে ভরে তুলত।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-৯-১৯২৫

২

ছাত্রসমাজ ও বিজ্ঞান

আমেরিকায় পাঠরত স্নাতকোত্তর পর্যায়ের জনৈক ছাত্র লিখেছেন:—

"ভারতের দারিদ্র্য অপনোদনের জন্য ভারতের সম্পদাবলী নিয়োগের কথা যাঁরা ভাবেন, আমি তাঁদের মধ্যে একজন। এদেশে এই ছয় বৎসর হল এসেছি। উদ্ভিদ্-রসায়ন নিয়ে আমি চর্চা করছি। ভারতের শিল্পোন্নতির

গুরুত্ব সম্বন্ধে এইরকম গভীরভাবে বিশ্বাস না করলে আমি হয়তো সরকারী চাকরি নিতাম, আর নয় চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করতাম।…কাগজের মণ্ড বা কাগজ উৎপাদনের মত শিল্পে আমার যোগদান করা কি আপনি সমর্থন করেন? ভারতের জন্য একটি সুবিবেচনাপ্রসূত মানবতাপূর্ণ শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্বন্ধে সাধারণভাবে আপনার কি অভিমত? আপনি কি বৈজ্ঞানিক প্রগতি চান? বৈজ্ঞানিক প্রগতি বলতে আমি অবশ্য ফ্রান্সের ডাঃ পাস্তুর, টোরিয়োণ্টোর ডাঃ বেণ্টিং-এর গবেষণার মত মানব-কল্যাণকর আবিষ্কার বুঝি।"

সব জায়গার ছাত্রদের কাছ থেকে আমার কাছে এত প্রশ্ন আসে এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আমার অভিমত সম্বন্ধে এত ভুল ধারণা আছে যে এই প্রশ্নটির প্রকাশ্য উত্তর দেওয়া আমি সমীচীন বোধ করছি। ছাত্রটি যে ধরনের শিল্পোন্নয়নের কথা ভাবছেন তাতে আমার কোনরকম আপত্তি নেই। তবে এর জন্যই একে আমি মানবতাপূর্ণ বলব না। আমার কাছে ভারতের পক্ষে মানবতাপূর্ণ শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা হচ্ছে হাতে সূতাকাটার গৌরবজনক পুনরভ্যুত্থান। কারণ শুধু এর দ্বারাই যে দারিদ্র্য এদেশের কোটি কোটি পর্ণকুটিরের অধিবাসীর জীবনকে কীটদষ্ট ফুলের মত নষ্ট করছে, অবিলম্বে তা দূর হতে পারে। দেশের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য আর সব এর পরে করা যেতে পারে। সুতরাং নিজের চরকাকে ভারতের কুটীরসমূহের পক্ষে উৎপাদনের অধিকতর কার্যকুশল যন্ত্রে পরিণত করার জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি যুবক স্বীয় প্রতিভা নিয়োগ করুন এই আমি চাই। আমি বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিরুদ্ধে নই। পক্ষান্তরে পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক মনোভাব আমার সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তবে আমার প্রশস্তিবাচন যদি কোথাও সীমিত হয়ে থাকে তবে তার কারণ হচ্ছে এই যে, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা ঈশ্বরের ক্ষুদ্রতর সৃষ্টির প্রতি দৃক্‌পাত করেন না। জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ প্রথা আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। তথাকথিত বিজ্ঞান ও মানবতার নামে নিরীহ জীবহত্যা করাকে আমি ক্ষমার

অযোগ্য মনে করি এবং এর প্রতি বিরাগ পোষণ করি। নিরপরাধের রক্তরঞ্জিত প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে আমি অহেতুক বিবেচনা করি। জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ ছাড়া যদি রক্তসঞ্চালন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন সম্ভব না হয়, তবে এমন জ্ঞান ছাড়াই মানুষের চলবে। আমার মনে হয় সেদিন দূরে নয়, যেদিন ইউরোপের সৎ বৈজ্ঞানিকেরা জ্ঞানার্জনের বর্তমান উপায়ের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করবেন। মানবতার ভবিষ্যৎ মূল্যমান শুধু মানবসম্প্রদায়ের কথাই ভাববে না, ভবিষ্যতে সকল জীবের কথাই বিবেচনা করা হবে। আজ যেমন আমরা ধীর অথচ নিশ্চিত ভাবেই একথা উপলব্ধি করছি যে আমাদের এক-পঞ্চমাংশকে নরকসদৃশ অবস্থায় ফেলে রেখে হিন্দুত্বের বিকাশ অসম্ভব, অথবা প্রাচ্যদেশ ও আফ্রিকার জাতিসমূহকে শোষণ ও হতমান করে যেমন পাশ্চাত্য জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখা ও সমৃদ্ধ হওয়া অসম্ভব, তেমনি সময়কালে আমরা বুঝতে পারব যে সৃষ্টির নিম্নস্তরের জীবের চেয়ে আমরা উচ্চ পর্যায়ের বলে তাদের হত্যা করাতে আমাদের মহত্ত্ব নেই। বরং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মঙ্গলবিধানই আমাদের উচ্চতার নিদর্শন। কারণ এবিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয় যে আমারই মত তাদেরও আত্মা বিদ্যমান।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-১২-১৯২৫

৩

আত্মত্যাগ

আমার সামনে একাধিক যুবকের নিকট হতে প্রাপ্ত এমন সব পত্র রয়েছে যার লেখকেরা অভিযোগ করেছেন যে জনসেবার ক্ষেত্রে তাঁরা যে মাসোহারা পান তা তাঁদের পারিবারিক প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। একজন সেইজন্য বলেছেন যে, তিনি জনসেবার কাজ ছেড়ে দিয়ে ধার করে বা চেয়েচিন্তে কিছু টাকা যোগাড় করে ইউরোপে গিয়ে নিজ উপার্জন-ক্ষমতা বাড়াবেন। আর একজন বেশী

মাইনের চাকরি খুঁজছেন এবং অন্য একজন আবার কোন লাভজনক ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করার জন্য কিছু পুঁজি চেয়েছেন। এইসব যুবকদের মধ্যে প্রত্যেকেই খাঁটি, সৎ এবং আত্মত্যাগী কর্মী। কিন্তু এঁদের মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। পারিবারিক প্রয়োজন বেড়ে গেছে। খাদি বা জাতীয় শিক্ষায় তাঁদের অন্তর তৃপ্ত নয়। আরও টাকা চেয়ে তাঁরা জনসেবা-কার্যের বোঝা হতে চান না। কিন্তু এই মনোভাব সর্বদা ব্যাপক হলে এর ন্যায়সঙ্গত পরিণতি হচ্ছে—হয় যেসব জনসেবামূলক কাজে এই জাতীয় যুবক-যুবতীর সেবা প্রয়োজন, সেসব বন্ধ করে দেওয়া, অথবা এইসব কর্মিদের মাসোহারা একধার থেকে অনির্দিষ্ট ভাবে বাড়িয়ে যাওয়া এবং এর ফলেও এই একই রকম অবাঞ্ছিত পরিণতিতে পৌঁছাতে হবে।

আমাদের পরিবেশের সঙ্গে তাল দিয়ে এইভাবে আমাদের প্রয়োজন ক্রমাগত দ্রুতহারে বেড়ে চলে—এই তথ্য জানার পর অসহযোগের কল্পনা মাথায় আসে। এইভাবে যে অসহযোগ আন্দোলনের কল্পনার উদ্রেক হয়, তা কিন্তু কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। যে পদ্ধতি আমাদের তার সর্পিল আলিঙ্গনে জড়িয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করার ব্যবস্থা করেছে, এ অসহযোগ সেই মনোভাবের বিরুদ্ধে। দেশের সর্বসাধারণের অবস্থার প্রতি বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করে এই পদ্ধতি আমাদের জীবনমান উন্নত করতে কৃতকার্য হয়েছে। আর ভারত অন্যদেশের শোষণের উপর নির্ভরশীল নয় বলে দেশের মধ্যবিত্ত অর্থাৎ মধ্যস্বত্বভোগীদের বিকাশের অর্থ দাঁড়িয়েছে সর্ব-নিম্নশ্রেণীর বিলুপ্তি। সুতরাং ক্ষুদ্রতম পল্লীটিও অতি পরিশ্রমের চাপে মরণোন্মুখ। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দেই আমাদের অনেকের কাছে একথা স্পষ্ট ধরা পড়েছিল। এ আন্দোলনের এখন শৈশবাবস্থা। হঠাৎ কোন কিছু করে এ আন্দোলনের পথে বাধক হওয়া উচিত নয়।

পাশ্চাত্য প্রথায় যৌথ পরিবারের স্থান নেই বলে আমাদের এই কৃত্রিম প্রয়োজনবৃদ্ধি বড় বেশী করে অনুভূত হচ্ছে। যৌথ পরিবার

প্রথা প্রাচীন হবার সঙ্গে সঙ্গে এর ত্রুটিগুলি রূঢ়ভাবে দেখা দিচ্ছে এবং এর যাবতীয় মাধুর্য অদৃশ্য হয়ে গেছে। এইভাবে দোষের উপর দোষ বাড়ছে।

সুতরাং আমাদের আত্মত্যাগ হবে দেশের প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে। বাইরে থেকে ভিতরের প্রয়োজন অধিক। গলিত আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া আদর্শ শাসনতন্ত্র হবে বোঝার উপর শাকের আঁটির মত।

অতএব আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত বিকাশসাধন করতে হবে। আত্মত্যাগ-বৃত্তির সম্প্রসারণ চাই। অতীতের ত্যাগ মহান্ হলেও দেশমাতৃকার বেদীমূলে যে ডালি দেওয়া প্রয়োজন তার তুলনায় এযাবৎ কিছুই হয়নি। পরিবারের মধ্যে যিনি সুস্থ হয়েও কাজ করবেন না, তাঁকে দেখা আমাদের কর্তব্য নয়। এ ব্যাপারে নর বা নারীর পার্থক্য করার প্রয়োজন নেই। সামাজিক ভোজ বা ব্যয়বহুল বিবাহের অনুষ্ঠানাদি নিরর্থক ও অজ্ঞতাপ্রসূত প্রথার জন্য আমাদের এক কপর্দক ব্যয় করা উচিত হবে না। প্রতিটি বিবাহ ও মৃত্যু পরিবারের প্রধানের উপর অহেতুক এক নিষ্ঠুর বোঝার মত চেপে বসে। এসব কাজকে আমরা আত্মত্যাগ ও আত্মসুখ বর্জনের দৃষ্টান্ত বলে মানব না। দৃঢ়তা ও সাহসিকতা সহকারে এসব পাপের সম্মুখীন হতে হবে।

এরপর আবার আমাদের অতীব ব্যয়বহুল শিক্ষা-ব্যবস্থা রয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোকের যখন দিন চালানো দায় এবং হাজার হাজার লোকে যখন অনশনে মৃত্যুবরণ করছে, তখন নিজের আত্মীয়স্বজনকে ব্যয়বহুল শিক্ষা দেবার কথা চিন্তা করাও পাপ। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মনের বিকাশ ঘটবে। এর জন্য স্কুল বা কলেজের চার দেওয়ালের মধ্যে আটক থাকার দরকার নেই। আমাদের মধ্যে জনকয়েক যখন এই তথাকথিত উচ্চশিক্ষাকে অগ্রাহ্য করবে, তখন খাঁটি উচ্চশিক্ষা দেওয়া ও নেওয়ার উপায় আবিষ্কৃত হবে। ছাত্রদের

পক্ষে নিজ শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের উপায় নেই, না খুঁজে পাওয়া যায় না? হয়তো এরকম কোন উপায় নেই। এরকম উপায় আছে কি নেই সেকথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আমরা যখন দেখব যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা অতীব কাম্য, অথচ ব্যয়বহুল শিক্ষার শরণ নিতে আমরা রাজী নই, তখন অধিকতর মাত্রায় আমাদের পরিবেশের অনুকূল উচ্চশিক্ষা পাবার একটি উপায় আবিষ্কৃত হবে। এসব ক্ষেত্রে সেরা নীতি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ লোক যা পায় না তা নিতে অস্বীকার করা। এই অস্বীকার করার শক্তি অকস্মাৎ আমাদের মধ্যে উদিত হবে না। এর জন্য প্রথমে লক্ষ লক্ষ লোক যে সুযোগ-সুবিধা পায় না, তা নিতে অস্বীকার করার মত চিত্তবৃত্তির অনুশীলন দরকার এবং তারপর অবিলম্বে আমাদের জীবনকে এই আদর্শ অনুযায়ী পুনর্গঠিত করা দরকার।

আমার মতে এই জাতীয় এক বিশাল, অতি বিশাল আত্মোৎসর্গকারী দৃঢ়চেতা কর্মীবাহিনী ব্যতিরেকে জনগণের সত্যকার প্রগতি অসম্ভব এবং সেই রকম প্রগতি বিনা স্বরাজ বলে কোন কিছু পাওয়া যাবে না। দরিদ্রদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগে উদ্বুদ্ধ কর্মীর সংখ্যা ঠিক যতটা বৃদ্ধি পাবে, আমাদের স্বরাজাভিমুখী প্রগতিও সেই অনুপাতে বাড়বে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৬-১৯২৬

৪

একটি ছাত্রের সমস্যা

জনৈক সরলহৃদয় ছাত্র লিখছেন:

"...বিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জন ও হাতের কাজ শেখার উপর আপনি কেন সমান জোর দেন তা আমি বুঝতে পারি না। আমি দেখেছি যে একসঙ্গে দুটি কাজ করতে গিয়ে আমরা কোনটিই ভালভাবে করতে পারি না।"

"আমাদের কোন কোন হাতের কাজ অবশ্যই শেখা উচিত। কিন্তু আমাদের প্রশিক্ষণের বৌদ্ধিক পর্বের সমাপ্তির পর সেটা শেখা ভাল নয়

কি ? সূতাকাটাকে আমি হস্তশিল্প বলে মনে করি না। সূতাকাটা হল সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন। সুতরাং সকলেরই সূতাকাটা উচিত। কিন্তু আমার মনে হয় বুনাই, কৃষি ও সূত্রধরের কাজ শেখাকে লেখাপড়ার পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুলতুবী রাখা উচিত। এগুলির প্রত্যেকটিই এক একটি স্বতন্ত্র শিক্ষণের বিষয় এবং এর প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য পৃথকভাবে এক বছর বা আরও বেশী সময় দেওয়া দরকার।

"এখানে যেভাবে কাজ চলছে তাতে ছাত্রদের বৌদ্ধিক বিকাশ এবং হস্তশিল্পের কুশলতা দুই-ই ব্যাহত হচ্ছে। তিন ঘণ্টা হাতের কাজ, অবকাশ সময়ে সূতাকাটা এবং অপরাপর বিদ্যালয়সমূহে যে সব বিষয় পড়ান হয় সে সব বিষয় শেখা, এর উপর নিজের পড়া ও তা ছাড়া প্রয়োজনীয় সামূহিক কৃত্য সম্পাদন—এক সঙ্গে এত সব করা নিঃসন্দেহে কঠিন ব্যাপার।

"ছেলেদের জন্য যে পরিমাণ পড়াশুনা নির্ধারণ করা হয়েছে তা কমান যায় না। তাদের সব বিষয় শিখতে হবে, তাই ছেলেদের যখন নিজেদের পড়া ছাড়া এত অধিক সংখ্যক বিষয় শিখতে হবে তখন তাদের উপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দেবার যৌক্তিকতা কোথায় ? তাদের নিজস্ব কর্তব্য সম্পাদনের উপযুক্ত সময়ই যখন তারা পায় না তখন তারা নিজেদের ব্যক্তিগত পড়াশুনা করবে—এটা কেমন করে আশা করা হয় ? আমি দেখছি যে পড়াশুনা যতই এগোয় ততই পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত পড়াশুনা আরও বেশী করে করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, অথচ এর সময়ই মেলে না।

"শিক্ষকদের কাছে আমি এসব অসুবিধার কথা বলেছি। তাঁরা এ সব সমস্যা নিয়ে আলোচনাও করেছেন কিন্তু তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারি নি। আমার মনে হয় তাঁরা আমাদের অসুবিধা ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারেন না। আপনি কি দয়া করে আমার প্রশ্নগুলি আলোচনা করে আমার ভুল কোথায় তা বুঝিয়ে বলবেন ?"

...আভ্যন্তরীণ প্রগতি এবং সমাজসেবার মধ্যে এখানে যে পার্থক্য করা হয়েছে ভারতবর্ষের আরও অনেকে তা করে থাকেন। আমার মতে এটা চিন্তাশক্তির বিভ্রান্তির দ্যোতক। আমি বিশ্বাস করি এবং

আমার অভিজ্ঞতাও আমাকে এই কথা বলে যে যা কিছু আত্মার ঊর্ধ্বগতির বিরোধী, সাধারণভাবে তা সমাজের যথার্থ মঙ্গলেরও পরিপন্থী। আর আমার মতে সমাজের সেবাই হল আত্মার ঊর্ধ্ব-গামীতার শ্রেষ্ঠ উপায়। সেবার মানেই হল যজ্ঞ। যে সেবা আত্মার ঊর্ধ্বগতির পক্ষে বাধক তা বর্জনীয়।

দেশে এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা বলে থাকেন যে সময়ে মিথ্যা কথা বলেও সেবা করা যায়। কিন্তু সকলেই জানেন যে মিথ্যা ভাষণের ফলে আত্মা অধোগামী হয়—আত্মার সুমহান্ মর্যাদা ভ্রষ্ট হয়। অতএব মিথ্যাভাষণের মাধ্যমে সেবা করার কথা চিন্তা করাই উচিত নয়। সত্যি কথা বলতে কি মিথ্যা ভাষণ যে সেবার মাধ্যম হতে পারে—এই কল্পনাই নিছক মায়া। এর ফল সাময়িকভাবে সমাজের পক্ষে কল্যাণপ্রদ মনে হতে পারে, কিন্তু একথা প্রমাণ করা যায় যে শেষ অবধি এর ক্ষতির পরিমাণই বেশী।

…জ্ঞানার্জন ও হাতের কাজ শেখার উপর সমান জোর দেবার প্রশ্নটি ভারতবর্ষে ফেরার পর থেকে আমাকে বহুবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এবং বরাবরই আমি এর একই উত্তর দিয়েছি। এই উত্তর হল উভয় প্রকার বিদ্যাকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত। পুরাকালেও এই রকম ছিল। ছাত্র শিক্ষকের কাছে সমিধ নিয়ে উপস্থিত হত। সমিধবহন ছিল ছাত্রের আনুগত্য ও পরিশ্রমে প্রস্তুতির নিদর্শন। গুরুর জন্য অরণ্য থেকে কাষ্ঠ আহরণ এবং জল আনয়ন হল সেই পরিশ্রম। ছাত্র কৃষি ও গোপালন সম্বন্ধেও কিছু কিছু শিক্ষা পেত।

আজ আর এ প্রথা নেই। বর্তমান পৃথিবীতে এত যে বুভুক্ষা, অবিচার ও পাপের প্রাদুর্ভাব তার অন্যতম কারণ এই। অক্ষরজ্ঞান অর্থাৎ পুঁথিপত্রের বিদ্যা ও বৌদ্ধিক জ্ঞান এবং বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় হাতে কলমে অভিজ্ঞতা আপাতদৃষ্টিতে পৃথক মনে হলেও আদৌ এরা ভিন্ন বিষয় নয়। এদের পৃথক করার এবং এদের মধ্যেকার বন্ধনকে ছিন্ন করার প্রয়াসের পরিণাম হল জ্ঞানের অপব্যবহার।

জ্ঞানের বৌদ্ধিক দিক হল স্বামী এবং শরীর শ্রমমূলক দিক হল স্ত্রীর মত। এতদুভয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। শরীর শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমানে এই স্বামী উচ্ছৃঙ্খলের মত আচরণ করছে। তার কলুষিত দৃষ্টি একবার এখানে একবার ওখানে—সর্বত্র পড়লেও শেষ অবধি কোথাও তৃপ্তি না পেয়ে ক্লান্ত ও নিঃশেষ প্রতীয়মান হচ্ছে।

প্রত্যুত দুটির মধ্যে যদি তুলনা করতেই হয় তবে শরীর শ্রমকে প্রথম স্থান দিতে হবে। কারণ শিশু সর্বাগ্রে বুদ্ধির প্রয়োগ করে না, করে হাত-পায়ের ব্যবহার। ধীরে ধীরে সে তার চোখ-কানের ব্যবহার করতে শেখে এবং বছর চার-পাঁচের হলে বুঝতে শেখে। তবে এর অর্থ এই নয় যে বোধশক্তির বৃদ্ধি হলে সে তার দেহকে উপেক্ষা করতে পারে। এরকম করলে সে নিজের দেহ মন—দুটিকেই নষ্ট করবে। শরীরের কার্যকলাপের মাধ্যমেই বুদ্ধি অভিব্যক্ত হয়। আজ শরীরচর্চা কেবল কসরৎ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অতীতে প্রয়োজনীয় শরীর শ্রমের মাধ্যমে একার্য সাধিত হত। অবশ্য আমি একথা বলছি না যে ছেলেরা খেলবে না অথবা দৌড়ঝাঁপে ভাগ নেবে না। তবে নিছক স্বাস্থ্যের কারণ খেলাধূলার খুব একটা প্রয়োজন ঘটা উচিত নয়। পক্ষান্তরে খেলাধূলা হবে শরীর ও মনের বিশ্রাম ও মনোরঞ্জনের সাধন। শিক্ষায় আলস্যের কোন স্থান নেই। হাতের কাজ শেখাই হক অথবা লিখতে পড়তে শেখার ব্যাপার—শিক্ষা পাওয়া সর্বদা চিত্তাকর্ষক হবে। লেখাপড়া অথবা হাতের কাজ শেখার সময় কোন ছেলের যদি একঘেয়েমি বোধ হয়, তাহলে তার দোষ ছেলেটির নয়, সে দোষ শিক্ষা-পদ্ধতির এবং শিক্ষকের।

আমার কাছে এই চিঠিটি আসার পর ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রের সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা-সংক্রান্ত একটি পুস্তক পড়ার সুযোগ হয়। সেদেশে এমন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে যার কাজ হচ্ছে হাতের কাজ শেখানর সঙ্গে সঙ্গে পুঁথিগত বিদ্যা শেখানর কেন্দ্র শুরু করা।

এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপনাকারীদের তালিকায় ইংলণ্ডের প্রায় সব প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্-এর নাম দেখা গেল। তাঁদের লক্ষ্য হল শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলিত ধারায় পরিবর্তন সাধন এবং শিশুদের বৌদ্ধিক জ্ঞান ও হস্তশিল্প দুই-এর শিক্ষা দেওয়া। খোলামেলা জায়গায় এরকম আরও বহু কেন্দ্র স্থাপনা করা হবে যাতে ছেলেদের হস্তশিল্প শিক্ষা দেবার সুব্যবস্থা করা যায়। এর ফলে ছেলেরা শিক্ষাকালেই কিছু উপার্জন করতে পারবে। বই-টির সম্পাদক বলছেন যে এর ফলে সম্ভবতঃ পুঁথিপত্র কেন্দ্রীক শিক্ষাদানের অবধি বেড়ে যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছেন যে তাতে কোন ক্ষতি হবে না, পক্ষান্তরে এর ফলে ছাত্ররা লাভবান হবে। ছাত্র যখন উপার্জন করতে শেখে তখন সৎভাবে উপার্জিত অর্থের মূল্যও বুঝতে শেখে এবং তাকে বিভিন্ন প্রকারের মাধ্যমে প্রদত্ত শিক্ষার প্রতিও সে শ্রদ্ধাশীল হয়।

আমার মনে হয় যে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলাম তার পরিণামেও পূর্বোক্ত অভিমতের পরিপুষ্টি হয়। সেইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার রূপায়ণের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমি যতটুকু চিন্তা করেছি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের যতটুকু কার্যান্বিত করেছি, সেগুলি ততটুকু সাফল্য লাভ করেছে।

শিক্ষাপদ্ধতি ভাল হলে পাঠ্যক্রম শেষ করতে বা পাঠ্যক্রম বহির্ভূত পড়াশুনা করতে খুব বেশী সময় লাগে না। অবশ্য নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোন কাজ করতে, পছন্দসই কোন বই পড়তে অথবা নিছক কুঁড়েমি করে খানিক সময় নষ্ট করার সুযোগ ছাত্রদের থাকা চাই। শুনেছি যোগশাস্ত্রে একে শবাসন করা বলে। শবাসনের অর্থ হল হাত-পা ছড়িয়ে দেহ মনকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দিয়ে মৃতদেহের মত পড়ে থাকা। অবশ্য এসময়ও বিশ্রামকে ব্যাহত না করে প্রতিটি নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে রামনাম করা উচিত। ব্রহ্মচারীর কাছে প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসই হল ঈশ্বরের নামোচ্চারণ।

কিন্তু আমি যা বলেছি তা যদি সত্য হয় তাহলে এই ছাত্রটি এবং

অন্যান্য বন্ধু যারা মিথ্যাবাদী বা অহঙ্কারী নয় ও যারা নিজেদের লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে প্রস্তুত, তারা কেন এই সত্য উপলব্ধি করে না?

খেদের কথা হল এই যে আমাদের মত সব শিক্ষকেরাই এমন একটা যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন ও বেড়ে উঠেছেন যখন বৌদ্ধিক শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হয় এবং হস্তশিল্পের শিক্ষা অত্যন্ত উপেক্ষিত। অবশ্য আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই মারাত্মক ত্রুটি ধরতে পেরেছেন। এ ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা হচ্ছে যদিচ কি ভাবে এ ত্রুটি সংশোধন করা যায় সে সম্বন্ধে কারও স্পষ্ট ধারণা নেই। এ ছাড়া আমরা যতটুকু বুঝতে পেরেছি তাকে কার্যান্বিত করার ক্ষমতা আমাদের নেই। রঘুবংশ, রামায়ণ অথবা শেক্স্‌পীয়রের কাব্যকৃতি যাঁরা পড়াতে পারেন তাঁদের সূত্রধর-বিদ্যা অথবা বয়নশিল্প শেখানর যোগ্যতা অথবা মানসিক প্রবণতা কোনটাই নেই। রঘুবংশ সম্বন্ধে তাঁরা যতটা জানেন বুনাই সম্বন্ধে তা জানেন না, আর জানলেও তাতে সমান আগ্রহ নেই। আমাদের শিক্ষককুলের এই অপূর্ণতার জন্য আমরা যে আদর্শ ছাত্র তৈরী করতে পারছি না, এতে আশ্চর্যের কোন কারণ নেই। আদর্শ ছাত্র এমন হবে যে কেতাবী শিক্ষা ও হাতের কাজ—উভয় রকমের শিক্ষার ক্ষেত্রেই সমান কুশল হবে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্রবলও থাকবে। সুতরাং এই সংক্রান্তি কালে আমাদের অপ্রস্তুত শিক্ষকবৃন্দ এবং কঠোর পরিশ্রমী ছাত্রসমাজ উভয়েই যেন ধৈর্য ও বিশ্বাসের পরিচয় দেন। বিশ্বাসের বলে মানুষ সমুদ্র লঙ্ঘন করতে পারে, দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করতে সক্ষম হয়।

নবজীবন, ৩-৭-১৯২৭

৫

বাঙ্গালোর বিজ্ঞান-মন্দিরের অভিভাষণ

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি (গান্ধীজী) বললেন, "কোথায় যে এসেছি একথা ভেবে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আমার মত যে

গ্রামবাসী এসব দেখে ভীতিজড়িত শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে রুদ্ধবাক্ হয়ে পড়ে, তার এখানে স্থান নেই। বেশী কিছু বলার অবস্থা আমার নেই। আমি শুধু এইটুকুই বলব যে এখানকার এইসব বিরাট বিরাট গবেষণাগার ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি দেখার সুযোগ পাওয়া গেছে লক্ষ লক্ষ জনের ইচ্ছাবিরুদ্ধ এবং বাধ্যতামূলক শ্রমের কারণে। কারণ টাটার ত্রিশ লক্ষ টাকা বাইরে থেকে আসে নি, আর মহীশূর রাজের দানের উৎসও বেগার-প্রথা ছাড়া আর কি? যেসব অট্টালিকা ও যন্ত্রপাতি কোন কালেই গ্রামবাসীদের উপকারে আসবে না, হয়ত ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কাজে লাগবে, তার জন্য কিভাবে আমরা তাদের অর্থের সদ্ব্যয় করছি একথা যদি আমরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেখা করে তাদের বুঝাতে যাই, তাহলে তারা তা বুঝতেই পারবে না। এসব কথায় তারা কোন উৎসাহ প্রকাশ করবে না। আমরা কিন্তু তাদের আস্থা অর্জনের কোন চেষ্টাই করি না এবং এসব সুবিধা পাওয়া স্বতঃসিদ্ধ অধিকার বলে মনে করি। আমরা ভুলে যাই যে 'প্রতিনিধিত্বের অধিকার না দিলে কর দেব না'—এই নীতি তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই নিয়ম যদি সত্যি সত্যি তাদের প্রতি প্রয়োগ করেন এবং তাঁদের টাকাপয়সার হিসাব-কিতাব তাদের কাছে দাখিল করার দায়িত্ব যদি বোধ করেন তবে দেখতে পাবেন যে এইসব গবেষক নিয়োগের অন্য আর একটি দিক আছে। তখন আপনারা নিজ হৃদয়ে এদের জন্য সংকীর্ণ স্থান নয়, অনেকখানি জায়গা আছে দেখতে পাবেন। হৃদয়ের এই বিস্তীর্ণ স্থানটুকুর যদি আপনারা উচিতমত হেফাজত করেন, তাহলে যেসব লক্ষ লক্ষ জনগণের মেহনতের উপর আপনাদের শিক্ষা নির্ভরশীল, তাদের মঙ্গলের জন্য আপনারা আপনাদের জ্ঞান নিয়োগ করবেন। আপনারা আমাকে যে টাকার থলি দিয়েছেন তা আমি দরিদ্রনারায়ণের কাজে নিয়োগ করব। সত্যকার দরিদ্রনারায়ণকে আমি চোখে দেখি নি, শুধু তার কল্পনা করে নিয়েছি। সুদূর যোগাযোগবিহীন গ্রামের নিভৃত পল্লীর

অধিবাসী যেসব কাটুনী এই অর্থ পাবেন, তাঁরাও সত্যকার দরিদ্র-নারায়ণ নন। আপনাদের অধ্যাপকদের কাছে শুনেছি যে কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্যের গুণ সন্ধান করতে একাধিক বৎসরের গবেষণার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এইসব গ্রামবাসীর সন্ধান করবে কে? আপনাদের গবেষণাগারে কোন কোন গবেষণা-কার্য যেমন চব্বিশ ঘণ্টাই চলে, তেমনি আপনাদের হৃদয়ের সুবিস্তীর্ণ অংশ যেন লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ব্যক্তির হিতকামনায় সদাই উষ্ণ থাকে।

"পথে ঘাটে বিচরণশীল সাধারণ মানুষের তুলনায় আপনাদের কাছে আমি অনেক বেশী আশা করি। যেটুকু আপনারা করেছেন, তাতে তৃপ্তি বোধ করে একথা বলবেন না, 'আমরা যা পেরেছি, করেছি। এবার টেনিস কিংবা বিলিয়ার্ড খেলা যাক।' আমি বলব যে বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে আর টেনিসের ময়দানে আপনাদের নামে প্রতিদিন যে বিরাট ঋণের অঙ্ক চাপছে তার কথা স্মরণ করুন। তবে ভিক্ষার চাল আবার কাড়া-আকাড়া কি? আপনারা আমাকে যা দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। যে প্রার্থনা আমি জানালাম তার কথা ভেবে দেখবেন এবং তাকে কার্যান্বিত করার চেষ্টা করবেন। দরিদ্র রমণীরা আপনাদের জন্য যে বস্ত্র উৎপাদন করেন তা পরতে শঙ্কিত হবেন না এবং খাদি পরিধান করার জন্য আপনাদের নিয়োগকর্তা যদি সিধা দরজা দেখিয়ে দেন তাতে ভয় পাবেন না। আমি চাই যে আপনারা মানুষের মত মানুষ হয়ে নিজ বিশ্বাসের বলে অকম্পিত পদে দাঁড়ান। মূক জনগণের জন্য আপনাদের মনে যে উদ্যম আছে তা যেন অর্থের সন্ধানে নিষ্প্রভ না হয়। আমি বলছি যে জড়জগতে সংশ্লিষ্ট কোন পদার্থের গবেষণা বিনা শুধু আভ্যন্তরীণ (আভ্যন্তরীণ গবেষণা ছাড়া সব গবেষণাই তো নিষ্ফল) গবেষণার ফলে আপনারা এমন বেতার-যন্ত্রের আবিষ্কার করতে পারেন যা লক্ষ লক্ষ জনগণের হৃদয়ের সঙ্গে আপনাদের হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করবে। আপনাদের সকল আবিষ্কারের লক্ষ্য যদি দরিদ্রদের মঙ্গলসাধন না হয়, তাহলে

রাজাগোপালাচারী ঠাট্টা করে যেকথা বলেছেন তাই সত্য হবে— আপনাদের এসব কর্মশালা শয়তানের কারখানার চেয়ে ভাল হবে না।”

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-৭-১৯২৭

৬

সেবা-বিদ্যা

আমি স্বীকার করছি যে জাতিকে ইংরাজীর মাধ্যমের বন্ধনে আবদ্ধ করার দায়িত্ব আমাদের পূর্বপুরুষদের। তবে জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে হলে আপনাদের এ বন্ধন ভাঙ্গতে হবে। জনসাধারণকে আপনারা কিভাবে সেবা করবেন সে সম্বন্ধে আমার খুব বেশী কিছু বলার নেই, কারণ গোড়াতেই আপনারা আমার চরকার আদর্শকে সমর্থন করে আমার কাজ সহজ করে দিয়েছেন। দলিত জাতিবর্গের কথা আপনারা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তথাকথিত দলিতবর্গের চেয়েও দালত ও নিপীড়িত বহুসংখ্যক অধিবাসী এদেশে আছেন এবং তাঁরাই সত্যকার ভারতবর্ষ। দেশের রেলব্যবস্থা বহু বিস্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এখনও এই জনসাধারণের একাংশকেও স্পর্শ করতে সক্ষম হয় নি এবং রেলপথ ছেড়ে একটু ভিতরের দিকে আপনারা যদি সফর করেন তাহলে এঁদের দেখা পাবেন। উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তীর্ণ ধমনীর মত এই রেলপথ জনসাধারণের সম্পদ দূরে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করে (লর্ড স্যালিসবারীর মতে জনসাধারণের সম্পদরূপী রক্তমোক্ষণের কাজ করে) এবং প্রতিদানে গ্রামবাসীদের কিছুই দেয় না। আর শহরবাসী আমরা এই রক্তচোষণ প্রক্রিয়ার সহায়ক। কথাটি শুনতে খারাপ হলেও বাস্তব অবস্থা এই-ই। এই শ্রেণী সম্বন্ধে আমি কিছুটা জানি। এদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আমি চিন্তা করেছি। আমি যদি চিত্রকর হতাম তাহলে জীবনের দ্যুতি ও

জ্যোতিবিহীন চক্ষুবিশিষ্ট শূন্য দৃষ্টির এই মানুষগুলির ছবি আঁকতাম। এদের সেবা করার উপায় কি ? টলস্টয় এর অনিন্দ্যসুন্দর জবাব দিয়েছেন, "আমরা যেন আমাদের প্রতিবেশীদের কাঁধের উপর থেকে নেমে পড়ি।" প্রত্যেকে যদি কেবল এই একটি কাজ করেন তাহলে ঈশ্বর কর্তৃক তাঁর কাছ থেকে আকাঙ্ক্ষিত সব সেবাই তাঁর করা হবে। এ প্রস্তাব চমকপ্রদ এবং আপনারা সেবাকার্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে রয়েছেন বলে আপনাদের একে কার্যে পরিণত করতে হবে।...ঐ দরিদ্র লোকগুলির কাঁধ থেকে নেমে পড়ার অপর কোন প্রক্রিয়া যদি আপনারা আবিষ্কার করতে পারেন তাহলে আমাকে জানাবেন। আমি স্বয়ং শিক্ষার্থী। কারও প্রতি আমার বিরোধিতা নেই। যেখানেই আমি সত্য দেখি আমি তা গ্রহণ করি এবং তদনুযায়ী আচরণের চেষ্টা করি।

...আপনাদের দ্বারা ব্যবহৃত "খাদির পৃষ্ঠপোষকতা করা" শব্দটি আমার পছন্দ হয় নি। শব্দটিতে কিঞ্চিৎ দুর্গন্ধ আছে। আপনারা খাদির পৃষ্ঠপোষক হবেন, না সেবক ? যতদিন খাদির পৃষ্ঠপোষকতা করবেন খাদি ততদিন একটা বাতিক বা ফ্যাশন হয়ে থাকবে। কিন্তু এটা যখন ঐকান্তিক নিষ্ঠার বস্তু হবে তখন এ হয়ে উঠবে সেবার প্রতীক। আপনারা খাদি পরিধান করতে শুরু করা মাত্র সেবা করা আরম্ভ করবেন। দরিদ্র সমাজের সঙ্গে আমার গত পঁয়ত্রিশ বছরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ফলে আমি দেখেছি যে সেবাকার্য খুবই সহজ। স্কুল-কলেজে এ বিদ্যা শেখা যায় না। যে-কোন জায়গা সেবাবৃত্তি শেখার স্থান।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৮-১৯২৭

৭
ছাত্রসমাজ ও বিধবা-বিবাহ

একটি বাঙলা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লিখছেন ঃ

"মাদ্রাজের ছাত্রদের আপনি যে শুধু বিধবা বিবাহ করার উপদেশ দিয়েছেন, তাতে আমরা আতঙ্কিত হয়েছি। আমি আপনার বক্তব্যের বিনম্র অথচ সবেদন প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি।

"এই জাতীয় উপদেশের ফলে বিধবাদের আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করে এক জন্মে মুক্তি পাবার প্রবৃত্তি শিথিল হবে। অথচ এই কারণেই ভারতীয় নারীর স্থান বিশ্বে অনন্য। আপনার উপদেশের ফলে তারা ঐহিক ভোগ-বিলাসের পুতি-গন্ধময় পথে নিক্ষিপ্ত হবে। বিধবাদের জন্য এই জাতীয় গভীর সহানুভূতি তাদের অহিত সাধন করবে এবং যেসব কুমারীদের পাত্রস্থ করা এমনিতেই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের প্রতিও অবিচার করা হবে। আপনার বিবাহ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত হিন্দুদের জন্মান্তর, পুনর্জন্ম এবং এমন কি মুক্তি সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করে হিন্দুসমাজকে অবাঞ্ছনীয়রূপে অন্যান্য সমাজের সমপর্যায়ে টেনে নামাবে। আমাদের সমাজেও অবশ্য দুর্নীতির সঞ্চার ঘটেছে। কিন্তু আমাদের হিন্দু-আদর্শের প্রতি দৃষ্টি দৃঢ়নিবদ্ধ রাখতে হবে এবং যথাসম্ভব উচ্চে ওঠার প্রচেষ্টা করতে হবে। অন্য কোন সমাজ বা আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হলে চলবে না। অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী, বেহুলা, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী আদির উদাহরণ হিন্দুসমাজকে পরিচালিত করবে এবং আমাদেরও কাজ হবে সমাজকে তাঁদের আদর্শে পরিচালিত করা। এই কারণে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, এইসব জটিল বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করা থেকে আপনি বিরত থাকুন এবং সমাজকে যথা অভিরুচি চলতে দিন।"

এই সবেদন প্রতিবাদে আমার মত পরিবর্তন হয় নি বা আমি অনুতপ্তও বোধ করছি না। ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে সচেতন এবং নিজ ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত ও সেপথে চলতে দৃঢ়সঙ্কল্প একজনও বিধবা আমার উপদেশে নিজপথ বর্জন করবেন না। তবে আমার উপদেশ অনুসৃত হলে যেসব অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা বিবাহানুষ্ঠানের সময় বিবাহের বিন্দুমাত্র তাৎপর্য উপলব্ধি করে নি, তারা প্রাণে বেঁচে

যাবে। তাদের ক্ষেত্রে 'বিধবা' কথাটি ব্যবহার করার অর্থ একটি পবিত্র শব্দের উৎকট অপপ্রয়োগ মাত্র। সত্য কথা বলতে কি পত্রলেখকের মনোগত ভাবের সম্মানার্থই আমি দেশের যুবকদের পরামর্শ দিয়েছি যে হয় তাঁরা এইসব তথাকথিত বিধবাদের বিবাহ করবেন, নয় চিরকুমার থেকে যাবেন। এ প্রথার পবিত্রতা তখনই রক্ষিত হবে, যখন বালবিধবাদের এর আওতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে ব্রহ্মচর্য পালন করলে বিধবাদের যে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়—এ কথাটি ভিত্তিহীন। এই চরম আশীর্বাদ অর্জন করতে হলে ব্রহ্মচর্য ছাড়া আরও অনেক কিছু প্রয়োজন। আর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ব্রহ্মচর্যের কোন মূল্য নেই। বরং বহু ক্ষেত্রে এর ফলে সমাজে গোপন দুর্নীতির প্রসার হয়। পত্রলেখক যেন অবগত থাকেন যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি এ কথা লিখছি।

আমার উপদেশের ফলে কুমারী বিধবাদের প্রতি যদি প্রাথমিক ন্যায়বিচার করা হয়, তাহলে আমি সত্য সত্যই সুখী হব এবং এর ফলে যদি অন্যান্য কুমারীরা অকালে পুরুষের কামনা-বহ্নির ইন্ধনে পরিণত না হয়ে বয়স ও জ্ঞানের দিক থেকে পরিণত হবার অবকাশ পায়, আমি তাতে আনন্দিত হব।

আমি বিবাহ সম্বন্ধে এমন কোন সিদ্ধান্ত প্রচার করি নি, যা পুনর্জন্ম, জন্মান্তর বা মুক্তির প্রতিকূল। পাঠকদের বোধহয় জানা আছে যে, যেসব লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে আমরা আক্রোশবশতঃ নীচ জাতীয় বলে আখ্যা দিই, তাঁদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কোন বাধা নেই। প্রবীণবয়স্কা বিধবাদের পুনর্বিবাহের কথা যদি না ওঠে, তাহলে ভ্রমবশতঃ যাদের বিধবা আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাদের সত্যকার বিবাহ কি করে যে সেই মহান্ মুক্তির বিশ্বাসের পথের বাধা হতে পারে একথা বুঝতে আমি অক্ষম। পত্রলেখক একথা

জেনে বোধ হয় আনন্দিত হবেন যে আমার কাছে জন্মান্তর বা পুনর্জন্ম শুধু সিদ্ধান্ত নয়, প্রাত্যহিক সূর্যোদয়ের মত আমার কাছে এ এক প্রত্যক্ষ ঘটনা। মুক্তি উপলব্ধিসিদ্ধ ব্যাপার এবং সর্বশক্তি প্রয়োগে আমি এর জন্য চেষ্টা করছি। কুমারী বিধবাদের প্রতি যে নিদারুণ অবিচার হচ্ছে তার প্রতি আমাকে সচেতন করে তুলেছে মুক্তির এই অপরিসীম অনুভূতি। আমরা যেন দুর্বলতাতাড়িত হয়ে আধুনিক যুগের নিপীড়িতা কুমারী বিধবাদের সঙ্গে এক নিশ্বাসে পত্রলেখক কর্তৃক উল্লিখিত সীতাদেবী ইত্যাদির অমর নামোচ্চারণ না করি।

পরিশেষে আমি বলব যে হিন্দুধর্মে সত্যকার বৈধব্য-ব্রতের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ভাবে মর্যাদা আরোপিত হলেও আমি যতদূর জানি বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ করার সপক্ষে বৈদিকযুগে কোন সমর্থন ছিল না। তবে আমার জেহাদ সত্যকার বৈধব্য-ব্রতের বিরুদ্ধে নয়। এর মারাত্মক ব্যঙ্গের বিরুদ্ধেই আমার সংগ্রাম। সেরা উপায় হচ্ছে এই যে আমি যেসব মেয়েদের কথা বলছি, তাদের বিধবা বলেই মনে না করা। যেসব হিন্দুর মধ্যে বিন্দুমাত্র সৌজন্য বোধ আছে, তাঁরা এইসব মেয়েদের এই অসহ্য বোঝার ভার থেকে নিশ্চয় মুক্তি দেবেন। সুতরাং যথোচিত বিনয় সহকারে সরবে আমি আমার বক্তব্যের পুনরুক্তি করছি যে প্রত্যেক হিন্দু যুবকের কর্তব্য হচ্ছে ভ্রমবশতঃ যেসব কুমারীদের বিধবা বলা হয়, তাদের ছাড়া আর কাউকে বিবাহ না করা।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-১০-১৯২৭

৮

ব্যক্তিগত শুচিতার সপক্ষে

একটু পূর্বেই ট্রিনিটি কলেজের ছাত্রদের আমি যা বলেছি তার পুনরুক্তি করে বলব যে, সত্য ও শুচিতার সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে আপনাদের শিক্ষা একেবারে মূল্যহীন। আপনারা

ছেলের দল যদি ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি না দেন এবং আপনাদের চিন্তায়, বচনে ও কর্মে যদি শুচিতার পরশ না লাগে, তাহলে পাণ্ডিত্যের আকর হলেও আপনারা শেষ হয়ে গেছেন বলতে হবে।

একটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমাকে বলা হয়েছে। শুচিতার প্রথম সোপান হচ্ছে পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হওয়া। তবে একথাও ঠিক যে বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ও আচার-ব্যবহারে মনের কথা বেরিয়ে আসেই। যে ছেলেটি নিজের মুখ পবিত্র রাখতে চায় তার কু-কথা উচ্চারণ করা চলবে না। কথাটা অবশ্য অতীব প্রাঞ্জল। এতদ্ব্যতিরেকে এমন কোন জিনিস সে মুখে দেবে না, যা কিনা তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং মনকে ধূম্রাচ্ছন্ন করতে পারে এবং যা তার বন্ধুদের ক্ষতি করবে।

আমি জানি যে অনেক ছেলে ধূমপান করেন। ধূমপানের এই বদভ্যাসের কথা বিবেচনা করতে গেলে স্বীকার করতেই হবে যে সর্বত্র ছেলেদের অবনতি হচ্ছে। তবে সিংহলের আপনারা বোধ হয় এদিক দিয়ে ব্রহ্মদেশের ছেলেদেরই মত খারাপ। আর আপনারা জানেন যে পার্শীদের অগ্নি-উপাসক বলা হয়। ভগবানকে তাঁরা অগ্নির দেবাদিদেব সূর্যরূপী মহান্ পাবকের মাধ্যমে দেখলে কি হবে, তাঁরা আপনাদের চেয়ে বড় অগ্নি-পূজক নন।

(উপস্থিত পার্শী ছাত্রদের লক্ষ্য করে) আপনারা অনেকে আদৌ ধূমপান করেন না এবং আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণে কিছু ছেলে থাকলে আপনাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা হয় যাতে তাঁরা ধূম্রজালে মুখমণ্ডল কলঙ্কিত না করেন তার প্রতি দৃষ্টি রাখা।

আপনাদের মধ্যে কেউ যদি ধূমপান করেন, তবে অতঃপর এ বদভ্যাস পরিহার করবেন। ধূমপানে শ্বাসপ্রশ্বাস কলুষিত হয়। অভ্যাসটি বিরক্তিকরও বটে। রেলের কামরায় উপবেশনকালীন ধূমপায়ী এ বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করেন না যে গাড়ীতে অন্য

যেসব ধূমপানে অনভ্যস্ত মহিলা বা পুরুষ রয়েছেন, তাঁদের পক্ষে তাঁর মুখনিস্থত দুর্গন্ধ বিরক্তির কারণ হয়।

দূর থেকে সিগারেট জিনিসটিকে ছোট্ট মনে হতে পারে। কিন্তু এর ধোঁয়া যখন মুখের ভিতরে ঢুকে বেরিয়ে আসে, তখন সে হয়ে ওঠে বিষ। ধূমপায়ীদের খেয়াল থাকে না যে তাঁরা কোথায় থুথু ফেলছেন। অতঃপর গান্ধীজী টলস্টয় লিখিত একটি গল্পের উল্লেখ করলেন, যাতে দেখানো হয়েছে যে তাম্রকূট সেবনের প্রতিক্রিয়া মদ্যপানের চেয়েও মারাত্মক এবং তারপর বললেন ঃ—

ধূমপানে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছন্ন হয় এবং অভ্যাসটিও খারাপ! আপনারা যদি কোন ভাল চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করেন তবে শুনবেন যে বহুক্ষেত্রে এই ধোঁয়া হচ্ছে কর্কট রোগের কারণ বা অন্ততঃ এ রোগের মূলে আছে তামাকের ধোঁয়া।

যখন এর কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে না, তখন ধূমপান করাই বা কেন? এ তো খাদ্য নয়। সিগারেট ধরার সময় পরের শোনা কথায় যেটুকু আনন্দ পাওয়া গিয়েছিল, তাছাড়া তো আর কোন আনন্দ নেই এতে।

আপনারা যুবকের দল যদি ভাল হন, আপনারা যদি আপনাদের শিক্ষকবর্গ ও অভিভাবকদের অনুগত হন, তাহলে ধূমপানের অভ্যাস বর্জন করুন এবং এর দ্বারা যেটুকু অর্থ বাঁচাবেন তা আমাকে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সহায়তার্থ পাঠিয়ে দিন।

সিংহলে গান্ধীজী, ১৮-১১-১৯২৮

৯

ছাত্রীদের কর্তব্য

আজকের দিনটিকে আপনারা নিয়মিত বাৎসরিক অনুষ্ঠানরূপে পালন করবেন এবং খাদি-কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ-মানসে এদিন চেষ্টা করবেন—আপনাদের এই সংকল্প আমার হৃদয়ের নিভৃততম কন্দরে অনুরণন সৃষ্টি করেছে। আমি জানি আপনারা

লঘুভাবে এ শপথ গ্রহণ করেন নি, ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনারা এ সংকল্প পূর্ণ করবেন। যে দৈন্যপীড়িত জনগণের প্রতিভূরূপে আমি সফর করে বেড়াচ্ছি, তাঁরা যদি তাঁদের ভগ্নীদের এই সংকল্পের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন, তবে আমি জানি যে এতে তাঁদের বুক ফুলে উঠত। আপনারা কিন্তু আমার কাছে একথা শুনে দুঃখিত হবেন যে, যাঁদের জন্য আপনারা এবং আপনাদের মত আরও অনেকে সিংহলে আমাকে এই টাকার তোড়া দিলেন, আমি বোঝাতে চেষ্টা করলেও তাঁরা এর বিন্দুবিসর্গ বুঝবেন না। তাঁদের শোচনীয় জীবন সম্বন্ধে আমি যত বর্ণনাই করি না কেন, আপনারা হয়ত কিছুতেই সে অবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবেন না।

এ থেকে স্বতঃই এই প্রশ্নটি জাগে—এই সব এবং এই জাতীয় লোকদের জন্য আপনাদের কি করা উচিত? আর একটু অনাড়ম্বর হওয়া বা জীবনে আর একটু কৃচ্ছ্রতা আনয়ন করা ইত্যাদি উপদেশ দেওয়া সহজ। কিন্তু তাতে প্রশ্নটির মূল স্পর্শ করা হবে না। এ সম্বন্ধে ভেবে ভেবে আমি চরকার কথায় উপনীত হয়েছি। আপনাদের আজ যে কথা বলছি সেই কথাই নিজের মনে মনে আমি বললাম—এই বুভুক্ষু জনসাধারণের সঙ্গে কোন জীবন্ত যোগসূত্র স্থাপন করতে পারলে আপনাদের, তাদের এবং সমগ্র জগতের পক্ষে একটা আশাস্থল দেখা যাবে।

আপনাদের এ প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং থাকা উচিত। এখানে একটি মনোরম দেব-দেউলও আছে। আপনাদের কর্মসূচীতে দেখছি যে আপনাদের দিনের কাজ শুরু হয় প্রার্থনা দিয়ে। এ সবই ভাল এবং আশাব্যঞ্জক। কিন্তু সে প্রার্থনা যদি কোন নিত্য-নৈমিত্তিক বাস্তব কর্মে প্রকট না হয়, তবে এর শুধু এক প্রাণহীন অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হবার আশঙ্কা আছে। প্রার্থনার এই ধারা অনুসরণ করার জন্যই আমি বলি যে চরকা ধরুন, আধঘণ্টা

সূতা কাটুন এবং যেসব জনগণের কথা আমি আপনাদের বলছি তাদের কথা ভাবুন। এরপর মনে ঈশ্বর স্মরণ করে বলুন, “আমি এই জনগণের জন্য সূতা কাটছি।” হৃদয় মন দিয়ে আপনারা যদি একাজ করেন, আপনাদের মনে যদি এই ভাবনা থাকে যে, সেই খাঁটি উপাসনা-কার্যের আপনারা আদর্শ দীন এবং সম্পন্ন পাত্র, আপনাদের পরিচ্ছদ পরিধানের কারণ যদি সাজগোজ করা না হয়ে দেহাচ্ছাদন হয়, তাহলে খাদি পরতে এবং নিজেদের সঙ্গে জনগণের সেই যোগসূত্র স্থাপন করতে আপনাদের মনে কোনরকম ইতস্ততঃ ভাব আসার কথা নয়।

আপনাদের পত্রিকায় দেখলাম ঈষৎ গর্ব সহকারে কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রীর কার্যকলাপের উল্লেখ আছে। অমুক অমুক বিবাহ করেছে—এই মর্মে চার-পাঁচটি বিজ্ঞপ্তিও দেখলাম। পঁচিশ বা এমন কি বাইশ বছরের মেয়েদের বিবাহ করার মধ্যে কোন অন্যায় নেই। কিন্তু এইসব বিজ্ঞপ্তিতে আমার এমন একটি নামও চোখে পড়ল না যিনি জনসেবার কাজে আত্মোৎসর্গ করেছেন। সুতরাং বাঙ্গালোরের মহারাজ কলেজের মেয়েদের আমি যা বলেছিলাম তার পুনরুক্তি করে বলব যে এইসব প্রতিষ্ঠানের সংস্রব ছাড়লেই আপনারা যদি স্রেফ পুতুলটি হয়ে জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে অদৃশ্য হন, তাহলে বলতে হবে যে শিক্ষাবিদ্‌রা যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন এবং দানবীরেরা দানের যে ধারা বইয়ে দিচ্ছেন, তার বিনিময়ে কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিদান মিলছে না।

স্কুল-কলেজ থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্র অধিকাংশ মেয়ে প্রকাশ্য জনসেবামূলক জীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে যান। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীর দল, আপনাদের এমন করলে চলবে না। আপনাদের সামনে কুমারী এমারীর উদাহরণ রয়েছে এবং এছাড়া আমার মনে হয় এখনকার কর্মচারীদের মধ্যে আরও অনেক অবিবাহিতা মহিলাও রয়েছেন।

প্রত্যেক মেয়ে, প্রতিটি ভারতীয় মেয়েকে যে বিয়ে করতেই হবে এমন কথা নয়। এমন অনেক মেয়ে আমি দেখাতে পারি যাঁরা একজন মাত্র লোকের সেবা না করে নিজেদের সকলের সেবার জন্য উৎসর্গ করেছেন। হিন্দু মেয়েদের সীতা বা পার্বতীর নবীন এমন কি অধিকতর গৌরবমণ্ডিত সংস্করণ সৃষ্টি করার দিন এসে গেছে।

আপনারা নিজেদের শৈব বলেন। পার্বতী যে কি করেছিলেন, তা আপনারা জানেন? স্বামীলাভের জন্য তিনি অর্থব্যয় করেন নি বা নিজেকে তিনি বিক্রয়োপযোগী পণ্যে পরিণত হতে দেন নি। আজ কিন্তু তিনি সপ্ত-সতীর অন্যতমারূপে পরিগণিত হয়ে হিন্দু-কুল-চূড়ামণি রূপে শোভিতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রীর জোরে নয়, এ গৌরব তিনি পেয়েছিলেন তাঁর অশ্রুতপূর্ব তপস্যার বলে।

আমার মনে হয় এখানে সেই ঘৃণ্য পণপ্রথা বিদ্যমান এবং এর জন্য তরুণীদের উপযুক্ত জীবনসঙ্গী পাওয়া অতীব দুষ্কর হয়ে পড়ে। আপনাদের মধ্যে অনেকে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে এই জাতীয় প্রলোভনের প্রতিরোধ করা। এই কু-প্রথার প্রতিরোধ করতে গেলে আপনাদের মধ্যে অনেককে আজীবন এবং অনেককে বেশ কয়েক বৎসর কুমারী থেকে যেতে হবে। তারপর যখন আপনাদের বিবাহকাল সমাগত হবে এবং আপনারা যখন মনে করবেন যে এবার একজন জীবনসঙ্গী প্রয়োজন, তখন আপনারা এমন কাউকে খুঁজবেন না, যাঁর ধন যশ বা দেহসৌষ্ঠব আছে। পার্বতীর মতই আপনারা এমন লোকের সন্ধান করবেন, যাঁর মধ্যে সৎচরিত্র গঠনের উপযোগী গুণাবলী বিদ্যমান। নারদ যে পার্বতীর কাছে মহাদেবের কিরকম বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা আপনারা জানেন—"গায়ে ছাইমাখা ভিখারী, রূপের কোন বালাই নেই, তায় আবার ব্রহ্মচারী।" পার্বতী এর জবাবে বললেন, "হ্যাঁ, তিনিই আমার পতি।" আপনাদের ভিতর কেউ কেউ তপস্যা

করতে মনস্থ না করলে একাধিক শিবের সৃষ্টি হবে না। অবশ্য পার্বতীর মত আপনাদের সহস্র বৎসর তপস্যা করতে হবে না। আমাদের মত ক্ষীণজীবী মানবের পক্ষে অতটা সম্ভবপর হবে না। তবে আপনাদের একটা জীবন আপনারা এই তপস্যা চালিয়ে যেতে পারেন।

পূর্বোক্ত শর্তগুলি স্বীকার করলে আপনারা পুতুলের দেশে নিরুদ্দেশ হতে অস্বীকার করবেন। আপনারা তখন পার্বতী দময়ন্তী সীতা এবং সাবিত্রীর মত সতী হতে চাইবেন। আমার মত ক্ষুদ্রব্যক্তির মতে তখনই আপনাদের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আওতায় আসার অধিকার জন্মাবে।

ভগবান যেন আপনাদের এই আশায় উদ্দীপ্ত করে তোলেন এবং আপনাদের মধ্যে প্রেরণা জাগলে তিনি যেন সে আশার পরিপূর্তির জন্য আপনাদের সহায়তা করেন।

সিংহলে গান্ধীজী, ২৯-১১-১৯২৭

১০

স্বাবলম্বনই আত্মমর্যাদা

এই পত্রিকা মারফত অনেকবার এই রকম প্রস্তাব করা হয়েছে যে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হলে, বা অন্ততঃ শিক্ষাগ্রহণেচ্ছুক প্রতিটি বালক-বালিকার কাছে শিক্ষাকে সহজলভ্য করতে হলে আমাদের স্কুল-কলেজগুলিকে পূর্ণতঃ না হলেও অন্তত প্রায় তারই সমান স্বাবলম্বী করা উচিত। চাঁদা তুলে, সরকারী সাহায্য নিয়ে ছাত্রদের বেতনে স্বাবলম্বী হলে চলবে না, ছাত্রদের স্বীয় উৎপাদন-মূলক কর্মের দ্বারা স্বাবলম্বী হতে হবে। এ শুধু সম্ভব হবে শিল্পশিক্ষা বাধ্যতামূলক করলে। যেসব কারণে কেতাবী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের শিল্পশিক্ষা দেবার প্রয়োজন দৈনিক অধিকতর মাত্রায় অনুভূত হচ্ছে, তা ছাড়াও শিক্ষাকে প্রত্যক্ষরূপে স্বাবলম্বী করার

জন্য এদেশে শিল্পশিক্ষা দেবার অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আমাদের ছাত্ররা যখন শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করতে শিখবে এবং যখন শ্রমমূলক বৃত্তি না জানা অগৌরবজনক বলে বিবেচিত হবার প্রথা প্রবর্তিত হবে, তখনই এ সম্ভবপর হবে। আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনাঢ্য দেশ এবং সেইজন্য সেখানে শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করার প্রয়োজন বোধ হয় সবচেয়ে কম। কিন্তু এই আমেরিকাতেও শিক্ষার পূর্ণ বা আংশিক ব্যয় ছাত্রদের শ্রমে নির্বাহ করা অতীব স্বাভাবিক ঘটনা। আমেরিকার হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনের সরকারী মুখপত্র 'হিন্দুস্থানী স্টুডেন্ট' বলছেন :

"আমেরিকার শতকরা প্রায় ৫০ জন ছাত্র গ্রীষ্মাবকাশে বা স্কুল-কলেজ খোলা থাকাকালীন কিছুটা সময়ে অর্থোপার্জন করেন। কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে 'স্বাবলম্বী ছাত্রদের সম্মান করা হয়'। শিক্ষায়তন খোলা থাকার সময় নিজ অধ্যয়ন-নিষ্ঠার কোনরকম গুরুতর ক্ষতি না করেও যে কোন ছাত্র সপ্তাহে ১২ থেকে ২৫ ঘণ্টা বাইরের কাজ করতে পারেন। কলেজের ১২ থেকে ১৬টি পিরিয়ডের জন্য সপ্তাহে মোট ৩৬ থেকে ৪৮ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। ছাত্রদের নিম্নলিখিত বিষয়ে কিছুটা ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা চাই : সূত্রধরের কাজ, জরিপ করা, নক্শা তৈরী, রাজমিস্ত্রীর কাজ, মোটর চালানো, ফটো তোলা, কলকব্জা-মেরামত, রন্ধন-বিদ্যা, কৃষিকর্ম, যন্ত্রসঙ্গীত ইত্যাদি। ঘণ্টা দুয়েকের জন্য আহার্য পরিবেশকের কাজ করা ইত্যাদি সাধারণ কাজ তো কলেজ খোলা থাকার সময়ে অনেকেই করেন। এতে ছাত্রদের নিজ ভোজন-ব্যয় নির্বাহে সুবিধা হয়। কোন আংশিক স্বাবলম্বী ছাত্র গ্রীষ্মাবকাশে কাজ করে ১৫০ থেকে ২০০ ডলার বাঁচাতে সমর্থ হন। কানসাস, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়, পিটস্‌বার্গ ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়, এন্টিওক কলেজ ইত্যাদি ইনডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং 'কো-অপারেটিভ' শিক্ষণক্রমের ব্যবস্থা করেছেন এবং এর ফলে ছাত্ররা কোন কারখানায় কাজ করে এক বছরের শিক্ষণ-বেতন উপার্জন করতে পারেন। এতে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাও বাড়ে।

"মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় সিভিল ও ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর এই জাতীয় কো-অপারেটিভ শিক্ষণক্রম প্রবর্তন করার কথা বিবেচনা করছেন।

কো-অপারেটিভ শিক্ষণক্রম গ্রহণ করলে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্নাতক হতে এক-বছর বেশী লাগে।"

আমেরিকা যদি সে দেশের স্কুল-কলেজগুলিকে এমন ধাঁচে গড়ে তোলে যাতে ছাত্ররা শিক্ষণ-ব্যয় উপার্জন করতে পারে, তাহলে আমাদের স্কুল-কলেজে এটা আরও কত প্রয়োজনীয়। দরিদ্র ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়তে দেবার ব্যবস্থা করে তাঁদের ভিখারী করে দেবার বদলে তাঁদের কাজ যোগাড় করে দেওয়া কি শ্রেয় নয়? জীবিকা বা শিক্ষণ-ব্যয় নির্বাহের জন্য নিজের হাতপায়ে খাটা অভদ্রতা—এই ভুল ধারণা ভারতীয় যুবকদের মনে ঢুকিয়ে দেবার জন্য তাঁদের অবর্ণনীয় ক্ষতি হচ্ছে। নৈতিক এবং ভৌতিক—দ্বিবিধ অপকারই এতে হচ্ছে, বোধ হয় নৈতিক হানির পরিমাণই বেশী। যে কোন বিবেকবান ছেলের কাছে বিনা বেতনে পড়া সারা জীবন বোঝার মত মনে হয় এবং হওয়া উচিত। কেউ চায় না যে উত্তরকালে তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হোক যে শিক্ষা পাবার জন্য তাঁকে দয়ার দানের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। পক্ষান্তরে এমন কি কেউ আছেন যিনি নিজ দেহ মন ও আত্মার শিক্ষার জন্য সূত্রধর বা ঐ জাতীয় কোন কাজ করার সৌভাগ্যের কথা ভবিষ্যৎ জীবনে সগৌরবে স্মরণ করবেন না?

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৮-১৯২৮

১১

উৎসব পালন

জনৈক পত্রলেখক আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন যে দেওয়ালী উৎসবোপলক্ষে যাঁরা বাজি, খারাপ মিষ্টি এবং অস্বাস্থ্যকর আলোক-সজ্জার পিছনে বহু অর্থের অপচয় করার কথা ভাবছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে আমি যেন সতর্কবাণী উচ্চারণ করি। এ অনুরোধে আমি সোৎসাহে সাড়া দেব। আমার যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে আমি

এই দিনটিতে জনসাধারণকে দিয়ে নিজ গৃহ এবং অন্তঃকরণের পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করতাম এবং বালক-বালিকাদের জন্য নির্দোষ ও শিক্ষামূলক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করতাম। আমি জানি যে বাজি পোড়ানতে ছেলে-পিলেরা আনন্দ পায়। তবে এর কারণ হচ্ছে এই যে তাদের পূর্বজ আমরা তাদের ভিতর বাজি পোড়ানর অভ্যাস প্রবর্তন করেছি। বাজি সম্বন্ধে অজ্ঞ আফ্রিকার ছেলে-মেয়েরা বাজি চায় বা এতে আনন্দ পায় বলে আমি শুনি নি। এর বদলে তাদের মধ্যে নাচের প্রথা আছে। নানারকমের লাফঝাঁপ করে খেলা করা ও বনভোজনের চেয়ে ছেলেমেয়েদের পক্ষে আর কি শ্রেয়তর ও স্বাস্থ্যকর হতে পারে? তবে এসব চড়ুইভাতিতে তারা এমন সব মিষ্টান্ন খাবে না যার উপকার সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। তারা খাবে শুকনা বা টাটকা ফলমূল। ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে বালক-বালিকাদের ঘর পরিষ্কার ও চুনকাম করা শেখান যেতে পারে। শুরুতে যদি অন্ততঃ একাজ ছুটির দিনেও আরম্ভ হয়, তবুও এর ফলে তারা শ্রমের মর্যাদা কতকটা বুঝতে শিখবে। কিন্তু যে কথাটার উপর আমি বিশেষ জোর দিতে চাই, তা হচ্ছে এই যে, এইভাবে বাজি এবং অন্যান্য খাতে যে টাকাটা বাঁচবে, তার পুরোটা না হলেও অন্ততঃ একাংশ খাদি-কার্য সম্প্রসারণের জন্য দান করা উচিত। আর খাদির ব্যাপারে যদি একেবারে দিব্যি দেওয়া থাকে, তাহলে এ অর্থ এমন কোন সৎকাজে দান করা যেতে পারে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিটি উপকৃত হতে পারে। উৎসবের দিনে দেশের দীনতম ব্যক্তিটিও সঙ্গে আছে—এই অনুভূতি হৃদয়ে থাকার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছুতে হতে পারে না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-১০-১৯২৮

১২

যুবকরা কি করতে পারে ?

কয়েকদিন হল আগ্রার ইয়ুথ লীগের তরফ থেকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে একটি চিঠি এসেছে ঃ—

"ভবিষ্যতের কার্যক্রম সম্বন্ধে আমরা একেবারে অন্ধকারে রয়েছি। কৃষক ও আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক ; কিন্তু কোন প্রত্যক্ষ কার্যক্রম দেখা যাচ্ছে না। আমরা আশা করি যে আপনি এ বিপদ থেকে ত্রাণ পাবার জন্য কিছু বাস্তব কর্মপন্থা দেখিয়ে দেবেন। মনে হয় যে শুধু আমাদের প্রতিষ্ঠানই এরকম অসুবিধায় পড়েনি। সুতরাং আপনি নবজীবন বা ইয়ং ইণ্ডিয়াতে এর নিশ্চিত সমাধানের ইঙ্গিত দিলে তা অতীব কাম্য হবে।"

গোরক্ষপুরের ইয়ুথ লীগের অভিনন্দনপত্রে ঐ একই মনোভাবের প্রতিচ্ছবি প্রকট হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার ছাত্রদের সামনে মূর্তিমান আতঙ্ক—অন্নসমস্যার সম্মুখীন হবার উপায় জানতে চেয়েছিলেন। আমার মতে উভয় সমস্যাই পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং নগর-জীবনের পরিবর্তে গ্রামীণ-জীবন যদি যুবকদের আদর্শ হয়, তবে উভয় সমস্যার সমাধান সম্ভবপর। আমরা গ্রামীণ-সভ্যতার উত্তরসাধক। দেশের বিশালতা, জনসংখ্যার বিপুলতা এবং এ দেশের অবস্থিতি ও আবহাওয়া সবই আমার মতে গ্রামীণ-সভ্যতাকে এদেশের বিধিলিপি করার মূলে আছে। এর দুর্বলতাও সুবিদিত ; তবে তা অনতিক্রম্য নয়। আমার মতে কোন কঠোর পদ্ধতির বলে দেশের জনসংখ্যাকে ত্রিশ কোটির বদলে তিন কোটি বা ত্রিশ লক্ষে পরিণত না করা পর্যন্ত এর মূলোৎপাটন করে এর পরিবর্তে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমি এই কথা ধরে নিয়ে এ সমস্যার প্রতিবিধানের পরিকল্পনা দেব যে আমরা বর্তমানের গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতাকে চিরস্থায়ী করব, তবে এর সর্বমান্য দোষগুলির সংশোধন করার প্রচেষ্টাও চলবে।

এটা করা সম্ভব তখনই—যখন যুবকরা গ্রাম্য জীবন গ্রহণ করবেন। আর এ করতে হলে এমনভাবে জীবনযাত্রার পুনর্গঠন করা প্রয়োজন, যাতে ছুটির প্রত্যেকটি দিন তাঁরা নিজ স্কুল বা কলেজের আশেপাশের গ্রামে গিয়ে থাকতে পারেন এবং যাঁরা পড়াশুনা শেষ করেছেন বা যাঁরা মোটেই পড়াশুনা করছেন না, তাঁদের গ্রামেই স্থায়িভাবে বসবাস করার কথা চিন্তা করতে হবে। এই জাতীয় ছাত্রদের গ্রামসেবার উপযুক্ত গুণান্বিত করে তুলতে এবং গ্রামে সহজলভ্য সরল জীবনযাত্রা প্রণালীতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতে ইচ্ছুক হলে সম্মানজনক উপায়ে তাঁদের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দিতে অখিল ভারত চরকা-সঙ্ঘ বা এর পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বদাই প্রস্তুত। চরকা-সঙ্ঘ মাসিক ১৫৲ টাকা থেকে ১৫০৲ টাকা উপার্জনকারী দেশের প্রায় ১৫০০ যুবককে প্রতিপালন করে এবং এখনও চরকা-সঙ্ঘ এমন সব অগাণত যুবককে নিতে প্রস্তুত যাঁরা উত্মমী, সৎ ও পরিশ্রমী এবং যাঁরা শরীরশ্রম করতে লজ্জাবোধ করেন না। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও সীমাবদ্ধ হবার কারণ, জাতীয় শিক্ষার রেওয়াজ দেশে নেই। প্রচলিত পরিবেশ ও দৃষ্টিকোণের প্রতি বীতস্পৃহ প্রতিটি আগ্রহশীল যুবককে আমি এই দুটি নীরব অথচ অতীব কার্যকরী গঠনমূলক কাজের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মপন্থা অনুধাবন করতে বলি। এই প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের যুবকদের কাছে সেবার সঙ্গে সঙ্গে সম্মানজনক জীবিকা উপার্জনের পথ খুলে দিয়েছে। তবে তাঁরা এই দুটি মহান্ জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের শরণ নিন বা না নিন, তাঁরা যেন গ্রামজীবনে অনুপ্রবেশ করে সেবা গবেষণা এবং সত্যকার জ্ঞানার্জনের অসীম সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। অবকাশকালে অধ্যাপকবর্গ ছেলেমেয়েদের উপর বইএর বোঝা না চাপালেই ভাল করবেন। ছাত্রদের তাঁরা সে সময় গ্রামে শিক্ষামূলক সফরে যাবার উপদেশ দেবেন। ছুটির সদ্ব্যয় আমোদ-প্রমোদে, বই মুখস্থ করায় নয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৭-১১-১৯২৯

১৩

প্রার্থনা সম্বন্ধে আলোচনা

আপনারা আমাকে প্রার্থনার অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলতে বলায় আমি আনন্দিত হয়েছি। আমি বিশ্বাস করি যে প্রার্থনাই ধর্মের মূল এবং নির্যাস স্বরূপ। সুতরাং প্রার্থনা মানব-জীবনের মুখ্য কৃত্য হওয়া উচিত, কারণ ধর্ম ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। অবশ্য এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা যুক্তিবাদের আত্মশ্লাঘা পরবশ হয়ে বলেন যে ধর্মের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এ কথা হচ্ছে নাসিকা বিনা নিশ্বাস গ্রহণের মত। যুক্তি, সহজ প্রবৃত্তি বা কুসংস্কার—যে কোন ভাবেই হোক না কেন, মানুষ ঐশ্বরিক শক্তির সঙ্গে কোন না কোন রকমের সম্বন্ধ স্বীকার করে। চূড়ান্ত অজ্ঞাবাদী বা নাস্তিকও সুনীতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন এবং মানেন যে সুনীতির বিধান পালনে ভাল ও লঙ্ঘনে খারাপ হয়। বিখ্যাত নাস্তিক্যবাদী ব্রাডলও সর্বদা হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস প্রকাশ করার উপর জোর দিতেন। এইভাবে সত্যকথনের জন্য তাঁকে বহু পীড়ন সহ্য করতে হত; কিন্তু তিনি এতে আনন্দ পেতেন ও বলতেন যে সত্যই স্বয়ং সত্যের পারিতোষিক। সত্য পালন দ্বারা যে আনন্দ পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। এ আনন্দ অবশ্য পার্থিব নয়, ঐশ্বরিক শক্তির সঙ্গে সংযোগের ফলেই এর উৎপত্তি। এই জন্যই আমি বলেছি যে ধর্ম ছাড়া কেউ বাঁচতে পারেন না, এমন কি ধর্মের যিনি নিন্দা করেন তিনিও না।

এর পর দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রার্থনা মানব-জীবনের মূল; কারণ এই হচ্ছে ধর্মের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রার্থনা হয় আবেদনমূলক নচেৎ ব্যাপকার্থে একে অন্তর্লোকের মিলন বলা যেতে পারে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই এর চূড়ান্ত লক্ষ্য অভিন্ন। প্রার্থনা যখন আবেদনমূলক হয়, সে আবেদন হওয়া উচিত আত্মার

পরিশুদ্ধি ও চতুর্দিকস্থ অজ্ঞানতা নাশ ও তিমির-জাল থেকে আত্মাকে মুক্ত করার জন্য। অতএব নিজের ভিতর অনুপমের জাগরণ যাঁর কাম্য, তাঁকে প্রার্থনার শরণ নিতেই হবে। কিন্তু প্রার্থনা তো স্বরযন্ত্র বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুশীলন মাত্র নয় বা এ শুধু নিষ্প্রাণ শ্লোকের পুনরাবৃত্তি নয়। হৃদয় আলোড়িত করতে না পারলে যতই রাম নাম করা যাক না কেন, তার মূল্য নেই। প্রার্থনায় হৃদয়বিহীন শব্দমালার চেয়ে শব্দবিহীন হৃদয় অধিকতর কাম্য। যে ক্ষুধার কারণে প্রার্থনার জন্ম, প্রার্থনাকে তার তৃপ্তিবিধান করতে হবে। ক্ষুধার্ত মানুষ যেমন হৃদ্যতা সহকারে পরিবেষিত ভোজ্যে তৃপ্তি বোধ করে, উপবাসী আত্মাও তেমনি হৃদয়ে অনুরণন সৃষ্টিকারী প্রার্থনায় সন্তুষ্টি বোধ করবে। নিজের এবং আমার সঙ্গী-সাথীদের অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনাদের বলছি যে প্রার্থনার জাদুর পরিচয় যে ব্যক্তি পেয়েছেন, তিনি খাদ্য ব্যতিরেকে একাদিক্রমে একাধিক দিন থাকতে পারেন কিন্তু প্রার্থনা ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচবেন না। কারণ প্রার্থনা ছাড়া অন্তর্লোকের শান্তি নেই।

কেউ হয়ত বলবেন যে যদি তাই হয়, তাহলে তো আমরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই প্রার্থনা করছি। এ সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ নেই; কিন্তু আমরা নিত্য ভ্রান্তিকারী মরণশীল মানব বলে এমন কি তিলেকের জন্যও অন্তর্লোকচারী হতে পারি না। এমতাবস্থায় সেই অতীন্দ্রিয় শক্তির সঙ্গে চিরমিলন অসম্ভব। এইজন্য আমরা এমন কিছুটা সময় নির্দিষ্ট করে নিই, যখন অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য আমরা ভববন্ধন ছিন্ন করার প্রচেষ্টায় ব্রতী হই এবং সেই সময়টুকুর জন্য এই রক্ত-মাংসের পিণ্ডের ঊর্ধ্বে থাকার আন্তরিক চেষ্টা করি। সুরদাসের নিম্নোক্ত প্রার্থনাটি আপনারা শুনে থাকবেন:

মো সম কোন কুটীল খল কামী।
জেহি তন দিয়ো তাহি বিসরায়ো,
এইসো নমক হারামী॥

(অর্থাৎ আমার মত কুটিল, খল ও কামুক আর কেই বা আছে ? যাঁর কৃপায় এই শরীর পেয়েছি, তাঁকেই ভুলে বসে আছি, এতই কৃতঘ্ন আমি।)

এ হচ্ছে সেই স্বর্গীয় শক্তির সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য হৃদয়ের আকুল আকুতি। আমাদের বিচারে সুরদাস ছিলেন মহাপুরুষ ; কিন্তু নিজেকে তিনি পাপীর অধম মনে করতেন। আধ্যাত্মিক লোকে তিনি আমাদের বহু যোজন অগ্রগামী ছিলেন ; কিন্তু সেই পুরুষোত্তমের কাছ থেকে তিনি নিজেকে এতটা বিচ্ছিন্ন মনে করতেন যে হতাশা ও আত্মগ্লানিতে তিনি ঐ কাতর আর্তনাদ তুলেছিলেন।

প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তার কথা আমি বলেছি এবং আলোচনা প্রসঙ্গে প্রার্থনার মূল তত্ত্বের কথাও আমি চর্চা করেছি। আমাদের জন্ম অপরের সেবার জন্য এবং সকলে যথেষ্ট পরিমাণে সজাগ না হলে এ কর্তব্য সুসম্পাদিত হওয়া কঠিন। মানব হৃদয়ে নিরন্তর সুরাসুরের সংগ্রাম চলেছে এবং যে ব্যক্তি নিজ জীবনের ভরসাস্থল প্রার্থনারূপী নোঙরের আশ্রয় পান নি, তাঁর অসুর শক্তির কবলে পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। প্রার্থনাকারী মানব নিজেকে এবং সমগ্র বিশ্বকে নিয়ে শান্তিতে থাকবেন এবং এই দুনিয়ায় যিনি প্রার্থনাশীল হৃদয় ছাড়াই বিচরণ করেন, তিনি মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হবেন এবং বিশ্বজগতকেও দয়নীয় করে তুলবেন। সুতরাং মৃত্যুর পর মানবের উপর প্রভাব বিস্তারের কথা বাদ দিলেও ইহলোকেই প্রার্থনা মানুষের কাছে অমূল্য সম্পদ। আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে শৃঙ্খলা, শান্তি এবং স্থৈর্য আনার একমাত্র সাধনা হচ্ছে প্রার্থনা। আশ্রমের আমরা যে সব বাসিন্দা এখানে সত্যের সন্ধানে আসি ও যাঁরা সত্যানুভূতির জন্য প্রার্থনার অপরিহার্যতার কথা বিশ্বাস করেন, তাঁরাও এখনো প্রার্থনাকে অত্যাবশ্যক ব্যাপার বলে গণ্য করেন না। এর প্রতি আমরা অন্যান্য বিষয়ের মত নজর দিই না। অকস্মাৎ আমি একদিন এই মহাসুপ্তি থেকে জেগে উঠলাম

এবং বুঝতে পারলাম যে আমার এই কর্তব্যের প্রতি আমি গুরুতর অবহেলা করেছি। এইজন্য আমি কঠোর অনুশাসনমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করলাম এবং এর ফল খারাপ হওয়ার পরিবর্তে ভালই হয়েছে। এর কারণ অতীব স্পষ্ট। অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি নজর দিলে অন্যান্য বিষয় আপনিই ঠিক হয়ে যায়। চতুর্ভুজের একটি কোণ ঠিক করে ফেলুন, তাহলে বাকি কোণগুলি আপনা আপনিই ঠিক হয়ে যাবে।

সুতরাং আপনাদের দিনের সূচনা হোক প্রার্থনা দিয়ে এবং সে প্রার্থনাকে এমন প্রাণবন্ত করুন যে তা যেন সায়ংকাল পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে থাকে। প্রার্থনার দ্বারা সমগ্র দিবসের কর্মসূচীর উপর সমাপ্তির যবনিকা টেনে দিন এবং তাহলে দেখবেন যে আপনাদের রাত্রি হবে শান্তিপূর্ণ—দুঃস্বপ্ন-মুক্ত। প্রার্থনার পদ্ধতি নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। এর রূপ যাই হোক না কেন, এ যেন শুধু আমাদের সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগ সাধন করতে পারে। শুধু এইটুকু স্মরণ রাখবেন যে এর পদ্ধতি যে রকমই হোক না কেন, প্রার্থনা-মন্ত্র যখন কণ্ঠে উচ্চারিত হবে, আমাদের হৃদয় যেন সেই সময় ইতস্তত সঞ্চারশীল না হয়।

আমার বক্তব্য যদি আপনারা প্রণিধান করে থাকেন, তা হলে আপনাদের ছাত্রাবাসাধ্যক্ষকে উপাসনায় অনুপ্রাণিত না করা পর্যন্ত আপনারা শান্তি পাবেন না এবং একে বাধ্যতামূলক করে ছাড়বেন। স্বতঃ আরোপিত সংযম বাধ্যবাধকতা নয়। যিনি সংযম-বন্ধন থেকে মুক্তি অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারের পথ গ্রহণ করবেন, তিনি হবেন ইন্দ্রিয়ের দাস এবং যিনি নিজেকে নিয়মকানুন ও সংযমের বাঁধনে বাঁধবেন, তিনি তাঁর আত্মার বন্ধন মোচন করবেন। সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহনক্ষত্র সহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি পদার্থ একটি নিয়ম-বন্ধনে চলে। এই নিয়মের বাঁধন ছাড়া পৃথিবী এক মুহূর্তও চলত না। আপনাদের মত যাঁদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে নিজ সাথীর সেবা, তাঁরা যদি কোন

না কোন অনুশাসনের বাঁধন স্বীকার না করেন, তা হলে আপনারা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবেন। এবং প্রার্থনা হচ্ছে একটি অতীব প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক অনুশাসন। আমাদের সঙ্গে পশুকুলের পার্থক্য হচ্ছে শৃঙ্খলা ও সংযমে। আমরা যদি চতুষ্পদ হয়ে চলার পরিবর্তে উন্নত-শির হয়ে বিচরণ করতে চাই, তাহলে আমাদের অনুশাসন ও সংযমের মহত্ত্ব বুঝে স্বেচ্ছায় নিজ জীবনে একে প্রয়োগ করতে হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-১-১৯৩০

১৪

ছাত্রসমাজ ও অবকাশ

দেরাদুন থেকে জনৈক ছাত্রের যে পত্র পেয়েছি তার সংক্ষিপ্ত মর্ম নিম্নরূপ :—

"আমাদের কলেজের ছাত্রাবাসে ইতিপূর্বে ভাঙ্গীরা ভুক্তাবশিষ্ট নিত। কিন্তু দেশে নবজাগরণ আসার পর আমরা এ ব্যবস্থা বন্ধ করে তাদের পরিষ্কার রুটি ও ডাল দিয়ে থাকি। হরিজনরা এতে অসন্তুষ্ট। উচ্ছিষ্টে তারা ঘি এবং অন্যান্য মুখরোচক পদার্থের কিছু অংশ পেত। ছাত্ররা হরিজনদের জন্য এসবের ভাগ দিতে অসমর্থ। তাছাড়া আর একটা অসুবিধা আছে। আমরা না হয় নূতন রীতি প্রবর্তন করলাম ; কিন্তু হরিজনরা তো ভোজবাড়ির উচ্ছিষ্ট খেতেই থাকবে। এমতাবস্থায় কি কর্তব্য ? এর জবাব দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার প্রতি আর একটি অনুরোধ আছে। কিভাবে আমরা আগামী অবকাশের সুন্দরতম উপযোগ করতে পারি, সে সম্বন্ধেও আপনি কিছু লিখবেন।"

পত্রলেখক যে অসুবিধার কথা লিখেছেন, তা বাস্তব। উচ্ছিষ্ট গ্রহণে হরিজনরা এতটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, তাঁরা যে শুধু এতে কিছু মনে করেন না তাই নয়, তাঁরা মনে প্রাণে এ চানও। এ না পেলে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে বঞ্চিত হলেন বলে মনে করেন। কিন্তু এই শোচনীয় ঘটনা শুধু হরিজন ও বর্ণহিন্দুদের অধঃপতনের সীমাই নির্দেশ করে। অন্যত্র কি হয় এ নিয়ে ছাত্রদের চিন্তা করার

প্রয়োজন নেই। তাঁদের প্রথম বিবেচ্য বিষয় হল নিজেরা ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা এবং তাঁদের প্রতি আমার উপদেশ এই যে তাঁরা যেন নিজেদের জন্য সাধারণতঃ যা রান্না হয় তার উচিত মত কিয়দংশ তাঁদের ঝাড়ুদারদের জন্য আলাদা করে রাখেন। দে-াহুনের ছাত্রটি খরচের কথা তুলেছেন। সমগ্র ভারতের ছাত্রাবাস-জীবনের কথা আমি কিছুটা জানি। আমার বিশ্বাস এই যে ছাত্ররা সাধারণতঃ রসনাতৃপ্তির আহার্য ও বিলাস-ব্যসনের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করেন। এও আমি জানি যে অনেক ছাত্র যথেষ্ট পরিমাণ ভুক্তাবশিষ্ট না রাখা অমর্যাদাকর মনে করেন। তাঁদের আমি বলব যে কোন রকম ভুক্তাবশিষ্ট রাখাই হচ্ছে অমর্যাদাকর এবং দরিদ্র দেশবাসীর প্রতি অসম্মানসূচক। যতটা সহজে খেতে পারি, থালায় তার চেয়ে বেশী কিছু নেবার অধিকার কারও—বিশেষতঃ ছাত্রদের তো নেই। ছাত্রদের সুখাদ্য ও বিলাসোপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই। ছাত্রজীবনের কর্তব্য হচ্ছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আত্মসংযমের অনুশীলন করা এবং তাঁরা যদি আত্মসংযমের পথ গ্রহণ করে থালায় ভুক্তাবশিষ্ট না রাখার পরিষ্কার অভ্যাস অর্জন করেন, তাহলে তাঁরা দেখবেন যে, নিজেদের জন্য যা রান্না হয়, তার বেশ খানিকটা ঝাড়ুদারদের জন্য আলাদা করে রেখেও তাঁদের সাশ্রয় হচ্ছে।

অতঃপর এ কাজ করার পর, আমি চাই যে তাঁরা হরিজনদের সঙ্গে নিজ আত্মীয়ের মত আচরণ করবেন এবং তাঁদের সঙ্গে সহানুভূতি সহকারে কথা বলবেন। অপরের উচ্ছিষ্ট খাওয়া কেন অনুচিত, তা তাঁরা তাঁদের বুঝিয়ে বলবেন ও তাঁদের জীবনে অন্যবিধ সংস্কার প্রবর্তন করার প্রয়াস পাবেন।

অবকাশকালের সদুপযোগ সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে, উদ্যম সহকারে কর্মরত হলে নিঃসন্দেহেই তাঁরা বহু কিছু করতে পারেন। এর মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ এখানে আমি করছি ঃ—

১। অবকাশের মেয়াদ বুঝে সংক্ষিপ্ত অথচ সুপরিকল্পিত পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করে দিবাভাগে এবং রাত্রে বিদ্যালয় পরিচালনা করা।

২। হরিজন পল্লীতে যাওয়া এবং হরিজন বস্তি সাফাই করা। এ কাজে হরিজনদের সহায়তা পেলে নেওয়া।

৩। হরিজন ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে বেরোনো এবং তাদের গ্রামের সন্নিকটস্থ দর্শনযোগ্য স্থান দেখানো। এই সুযোগে তাদের প্রকৃতিপাঠ বিদ্যা শেখানো। এই ভাবে তাদের নিজ পরিবেশ সম্বন্ধে কৌতূহলী করা যেতে পারে এবং ভূগোল ও ইতিহাসের মোটামুটি জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে।

৪। রামায়ণ ও মহাভারতের ছোট ছোট সহজ গল্প তাদের পড়ে শোনানো।

৫। তাদের সহজ ভজন গান শেখানো।

৬। হরিজন ছেলেমেয়েদের দেহ পরিষ্কার করে দেওয়া ও বালক এবং প্রাপ্তবয়স্ক সকলকেই স্বাস্থ্যতত্ত্বের জ্ঞান দেওয়া।

৭। হরিজনদের অবস্থা সম্বন্ধে বাছাই করা এলাকায় বিশদ তথ্য সংগ্রহ করা।

৮। অসুস্থ হরিজনদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

এ পর্যন্ত আমি শুধু হরিজন-সেবার কথাই বলেছি। তবে বর্ণ-হিন্দুদের কাছে সেবার প্রয়োজন এদের চেয়ে কম নয়। সময় সময় ছাত্ররা অতীব বিনীতভাবে তাঁদের কাছে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী বাণী নিয়ে উপস্থিত হতে পারেন। তাঁদের ভিতরও এতটা অজ্ঞতা বিদ্যমান, সহজেই যা সত্য তথ্যসমন্বিত বিবেচনাপূর্ণ বক্তৃতা দিলে দূর হতে পারে। ছাত্ররা অস্পৃশ্যতার সমর্থক ও বিরোধীদের সংখ্যা সংগ্রহ করতে পারেন এবং এ কার্য করার সময় যেসব কূপ, পুষ্করিণী, বিদ্যালয় ও মন্দিরে হরিজনদেরও সম অধিকার আছে তার তালিকা রচনা করতে পারেন।

বিধিবদ্ধ ও নিয়মনিষ্ঠভাবে এসব কাজ করলে তাঁরা দেখতে

পাবেন যে এর ফল কেমন চমকপ্রদ হয়। প্রত্যেক ছাত্রের একটি করে খাতা রাখা উচিত ও তাতে এই সব কাজের বিবরণ লেখা উচিত। অবকাশের অবসানে তাঁরা এর থেকে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল বিবরণী প্রণয়ন করে নিজ নিজ প্রদেশের হরিজন সেবক সঙ্ঘের কাছে পাঠাবেন। অন্যান্য ছাত্ররা এই কর্মসূচীর এক বা একাধিক ধারা গ্রহণ করুন আর নাই করুন, পত্রলেখক স্বয়ং ও তাঁর অন্তরঙ্গের দল কি করেছেন, আমি যেন পত্রলেখকের কাছ থেকে তার বিবরণ পাই।

হরিজন, ১-৪-১৯৩৩

১৫

যুবকদের জন্য

অনেক জায়গায় আজকাল বয়োবৃদ্ধদের সব কথা নিয়ে বিদ্রূপ করা যুবকদের কাছে একটা ফ্যাশানের মধ্যে গণ্য হয়েছে। আমি একথা বলতে চাই না যে, এ বিশ্বাসের সপক্ষে একেবারে কোন কারণ নেই। তবে প্রবীণরা যাই বলুন, তাকে স্রেফ বৃদ্ধদের কথা বলেই লঘু করার মনোবৃত্তি সম্বন্ধে আমি দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দিতে চাই। সময় সময় শিশুর মুখে যেমন জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি বৃদ্ধদের কাছেও প্রজ্ঞার নিদর্শন মেলে। সেরা উপায় হচ্ছে, যাঁর কাছে যা কিছু শোনা যাক না কেন, যুক্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকে তার বিচার করা। গর্ভনিরোধক সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে গর্ভনিয়ন্ত্রণের বিষয়ের আমি পুনরালোচনা করতে চাই। প্রতিনিয়ত কানের কাছে এই কথা বলা হয়ে থাকে যে, দেহের ক্ষুধার খোরাক জোগানো আইনসঙ্গত ঋণ পরিশোধ করার মতই পবিত্র দায়িত্ব এবং এ না করার শাস্তি হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমাপহ্নব। এই দেহের ক্ষুধার সঙ্গে বংশবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা যুক্ত নেই এবং গর্ভনিরোধক সাজ-সরঞ্জামের সমর্থকরা বলেন যে উভয়পক্ষের সম্মতি না থাকলে গর্ভসঞ্চাররূপী দুর্ঘটনার প্রতিরোধ

করতে হবে। আমার নম্র নিবেদন এই যে, যেখানেই প্রচার করা হোক না কেন, এ এক ভীষণ নীতি। বিশেষ করে ভারতের মত যে দেশে মধ্যবিত্ত সমাজের পুরুষরা সৃজন-ক্রিয়ার দুরুপযোগের ফলে প্রায় পুরুষত্বহীনের কোঠায় এসে পৌঁছেছেন, সেখানে এ আরও ভয়ঙ্কর। রীরংসা বৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধন যদি কর্তব্য বলে পরিগণিত হয়, তাহলে কিছুদিন আগে আমি যেসব অস্বাভাবিক পাপের কথা উল্লেখ করেছিলাম, সেসব এবং লালসা-তৃপ্তির অন্যবিধ উপায়-সমূহকেও কাম্য বলে স্বীকার করতে হয়। পাঠকদের জেনে রাখা উচিত যে এমন কি প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিরাও তথাকথিত কামবিকারের সমর্থক। কথাটায় হয়তো অনেকে চমকে উঠবেন। তবে কোন না কোন রকমে একবার এসব যদি মর্যাদার ছাপ পায়, তাহলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমলৈঙ্গিক রতিবাসনা তৃপ্তির রেওয়াজ চালু হবে। আমার কাছে গর্ভনিরোধক সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করা আর বিচিত্র উপায়ে রমনেচ্ছায় নিবৃত্তিসাধন সমান জিনিস এবং এর ফল যে কি হয়, তা অনেকেরই জানা নাই। স্কুলের ছেলেমেয়েদের ভিতর এই গোপন পাপ কী বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, তা আমি জানি। বিজ্ঞানের নামে ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুমোদনক্রমে গর্ভনিরোধক যন্ত্রপাতির প্রবর্তনের ফলে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে ও সমাজ-জীবনকে কলুষতা মুক্ত করার কাজে ব্রতী সংস্কারকদের কাজ এখনকার মত প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। একথা আজ গোপন নয় যে, স্কুল-কলেজের ছাত্রী এমন সব অনেক বয়স্থা মেয়ে আছে, যাঁরা গর্ভনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় পুস্তকাবলী এবং পত্রপত্রিকা পাঠ করেন ও এমন কি অনেকের কাছে গর্ভানরোধক সাজ-সরঞ্জাম থাকে। শুধু বিবাহিতাদের মধ্যে এসবের ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখা অসম্ভব। যখন স্বাভাবিক পরিণতি সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন হয়ে শুধু পাশববৃত্তির তৃপ্তিসাধন করাই বিবাহের লক্ষ্য ও পরমার্থ জ্ঞান করা হয়, তখন বিবাহ তার পবিত্রতা হারিয়ে ফেলে।

আমার এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে, যেসব ভদ্রমহোদয় ও মহিলা ধর্মীয় উন্মাদনায় আবিষ্ট হয়ে এর সপক্ষে প্রচার করছেন, তাঁরা এই ভ্রান্ত ধারণার অনুবর্তী যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে গর্ভধারণে অনিচ্ছুক রমণীদের তাঁরা বাঁচার রাস্তা দেখাচ্ছেন। অথচ তাঁদের এই কাজের ফলে দেশের যুবক-যুবতীদের মারাত্মক হানি হচ্ছে। যাঁরা সত্যসত্যই সন্তান সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ইচ্ছুক, তাঁরা সহজে তাঁদের কাছে পৌঁছাতে পারবেন না। আমাদের দেশের দরিদ্র রমণীদের পাশ্চাত্য ললনাদের মত শিক্ষা-দীক্ষা নেই। এ প্রচার নিশ্চয় মধ্যবিত্ত সমাজের নারীদের জন্য হচ্ছে না। কারণ আর যাই হোক, দরিদ্র নারীদের মত তাঁদের এতে এতটা প্রয়োজন নেই।

তবে এই প্রচারে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে, এর ফলে প্রাচীন আদর্শ বাতিল করে তার জায়গায় এমন এক আদর্শ কায়েম করার ব্যবস্থা হচ্ছে, যা কার্যান্বিত হলে জাতির মানসিক ও দৈহিক অবলুপ্তি ঘটবে। পুরুষের দেহস্থিত সেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদার্থের অপচয় সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্ররাজি যে সব আতঙ্ককর কথা বলছে, তা মোটেই অজ্ঞতা-প্রসূত কুসংস্কার নয়। যে গৃহস্থ তার সেরা বীজ ঊষর ভূমিতে বপন করে বা যে কৃষক তার উৎকৃষ্ট ক্ষেতে এমন ভাবে ভাল বীজ নিয়ে থাকে যে তা যেন অঙ্কুরিত না হয়, তাদের আর কি বলা যেতে পারে? ভগবান মানুষকে অতুলনীয় জীবনীশক্তি-বিশিষ্ট বীজের অধিকারী করেছেন এবং নারীকে দিয়েছেন এমন ক্ষেত্র, সমগ্র ভূমণ্ডলে যার জুড়ি নেই। মানুষ তার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদের অপচয় করবে—এটা নিশ্চয় চূড়ান্ত মূর্খতা। অতীব মূল্যবান হীরা-জহরতের চেয়েও সতর্কভাবে এর হেফাজত করা প্রয়োজন। এইভাবে যে নারী তার প্রাণদায়িনী ক্ষেত্রে জেনেশুনে নষ্ট হতে দেবার জন্য বীজ গ্রহণ করে, সেও অপরিসীম মূঢ়তার দোষে দোষী। এদের উভয়েই নিজ সম্পদের দুরুপযোগের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে এবং তাদের যা দেওয়া হয়েছিল,

তা তারা হারাবে। রতিকামনা মহৎ ও সুন্দর এতে সন্দেহ নেই। এতে লজ্জাবোধ করার কিছু নেই। কিন্তু শুধু সৃষ্টিতেই এর সার্থকতা। এছাড়া অন্য কোনভাবে এর প্রয়োগ ঈশ্বর ও মানবতার বিরুদ্ধে পাপস্বরূপ। কোন না কোন প্রকারের গর্ভনিরোধক সাজ-সরঞ্জাম আগেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে সেকালে এর ব্যবহার পাপজনক বলে মনে করা হত। আমাদের যুগের কেরামতি হচ্ছে পাপকে পুণ্য বলে চালানো। গর্ভনিরোধক সাজ-সরঞ্জামের প্রচারকেরা ভারতের যুবকদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছেন এই যে, আমি যাকে ভ্রান্ত আদর্শ মনে করি, তাঁরা তাঁদের মাথায় তা-ই ঢোকাচ্ছেন। যেসব যুবক-যুবতীর হাতে ভারতের ভাগ্য নির্ভরিত, তাঁরা যেন এই মেকী ভগবান সম্বন্ধে সতর্ক হন এবং ভগবান তাঁদের যে সম্পদ দিয়েছেন, তা যেন তাঁরা সযত্নে রক্ষা করেন ও ইচ্ছা হলে যেজন্য এর সৃষ্টি সে কাজে ব্যবহার করেন।

হরিজন, ২৮-৩-১৯৩৬

১৬

যৌনশিক্ষা

গুজরাতের মত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও আজকাল যৌন গূঢ়ৈষা ক্রমশঃ দৃঢ়মূল হচ্ছে। আর উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে যাঁরা এর কবলিত হন, তাঁরাই আবার মনে করেন যে এ যেন একটা গৌরবের বিষয়। ক্রীতদাস যখন তার লৌহবলয় সম্বন্ধে গর্বানুভব করে ও মূল্যবান অলঙ্কারের মত তার প্রতি আসক্ত হয়, তখনই বুঝতে হবে যে সেই ক্রীতদাসের প্রভুর পূর্ণ বিজয় লাভ হয়েছে। কিন্তু রতিদেবতার আপাতদৃষ্টিতে নয়নমোহনকারী এই সাফল্য অবশেষে যে ক্ষণস্থায়ী ও অবাঞ্ছিত মনে হবে, এ বিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয়। নির্বিষ বৃশ্চিকের মত শেষ পর্যন্ত এ শূন্যগর্ভ বলে প্রমাণিত হবে। তবে তার অর্থ এই নয় যে ইত্যবসরে আমরা হাত-

পা গুটিয়ে বসে থাকব। এর পরাভবের নিশ্চয়তা যেন আমাদের অলীক নিরাপত্তার সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন করতে না পারে। কোন পুরুষ বা রমণীর অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিপ্রকাশ হচ্ছে কামনা-বাসনার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করা। বাসনাজয়ী না হওয়া পর্যন্ত মানুষ নিজের উপর রাজত্ব করার আশা পোষণ করতে পারে না। আর আত্মশাসন বিনা স্বরাজ বা রামরাজত্বের ভরসা নেই। আত্ম-শাসন ব্যতিরেকে সর্বসাধারণকে শাসন করতে যাওয়া আত্ম-প্রতারণার নামান্তর মাত্র। এ যেন সুন্দর রঙ-করা মাটির আম। বাইরে থেকে দেখতে মনোহর ; কিন্তু আসলে অন্তঃসারশূন্য। যে কর্মী নিজ কামনা-বাসনা সংযত করতে শেখেন নি, তিনি হরিজন সেবা, সাম্প্রদায়িক ঐক্য, খাদি, গোরক্ষা বা গ্রামোন্নয়ন আদি কোন ক্ষেত্রেই সত্যকার সেবা করতে পারেন না। এই জাতীয় মহান কার্য শুধু বৌদ্ধিক সম্পদ দ্বারা সাধিত হতে পারে না। এর জন্য নৈতিক ও আত্মিক শক্তি প্রয়োজন। আত্মার শক্তি আসে ঈশ্বর-কৃপায় এবং যিনি বাসনার দাস, তিনি কখনও ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করতে পারেন না।

সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে এই—আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে যৌন-বিজ্ঞানের স্থান কি হবে বা আদৌ এর কোন স্থান থাকবে কিনা ? যৌনবিজ্ঞান দুই প্রকারের। একরকম যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও নিবৃত্তি শেখায় ও অপরটি যৌন উত্তেজনা বাড়ায় ও এর খোরাক সংগ্রহে প্রবুদ্ধ করে। প্রথমোক্ত শিক্ষা ছেলেমেয়েদের জন্য যতটা প্রয়োজন, দ্বিতীয় ধরনের শিক্ষা ঠিক ততটাই ক্ষতিকারক ও বিপজ্জনক বলে একান্ত বর্জনীয়। কামকে মানুষের পয়লা নম্বরের শত্রু আখ্যা দিয়ে সকল ধর্ম ঠিকই করেছে। ক্রোধ বা বিদ্বেষকে সকলে দ্বিতীয় স্থান দিয়েছে। গীতার মতে কাম থেকেই ক্রোধের উৎপত্তি। গীতায় অবশ্য কাম কথাটি ব্যাপকার্থে প্রযুক্ত হয়েছে। তবে যে সংকুচিত অর্থে শব্দটি এখানে প্রয়োগ করা হল, গীতার উপদেশ সে অর্থেও সমান কার্যকরী।

অবশ্য তবুও মূল প্রশ্নের জবাব দেওয়া বাকি থেকে যায়। কথা হচ্ছে এই যে সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীদের প্রজনন-যন্ত্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া কাম্য কিনা? আমার মনে হয় তাঁদের এ সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জ্ঞান দান করা উচিত। বর্তমানে তাঁদের যে কোন উপায়ে এতদ্‌সম্বন্ধীয় জ্ঞানার্জনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় ও ফলে তাঁরা পথভ্রান্ত হয়ে নানারকম কুক্রিয়ার কবলে পড়েন। যৌন কামনা সম্বন্ধে জোর করে চোখ বুজে আমরা যথোচিত ভাবে এর নিয়ন্ত্রণ বা দমন করতে পারব না। সুতরাং আমি তরুণবয়স্ক বালক-বালিকাদের নিজ প্রজনন যন্ত্রের তাৎপর্য ও যথাযথ উপযোগিতা শিক্ষা দেবার ঐকান্তিক সমর্থক এবং আমার উপর যেসব ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার পড়েছিল, তাঁদের আমি আমার স্বকীয় পদ্ধতিতে এ সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু আমি যে ধরনের যৌন শিক্ষা চাই, তার লক্ষ্য হবে যৌন আকাঙ্ক্ষাকে জয় করে এর থেকে নিবৃত্ত হওয়া। এ শিক্ষা স্বতঃই ছাত্রদের মানুষ ও পশুর পার্থক্য বুঝিয়ে দেবে, তাঁদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করবে যে মস্তিষ্ক ও হৃদয়—এই উভয়বিধ বৃত্তির আধার হবার একমাত্র সৌভাগ্য হয়েছে শুধু মানুষেরই। তাঁদের জানতে হবে যে, মনুষ্য কথাটির শব্দ-রূপার্থের যথাযথ পরিচয় তাঁদের মাঝে আছে, অর্থাৎ তাঁরা প্রবৃত্তিতাড়িত হলেও বিচারশীল জীব বটেন। অতএব অন্ধ প্রবৃত্তির কাছে বিচার-ক্ষমতার সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেওয়া মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দেবার সমতুল। মানুষের ভিতর বিচারশক্তি ক্রমাভিব্যক্ত হয় ও প্রবৃত্তি যুক্তির দ্বারা চালিত হয়; কিন্তু পশুর ভিতর আত্মা চিরকালই সুপ্তিমগ্ন। হৃদয়কে সজাগ করার অর্থ নিদ্রামগ্ন আত্মাকে জাগরিত করা, যুক্তিবোধের ঘুম ভাঙ্গানো এবং সু ও কুর ভিতর পার্থক্য করার স্ফুরণ ঘটানো।

সত্যকার এই যৌন বিজ্ঞানের শিক্ষা দেবেন কে? নিঃসন্দেহে যিনি ইন্দ্রিয় দমন করেছেন তিনি-ই। জ্যোতিবশাস্ত্র বা তৎসংশ্লিষ্ট

বিষয় শিক্ষা দেবার জন্য আমাদের এমন সব শিক্ষক প্রয়োজন হয়, যাঁরা এসব বিষয় ভাল ভাবে জানেন ও এ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেছেন। এইভাবে যৌনবিজ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দমন-বিজ্ঞান শেখবার জন্য আমাদের এমন সব শিক্ষক প্রয়োজন, যাঁরা এ সম্বন্ধে চর্চা করেছেন ও আত্মজয় করেছেন। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত না হলে সুমহান ভাবোদ্যোতক বাক্যও নিষ্প্রাণ ও জড়বৎ প্রতীয়মান হয় এবং জনমানসে প্রবেশ করা ও হৃদয় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা এর থাকে না। অথচ আত্মোপলব্ধি ও সত্যকার অভিজ্ঞতার ফলে উৎসারিত বাক্যাবলী সর্বদা ফলপ্রসূ হয়।

আজকাল আমাদের সমগ্র পরিবেশ—পঠন পাঠন চিন্তা সামাজিক আচার ব্যবহার ইত্যাদি সব কিছুকেই একধার থেকে কামোদ্দীপক আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এর হাত এড়ানো অতি কঠিন ব্যাপার। তবে নিঃসন্দেহে এ লেগে পড়ে থাকার মত কাজ। আত্মসংযমকে মানুষের সর্বোচ্চ কর্তব্য বিবেচনাকারী জনকয়েক মাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষাগুরুও যদি থাকেন এবং তাঁরা যদি সত্যকার জ্বলন্ত বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হন ও তাঁরা যদি সদাজাগ্রত ও নিয়ত ক্রিয়াশীল থাকেন, তাহলে তাঁদের প্রযত্নের ফলে গুজরাতের সন্তান-সন্ততিদের চলার পথ আলোকোদ্ভাসিত হবে, অজ্ঞজন কামুকতার পঙ্কে নিপতিত হবার হাত থেকে ত্রাণ পাবেন এবং যাঁরা ইতিপূর্বে এর কবলিত হয়েছেন, তাঁদেরও পরিত্রাণের পথ পাওয়া যাবে।

হরিজন, ২১-১১-১৯৩৬

১৭

ছাত্রসমাজ ও ধর্মঘট

ছাত্রদের বাক্-স্বাধীনতা ও অবাধ বিচরণের স্বাধীনতার সপক্ষে আন্দোলন করলেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছাত্র-ধর্মঘট এবং ছাত্রদের

দ্বারা বিক্ষোভ প্রদর্শন আমি সমর্থন করতে অক্ষম। ছাত্রদের মতামত প্রকাশের সর্ববিধ স্বাধীনতা থাকা চাই। তাঁরা ইচ্ছামত যে-কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতি জ্ঞাপন করতে পারেন। কিন্তু আমার মতে পাঠ্যাবস্থায় তাঁদের ইচ্ছামত যা-কিছু করার স্বাতন্ত্র্য থাকা উচিত নয়। সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনা করা সম্ভব নয়। তবে জাতীয় আন্দোলন-কালে কঠোরভাবে কোন সীমারেখা টানা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অবশ্য তখনকার অবস্থায় 'ধর্মঘট' শব্দটি প্রয়োগ করা চলতে পারে কি না, তা একটি বিবেচ্য বিষয়। যাই হক, তখন আর তাঁদের ধর্মঘট করতে হয় না। তখন সর্বব্যাপক ধর্মঘট শুরু হয়। অর্থাৎ সাময়িকভাবে পড়াশুনা মুলতুবি রাখতে হয়। তাই আপাতদৃষ্টিতে যাকে ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে, আসলে তা ব্যতিক্রম পদবাচ্য নয়।

হরিজন, ২-১০-১৯৩৭

১৮

ছাত্রদের পক্ষে লজ্জার বিষয়

প্রায় দুমাস যাবত আমার দপ্তরে পাঞ্জাবের একটি কলেজের ছাত্রীর একটি অত্যন্ত করুণ পত্র পড়ে আছে। সময়াভাবের জন্য মেয়েটির পত্রের জবাব দিতে পারি নি বলাটা খানিকটা বাজে অজুহাতের মত শোনাবে। আসল কথা এই যে তাঁর প্রশ্নের জবাব জানলেও পাকেপ্রকারে জবাব দেবার হাঙ্গামা আমি এড়াতে চাইছিলাম। ইতিমধ্যে আর একজন অতীব অভিজ্ঞতাসম্পন্না ভগ্নীর একটি চিঠি পেলাম এবং তখন মনে হল যে কলেজের ঐ ছাত্রীটি যে অতীব প্রত্যক্ষ অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন, আর তার সম্বন্ধে আলোচনা না করলে চলে না। পত্রের ছত্রে ছত্রে মেয়েটির গভীর ভাবাবেগের ছাপ পড়েছে। তাই সম্পূর্ণ পত্রটি উদ্ধৃত করা সম্ভব না হলেও তার প্রতি আমি যথাসম্ভব ন্যায়বিচার করব ঃ

"ইচ্ছা না থাকলেও মেয়েদের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন তাদের একলা বাইরে বেরোতে হয়। শহরের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা বা এক শহর থেকে অন্য শহরে সময় সময় তাদের যাবার দরকার পড়ে। এই কারণে তাদের যখন একলা পাওয়া যায় তখন কু-স্বভাব ব্যক্তিরা তাদের উত্যক্ত করে। পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা অসৌজন্যমূলক এবং এমন কি অশ্লীল ভাষা উচ্চারণ করে। আর তাদের মনে ভয়ডর না থাকলে তারা আরও দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে অহিংসার কর্তব্য কি তা আমি জানতে ইচ্ছুক। অবশ্য এরকম অবস্থায় হিংসার প্রয়োগ তো হাতের মধ্যেই রয়েছে। মেয়েটি যদি যথেষ্ট সাহসী হয় তবে সে সেই বদলোকটিকে শায়েস্তা করার জন্য হাতের সামনে যা পাবে তা-ই কাজে লাগাবে। মেয়েটি অন্ততঃ চেঁচামেচি জুড়ে দিতে পারে এবং তার ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়ে বদমায়েসটির পিঠে ভালমত চাবুকের দাগ পড়ার সম্ভাবনা আছে। তবে আমি একথা জানি যে এর ফলে দুর্গতিকে শুধু মুলতুবি রাখা হয়, এ কোন স্থায়ী সমাধান নয়। মানুষ দুর্ব্যবহার করলেও একটা আশা থাকে যে যুক্তি প্রেম-ভাব এবং বিনয়ের পরিচয় দিলে তার মন পাল্‌টানো যেতে পারে। কিন্তু সাইকেলে করে যেতে যেতে কেউ যখন পুরুষ-অভিভাবকহীনা মহিলাদের উদ্দেশ্যে কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করে তখন কি করা সম্ভব? তার সঙ্গে যুক্তিতর্কে প্রবৃত্ত হবার অবকাশ নেই। তার সঙ্গে হয়ত আর কোন দিন দেখাই হবে না। তাকে এর পরে চেনাও যাবে না, বা তার হালহদিসও জানা নেই। এ অবস্থায় দুর্ভাগা মেয়েদের উপায় কি? উদাহরণস্বরূপ আমার গতকালকার (২৬শে অক্টোবর) অভিজ্ঞতার কথা বলব। রাত প্রায় সাড়ে সাতটার সময় একটি বিশেষ কাজে আমার একটি বান্ধবীর সঙ্গে আমি যাচ্ছিলাম। সে সময় কোন পুরুষ-সাথী পাবার উপায় ছিল না এবং কাজটাও মুলতুবি রাখার মত নয়। রাস্তায় একটি শিখ-যুবক সাইকেলে চড়ে পার হয়ে গেল এবং আমরা তার কথা শ্রবণযোগ্য দূরত্বের মধ্যে থাকাকালীন সব সময়ে সে একটি কথা বলেই চলল। বুঝলাম সে কথা আমাদের লক্ষ্য করে। আমরা ক্ষুণ্ণ হলাম ও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। রাস্তায় বিশেষ জনমানব ছিল না। দুই-এক পা যেতে না যেতেই সেই সাইকেল-আরোহী ফিরে এল। বেশ খানিকটা দূর থেকেই তাকে আমরা চিনতে পেরেছিলাম। সে

আমাদের দিকেই আসতে লাগল। আমাদের সামনে নেমে পড়া না পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া—কি যে তার মতলব ছিল ভগবানই জানেন। আমার মনে হল বিপদ আসন্ন। শরীরের শক্তিতেও আমাদের ভরসা ছিল না। নিজে আমি গড়পড়তা মেয়েদের চেয়ে দুর্বল। তবে আমার হাতে একখানা ভারি বই ছিল। কি জানি কি করে হঠাৎ আমার মনে সাহস এল। ভারি বইখানা সাইকেলের দিকে ছুঁড়ে মেরে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'ফের ওসব বলবে?' অতিকষ্টে সে সাইকেলের ভারসাম্য বজায় রেখে জোরে পা চালিয়ে পালিয়ে গেল। আমি যদি ঐভাবে সাইকেলের দিকে বইখানি ছুঁড়ে না মারতাম তাহলে সারা পথ সে হয়ত ঐসব কুৎসিত কথা বলে আমাদের বিরক্ত করত। এটা অবশ্য অতি সাধারণ ও অনুল্লেখযোগ্য ঘটনা। আপনি যদি লাহোরে এসে আমাদের মত হতভাগ্য মেয়েদের কাহিনী শোনার অবকাশ পেতেন তাহলে বড় ভাল হত। আপনি নিশ্চয় এর সম্যক্ সমাধান খুঁজে পাবেন। প্রথমতঃ আমাকে এই কথা বলুন যে ঐরকম অবস্থায় কিভাবে মেয়েরা অহিংসা-নীতি প্রয়োগ করে আত্মরক্ষা করতে পারে? দ্বিতীয়তঃ এইসব হীনচেতা যুবকদের মহিলাদেরকে অসম্মান করার রোগ থেকে মুক্ত করার উপায় কি? আপনি নিশ্চয় একথা বলবেন না যে যতদিন না মেয়েদের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ করতে শিক্ষাপ্রাপ্ত নবীন মানবসমাজের অভ্যুদয় হচ্ছে, ততদিন ধৈর্য ধরে আমাদের এ অপমান সয়ে যেতে হবে। সরকার হয় এ সামাজিক দুরাচার বন্ধ করতে অনিচ্ছুক আর নয় তার সে শক্তি নেই। বড় বড় নেতাদের এ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কোন সাহসিকা কোন অসৌজন্যকারী যুবককে উচিত শিক্ষা দিয়েছে শুনলে বলেন, 'ঠিক করেছে। এইভাবে সব মেয়েদের চলা উচিত।' সময় সময় কোন কোন নেতা ছাত্রদের এইসব বদভ্যাসের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতাও দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই গুরুতর সমস্যার সমাধানের জন্য কেউ নিরন্তর প্রযত্নশীল নন। আপনি একথা জেনে দুঃখিত ও বিস্মিত হবেন যে দেওয়ালী ও অন্যান্য পর্বের সময় সংবাদপত্রে এই মর্মে সব বিজ্ঞপ্তি বেরোয় যে মেয়েরা যেন এমন কি দীপান্বিতার আলোক-সজ্জা পর্যন্ত দেখতে না বেরোয়। শুধু এই একটি ঘটনা থেকেই বুঝতে পারবেন যে পৃথিবীর এই অংশে আমরা কী রকম হীন অবস্থায় নেমে গেছি। ঐসব বিজ্ঞপ্তির লেখক ও পাঠক কারও মনে এই জাতীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার জন্য এতটুকু লজ্জাবোধ নেই।"

আর একটি পাঞ্জাবী মেয়েকে আমি এই চিঠিটি পড়তে দিয়েছিলাম। তিনি নিজ কলেজ-জীবনের কথা উল্লেখ করে পত্র-লেখিকার বক্তব্য সমর্থন করলেন এবং জানালেন যে এই মেয়েটি যা লিখেছেন অধিকাংশ মেয়ের অভিজ্ঞতাই এই ধরনের।

আর একজন যে অভিজ্ঞতাসম্পন্না মহিলার কথা উল্লেখ করেছিলাম, তিনি তাঁর লক্ষ্ণৌ-এর বান্ধবীর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে পিছনের সারিতে উপবিষ্ট ছেলেরা নানারকম অভব্য উক্তি করে তাঁদের বিরক্ত করে। সেখানকার ছেলেরা তাঁদের সঙ্গে যেসব ঠাট্টা-তামাসা করতে যায়, তার কথা পত্রলেখিকা উল্লেখ করলেও এখানে আমি আর তার পুনরালোচনা করছি না।

শুধু যদি তৎকালীন ও ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানের কথা আলোচনা করতে হয় তাহলে বলতে হবে যে, যে মেয়েটি নিজেকে দুর্বল মনে করেন তাঁর কাজ অর্থাৎ সাইকেলের আরোহীর প্রতি বই ছুঁড়ে মারাই ঠিক। প্রতিকারের এ পন্থা বহুদিনের। এবং একাধিক বার আমি বলেছি যে হিংস আচরণ করতে ইচ্ছুক হলে শারীরিক দুর্বলতা—এমন কি অধিকতর বলশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে হিংসার আয়ুধ প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যের বাধা নয়। আর আজকাল দৈহিক হিংসা প্রয়োগ করার এমন সব পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে যে একটুখানি বুদ্ধি থাকলে ছোট্ট একটি মেয়েও হত্যা এবং ধ্বংস সাধন করতে পারে। পত্রলেখিকা বর্ণিত অবস্থায় এপন্থায় মেয়েদের আত্মরক্ষা করার উপায় শিক্ষা দেবার রেওয়াজও আজকাল দেখা যাচ্ছে। তবে পত্রলেখিকা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী বলে একথা বুঝতে পেরেছেন যে ঐক্ষেত্রে সাময়িকভাবে বাঁধানো বইটিকে আত্মরক্ষার অস্ত্ররূপে সাফল্য সহকারে প্রয়োগে সমর্থ হলেও ক্রমবর্ধমান এই পাপের স্থায়ী সমাধান এ নয়। কেউ কোন অসৌজন্যমূলক মন্তব্য করলে বিচলিত হবার কারণ নেই। তবে

এসব ঘটনা উপেক্ষা করাও চলে না। এসব কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া উচিত। দুষ্কৃতিকারীদের খোঁজ পাওয়া গেলে তাদের নাম প্রকাশ করা দরকার। পাপকে সর্বজনসমক্ষে ব্যক্ত করার ব্যাপারে কোন রকম ভূয়া বিনয় সামনে এসে পথরোধ না করে। প্রকাশ্যে যারা বদমায়েসী করে বেড়ায়, তাদের সাজা দিতে হলে জনমতের মত কার্যকরী আর কিছু নেই। পত্রলেখিকার কথা ঠিক যে জনসাধারণের মনে এ সম্বন্ধে প্রচণ্ড ঔদাসীন্য বিদ্যমান। তবে এজন্য শুধু জনসাধারণকে দোষ দিলেই চলবে না। তাঁদের কাছে দুর্ব্যবহারের প্রত্যক্ষ উদাহরণ পেশ করা চাই। চুরির ঘটনা প্রকাশ না হলে এবং তার তদন্ত না হলে যেমন চুরির ব্যাপারে কিছু করা যায় না, তেমনি দুর্ব্যবহারের উদাহরণ চেপে গেলে তার আর কিনারা হয় না। সাধারণতঃ পাপ ও অপরাধের পরিপুষ্টির জন্য অন্ধকারের প্রয়োজন ঘটে। আলোর ছটা পড়লেই এসব নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

তবে আমার মনে হয় যে একজন আধুনিকা অন্ততঃপক্ষে আধ ডজন রোমিওর জুলিয়েট হতে চান। দুঃসাহসিক বৃত্তি তাঁদের খুব পছন্দ। পত্রলেখিকা বোধহয় সাধারণ মেয়ের ব্যতিক্রম। আধুনিকাদের পোশাক-পরিচ্ছদ বৃষ্টিবাদলা অথবা রবিকরোত্তাপের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নয়, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। গালে মুখে রং চং মেখে তাঁরা প্রকৃতির উপরও এক কাঠি উঠতে চান এবং নিজেদের চেহারাকে অনন্যসাধারণ করে তোলেন। অহিংসা এসব মেয়ের জন্য নয়। একাধিকবার আমি একথা বলেছি যে নিজেদের মধ্যে অহিংস-শক্তির বিকাশের একটা সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিক নিয়ম আছে। এর জন্য কঠোর প্রযত্ন করতে হয়। পত্রলেখিকা এবং তাঁর মত মেয়েরা যদি পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় জীবনে বিপ্লব সাধন করেন, তাহলে অনতিবিলম্বে তাঁরা দেখতে পাবেন যে যেসব যুবক তাঁদের সংস্পর্শে আসেন তাঁরা তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন ও

তাঁদের সামনে সাধ্যমত সৌজন্যমণ্ডিত আচরণ করছেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁরা যদি দেখেন যে তাঁদের সতীত্ব সংকটাপন্ন (আর এর সম্ভাবনা আছেই), তাহলে মানুষের ভিতরকার সেই পশুটার কাছে আত্মসমর্পণ করার বদলে তাঁরা বরং মরার সাহস অর্জন করবেন। অনেকে আমাকে বলে থাকেন যে মুখে কাপড় গুঁজে বা অন্য ভাবে যেসব মেয়েকে বেঁধে রেখে তাঁদের আত্মরক্ষা করার শক্তিটুকু পর্যন্ত হরণ করা হয়েছে তাঁদের মরা আমি যতটা সহজ ভাবছি তা নয়। সবিনয়ে আমি এই কথা নিবেদন করব যে যাঁর প্রতিরোধ করার ইচ্ছা আছে তিনি তাঁর দেহকে বন্ধনকারী সর্ববিধ বাঁধনকে ছিন্নভিন্ন করতে পারেন। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি তাঁকে মরণ বরণ করার ক্ষমতা দেবে।

কিন্তু এরকম সাহসিকতা প্রকাশ করা সম্ভব শুধু তাঁদেরই, যাঁরা এর অনুকূল শিক্ষা নিয়েছেন। অহিংসায় যাঁদের জীবন্ত বিশ্বাস নেই তাঁরা আত্মরক্ষার সাধারণ প্রক্রিয়া শিখবেন এবং এইভাবে অভব্য যুবকদের অসৌজন্যমূলক আচরণ থেকে আত্মরক্ষা করবেন।

বড় কথা হচ্ছে এই যে যুবকেরা কেন এ ভাবে সাধারণ ভদ্র আচরণ-জ্ঞানবিরহিত হবে, যার জন্য সচ্চরিত্রা মেয়েদের নিরন্তর তাদের দ্বারা উত্যক্ত হবার ভয়ে কাল কাটাতে হবে? অধিকাংশ যুবক ভব্যতার যাবতীয় জ্ঞানগম্যি হারিয়েছেন—এ কথা শুনলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব। তাঁদের কিন্তু সমগ্রভাবে নিজ সম্প্রদায়ের সুযশ বজায় রাখার জন্য বদ্ধপরিকর হতে হবে এবং নিজ সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে কেউ বেচাল হলে নিজেদেরকেই তার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। তাঁদের একথা বুঝতে হবে যে প্রত্যেক নারীর সম্মান তাঁর নিজ মাতা ও ভগ্নীর সম্ভ্রমের সমতুল্য মহার্ঘ। সদাচার না শিখলে তাঁদের সকল শিক্ষা মূল্যহীন।

ছাত্রদের ভিতর যাতে ভদ্রতাবোধের বিকাশ হয়, তা দেখা এবং

ক্লাসের পাঠ্য-তালিকার ভিতর সদাচার শিক্ষা দেবার প্রথা সমাবিষ্ট করার সম পরিমাণ দায়িত্ব কি অধ্যাপকবর্গ ও শিক্ষকমণ্ডলীর উপরও বর্তায় না ?

হরিজন, ৩১-১২-১৯৩৮

১৯
আধুনিকা

এগার জন মেয়ের নাম ও ঠিকানা সমন্বিত একটি চিঠি আমি পেয়েছি। চিঠিটির কোন রকম অর্থ পরিবর্তন না করে শুধু সুপাঠ্য করার জন্য ঈষৎ পরিমার্জন করণান্তর আমি সেটি প্রকাশ করছি।

"জনৈক ছাত্রীর পত্রোত্তরে ৩১শে ডিসেম্বরের হরিজনে 'ছাত্রদের পক্ষে লজ্জাজনক' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি আপনি লিখেছেন, সেটি গভীর চিন্তাদ্যোতক। তবে আধুনিকাদের প্রতি আপনি এতখানি বীতশ্রদ্ধ যে শেষ পর্যন্ত তাঁদের আধ ডজন রোমিওর জুলিয়েট আখ্যা দিয়ে বাতিল করে দিয়েছেন। আপনার এই মন্তব্য নারীসমাজের সঠিক অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতা-সঞ্জাত বলে বিশেষ উদ্দীপনাজনক নয়।

এযুগে যখন জীবন-সংগ্রামে পুরুষদের সমান অংশীদার হবার জন্য মেয়েদের বদ্ধ আগল খুলে বাইরে বেরোতে হচ্ছে, তখন পুরুষদের কাছে অসদ্ব্যবহার পাওয়া সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি নিন্দারোপ করা বড় বিচিত্র ব্যাপার। একথা অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে বহুক্ষেত্রে উভয় পক্ষকেই সমপরিমাণে দোষী দেখা যায়। হয়ত কয়েকজন মেয়ে আধ ডজন রোমিওর জুলিয়েটের ভূমিকায় অবতীর্ণা হন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে একথাও মেনে নিতে হয় যে আধ ডজন রোমিও-ও জুলিয়েটের খোঁজে পথেঘাটে ঘুরে বেড়ায়। তবে একথা মনে করা অনুচিত যে প্রত্যেকটি আধুনিকাই জুলিয়েট এবং প্রত্যেকটি আধুনিক যুবকই রোমিও। আপনি নিজেই বহু আধুনিকার সংস্পর্শে এসেছেন এবং আপনি নিশ্চয় তাঁদের দৃঢ়চেতা স্বভাব ও ত্যাগবৃত্তি আদি প্রশংসনীয় নারীসুলভ আচরণে মুগ্ধ হয়েছেন।

আপনি যে দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করার কথা বলেছেন,

সে কাজ মেয়েদের নয়। অহেতুক সংকোচ তাঁদের এ পথের বাধা, একথা বলছি না। আসলে এতে কোন ফল হবার নয়।

কিন্তু আপনার মত একজন বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তির কাছে এ জাতীয় কথা শোনা অধুনা অপ্রচলিত 'নারী নরকের দ্বার' প্রবাদের পরিপূরক।

তবে পূর্ববর্তী মন্তব্য থেকে এ কথা মনে করবেন না যে আধুনিকাদের মনে আপনার জন্য শ্রদ্ধার আসন নেই। যুবকের মতই তাঁরা আপনাকে সমান সমাদর করেন। তাঁদের আপত্তি হচ্ছে, এই ভাবে তাঁদের ঘৃণা ও অনুকম্পা প্রদর্শন করায়। সত্য সত্যই তাঁরা দোষী হলে ত্রুটি সংশোধন করে নিতে প্রস্তুত। তবে অভিসম্পাত দেবার আগে তাঁদের দোষ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাঁরা 'শুনেছেন মশাই, মেয়েছেলে'—এই জাতীয় বর্মের আড়ালে আত্মগোপন করবেন না বা বিচারক যে তাঁর খেয়াল-খুশীমত রায় দিয়ে যাবেন, তাও তাঁরা নীরবে বরদাস্ত করবেন না। সত্যের সম্মুখীন হতে হবে। আধুনিকা বা আপনার ভাষায় 'জুলিয়েটরা' সত্যের মুখোমুখী হবার সাহস রাখে।"

পত্রলেখিকাদের বোধ হয় জানা নেই যে চল্লিশ বছর আগে যখন তাঁদের কারও জন্মই হয় নি, তখন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয় নারীদের সেবার ভার আমি স্বয়ং গ্রহণ করেছিলাম। আমি মনে করি যে নারীত্বের প্রতি অমর্যাদাসূচক কিছু লেখা আমার পক্ষে সম্ভবই নয়। অবলা সমাজের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এত প্রবল যে আমি তাঁদের পক্ষে হানিকর কোন কিছুর চিন্তাই করতে পারি না। তাঁরা হচ্ছেন ইংরাজীতে যাকে বলে মানব-সমাজের শ্রেয়তর অর্ধাংশ। আর আমার প্রবন্ধটি লিখিত হয়েছিল ছাত্রদের কুকর্মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, মেয়েদের দুর্বলতার কথা আলোচনার জন্য নয়। তবে সত্যকার প্রতিবিধানের নিদান নির্দেশ করতে হলে রোগ নির্ণয়কালে যেসব কারণে এ রোগের জন্ম, তার প্রত্যেকটির উল্লেখ আমি করতে বাধ্য।

আধুনিকা শব্দটি বিশেষ অর্থবাচক। সুতরাং আমার মন্তব্যকে জনকয়েকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার অবকাশ আমার ছিল না।

কিন্তু যেসব মেয়ে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিতা হন, তাঁদের প্রত্যেককে আধুনিকা বলা সঙ্গত নয়। আমি এমন অনেককে জানি যাঁদের মোটেই এই আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে নি। তবে অনেকে আবার আধুনিকা সেজে বসে আছেন। আমার মন্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ছাত্রীরা যাতে আধুনিকার নকল করে একটি গুরুতর সমস্যাকে আরও জটিল না করে দেন, তার জন্য তাঁদের সতর্ক করা। কারণ এই চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি অন্ধ্রের একটি ছাত্রীরও একখানি চিঠি পেয়েছি। মেয়েটি অন্ধ্রের ছাত্রদের অসদ্ব্যবহার সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা লাহোরের মেয়েটির বর্ণনাকেও ছাড়িয়ে যায়। এই অন্ধ্র-বালার বক্তব্য হচ্ছে এই যে সাদাসিধে পোশাক সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গীনীদের পরিত্রাণ নেই। স্বীয় প্রতিষ্ঠানের কলঙ্ক-স্বরূপ এইসব ছাত্রদের বর্বরতা লোকসমক্ষে জাহির করার মত সাহসও তাঁদের নেই। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দরবারে আমি এই অভিযোগ উপস্থাপিত করছি।

এই এগারটি মেয়েকে আমি ছাত্রদের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ করছি। যাঁরা নিজেদের সাহায্য করেন, ঈশ্বর তাঁদের সহায়। পুরুষদের অভব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কলা মেয়েদের শিখতে হবে।

হরিজন, ৪-২-১৯৩৯

২০

এর নাম অহিংসা ?

নীচে আন্নামালী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপকের পত্র থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হল :

"গত নভেম্বর মাসে আন্দাজ পাঁচ-ছয় জন ছাত্র মিলে এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন ছাত্রকে (তখন বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের সম্পাদক) মারধর করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এ বিষয়ে

কঠোর মনোভাব অবলম্বন করতঃ সেই দলের নায়ককে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত করেন এবং বাদবাকি ক'জনের নাম সে বছরের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা থেকে কেটে দেওয়া হয়।

শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের কয়েকজন বন্ধু ও সমর্থক ক্লাসে যোগদান না করার কথা ভাবতে লাগলেন ও তাঁরা ধর্মঘট করা মনস্থ করলেন। তাঁরা অন্যান্য ছাত্রের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদেরও এর প্রতিবাদস্বরূপ ধর্মঘট করতে রাজী করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁরা এইজন্য সফলকাম হলেন না যে বেশীর ভাগ ছাত্রের মতে ঐ ছয় জনের শাস্তি পাওয়া উচিত বলে মনে হল এবং তাঁরা তাই ধর্মঘটে যোগদান করলেন না, তাঁদের প্রতি সহানুভূতিও দেখালেন না।

পরের দিন আন্দাজ শতকরা ২০ জন ছাত্র ক্লাসে আসেন নি। বাদবাকি ৮০ জন যথাবিহিত ক্লাসে যোগদান করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা ৮০০।

এর পর বহিষ্কৃত ছাত্রটি ধর্মঘট পরিচালনার জন্য ছাত্রাবাসের ভিতর এলেন। ধর্মঘট অসফল দেখে সন্ধ্যাবেলায় তিনি অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করতে লাগলেন। ছাত্রাবাস থেকে বাইরে যাবার মূল চারটি ফটকের উপর শুয়ে পড়া, ছাত্রাবাসের কোন কোন ফটকে তালা দেওয়া, যেসব অল্পবয়সী ছেলেদের ভয় দেখিয়ে কথা মানানো সম্ভব তাদের নিজ নিজ কামরায় আটকে রাখা ইত্যাদি চলতে লাগল। এইভাবে পঞ্চাশ-ষাট জন মিলে বিকেল নাগাদ অন্যসব ছাত্রদের বাইরে বেরোন বন্ধ করে দিলেন।

কর্তৃপক্ষ যখন দেখলেন যে এইভাবে সব ফটক বন্ধ হয়ে গেছে, তখন তাঁরা বেড়ার ভিতর দিয়ে রাস্তা করার কথা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু তাঁরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মজুরদের দিয়ে বেড়া ভাঙ্গা শুরু করলেন, ধর্মঘটীরা তখন সে রাস্তা দিয়ে অন্য ছাত্রদের কলেজে যাওয়ায় বাধা দিতে লাগলেন। পিকেটিংএ নিরত ছাত্রদের সেখান থেকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টাও সফল হল না। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে গেছে দেখে কর্তৃপক্ষ সকল গণ্ডগোলের মূল সেই বহিষ্কৃত ছাত্রটিকে ছাত্রাবাসের চৌহদ্দী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য পুলিসের কাছে অনুরোধ জানালেন এবং পুলিস এসে তাকে সরিয়েও দিল। এর ফলে স্বভাবতঃ আরও কিছুসংখ্যক ছাত্র বিক্ষুব্ধ হলেন এবং তাঁরা

ধর্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা শুরু করলেন। পরের দিন ছাত্ররা যখন দেখলেন যে সমস্ত বেড়া অপসৃত হয়েছে, তখন তাঁরা কলেজ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে ক্লাস-ঘরে ঢোকার পথে এবং সিঁড়িতে সিঁড়িতে শুয়ে পিকেটিং করা শুরু করলেন। এর ফলে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়কে দীর্ঘ দিনের অবকাশ দিলেন। নভেম্বরের ২৯শে থেকে জানুয়ারীর ১৬ই পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় দেড় মাস কলেজ বন্ধ রইল। তিনি সংবাদপত্রে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এক বিবৃতি দিয়ে অবকাশের পর তাদের আবার পড়াশুনা করার জন্য হাসিখুশিভরা চিত্তে ফিরতে বললেন।

কিন্তু কলেজ খোলার পর দেখা গেল যে···কাছ থেকে নূতন নূতন সব সলাপরামর্শ পাওয়ায় ধর্মঘটীরা নবোদ্যমে তাঁদের কাজে লেগে গেছেন। শোনা গেল, তাঁরা রাজাজীর কাছেও গিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের উপাচার্য মহাশয়ের কথা মেনে চলবার উপদেশ দেন ও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেন। উপাচার্য মহাশয় মারফত তিনি তাঁদের কাছে দুটি তারবার্তা পাঠিয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে ও শান্তভাবে পড়াশুনা আরম্ভ করতে অনুরোধ জানান। যদিচ অধিকাংশ ভাল ছেলের মনে এ তারবার্তার প্রতিক্রিয়া ভালই হয়, তবু ধর্মঘটীরা নিজেদের গোঁ ধরে রইলেন।

এখনও পিকেটিং চলছে। এ একেবারে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ধর্মঘটীদের সংখ্যা ৩৫ থেকে ৪৫এর মধ্যে। তাঁদের এমন জনা-পঞ্চাশেক সমর্থক আছেন, যাঁরা সাহস করে প্রকাশ্যভাবে ধর্মঘটে যোগ দেন না; কিন্তু ভিতর থেকে সব রকমের গোলমাল পাকান। রোজ তাঁরা দলবদ্ধ ভাবে এসে ক্লাসে ঢোকার রাস্তার সামনে এবং দোতলার সিঁড়ির উপরে শুয়ে পড়ে ছাত্রদের ক্লাসে যাওয়া আটকান। শিক্ষকরা কিন্তু মাঝে মাঝে স্থান পরিবর্তন করে পড়িয়ে যান এবং ধর্মঘটীরা আসার আগেই তাঁদের ক্লাস শেষ হয়ে যায়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক্লাসের জায়গা বদল হয়। সময় সময় খোলা জায়গায় ক্লাস হয় এবং সে অবস্থায় আর ধর্মঘটীরা শুয়ে থেকে পথ আটকাতে পারেন না। তখন তাঁরা চেঁচামেচি করে ক্লাসের ক্ষতি করেন এবং কখনও কখনও তাঁরা যেসব ছাত্র অধ্যাপকদের কথা শুনতে এসেছেন, তাঁদের সামনে বক্তৃতা জুড়ে দেন।

কাল আবার একটা নূতন ব্যাপার ঘটেছে। ধর্মঘটীরা ক্লাসের ভিতর ঢুকে পড়ে মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে চিৎকার জুড়ে দিয়েছিলেন। শুনলাম

জনকয়েক ধর্মঘটী অধ্যাপক মহাশয় পৌঁছাবার আগে তাক্ বুঝে বোর্ডে খেয়ালখুশিমত লেখা শুরু করে দিয়েছিলেন। যেসব অধ্যাপককে তাঁরা নিরীহ প্রকৃতির বলে জানেন, তাঁদের তাঁরা ভয় দেখানো শুরু করে দিয়েছেন। এমন কি উপাচার্য মহাশয়কে তাঁরা এই বলে শাসানি দিয়েছেন যে তিনি যদি তাঁদের দাবি না মেনে নেন, তবে 'হিংসা ও রক্তস্রোতের' বন্যা বয়ে যাবে।

আপনাকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানানো দরকার। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে গোলযোগের সৃষ্টি করার জন্য ছাত্ররা বাইরের লোকের সাহায্য গ্রহণ করেন ও গুণ্ডা নিয়োগ করেন। সত্যি কথা বলতে কি আমি স্বয়ং এমন অনেক গুণ্ডা ও ছাত্রেতর ব্যক্তি দেখেছি, যাঁরা কলেজের বারান্দায় এবং ক্লাস-ঘরের আশেপাশে ঘোরাফেরা করেন। এ ছাড়া ছাত্ররা উপাচার্য মহাশয়ের উদ্দেশ্যে আপত্তিকর ভাষা প্রয়োগ করেন।

এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে এই: আমরা সকলে অর্থাৎ কতিপয় অধ্যাপক ও বহুসংখ্যক ছাত্র মনে করি যে এসব কার্যকলাপ সত্য ও অহিংসার সম্পর্করহিত এবং সেইজন্য সত্যাগ্রহের ভাবধারার প্রতিকূল। আমি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে অবগত হলাম যে জনকয়েক ধর্মঘটী ছাত্র এ আন্দোলনকে বার-বার অহিংসা নীতি-সম্মত বলে প্রচার করেছেন। তাঁরা বলেন যে মহাত্মাজী যদি একে হিংস আন্দোলন বলে ঘোষণা করেন, তাহলে তাঁরা এসব কার্যকলাপ বন্ধ করবেন।"

পত্রটি ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কাকা সাহেব কালেলকারের উদ্দেশ্যে লিখিত। অধ্যাপক মহাশয় কাকা সাহেবকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন। এর বাকি যেটুকু অংশ প্রকাশ করা হল না, তাতে ছাত্রদের এই আচরণকে অহিংস বলা চলে কিনা, এ সম্বন্ধে কাকা সাহেবের অভিমত জানতে চাওয়া হয়েছিল এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদের ভিতর যে দুর্বিনীত ভাব দেখা যাচ্ছে, তার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছিল।

যাঁরা ধর্মঘটীদের বর্তমান আচরণের সমর্থক ও প্ররোচক, পত্রে তাঁদের নামও ছিল। ধর্মঘট সম্বন্ধে আমার অভিমত জ্ঞাপন করার

পর একজন, সম্ভবত কোন ছাত্রই হবেন আমাকে উত্তেজিত ভাষায় লিখিত এক তার-বার্তা প্রেরণ করে জানিয়েছেন যে ধর্মঘটীদের আচরণ একেবারে অহিংসা-সম্মত। উপরে ধর্মঘট সম্বন্ধে যেসব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তা যদি সত্য হয়, তবে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই আমি বলব যে ছাত্রদের আচরণ নিঃসন্দেহে হিংস। আমাকে আমার ঘরের দরজার গোড়া থেকে ঠেলে দেবার মতই আমার ঘরের পথ আগলে থাকা হিংস আচরণ বলে গণ্য হবে।

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রদের যদি সত্যকার কোন অভিযোগ থাকে, তবে নিশ্চয় তাঁদের ধর্মঘট এবং এমন কি পিকেটিং করার অধিকার আছে। বড় বেশী হলে তাঁরা নম্রভাবে এর প্রচার করতে পারেন। মুখের কথায় বা ইস্তাহার বিলি করে এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। কিন্তু যাঁরা ধর্মঘট করতে ইচ্ছুক নন, তাঁদের চাপ দেবার জন্য পথ আটকানো বা অন্য কিছু তাঁরা করতে পারেন না।

আর তাছাড়া ছাত্ররা কার বিরুদ্ধে ধর্মঘট করেছেন? শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় ভারতের অন্যতম মনীষী। বেশীর ভাগ ছাত্র যখন জন্মায় নি বা যখন তাঁদের শৈশবকাল চলেছে, তখন থেকেই অধ্যাপক হিসেবে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও চরিত্র-মাহাত্ম্যের জন্য পৃথিবীর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে উপাচার্যরূপে পেলে গর্বানুভব করবে।

কাকা সাহেবকে যিনি পূর্বোক্ত পত্র লিখেছেন, তিনি যদি ঘটনার যথাযথ বিবরণ দিয়ে থাকেন, তবে স্বীকার করতে হবে যে আন্নামালী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা আয়ত্তাধীন আনার জন্যে শাস্ত্রীজীর পদক্ষেপ অতীব সমীচীন পথে হয়েছে। আমার মতে ধর্মঘটীরা নিজ উদ্দেশ্য ব্যাহত করেছেন। আমি প্রাচীনপন্থী লোক এবং আমাদের শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষককে শ্রদ্ধা করা। শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করার কথা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু শিক্ষকের কথায় তাচ্ছিল্য করা বা তাঁদের নিন্দা করা

আমার মাথায় ঢোকে না। একরকম আচরণ অভব্য এবং সব রকমের অভব্যতাই হিংসা।

হরিজন, ৪-৩-১৯৩৯

২১
ছাত্রসমাজ ও রাজনৈতিক ধর্মঘট

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের ফলে মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশে যে ছাত্রবিক্ষোভ হয় ও সেই আন্দোলন দমনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রদেশের সরকার কি রকম প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তার খবর জানিয়ে আমাকে অনেক ছাত্র চিঠি লিখেছেন। ছাত্ররা এখন এর প্রতিবাদে ধর্মঘট করতে চান ও এর জন্য আমার পরামর্শ চেয়েছেন।

ভারতের একজন মহান ও অসমসাহসী সন্তানের কারাদণ্ড বিধানের জন্য সমগ্র বিশ্ব যখন লজ্জায় অধোবদন, তখন ভারতের ছাত্রসমাজের সত্তার মূল পর্যন্ত যে এতে বিচলিত হয়ে উঠবে, তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? সুতরাং মনে প্রাণে তাঁদের প্রতি আমার সমর্থন থাকা সত্ত্বেও আমি এই অভিমত ব্যক্ত করতে বাধ্য যে, জওহরলাল নেহরুর প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হবার প্রতিবাদে তাঁদের নিজ নিজ বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যাওয়া অন্যায় হয়েছে। অবশ্য দমননীতি অবলম্বন করে উভয় প্রদেশের সরকার গভীরতর অন্যায় অনুষ্ঠান করেছেন।

আমার মতে ছাত্রদের প্রস্তাবিত প্রতিবাদমূলক ধর্মঘট না করাই ভাল। তাঁরা যদি সত্য সত্যই আমার উপদেশ চান, তাহলে তাঁরা যেন এমন একজন দায়িত্বশীল প্রতিনিধি আমার কাছে পাঠান, যাঁর কাছ থেকে সব খবরাখবর পাওয়া যেতে পারে। কারণ ঘটনাবলীর পূর্ণ বিবরণ আমার জানা নেই। আমার উপদেশের ফল যাই হোক না কেন, সানন্দে আমি উপদেশ দেব। তাঁরা জানেন যে আমি

যে আন্দোলন পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেছি, তার সাফল্যের জন্য তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতার মূল্য আমি কত দামী বলে মনে করি। যাই হোক, ভালভাবে ভেবেচিন্তে কাজ না করলে তাঁরা নিজেদের হানি করার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন।

২

সংবাদপত্রে এমন কতকগুলি লেখা প্রকাশিত হয়েছে যাতে ছাত্র-সমাজে উত্তেজনা-সৃষ্টিকারী বিষয়াবলী সম্বন্ধে আমার অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ওগুলির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এ জাতীয় প্রত্যেকটি রচনা পড়ার অবকাশ আমার হয় নি। অন্য কোন কারণে না হোক, সম্প্রতি আমার মাথায় যে অতীব গুরুতর কাজের চাপ পড়েছে, তার জন্য শক্তি সঞ্চয় মানসেই এত সব লেখা পড়ে ওঠার সময় করতে পারি নি। আমার অভিমত স্পষ্ট। চিরতরে স্কুল-কলেজের পাট চুকিয়ে দিতে মনস্থ না করা পর্যন্ত কোন রকম প্ররোচনার দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক কারণে ছাত্র-ধর্মঘট করা চলতে পারে না। আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা স্বাধীন দেশের মত নয়। এদেশে যে শাসকবর্গের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আমরা সংগ্রাম করছি, তাঁরাই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালক। সুতরাং শাসকবৃন্দ কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত শিক্ষায় শিক্ষিত হবার দাম দিতে হবে ছাত্রদের আত্মাবদমনের দ্বারা। গাছেরও খাব, তলারও কুড়োব—দুই চলতে পারে না। স্কুল-কলেজে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে তাঁরা যদি শিক্ষা পেতে চান (আর এ তাঁরা চান বলেই মনে হয়), তাহলে সেখানকার নিয়মকানুন তাঁদের মানতে হবে। সুতরাং ঐসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সম্মতি না পেলে কোন রকম রাজনৈতিক ধর্মঘট হওয়া উচিত নয়। তবে

আমি একটি পথ নির্দেশ করতে পারি। স্কুল-কলেজের কয়েক ঘণ্টার পর ছাত্রদের নিজ আয়ত্তাধীন বহু সময় থাকে। ঐ সময় তাঁরা সভাসমিতি করে সুশৃঙ্খলভাবে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁদের সহানুভূতি প্রকট করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে তাঁরা শোভাযাত্রাও বার করতে পারেন। যাঁরা আমার নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে ইচ্ছুক, তাঁদের সাময়িক ভাবে বিদ্যানিকেতনের সংসর্গ ত্যাগ করতে হবে এবং আমার অনুমতি নিয়ে সত্যাগ্রহ করার যাবতীয় শর্ত পালনের পর তাঁরা একাজে লাগতে পারবেন।

ব্যক্তিগতভাবে অনেক ছাত্র আমার কাছে যেসব পত্র লিখছেন, তার থেকে বুঝতে পারছি যে আমার নেতৃত্বে তাঁদের বিশেষ আস্থা নেই। কারণ যে গঠনমূলক কাজের মূল ও সর্বাপেক্ষা দৃষ্টিগোচর অংশ হচ্ছে খাদি, তার উপরই তাঁদের বিশ্বাস নেই। সূতা কাটার প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নেই এবং পত্রলেখকদের যদি নির্ভরযোগ্য সাক্ষী বলে মেনে নেওয়া যায়, তবে প্রমাণ পাওয়া যাবে যে অহিংসার প্রতি তাঁদের নিষ্ঠার পরিমাণও সন্দেহজনক।

মনেপ্রাণে শৃঙ্খলাবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে ছাত্ররা জাতীয় সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা যদি নিজেদের খেয়ালে চলে অকিঞ্চিৎকর বিক্ষোভ প্রদর্শনের পিছনেই যাবতীয় উদ্যম ব্যয় করেন, তাহলে তাঁরা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষতি করছেন বলতে হবে। কংগ্রেস-কর্মীদের কাছে বেশ শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে দেখে আমার আনন্দ হচ্ছে। সত্যি বলতে কি আমি একটু আশ্চর্য হয়ে গেছি। কারণ আমি এর জন্য তৈরী ছিলাম না। ছাত্র-সমাজের সম্বন্ধে কেউ যেন একথা বলার সুযোগ না পান যে, ঠিক কাজের সময় তাঁদের ত্রুটি ধরা পড়েছে। তাঁরা যেন মনে রাখেন যে, বিশৃঙ্খলা এবং হঠকারিতাপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের তুলনায় আমি তাঁদের কাছ থেকে অধিকতর দৃঢ়তা

সাহস ও আত্মত্যাগের পরিচয় চাইছি। ছাত্রদের একথাও বোঝা উচিত যে জাতির ৩৫ কোটি অধিবাসীর তুলনায় আইন অমান্যকারীদের সংখ্যা সীমিত হতে বাধ্য। কিন্তু গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগকারীর সংখ্যার কোন সীমা নেই। একেই আমি স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অংশ মনে করি। কারণ এছাড়া আইন অমান্য আন্দোলনে কোন আইন থাকবে না এবং ফলে এ একেবারে অকার্যকরী প্রমাণিত হবে।

১৬-১১-১৯৪০

২২

ছাত্রসমাজ ও ক্ষমতা দখলের রাজনীতি

দেশের জন্য আমি লড়াই করছি। এই দেশ বলতে অন্যান্য সকলের সঙ্গে ছাত্রসমাজকেও বোঝায়। তবে ছাত্রদের উপর আমার একটা বিশেষ অধিকার আছে এবং তাঁদেরও আমার কাছে একটা বিশেষ দাবি আছে। তার কারণ, আমি এখনও নিজেকে ছাত্র মনে করি। আর তাছাড়া আমি ভারতে ফেরার পর থেকেই ছাত্রদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং তাঁদের অনেকে সত্যাগ্রহের কাজ করেছেন।

সুতরাং সাময়িক আবেগের তাড়নায় আজ সমস্ত ছাত্রসমাজও যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবুও আমার পরামর্শ অগ্রাহ্য হবে এই আশঙ্কায় আমি উপদেশ দেওয়া বন্ধ করব না।

ছাত্রদের দলীয় রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়া উচিত নয়। তাঁরা যেমন সব ধরনের বই পড়েন, তেমনি প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের বক্তব্য তাঁরা শুনবেন। তাঁদের লক্ষ্য হবে "নীরং পরিত্যক্তয়া গ্রহেৎ ক্ষীরম্।" রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি এই হবে তাঁদের যুক্তিযুক্ত দৃষ্টিকোণ।

ক্ষমতা দখলের রাজনীতি ছাত্রসমাজের কাছে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত হওয়া উচিত। এইসব ব্যাপারে আটকা পড়া মাত্র তাঁদের ছাত্রত্ব আর থাকে না এবং তাই সংকটমুহূর্তে তাঁরা আর জাতির সেবা

করতে সক্ষম হন না। আর সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আপনি যদি এই রকম রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন, তাহলে আপনাকে দিয়ে ছাত্রদের কোন সেবা হবে না।

প্রত্যেকটি কংগ্রেসীই যেমন দেবদূত নন, তেমনি সব কমিউনিস্ট খারাপ নন। আমার তাই কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে কোন রকম গোঁড়ামি নেই। তবে তাঁদের আদর্শ তাঁরা আমার কাছে যতটুকু বর্ণনা করেছেন, তাতে বুঝেছি যে আমি তাঁদের সঙ্গে সহমত হতে পারি না। ডাঃ আসরফের যোগ্যতার প্রতি আমার যথেষ্ট আস্থা আছে। তাঁর স্বদেশপ্রেমের সততা সম্বন্ধে আমি কোনদিন কোন প্রশ্ন তুলি নি। তবে এ বিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয় যে, একদিন তাঁকে ছাত্রসমাজকে ভুলপথে পরিচালিত করার জন্য অনুতাপ করতে হবে। তবে আমার নিজ আদর্শে যতটা বিশ্বাস, তিনিও নিজ মতবাদের প্রতি ঠিক ততখানিই আসক্ত এবং আমরা দুজনেই সমান একরোখা। আমিও তাঁকে তাঁর ভুল দেখিয়ে দিতে পারব না বলে কখনও তাঁর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হই না এবং তিনিও আমাকে এড়িয়ে গিয়ে আমায় সম্মান করে থাকেন।

তবে ছাত্ররা যেন এই কথাটি জেনে রাখেন যে, এখন আমি দেশের জন্য লড়াই করছি। আমি অনভিজ্ঞ সেনানায়ক নই, পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা আমার পিছনে রয়েছে। সুতরাং আমার পরামর্শ নস্যাৎ করার আগে তাঁরা যেন পঞ্চাশ বার ভাবেন। এই পরামর্শ হচ্ছে, আমাকে জিজ্ঞাসা না করে তাঁরা যেন কোন ধর্মঘট শুরু না করেন।

আমি কখনও এমন কথা বলি নি যে, কদাপি তাঁদের ধর্মঘট করা উচিত নয়। সম্প্রতি আমি মিশনারী কলেজের ছাত্রদের যে উপদেশ দিয়েছিলাম, তা যেন তাঁরা বিস্মৃত না হন। সে উপদেশ দেবার জন্য আমি অনুতপ্ত নই। তাঁরা যেন একে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগান।

২৬-১-১৯৪১

২৩

ছাত্রদের প্রতি

ছাত্রদের সঙ্গে আমি বরাবরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছি। তাঁরা আমাকে জানেন এবং আমি তাঁদের জানি। তাঁদের কাছ থেকে আমি কাজ পেয়েছি। কলেজের অনেক প্রাক্তন ছাত্র আমার অন্তরঙ্গ সহকর্মী। আমি জানি যে তাঁরাই হচ্ছেন ভবিষ্যৎ আশাস্থল। অসহযোগের গৌরবোজ্জ্বল দিনে তাঁদের স্কুল-কলেজ ছেড়ে চলে আসতে আহ্বান জানিয়েছিলাম। অনেক অধ্যাপক ও ছাত্র যাঁরা কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং এখনও যাঁরা দৃঢ়তা সহকারে নিজ কর্তব্য করে যাচ্ছেন, তাঁরা দেশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধন করেছেন, এবং নিজেরাও উপকৃত হয়েছেন। আর সে আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করা হয় নি, কারণ দেশের অবস্থা সেরকম নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, বর্তমান শিক্ষা মিথ্যা ও অস্বাভাবিক হলেও দেশের যুব-সম্প্রদায়ের কাছে এর প্রলোভন অতীব তীব্র। কলেজী শিক্ষার ফলে ভবিষ্যৎ জীবনের সুরাহা হয়। মন্ত্রমুগ্ধদের দলে ঢুকে পড়ার অনুমতিপত্র এ। গতানুগতিক পন্থায় না চললে সাধারণ পর্যায়ের জ্ঞান-পিপাসা মেটে না। মাতৃভাষার পরিবর্তে সম্পূর্ণ এক বিদেশী ভাষার জ্ঞান অর্জনের জন্য যে বহুমূল্য সময় নষ্ট হয়, তার প্রতি কোন রকম ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। এ পাপ কখনই অনুভূত হয় না। ছাত্রসমাজ ও তাঁদের শিক্ষকগণ স্থির করে নিয়েছেন যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করার ব্যাপারে দেশীয় ভাষা সম্পূর্ণ অযোগ্য। আমি ভেবেই পাই না যে, জাপানের কাজকর্ম চলছে কেমন করে! কারণ আমি যতদূর জানি, তাঁরা জাপানী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পেয়ে থাকেন। চীনের জেনারেলিসিমো ইংরাজী প্রায় জানেন না বললেই চলে।

কিন্তু ছাত্রদের বর্তমান অবস্থা মেনে নিলেও একথা ঠিক যে,

এইসব নবীন নরনারীর ভিতর থেকেই ভবিষ্যৎ নেতৃবৃন্দের সৃষ্টি হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁদের মধ্যেও বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত চলছে। অহিংসার প্রতি তাঁদের আকর্ষণ অতি অল্প। এক ঘুষির বদলে আরও একটি বা দুটি ঘুষির কথা তাঁরা সহজেই বোঝেন। এর পরিণাম অস্থায়ী হলেও তাঁরা মনে করেন যে, এতে দ্রুত ফললাভ হয়। এ হচ্ছে পশু বা মানবজাতির যুদ্ধকালীন সতত বিরাজমান পাশব শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অহিংসার পৃষ্ঠপোষকতার অর্থ হচ্ছে ধৈর্যের সঙ্গে অনুসন্ধিৎসা এবং আচরণের ক্ষেত্রে এর অর্থ হচ্ছে অধিকতর কষ্ট ও তিতিক্ষার পরিচয় দেওয়া। কিন্তু আমি নিজেই হচ্ছি তাঁদের সমগোত্রীয় ছাত্র এবং কিঞ্চিৎ ব্যাপক অর্থে এই বিশ্বই আমার বিদ্যালয়। তাঁদের ও আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্থক্য আছে। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার জন্য এবং আমার গবেষণার সহকর্মী হবার জন্য তাঁদের আমি স্থায়ী আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তবে এ আমন্ত্রণ নিম্নরূপ শর্তে ঃ

১। দলগত রাজনীতিতে ছাত্ররা কোনক্রমেই অংশ গ্রহণ করবেন না, তাঁরা হচ্ছেন বিদ্যার্থী এবং তথ্যান্বেষক—রাজনীতিবিদ্ নন।

২। রাজনৈতিক কারণে ধর্মঘট করা তাঁদের উচিত হবে না। নেতা অবশ্য তাঁদের থাকবে, তবে নেতার প্রতি তাঁরা অনুরাগ দেখাবেন তাঁর সৎগুণাবলীর অনুকরণ করে। তাঁদের নেতাকে জেলে দিলে বা নেতা মারা গেলে কিংবা এমন কি তাঁর ফাঁসি হলেও তাঁরা ধর্মঘট করবেন না। দুঃখ যদি তাঁদের অসহ্য মনে হয় এবং সমস্ত ছাত্রের বুকেই যদি তা সমানভাবে বাজে, তবে সে ক্ষেত্রে অধ্যক্ষের সম্মতি নিয়ে বিদ্যালয় বা কলেজ বন্ধ করা যেতে পারে। অধ্যক্ষ কর্ণপাত না করলে যথোচিত শিষ্টাচার সহকারে ছাত্ররা বিদ্যানিকেতন ছেড়ে চলে যেতে পারবেন এবং কর্তৃপক্ষ অনুতাপ প্রকাশ করে তাঁদের পুনরায় ডেকে না পাঠানো পর্যন্ত তাঁরা ফিরে আসবেন না। বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছাত্র বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কখনই তাঁরা বলপ্রয়োগ

করবেন না। এ বিশ্বাস তাঁদের থাকা চাই যে, সংহতিসম্পন্ন হলে এবং নিজেদের আচরণ সৌজন্যপূর্ণ হলে তাঁদের বিজয় অনিবার্য।

৩। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাঁরা ত্যাগের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সূতো কাটবেন। তাদের সাজ-সরঞ্জাম সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সাজানোগোছানো থাকবে। সম্ভব হলে তাঁরা নিজেরাই সেসব তৈরি করবেন। স্বভাবতই তাঁদের সূতো খুব উঁচুদরের হবে। সূতো কাটার আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি যাবতীয় দিকগুলি সম্বন্ধে যেসব বই আছে, তাঁরা সেগুলি পড়বেন।

৪। তাঁরা পুরোপুরি খাদি ব্যবহার করবেন এবং কলে তৈরী বা বিদেশী জিনিসের বদলে গ্রাম্যপণ্য ব্যবহার করবেন।

৫। অপরের উপর তাঁরা "বন্দেমাতরম্" বা "জাতীয়-পতাকা" জোর করে চাপাবেন না। জাতীয় পতাকার ছবিযুক্ত প্রতীক তাঁরা নিজেরা ব্যবহার করতে পারেন, তবে অপরকে অনুরূপ প্রতীক ব্যবহারের জন্য চাপ দেবেন না।

৬। ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার বাণী তাঁরা নিজেরা বহন করবেন এবং তাঁদের মনে সাম্প্রদায়িকতা বা ছুঁৎমার্গের ভাব থাকবে না। প্রিয়জনের মত নিজেরা অন্য ধর্মাবলম্বী এবং হরিজন ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনা করবেন।

৭। আহত প্রতিবেশীর প্রাথমিক পরিচর্যা অবশ্যই তাঁরা করবেন এবং নিকটস্থ গ্রামে তাঁরা সাফাই এবং আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করবেন ও গ্রামের শিশু ও বয়স্কদের তাঁরা শিক্ষা দেবেন।

৮। রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানী তাঁরা সবাই শিখবেন এবং এর বর্তমান যুগ্মরূপ অর্থাৎ দু ধরনের কথন ও লিখনপদ্ধতিও তাঁরা জানবেন। এর ফলে হিন্দি বা উর্দু—যাই বলা হোক না কেন এবং নাগরী ও উর্দু যে কোন লিপিই লেখা হোক না কেন, তাঁরা কোন অসুবিধাই ভোগ করবেন না।

৯। নতুন কিছু যা তাঁরা শিখবেন, তা তাঁরা মাতৃভাষায় অনুবাদ করবেন এবং নিকটস্থ গ্রামগুলিতে সাপ্তাহিক পরিক্রমার সময় সেই নতুন জ্ঞান ছড়িয়ে দেবেন।

১০। কোন কিছুই তাঁরা গোপন করবেন না, তাঁদের যাবতীয় আচরণ খোলাখুলি হবে। তাঁরা আত্মসংযমমূলক পবিত্র জীবনযাপন করবেন, সমস্ত ভয় বিসর্জন দেবেন ও সহপাঠী দুর্বল ছাত্রদের রক্ষা করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকবেন। জীবন পণ করেও অহিংস পন্থায় দাঙ্গা দমনের জন্য তাঁরা তাঁদের বিদ্যানিকেতন ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন ও প্রয়োজন হলে দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করবেন।

১১। সহপাঠিনী ছাত্রীদের সঙ্গে তাঁরা যথোচিত ন্যায়সঙ্গত ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করবেন।

ছাত্রদের যে কার্যক্রম আমি ছকে দিয়েছি, তাকে কার্যে পরিণত করার জন্য তাঁদের সময় করে নিতে হবে। আমি জানি যে কুড়েমি করে তাঁরা বহু সময় নষ্ট করেন। প্রকৃত মিতাচারের ফলে তাঁরা সময় বাঁচাতে পারেন। তবে কোন ছাত্রের উপর আমি অসঙ্গত চাপ দিতে চাই না। কোন দেশপ্রেমিক ছাত্রকে একনাগাড়ে আমি তাই একটি বছর নষ্ট করতে বলব না। তাঁর সমস্ত বিদ্যাভ্যাস-কালের মধ্যে তাঁকে এই এক বছর দিতে বলব। তাঁরা দেখবেন যে এভাবে এক বছর দেওয়ায় সময় নষ্ট হয় নি। এ প্রচেষ্টায় তাঁরা মানসিক নৈতিক এবং শারীরিক—সব দিক দিয়েই সমৃদ্ধ হবেন এবং পঠদ্দশায় তাঁরা দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে যথেষ্ট অবদান রেখে যেতে পারবেন।

১৩-১১-১৯৪৫

২৪
ছাত্রদের সম্বন্ধে

জনৈক পত্রলেখক জানাচ্ছেন ঃ

"ভারতের ছাত্রসমাজ সম্বন্ধে আপনি ঠিক সময়ে লেখা শুরু করেছেন। এ সময়ে আপনার অভিমত পাওয়া অতীব প্রয়োজন। পরলোকগত মনীষী এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌ এক জায়গায় ছাত্রদের 'আণ্ডার গ্রাজুয়েট বুদ্ধি' আখ্যা দিয়েছেন। অর্ধ পরিণত ছাত্রসমাজকে কাজে লাগিয়ে নেওয়া অতীব বিপজ্জনক। এর ফলে ছাত্রদের অতীব প্রয়োজনীয় কাজ—অধ্যয়ন ও মননকার্য ব্যাহত হয়। এই সংকটকালে 'আণ্ডার গ্রাজুয়েট বুদ্ধির' শোষণ হবার ফলে যে ক্ষতি হয়, তা ফিরে শোষকদেরই আঘাত করে। তবে আপনার পূর্বোক্ত রচনা পাঠে মনে একটি প্রশ্ন জাগে। এ হল, গান্ধীজীই কি এঁদের সর্বপ্রথম রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে টেনে আনেন নি? আমি জানি যে একথা সত্য নয়। তবে নিজের অবস্থা নূতন করে খোলসা করাও আপনার কর্তব্য।"

"দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে ঃ ছাত্র-প্রতিষ্ঠানগুলি কি করবে? তাদের লক্ষ্য কি হবে? আজ আপনি ভাল ভাবেই জানেন যে ছাত্র-প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনীতির সাতমহলা সৌধে প্রবেশ করার সিংহদ্বার। কেউ কেউ শুধু এই উদ্দেশ্যে এগুলির নাম ভাঙায়।"

'আণ্ডার গ্রাজুয়েট বুদ্ধি' কি ক্ষতি করতে পারে, এই সপ্তাহেই তার নিদর্শন দেখার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয় ছাত্র-সমাবেশে কিছু বলার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। দুঃখের কথা তাঁরা শহীদ সাহেবের (জনাব সুরাবর্দী—অনুঃ) বিরুদ্ধে উত্তেজিত অন্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরে অবশ্য তাঁদের সুবুদ্ধি ফিরে আসে এবং কৃতকার্যের জন্য তাঁরা অনুতপ্ত হন। অর্ধ পরিণত বুদ্ধি বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নেতৃত্ব পেলে কি ভাবে উচিত কাজও করতে পারে, তার প্রমাণও ঐদিন তাঁরা দিয়েছিলেন। এইবারের হরিজনে আমার প্রার্থনান্তিক ভাষণের যে বিবরণ বেরিয়েছে, তাতে এর সমাচার পাওয়া যাবে।

ছাত্রদের যদি একটি মাত্র সুসংহত প্রতিষ্ঠান থাকে, তবে তা দিয়ে অনেক কাজ হতে পারে। সে প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য হবে

ছাত্রদের দেশমাতৃকার সেবার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। তাঁদের ভিতর উচ্চ বেতনের কর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টি করা এ প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী হবে না। দেশসেবার আদর্শের উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠলে তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ হবে। যাঁরা অধ্যয়ন শেষ করেছেন আন্দোলন ইত্যাদি করার ভার শুধু তাঁদের উপর পড়বে। পাঠরত অবস্থায় ছাত্রদের একমাত্র কাজ হচ্ছে জ্ঞানের সঞ্চয় বাড়িয়ে যাওয়া। ভারতের জনগণের কথা চিন্তা করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে আজকের শিক্ষা দেশের স্বার্থের পরিপন্থী। কেউ কেউ অবশ্য এই নজির দেখাতে পারেন যে বর্তমান শিক্ষার ফলে দেশের কিছু না কিছু মঙ্গল হয়েছে। একে আমি নগণ্য বিবেচনা করি। এর দ্বারা কেউ যেন প্রতারিত না হন। এর অগ্নি-পরীক্ষার উপায় হচ্ছে এই কথাটি জানা যে, এর দ্বারা কি অতি প্রয়োজনীয় কার্য—অন্নবস্ত্র উৎপাদন-ক্রিয়ায় কোন সহায়তা হয়? আজকে যে কাণ্ডজ্ঞানহীন হত্যালীলা চলেছে, তা বন্ধ করার জন্য ছাত্রসমাজ কি করছেন? প্রত্যেক দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ নয়নগোচর ভাবে সে দেশের প্রগতির সহায়ক হতে হবে। এ কথা কে অস্বীকার করতে পারেন যে ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা সে কর্তব্যসাধনে সক্ষম হয় নি। সুতরাং প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের একটি প্রধান কাজ হবে বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির গলদ আবিষ্কার করে যথাসম্ভব নিজজীবনকে সে ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা। আদর্শ আচার-ব্যবহারের দ্বারা ছাত্ররা নিজ নিজ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের নিজ মতের অনুবর্তী করে ফেলতে পারবেন। এ কাজ করতে পারলে কখনও তাঁদের দলীয় রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে জড়িয়ে পড়তে হবে না। পরিবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় গঠনমূলক ও সৃজনাত্মক কর্মসূচী নিঃসন্দেহে যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে; তাঁদের কার্যকলাপের ফলে পরোক্ষভাবে দেশের রাজনীতি শোষণ-স্পৃহা থেকে মুক্ত থাকবে।

এবার প্রথম প্রশ্নের জবাব দেওয়া যাক। মনে হচ্ছে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলার সময় ছাত্রদের শিক্ষা সম্বন্ধে আমি যা বলেছিলাম, দেশ

তা ভুলে গেছে। স্কুল-কলেজে পাঠরত অবস্থায় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমি কখনও ছাত্রদেরকে আমন্ত্রণ জানাই নি। আমি তাঁদের ভিতর অহিংস অসহযোগ বৃত্তি জাগিয়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলাম। আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, তাঁরা যেন এইসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান উজাড় করে দিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় কলেজ ও বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমান ধারায় পরিচালিত স্কুল-কলেজের শিক্ষার আকর্ষণ ছাত্রদের কাছে অতীব শক্তিশালী বলে প্রতীয়মান হল। মাত্র মুষ্টিমেয় ছাত্র এর সম্পর্ক বর্জন করতে সক্ষম হলেন। সুতরাং একথা বলা ঠিক নয় যে আমি ছাত্রদের রাজনীতিতে টেনে এনেছি। তাছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় কুড়ি বছর নির্বাসিতের জীবন কাটিয়ে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন ভারতে ফিরলাম, তখন দেখি ছাত্ররা ইতিপূর্বে পাঠরত অবস্থাতেই রাজনীতির ক্ষেত্রে নেমে পড়েছেন। হয়ত তখন উপায়ান্তর ছিল না। সমগ্র দেশের যাবতীয় কাজ-কর্ম ও প্রতিটি ক্ষেত্র বিদেশী শাসকবর্গ কর্তৃক এভাবে পরিকল্পিত ও পরিচালিত হচ্ছিল যে কারও পক্ষেই আর দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করার রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। দেশের যুবকদের শিক্ষাদান ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত হচ্ছিল যে তাঁরা এই শাসকদের অধীনে থাকতে বাধ্য হন এবং তাঁদের মধ্যে অনেককে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে একেবারে অন্ধকারে রেখে দেওয়া হত। এই উপায়ে বিদেশী নিয়ন্ত্রণকে যথাসম্ভব দীর্ঘস্থায়ী করার প্রচেষ্টা চলছিল। সুতরাং ভিন্নদেশীয় শাসকবর্গ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত স্কুল-কলেজ ছাড়া অন্যত্র স্বদেশ-প্রেমিক কর্মী জুটত না। এই বিদেশী শিক্ষা-ব্যবস্থার কতখানি অপব্যবহার হয়েছিল, তার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

হরিজন, ৭-৯-১৯৪৭

সপ্তদশ অধ্যায় ঃ বিবিধ

১

পাঠ্যপুস্তক প্রসঙ্গে

আমার মনে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সার্বজনীন বিদ্যালয়-সমূহে বিশেষ করে শিশুদের জন্য যেসব পাঠ্যপুস্তক ব্যবহৃত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি যদি নেহাত ক্ষতিকারক নাও হয়, তবে নিরর্থক। এদের মধ্যে অনেকগুলি যে খুব চাতুর্য সহকারে লিখিত এ কথা অস্বীকার করা যায় না। যে পরিবেশ ও যাদের জন্য ওগুলি লেখা তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ হতে পারে। কিন্তু সেগুলি ভারতীয় ছেলেমেয়ে অথবা এদেশের পরিবেশের উপযুক্ত করে লেখা নয়। আর আমাদের দেশের প্রয়োজনের কথা নজরে রেখে যে সব পাঠ্যপুস্তক লেখা হয়েছে বলে দাবী করা হয় সেগুলিও সাধারণতঃ পশ্চিমের পাঠ্যপুস্তকের দুর্বল অনুকরণ এবং আমাদের দেশের ছাত্রদের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে কদাচিৎ সক্ষম। আমাদের এই দেশে প্রদেশ এবং ক্লাসের পার্থক্যের উপর ছাত্রদের চাহিদার পার্থক্য নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ অন্ততঃ প্রথমাবস্থায় হরিজন ছাত্রদের চাহিদা অপরের থেকে পৃথক।

আমি তাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে ছাত্রদের চেয়ে শিক্ষকদেরই পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন বেশী। আর প্রত্যেক শিক্ষককে যদি তাঁর ছাত্রের প্রতি পূর্ণ ন্যায়বিচার করতে হয় তাহলে তাঁকে প্রত্যেক দিনের পাঠের বিবরণ তৈরি করতে হবে। আর এটা তিনি করবেন তাঁর ক্লাসের বিশেষ প্রয়োজনের কথা খেয়াল রেখে।

সত্যকার শিক্ষাকে ছেলেমেয়েদের ভিতরকার শ্রেষ্ঠগুণাবলীকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। এলোমেলোভাবে সংগৃহীত এবং অপ্রয়োজনীয় তথ্য দ্বারা ছাত্রদের মগজ ভরাট করে এ উদ্দেশ্য সাধন করা যাবে

না। এসব পাষাণভারের মত তাঁদের উপর চেপে বসে ছাত্রদের সব মৌলিকতা নষ্ট করে তাঁদের প্রাণহীন যন্ত্রে পর্যবসিত করে। স্বয়ং আমরা যদি এই প্রথার শিকার না হতাম তাহলে বিশেষ করে ভারতের মত দেশে আধুনিক ব্যাপক শিক্ষাদান-পদ্ধতি যে ক্ষতিসাধন করছে তা উপলব্ধি করতে পারতাম।

অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নিজেদের পাঠ্যপুস্তক লেখা ও প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছেন এবং এতে তাঁরা মোটামুটি সফলকামও হয়েছেন। তবে আমার মতে এর দ্বারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটাবার সমস্যার সমাধান হবে না।

এখানে আমি যে অভিমত ব্যক্ত করেছি তা একেবারে মৌলিক—এমন কোন দাবী আমি করছি না। হরিজন বিদ্যালয়-সমূহের পরিচালক ও শিক্ষকদের দায়িত্ব অসীম। তাই তাঁদের জন্য এখানে উক্ত অভিমতের পুনরুক্তি করা হচ্ছে। যান্ত্রিক ভাবে কাজ করে তাঁদের অধীনস্থ ছেলেদের এলোমেলো ভাবে বেছে নেওয়া পাঠ্যপুস্তক যেমন তেমন ভাবে তোতাপাখীর মত কণ্ঠস্থ করিয়ে দিয়ে তাঁদের সন্তুষ্টি বোধ করা চলবে না। হরিজন বিদ্যালয়-সমূহের পরিচালক ও শিক্ষকবর্গ এক মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং সে দায়িত্ব তাঁদের সাহসিকতা বুদ্ধি ও সততা সহকারে পালন করতে হবে।

কাজ কঠিন। তবে শিক্ষক বা পরিচালক তাঁর সমগ্র মন-প্রাণ যদি একাজে দেন, তাহলে কাজ তেমন কঠিন হবে না। তিনি যদি তাঁদের ছাত্রদের মা-বাবা হয়ে যেতে পারেন তাহলে তাদের চাহিদা তিনি নিজে থেকেই বুঝতে পারবেন এবং সেই চাহিদা পূর্ণ করার চেষ্টা করবেন। সে চাহিদা মেটাবার শক্তি তাঁর না থাকলে তিনি সে যোগ্যতা অর্জন করার চেষ্টা করবেন। আর ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনানুযায়ী তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত—এই নীতি নিয়ে আমরা চলা শুরু করেছি বলে হরিজন বা যে কোন শিশুর

শিক্ষকের কোন মাত্রাতিরিক্ত বুদ্ধি-চাতুর্য অথবা বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজন হবে না।

আর একথা যদি স্মরণ রাখা যায় যে ছাত্রের চরিত্রগঠনই সকল শিক্ষার মূল লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয় অথবা হওয়া উচিত তাহলে চরিত্রবান শিক্ষকের কদাপি হতাশ হওয়া উচিত নয়।

হরিজন, ১-১২-১৯৩৩

২

পাঠ্যপুস্তক

শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে নিত্য পরিবর্তনশীল পাঠ্যপুস্তকের বাতিক আদৌ শুভ লক্ষণ নয়। পাঠ্যপুস্তককে যদি শিক্ষার বাহন বলে বিবেচনা করা হয়, তাহলে শিক্ষকের প্রাণবন্ত কথার আর বিশেষ মূল্য থাকে না। যে শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক থেকে পড়ান তিনি তাঁর ছাত্রদের মৌলিকতার পাঠ দিতে সমর্থ নন। তিনি স্বয়ং পাঠ্য-পুস্তকের কৃতদাস হয়ে পড়েন এবং মৌলিক হবার কোন স্থযোগ বা অবকাশ তিনি পান না। তাই মনে হয় যে পাঠ্যপুস্তক যত কম হবে ছাত্র ও শিক্ষকদের পক্ষে ততই মঙ্গল। পাঠ্যপুস্তক ব্যবসায়ের পণ্য হয়ে গেছে। যেসব গ্রন্থকার ও প্রকাশক পুস্তক রচনা ও প্রকাশনকে অর্থাগমের মাধ্যমে পরিণত করেছেন প্রতিনিয়ত পাঠ্য পুস্তক পরিবর্তন করার ব্যাপারে তাঁদের খুব আগ্রহ। বহুক্ষেত্রে শিক্ষক ও পরীক্ষকরাই স্বয়ং পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা। তাই পাঠ্যপুস্তকের কাটতি হওয়া স্বভাবতঃই তাঁদের স্বার্থের অনুকূল। আবার পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন কমিটিতেও এঁরা রয়েছেন। এইভাবে দুষ্টচক্র সম্পূর্ণ হয়। আর অভিভাবকদের পক্ষে প্রত্যেক বছর নূতন নূতন পাঠ্যপুস্তক কেনা কঠিন হয়ে পড়ে। ছেলেমেয়েরা গাদা গাদা পাঠ্যপুস্তকের বোঝা বয়ে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে—এই শোচনীয় দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে। সমগ্র প্রথাটিকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ব্যবসায়িক

বৃত্তিকে একেবারে বাদ দিতে হবে এবং কেবল জ্ঞানার্জনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। তাহলে দেখা যাবে যে আজকের পাঠ্যপুস্তকসমূহের শতকরা পঁচাত্তর ভাগকেই হয়ত বাতিল করে আবর্জনার গাদায় ফেলে দিতে হচ্ছে। ক্ষমতা থাকলে আমি প্রধানতঃ শিক্ষকদের সহায়ক হিসাবেই পাঠ্যপুস্তক রাখতাম, ছাত্রদের জন্য নয়। আর ছাত্রদের জন্য যে কয়টি পাঠ্যপুস্তক একান্ত অপরিহার্য বিবেচিত হয় সেগুলি অন্ততঃ কয়েক বৎসরের জন্য চালু রাখতে হবে যাতে মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে এই খরচ বহন করা সম্ভবপর হয়। এতদভিমুখী প্রথম পদক্ষেপ সম্ভবতঃ এই যে সরকারকে পাঠ্যপুস্তক ছেপে প্রকাশ করার দায়িত্ব নিতে হবে। এর পরিণামে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যাবৃদ্ধি স্বতঃই বন্ধ হয়ে যাবে।

হরিজন, ৩-৯-১৯৩৯

৩

সহশিক্ষা

সহশিক্ষা সম্বন্ধে আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। ব্যাপারটি বিপজ্জনক। ছেলে এবং মেয়েদের পৃথক পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দিতে হবে—এইটাই সাধারণ নিয়ম হওয়া উচিত।

প্রয়োজনমত শিক্ষয়িত্রী আমরা পাচ্ছি না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য কি করা যায়?

যতদিন আমরা এই বিশ্বাস পরবশ হয়ে চলব যে শিক্ষিত সহ সব নারীদেরই বিবাহ করা অপরিহার্য ততদিন শিক্ষয়িত্রীর অভাব ঘুচবে না।

বিধবা মহিলাদের ভিতর থেকে ভাল শিক্ষয়িত্রী পাওয়া উচিত। তবে ভারতবর্ষ যতদিন না বিধবাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিচ্ছে এবং যত দিন পাশ্চাত্য সভ্যতাপ্রেমী হিন্দুদের দ্বারা নারীশিক্ষার পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে, ততদিন এমন কি বিধবা মহিলাদের ভিতর

থেকেও ভাল শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যাবে না। আমাদের বহুবিধ পরিকল্পনাই কোন না কোন সামাজিক কুপ্রথার পাষাণভারের চাপে মারা যায় এবং আমরা কোন প্রগতি করতে পারি না। এর কারণ হল এই যে কুসংস্কার-বিবর্জিত অংশের সঙ্গে দেশের সর্বসাধারণের কোন মূলগত সংযোগ নেই।

মারাঠী মাসিক 'আত্মোদ্ধার' থেকে।

৪

সহশিক্ষা ও নয়ী তালিম

মাদ্রাজের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত অবিনাশ লিঙ্গমের মতে তালিমী সঙ্ঘের সহশিক্ষার নীতি মাদ্রাজ প্রদেশের উপযোগী নয়। শিশু এবং নিজেদের মনকে জানার বয়স যাদের হয়েছে সেই সব বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য সহশিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে তাঁর কোন আপত্তি নেই। তবে পনের যোল বছর বয়সে যখন মনে সবচেয়ে গভীর ভাবে দাগ পড়ে, অধিকাংশ মেয়েরা সেই বয়সে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে আসে এবং তিনি এই বয়সের মেয়েদের জন্য সহশিক্ষার ব্যবস্থায় গররাজী। গান্ধীজী অবশ্য ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, "আপনাদের বিদ্যালয়ে সহশিক্ষার ব্যবস্থা থাকল অথচ প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় রইল না—এ ব্যাপার দেখে ছেলেমেয়েদের মনে হবে যে কোথাও কোন গোলমাল আছে। আমার ছেলেমেয়েদের আমি বিপদের ঝুঁকি নিতে দেব। কোন না কোন দিন আমাদের যৌন মানসিকতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হবে। পাশ্চাত্যের উদাহরণের অপেক্ষায় বসে থেকে লাভ নেই। শিক্ষকেরা যদি বুদ্ধিমান হন এবং তাঁদের হৃদয় যদি নির্মল হয় ও নয়ী তালিমের আদর্শে যদি তাঁরা ওতপ্রোত হন তাহলে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়েও ভয়ের কোন আশঙ্কা নেই। আর দৈবাৎ যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটেও যায় তার জন্য ভীত হবার কিছু নেই। যেকোন জায়গায় এরকম হতে পারে।

এরকম সাহসিকতা সহকারে একথা বললেও আমি এর যে ঝুঁকি আছে সে সম্বন্ধে সচেতন। তবে দায়িত্বশীল মন্ত্রী হিসাবে আপনি এ সম্বন্ধে স্বয়ং চিন্তা করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।”

হরিজন, ৯-১১-১৯৪৭

৫

জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ও জাতিভেদ

কাকা সাহেব প্রত্যহ অনেক চিঠি পান এবং তাতে তাঁকে নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। এই সব প্রশ্নের একটি হল জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের খাবারঘরে জাতিভেদ-প্রথা মানা সম্বন্ধে। পত্রলেখককে তিনি যে উত্তর দিয়েছেন তার একটি নকল আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর এই বিষয় সংক্রান্ত অভিমত এই জাতীয় বিভিন্ন ছাত্রাবাসের কর্তৃপক্ষের পথপ্রদর্শনের কাজ করবে। সুতরাং কোন রকম পরিবর্তন না করে এখানে আমি তাঁর উত্তরটি উদ্ধৃত করছি :

“বিদ্যাপীঠের ছাত্রাবাসে খাওয়া-দাওয়ার সময় আমরা জাতিভেদ প্রথা মানি কি না—এ প্রশ্ন উত্থাপন করে আপনি ভালই করেছেন। আশা করি আপনি এ কথা জানেন যে বিদ্যাপীঠের উদ্দেশ্যের ঘোষণাপত্রে নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি আছে।

‘বিদ্যাপীঠের নিয়ন্ত্রণাধীন যাবতীয় প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম-মতকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হবে। ছাত্রদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এইসব ধর্মেরই জ্ঞান তাদের দেবার ব্যবস্থা করা হবে। তবে এই প্রক্রিয়ায় সত্য ও অহিংসা রূপী মূল নীতি দুটির কথা সর্বদা স্মরণ রাখা হবে।’

‘আপনি একথাও জানেন যে বিদ্যাপীঠ অস্পৃশ্যতা-প্রথাকে হিন্দু-ধর্মের কলঙ্ক ও পাপ বিবেচনা করে। যে পদ্ধতিতে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় তা গ্রহণে ইচ্ছুক প্রতিটি ছাত্রের জন্য বিদ্যাপীঠের দ্বার উন্মুক্ত। আমরা জাতি-বর্ণের কোন পার্থক্য করি না। ছাত্রদের আমরা অসহযোগ-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করছি এবং তাদের আমরা সূতা কাটা ও কাপড় বোনাও শেখাচ্ছি। কারণ আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এর দ্বারা জাতীয়

উন্নতির পরিপুষ্টি সাধন হবে। আমাদের দেশবাসীর অধিকাংশ আজকে যে আচার-ধর্ম (শারীরিক পবিত্রতার জন্য পালিত বিধি-বিধান) পালন করেন তার বিরুদ্ধাচরণ করা আমাদের বিদ্যাপীঠের উদ্দেশ্য নয়। সেইজন্য আমাদের ছাত্রাবাসে রন্ধনের দায়িত্ব পাচক-ব্রাহ্মণের উপর ন্যস্ত। অতএব রান্নার ব্যাপারে আমরা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী চলি। কিন্তু খেতে বসার সময় আহারকারীদের বসার জায়গা নিয়ে যে ভেদাভেদ করা হয়, তা আচার-ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ হল জাতিভেদ-প্রথা ও তজ্জনিত সামাজিক বৈষম্যের দ্যোতক। খেতে বসার সময় যে জাতীয় আহার্য আমাকে দেওয়া হচ্ছে এবং তা প্রস্তুত করার সময় কতটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নীতি মানা হয়েছে—সে সম্বন্ধে অবশ্যই আমি বিবেচনা করি। কিন্তু আমার সঙ্গে বসে আর যাঁরা খাচ্ছেন, তাঁদের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে আমি বিশেষ চিন্তা করি না। এর কারণ হল এই যে জাতিভেদ-প্রথা-ভিত্তিক উচ্চ-নীচ বর্ণের ধারণায় আমার আস্থা নেই। উচ্চতার এই ভ্রান্ত ধারণায় বিশ্বাস করা বা তার পরিপোষণ করার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্বন্ধ নেই। আমেরিকাতে কোন নিগ্রো যদি কোন শ্বেতাঙ্গের পাশে বসে তাহলে শ্বেতাঙ্গটি তা হীনতাব্যঞ্জক বলে বিবেচনা করেন। পরস্পরের সম্বন্ধে উচ্চতা বা হীনতার ধারণা পোষণ করে আমরা একই রকম পার্থক্যের সৃষ্টি করে থাকি। এই পরিস্থিতিকে শোচনীয় বলতাম না যদি এ প্রথা আমাদের সমাজে উপহাসের বিষয় হত।

খাবার সময় ছেলেরা কেমন ভাবে এবং কার পর কে বসে—এ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নেই। ছেলেরা কেমন ভাবে বসবে সে সম্বন্ধে তাদের কিছু বলা হয় না, তারা নিজেদের খুশী মতই বসে থাকে। আর এখানকার শিক্ষকরাও এ জাতীয় পার্থক্যে বিশ্বাসী নন। তবে দুই বা তিনটি এমন ছাত্র আছে যারা রসুইকরদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় বসে আহার করে থাকে। তাদের গোঁড়া বাবা-মায়ের নির্দেশেই তারা এই রকম করে। তবে বিদ্যাপীঠ ভবিষ্যতে এ প্রথাকে প্রোৎসাহন দিতে চায় না। আহার্য বস্তুর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি আমরা ইতিপূর্বে যতটা দৃষ্টি দিয়েছি, ভবিষ্যতে তার চেয়ে অধিকতর মনোযোগ দেব। তবে খেতে বসার সময় কোন রকম ভেদাভেদ এইজন্য সমর্থন করা যায় না যে বিদ্যাপীঠের মতে এইসব পার্থক্য ভ্রান্ত উচ্চতাবোধের প্রতীক।…”

কাকাসাহেব ছাত্র ও তাদের অভিভাবকদের বিশ্বাসকে অকারণে আঘাত করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে অতীব সতর্ক। তাই তিনি বলেছেন ঃ…"আমাদের ছাত্রাবাসে রন্ধনের দায়িত্ব পাচক-ব্রাহ্মণদের উপর ন্যস্ত। অতএব রান্নার ব্যাপারে আমরা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী চলি।" আমার মনে হয় ব্রাহ্মণ পাচক রাখার এই প্রথা আর খুব বেশী দিন পালন করা সম্ভবপর হবে না। একথা সত্য নয় যে কেবল ব্রাহ্মণরাই (যে অর্থে শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নিয়ম মেনে চলেন অথবা সর্বদাই তাঁরা সে নিয়ম পালন করেন। আপাদমস্তক নোংরা বহু ব্রাহ্মণ পাচক আমি দেখেছি যাঁরা স্বাস্থ্যের আইনকানুন মানেন না। দেখার মত চোখ যাঁদেরই আছে তাঁরাই এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন। অনুরূপভাবে আমি এমন বহু অব্রাহ্মণ পাচক দেখেছি যাঁরা পরিচ্ছন্নতার বিধি-বিধান পালন করেন এবং স্বাস্থ্য ও সাফাই-এর নিয়মকানুন জানেন এবং তদনুযায়ী চলেন। অতএব ব্রাহ্মণ শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ যদি আমরা খেয়াল রাখি এবং পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিধি-বিধান যিনিই পালন করেন তাঁকেই যদি ব্রাহ্মণ বলে বিবেচনা করি, তাহলে যাবতীয় জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে কাকাসাহেব কর্তৃক উল্লিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সহজসাধ্য হবে। আর আমরা যদি ব্রাহ্মণ শব্দটিকে কেবল জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি তাহলে অধিক সংখ্যক উপযুক্ত ধরনের ব্রাহ্মণ রসুইকর পাওয়া যাবে না। স্বল্প সংখ্যক যে কয়জন আমরা পাব তাঁরা মাত্রাতিরিক্ত পারিশ্রমিক দাবী করবেন এবং এমন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করবেন যে তাঁদের রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

বিদ্যাপীঠ সত্য ও অহিংসার আদর্শে উৎসর্গীকৃত। সুতরাং আমাদের ছাত্রাবাসসমূহের যথাযথ অবস্থা আমাদের ব্যক্ত করতে হবে। ভিতর বা বাইরের লোকেদের কাছ থেকে সত্যকার অবস্থা আমরা গোপন করতে পারি না। সেইজন্য কাকাসাহেব স্পষ্টভাবে

একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে বিদ্যাপীঠের ছাত্রাবাসে আর জাতিভেদ-প্রথার স্থান নেই। খাবার সময় বসার জায়গায় পার্থক্য করা স্পষ্টতঃ উচ্চ-নীচের ভেদাভেদভিত্তিক। সমাজের বর্ণভেদ এবং উচ্চ-নীচ ধারণার মধ্যে আদৌ কোন সম্বন্ধ নেই। যে ব্রাহ্মণ অপরের থেকে উচ্চ মর্যাদা দাবী করেন তিনি নীচে নেমে যান ও নিজেকে হেয় করে ফেলেন। মর্যাদা বা সম্মান দাবী না করে যাঁরা সেবা করেন সেই সব বিনয়ী সেবকদের পৃথিবী উচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকে। যেদেশে মোক্ষপ্রাপ্তিকে চরম লক্ষ্য জ্ঞান করা হয়, যেখানে অহিংসা হল পরমধর্ম ও যেদেশে আত্মায় আত্মায় কোন ভেদাভেদ করা হয় না কারণ একই আত্মা সর্বজীবে বিরাজমান, সেখানে উচ্চ-নীচের এই পার্থক্যের কোন স্থান নেই। সুতরাং আমার মতে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস সম্বন্ধে আমরা কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে শুচিতার বিধি-বিধান সেখানে পালন করা হবে। অর্থাৎ ছাত্রাবাসগুলির আদর্শ হবে যথার্থ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। বাহ্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম কেবল নামেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং তাই তা আমাদের আদর্শ হতে পারে না। কারণ এ পাপ এবং একে পরিহার করাই কর্তব্য।

নবজীবন, ৯-৯-১৯২৮

৬

আদর্শ ছাত্রাবাস

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত আমি ছাত্রাবাস পরিচালনা করছি। সুতরাং আমি এই দাবী করতে পারি যে কি-ভাবে ছাত্রাবাস পরিচালনা করতে হবে সে সম্বন্ধে আমার কিছুটা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে। এখানে "ছাত্রাবাস" শব্দটি একটু ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করলে ভাল হয়। প্রতিটি ব্যক্তি যিনি কিছু না কিছু শিখছেন তিনিই ছাত্র এবং যেখানে যেখানে এরকম একাধিক ছাত্র থাকেন সেইসব জায়গাকেই ছাত্রাবাস বিবেচনা করা যায়।

এইসব ছাত্রাবাস সাফল্যসহকারে পরিচালনার প্রথম ও সর্ব প্রধান শর্ত হল এই যে এখানকার সুপারইনটেনডেন্ট বা ছাত্রাবাসাধ্যক্ষেরা সচ্চরিত্র ব্যক্তি হবেন।

ছাত্রাবাসকে কদাপি কেবল ছাত্রদের বাসাবাড়ীতে পর্যবসিত হতে দেওয়া উচিত নয়, যেখানে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার জন্য ছাত্ররা একত্র থাকেন।

ছাত্রদের পরস্পরের ভিতর পরিবার-ভাবনামূলক বন্ধন গড়ে উঠবে এবং ছাত্রাবাসাধ্যক্ষ এ ব্যাপারে পিতার ভূমিকা নেবেন। ছাত্রাবাসাধ্যক্ষ ছাত্রদের সব ব্যাপারে আগ্রহ প্রদর্শন করবেন, তাঁদের সামাজিক জীবনের ভাগীদার হবেন এবং ছাত্রদের সঙ্গে আহার করবেন।

আদর্শ ছাত্রাবাস ছাত্রদের কাছে নিজ নিজ বিদ্যায়তনের চেয়েও গুরুত্ব লাভ করবে। প্রত্যুত ছাত্রাবাসই যথার্থ বিদ্যালয়। বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ে ছাত্ররা কেবল মৌখিক জ্ঞান পান কিন্তু ছাত্রাবাসে তাঁরা সব রকমের জ্ঞান অর্জন করবেন। আদর্শ ছাত্রাবাস বিদ্যানিকেতন থেকে পৃথক কোন প্রতিষ্ঠান হবে না। সুতরাং উভয় প্রতিষ্ঠান একই কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীন হবে এবং ছাত্র ও শিক্ষকেরা একত্র থাকবেন। এইভাবে ছাত্রাবাসগুলিকে যথার্থ বাড়ীর মত করে তুলতে হবে এবং সেখানে ছাত্রদের বিকাশের এমন আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি হবে যা আসল বাড়ীতেও পাওয়া যায় না। অতএব ছাত্রাবাসগুলিকে গুরুকূলে রূপান্তরিত করতে হবে।

আমাদের ছাত্রাবাসসমূহে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। এর কারণ হল এই যে ছাত্রাবাসের ছাত্রদের ভিতর এই মনোভাব গড়ে ওঠে না যে তাঁরা একই পরিবারের অংশ। আর ছাত্রাবাস পরিচালকরাও ছাত্রদের জীবনে পারিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করেন না।

তাছাড়া এইসব ছাত্রাবাসকে শহরের এলাকার বাইরে নিয়ে যেতে হবে এবং গ্রাম বা শহরের নাগরিক জীবনে যেসব সংস্কার

সাধন করা প্রয়োজন বলে অনুভূত হয়, সেগুলিকে এইসব ছাত্রাবাসে প্রথমে প্রবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ এখানে স্বাস্থ্য ও সাফাই-নীতি-সঙ্গত জীবন যাপন করার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে এবং স্বাস্থ্য ও সাফাই-এর বিধি-বিধান কঠোরতা সহকারে পালন করতে হবে। ভাড়াটে বাড়ীতে আদর্শ ছাত্রাবাস পরিচালনা করা যায় না। ছাত্রাবাসে ভাল স্নান ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। কামরাগুলিতে চমৎকার আলোহাওয়া খেলবে এবং ছাত্রাবাসের সংলগ্ন একটি বাগান থাকা চাই।

আদর্শ ছাত্রাবাস সর্ববিষয়ে স্বদেশী হবে। ছাত্রাবাসের গৃহ নির্মাণ তার আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম—সর্বত্র এই স্বদেশীয়ানার ছাপ থাকবে। গ্রামীণ শিল্প হস্তকলা এবং জীবনযাত্রা পদ্ধতির প্রভাব পড়বে ছাত্রাবাসের জীবনে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের কথা বিবেচনা করে এর ঘরবাড়ী তৈরি হবে। সুতরাং সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিশালী পাশ্চাত্য দেশসমূহে যেরকম ছাত্রাবাস তৈরি হয়, তা আমাদের আদর্শ হতে পারে না। সেইসব দেশের আবহাওয়ার সঙ্গেও আমাদের দেশের পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং ছাত্রাবাসের ঘরবাড়ী হবে আমাদের দেশের অবস্থার অনুকূল।

আদর্শ ছাত্রাবাসে এমন কিছু থাকবে না যার ফলে আলস্য বা বিলাস প্রোৎসাহন পায় অথবা স্বেচ্ছাচারের পথ প্রশস্ত হয়। এইজন্য সেখানে যে আহার্য সরবরাহ করা হবে তা জ্ঞানান্বেষীর জীবনচর্যার উপযুক্ত সাদাসিধে হবে। ছাত্রাবাসে নিয়মিত প্রার্থনা হবে, কাজ-কর্মের এবং বিশ্রাম ও নিদ্রার বাঁধাধরা নিয়ম থাকবে।

আদর্শ ছাত্রাবাস হবে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মত—ব্রহ্মচারীর মত জীবনযাপনকারী ছাত্রদের বসতি। ছাত্র শব্দটি একালের। প্রাচীনকালে এর পরিবর্তে ব্রহ্মচারী শব্দটি ব্যবহৃত হত এবং ছাত্র-জীবনের আদর্শ যথাযথভাবে ব্যক্ত করার পক্ষে সেই শব্দটি অধিকতর ভাববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রহ্মচর্য বা আধ্যাত্মিক অনুশীলন

—ইন্দ্রিয় সংযম, দেহ-মনের পবিত্রতা ও চূড়ান্ত সত্যের উপলব্ধির প্রয়াস অধ্যয়নকালে একান্ত অপরিহার্য। বর্তমানের এই বিপর্যয়কর দিনে আমি চাইব যে বিবাহিত ছাত্রেরাও যদি ছাত্রাবাসে থাকেন তাহলে অধ্যয়নকাল শেষ না হওয়া অবধি তাঁরা যেন ব্রহ্মচর্য পালন করেন। এর অর্থ হল এই যে এই সময়ে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তাঁরা তাঁদের স্ত্রীর সংসর্গ থেকেও দূরে থাকবেন।

পাঠকেরা স্মরণ রাখবেন যে আমি আদর্শ ছাত্রাবাসের বিধি-প্রকরণ বর্ণনা করেছি। একথা বুঝতে পারা যায় যে, সব ছাত্রাবাসই হয়ত এ আদর্শে উপনীত হতে পারবে না। তবে পূর্ববর্ণিত আদর্শকে যদি মানদণ্ডস্বরূপ স্বীকার করে নেওয়া যায়, তাহলে প্রত্যেক ছাত্রাবাসের কর্তব্য হল সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য চেষ্টা করা ও পূর্বোক্ত আদর্শের সঙ্গে তুলনা করে নিজেদের অগ্রগতির পরিমাপ করা।

নবজীবন, ৩-৩-১৯২৯

৭
আদর্শ ছাত্রাবাস প্রসঙ্গে

ছাত্রাবাসে থাকা সম্বন্ধে আমার ধারণা হল এই যে, এ হল নিজের পরিবারে থাকার মত। ছাত্রাবাসাধ্যক্ষ এবং ছাত্ররা একই পরিবারের সদস্যদের মত মিলেমিশে থাকবেন এবং এখানে অধ্যক্ষ পিতামাতার স্থান নেবেন। ছাত্রাবাসাধ্যক্ষের স্ত্রী সেখানে থাকলে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে ছাত্রদের এই পরিবারের বাবা-মায়ের ভূমিকা গ্রহণ করবেন। আমাদের দেশের ছাত্রাবাসগুলির অবস্থা এই আদর্শ থেকে অনেক দূরে। ছাত্রাবাসাধ্যক্ষ যদি ব্রহ্মচর্য পালন না করেন, তাহলে তাঁর স্ত্রী ছাত্রদের মায়ের স্থান নিতে পারবেন না। সম্ভবতঃ তিনি তাহলে চাইবেনই না যে তাঁর স্বামী ছাত্রাবাসের দায়িত্ব নিন আর যদি বা স্বামীকে সে কাজ করতে দেন তবে তা কেবল ভাল মাইনের

জন্য। সেক্ষেত্রে স্বামী যদি ছাত্রাবাসের ভাঁড়ারঘর থেকে কিছুটা ঘি চুরি করেন তাহলে স্ত্রীর তাতে পরোক্ষ সমর্থন থাকবে এবং তিনি ঘি পাবার জন্য খুশীও হবেন। এই উদাহরণ দিয়ে আমি অবশ্য এই কথা বলতে চাই না যে সব ছাত্রাবাসাধ্যক্ষেরাই এমনি। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে আমাদের বর্তমান অবস্থা শ্লাঘনীয় নয়।

আমি যাকে আদর্শ ছাত্রাবাস বিবেচনা করি, তার সংখ্যা আজও খুবই কম। প্রত্যুত গুজরাতের বাইরে ভারতবর্ষে এজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। ছাত্রাবাস গুজরাতের এক বিশেষ অবদান। এর বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। গুজরাত ধনী ব্যবসায়ী ও বনিকদের দেশ। ব্যবসার দ্বারা যাঁরা অর্থোপার্জন করেন, তাঁরা স্বীয় সম্প্রদায়ের বালকদের জন্য ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করতে ভালবাসেন। ছাত্রালয় নামক মহৎ শব্দটি অবশ্য পরে ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়েছে। গোড়ার দিকে এগুলিকে কেবল ছাত্রদের বাসাবাড়ী বলা হত। কারণ তখন শহরে আশেপাশের গ্রাম থেকে যেসব ছাত্র আসেন তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোন পরিকল্পনা ছিল না। পরবর্তীকালে যখন অধিকতর জ্ঞানী ছাত্রাবাসাধ্যক্ষদের নিয়োগ করা হতে লাগল তখন তাঁরা এখানকার ব্যবস্থাপনায় আদর্শবাদের অনুপ্রবেশ ঘটান আরম্ভ করলেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমি বিদ্যালয়ের চেয়ে ছাত্রাবাসকে অধিক গুরুত্ব দিই। প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অনেকটা যা বিদ্যালয়ে পাওয়া যায় না, তা পাওয়া যায় ছাত্রাবাসে। বিদ্যালয়ে কিছুটা বৌদ্ধিক প্রশিক্ষণ ঘটে থাকে, তবে তার পরিমাণ খুব বেশী নয়। ছেলেরা বিদ্যালয়ে যা শোনে ও যার পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয় তার খানিকটা অচেতন ভাবে হলেও তাদের মনে লেগে থাকে। আমি অবশ্য কেবল খারাপ দিকটাই দেখাচ্ছি। বিদ্যালয়ের পক্ষে এককভাবে ছাত্রাবাসের মত ছেলেদের মনকে শক্তিশালী ও বিকশিত করা সম্ভবপর নয়। আমার

কল্পনা হল এই যে শেষ অবধি ছাত্রাবাসের মধ্যে বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস উভয়েরই কর্মের সমন্বয় ঘটুক।

শেঠজীদের বদান্যতার দ্বারা স্থাপিত ছাত্রাবাসগুলি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। শেঠজীরা ছাত্রাবাস স্থাপনা করলেও তার প্রত্যক্ষ পরিচালনার ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করতেন না। ছাত্রাবাসাধ্যক্ষও মনে করতেন যে ছাত্রাবাসের ছাত্ররা যদি খেতে পায় ও বিদ্যালয়ে যায় তাহলে তাঁর দায়িত্ব শেষ হল।···ছাত্রাবাসাধ্যক্ষকে কেবল হিসাবনবিস হলে চলবে না, ছাত্ররা বিদ্যালয়ে কি করছে তার দিকেও নজর রাখতে হবে। ছাত্রাবাসের বাসিন্দাকে তিনি নিজের পুত্র বা ছাত্র মনে করে তাঁর পড়াশুনার উন্নতি ও অধিকতর কল্যাণের জন্য তিনি প্রয়াস পাবেন। বহুক্ষেত্রে আজ কিন্তু ছাত্ররা কোন্ ধরনের খাবার খেল সে সম্বন্ধে ছাত্রাবাসাধ্যক্ষ খবরও রাখেন না।

আমাদের ছাত্রাবাসসমূহে আজকে যে দুঃখদ বিপত্তিকর পরিস্থিতি বিরাজিত এবং প্রায়শঃ যাকে গোপন করার প্রচেষ্টা করা হয়, বিশেষ করে আমি তার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ছাত্রাবাসাধ্যক্ষেরা সত্যকার অবস্থা ব্যক্ত করতে অনিচ্ছুক। তাঁদের প্রতিষ্ঠানের দুর্নাম হবে এই আশঙ্কায় তাঁরা এইসব ঘটনা গোপন করেন। ছাত্রদের দুষ্কর্ম প্রকাশিত হয়ে পড়বে এই ভয়ে তাঁরা এমন কি ছাত্রদের অভিভাবকদেরও সেসব ঘটনার কথা জানান না। তবে চিরকাল এইভাবে সত্যকে গোপন রাখা যায় না। ছাত্রাবাসাধ্যক্ষ এই ধারণাপরবশ হয়ে চলেন যে এসব ঘটনার কথা বুঝি কেউ জানেন না; কিন্তু দুর্গন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েই। সবাইকে আমি এ ব্যাপারে সতর্ক হতে অনুরোধ জানাচ্ছি। তাঁরা যেন সাবধান হন এবং যথাযথভাবে নিজ কর্তব্য পালন করেন। যেসব ছাত্রাবাসাধ্যক্ষ নিজেদের ছাত্রাবাসকে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মানদণ্ড অনুযায়ী পরিচালনা করতে পারেন না, তাঁরা যেন ইস্তফা দেন। ছাত্রাবাসের বাসিন্দা ছেলেরা যদি চরিত্রশক্তি হারিয়ে ফেলেন, তাঁদের

চিন্তা যদি বিশৃঙ্খল হয় ও বুদ্ধিবৃত্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ার জন্য তাঁরা যদি বখাটেস্বভাবের হয়ে পড়েন তাহলে তার দায়িত্ব ছাত্রাবাসাধ্যক্ষের। এটা তাঁর অযোগ্যতার পরিচায়ক।

....ছাত্রাবাসাধ্যক্ষের উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা একাজ করার জন্য উচ্চ হারে বেতন দাবী করেন। তাঁরা বলেন যে তাঁদের বিধবা বোনকে দেখতে হয়, তাঁদের পুত্র বা কন্যার বিবাহের ব্যয়-নির্বাহ করতে হয়। এমতাবস্থায় এরকম লোক যোগ্য হলেও তাঁদের বাদ দিয়েই আমাদের কাজ চালাতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে দেশে এমন আরও অনেকে আছেন যাঁরা সমাজসেবা হিসাবে এ কাজে নেমেছেন—এ কাজকে তাঁরা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা অপর কিছু করতে চান না, এমন অনেকে আছেন যাঁরা কেবল মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থানের বিনিময়ে এ কাজ করতে প্রস্তুত।

পূর্বে আমি যা বলেছি তার থেকে বোঝা যাবে যে ছাত্রাবাসাধ্যক্ষকে প্রায় নিখুঁত মানুষ হতে হবে। যিনি ছাত্রদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে এবং তাঁদের উপর নৈতিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম তিনিই কেবল সফল ছাত্রাবাসাধ্যক্ষ হতে পারেন। প্রথমে এ জাতীয় ছাত্রাবাসাধ্যক্ষ জোগাড় না করে ছাত্রাবাস খোলা বিপজ্জনক ব্যাপার।

ছাত্রাবাসাধ্যক্ষদের সম্বন্ধে এই পর্যন্ত। এবার ছাত্রদের সম্বন্ধে কিছু বলব। গর্বে অন্ধ হয়ে ছাত্ররা যদি মনে করেন যে ছাত্রাবাসাধ্যক্ষেরা তাঁদের সুখসুবিধা দেখাশুনা করার চাকর, তাহলে মারাত্মক ভুল করা হবে। ছাত্ররা যদি মনে করেন যে তাঁদের কিছুই করার নেই, ছাত্রাবাসের সব কাজকর্ম সেখানকার ভৃত্যেরা করবেন তাহলে তাও হবে আর এক ভ্রান্তি। ছাত্ররা স্মরণ রাখবেন যে ছাত্রাবাস আরাম-আয়াসে দিন কাটাবার জায়গা নয়। ছাত্রাবাসে তাঁরা যা কিছু পাচ্ছেন তার দাম দিচ্ছেন—এই ধারণা তাঁদের ছেড়ে দিতে হবে। ছাত্রদের কাছ থেকে যে টাকা পাওয়া যায় তাতে

ছাত্রাবাসের সব খরচ চলে না। এই সব ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠাতা শেঠেরা ভ্রান্তিবশতঃ মনে করেন যে মাত্রাতিরিক্ত খাওয়ালেই বুঝি ছাত্রদের উন্নতি ঘটবে এবং তাঁদের সুখ-সাচ্ছন্দ্যে রাখলে পুণ্যলাভ হবে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণ ছাত্রদের জন্য তাঁরা বহুবিধ সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এর ফলে পুণ্য হবার পরিবর্তে পাপ হয়। ভাল হবার বদলে ছেলেরা আরও খারাপ হয় এবং তাদের পরনির্ভরশীল স্বভাব গড়ে ওঠে। যে কোন বুদ্ধিমান ছাত্র সহজেই এটা হিসাব করতে পারেন যে তিনি ছাত্রাবাসের যে কামরায় থাকেন তার ভাড়া কত এবং ছাত্রাবাসাধ্যক্ষ ও সেখানকার পাচক ভৃত্য ইত্যাদির বেতনই বা কত। এই হিসাবটুকু করলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে ছাত্রাবাসের খরচ হিসাবে ছাত্ররা যা দেন তাতে ছাত্রাবাসের সবরকম ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। তাঁরা কেবল খাইখরচ দেন। অনেক ছাত্রাবাসে আবার আহার্য বস্ত্র ও পুস্তক ইত্যাদি বিনা ব্যয়ে সরবরাহ করা হয়। যেসব শেঠেরা এই সব বাবদ অর্থব্যয় করেন তাঁরা যদি সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রদের কাছ থেকে এই মর্মে লিখিত প্রতিশ্রুতি নিতেন যে শিক্ষা লাভের পর তাঁরা দেশের সেবা করবেন তাহলে নাহয় একটা কথা ছিল। বদান্য হবার কারণ তাঁরা এমন কোন প্রতিশ্রুতি নেন না। কিন্তু ছেলেদের একথা বোঝা উচিত যে তাঁরা যা পাচ্ছেন তার প্রতিদান না দিলে চুরির ধনে জীবন নির্বাহ করা হয়। আমার ছেলেবেলায় আমি আখা ভগতের একটি কবিতা পড়েছিলাম যার একটি ছত্র নিম্নরূপঃ "চুরির ধনে জীবন যাপন করার অর্থ পারা খাওয়ার মত।"

বেআইনী প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করার ফলে ছাত্রদের বীরোচিত গুণাবলী গড়ে উঠতে পারে না। এর ফলে ছাত্ররা পোষমানা ও বশম্বদ স্বভাবের হয়ে পড়েন। তাঁদের এই বিনা-মূল্যের খাদ্য স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। ছাত্রাবাসে অপরাপর যেসব সুবিধা দেওয়া হয়, সেসব তাঁরা নিতে

পারেন। কিন্তু আমার কাছ থেকে শোনার পর অবিলম্বে যেন তাঁরা ছাত্রাবাসাধ্যক্ষকে অনুরোধ করেন যে তিনি যেন ছাত্রাবাসের চাকর বাকরকে ছুটি দেন এবং তাঁরা নিজেরাই (ছাত্ররা) সেই সব কাজ করে নেবেন। আর চাকরি গেলে চাকরদের কি হবে—এই চিন্তায় ছাত্ররা করুণাপরবশ হয়ে যদি তাঁদের রাখতে চান রাখুন; কিন্তু সে অবস্থাতেও তাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে মলমূত্র সাফাই সহ ছাত্রাবাসের সব রকমের কাজ তাঁরা স্বয়ং করে নেবেন। তাহলেই কেবল তাঁরা ভাল গৃহস্থ, আদর্শ নাগরিক হবেন এবং দেশকে সেবা করার যোগ্যতা অর্জন করবেন। আজ তো সৎভাবে পরিশ্রম করে লোকে নিজেদের ছোট ছোট পরিবারই প্রতিপালন করতে পারে না।

ভাল চাকরি পাবার মানে এই নয় যে লোকটি সৎভাবে জীবিকা অর্জন করছেন। তাঁকে ভেবে দেখতে হবে যে কেরানীর চাকরি করে তিনি যখন মাসে পঁচাত্তর টাকা পাচ্ছেন তখন পরিবারের সদস্য-সংখ্যা বেশী হওয়া সত্ত্বেও কোন শ্রমিক কেন কেবল বার টাকা পাচ্ছেন। নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে শীঘ্র তিনি বুঝতে পারবেন যে তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক বেতন পাবার যোগ্য নন, সৎভাবে তিনি নিজ জীবিকা অর্জন করছেন না এবং শহরে আমরা অধিকাংশই চুরির দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করছি। আমরা ডাকাতের দলের দালাল ছাড়া আর কিছুই নই। জনসাধারণের কাছ থেকে আমরা যা নিই তার শতকরা পঁচানব্বই ভাগ বিদেশে পাঠিয়ে দিই। এ জাতীয় পেশার দ্বারা রোজগার করার অর্থ আদৌ রোজগার না করা।

আমি যা বললাম তা যদি আপনাদের যুক্তিযুক্ত মনে হয় এবং আপনারা যদি আমার বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হন তাহলে আমি চাইব যে আজ থেকেই আপনারা এতদনুযায়ী চলা শুরু করুন।

…একথা ভাববেন না যে কোন রকম প্রস্তুতি ব্যতিরেকে হঠাৎ ত্যাগের পথে চলা যায়। বহু প্রযত্ন করার পরই মানুষ ত্যাগময় জীবন

গ্রহণ করতে পারে। কোন মানুষের ত্যাগমূলক জীবন যাপনের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকতে পারে, কিন্তু আপাত নির্দোষ জীবনের ছোট ছোট সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বাসনা যদি তিনি জয় করতে না পারেন তাহলে দেখা যাবে যে প্রয়োজনের মুহূর্তে তিনি পরাভূত হচ্ছেন। অভিজ্ঞতায় এটা সপ্রমাণ হয়েছে। উপস্থিত ছাত্ররা আমি যা বলেছি তা বোঝার জন্য যদি আন্তরিক চেষ্টা করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে আমার বক্তব্য মোটেই কঠিন নয় এবং সহজেই এটা পালন করা যেতে পারে।

নবজীবন, ১৩-২-১৯৩০

৮

সামরিক শিক্ষা

…যে বিষয়টি আমাকে বেদনা দিয়েছে তা হল সামরিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা। আমার মতে এ বিষয়ে সর্বভারতীয় স্তরে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে আমাদের অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে। নচেৎ পৃথিবীর পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হবার পরিবর্তে আমরা অভিশাপ হয়ে উঠব। নেতা কাউকে বানান যায় না, লোকে নেতা হয়েই জন্মায়। পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বেই রাষ্ট্রের কি এ ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে ওঠা সমীচীন? সুতরাং কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি এ জাতীয় বহু ব্যাপক সুপারিশ* করায় ভাগ নিয়েছেন দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

হরিজন, ২৩-৩-১৯৪৭

***শিক্ষা-সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির সুপারিশ**

নূতন দিল্লী, ২৭শে জানুয়ারী

"শিক্ষা-সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি জাতীয় সামরিক বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির এই সুপারিশ সমর্থন করেছে যে রাজ্য ও প্রদেশসমূহ জাতীয় সামরিক বিদ্যালয়ে ছাত্র পাঠাবার উপযুক্ত আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করবেন, ছেলেরা যেখানে চরিত্র গঠন ও নেতৃত্বশক্তির বিকাশের যথেষ্ট সুবিধা পাবে।

৯

শিক্ষা ও শ্রমের মর্যাদা

…মাদক দ্রব্য বিক্রয় খাতে প্রাপ্ত রাজস্ব অথবা ভূমি-রাজস্ব দ্বারা আমাদের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করা চলবে না। স্বরাজ হলে চরখাই হবে এর প্রধান অবলম্বন। প্রত্যেক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে যদি চরখা ও তাঁত প্রবর্তন করা যায় তাহলে সহজেই তার দ্বারা শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করা যাবে। আজ আমি চাই যে ছেলেরা সব সময়ে সূতা কাটুক। কিন্তু স্বরাজ অর্জিত হলে এর জন্য রোজ অন্ততঃ এক ঘণ্টা করে সময় দিতে হবে। আমাদের জীবনের সর্বস্তরে যেন স্বরাজ ক্রিয়াশীল হয়। আজ আমাদের বিদ্যালয়গুলি কৃতদাস উৎপাদনের কারখানাস্বরূপ। স্বরাজের আওতায় শিক্ষার লক্ষ্য হবে ছেলেদের যুবাবস্থা থেকে স্বাবলম্বী করা। তাদের যে-কোন পেশা শেখান যেতে পারে কিন্তু সূতা কাটাটা হবে বাধ্যতামূলক। দুর্গতের সান্ত্বনা হবে চরখা। অপর কোন শিল্পের চরখার সমান গুণ নেই, কারণ চরখাই একমাত্র কৃষিকার্যের পূরক হতে পারে। সবাই সূত্রধর বা কর্মকার হতে পারেন না কিন্তু কাটুনী সকলেই হতে পারেন। তাঁরা হয় দেশের জন্য অথবা নিজেদের আয়ের অনুপূর্তির উদ্দেশ্যে সূতা কাটবেন। কাপড় পরার প্রয়োজনীয়তা সার্বজনীন বলে চরখাকেও সার্বজনীন হতে হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-৩-১৯২১

"সমিতি এই অভিমত পোষণ করে যে জাতীয় যুদ্ধোত্তর শিক্ষায় যে নূতন ধরনের বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে তা স্থল নৌ ও বিমান বাহিনীর উপযুক্ত নেতৃত্বশক্তি চরিত্র বুদ্ধি সাহস ও শারীরিক দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেবে।

"সমিতি প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সামরিক কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত পূর্বোক্ত ধরনের বিদ্যালয় স্থাপনা করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি আকর্ষণ করছে।"—অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া।

হরিজন, ২৩-৩-১ ৪৭

১০

শিক্ষায় চরখার ভূমিকা

যদি আমরা বিশ্বাস করি যে খদ্দরের সূতায় স্বরাজের চাবিকাঠি রয়েছে, চরখার শক্তিতে যদি আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, যদি আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ভারতের যে আর্থিক পুনরুত্থান আমরা এত তীব্রভাবে চাই, চরখা ছাড়া তা সম্ভবপর হতে পারে না, আর আমরা যদি এই সত্য উপলব্ধি করে থাকি যে নিজেদের অত্যল্প প্রয়োজন মেটাবার সঙ্গতি না থাকার দরুন এবং পরিপূরক কাজ না থাকার কারণ আমাদের কোটি কোটি স্বদেশবাসী সর্বদা ঋণ-জর্জর, তাহলে আমাদের দেখা উচিত যে আমাদের ছাত্রদের যেন সর্বাগ্রে সূতা কাটা শেখান হয়। এর দ্বিবিধ পরিণাম হবে: প্রথমতঃ ছেলেরা স্বাবলম্বী হতে শিখবে; দ্বিতীয়তঃ ছেলেদের বিদ্যালয়ে সূতা কাটা শেখান আরম্ভ হলে শীঘ্র তা সর্বব্যাপক হয়ে পড়বে। যারা সম্পূর্ণরূপে হতাশার কবলিত এবং টিকে থাকার জন্য যারা ভিক্ষা করতে অভ্যস্ত তাদের চরখা চালাতে শেখান একটু কঠিন। সূতা কাটাকে কেবল উপরোক্ত শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে আমরা যদি একে নিছক দরিদ্র ও বুভুক্ষুদের পেশাতে পরিণত করি তাহলে এ শিল্প কখনই ব্যাপ্তি লাভ করবে না। কিন্তু সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তিরা একে কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করলে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে চরখাকে গ্রহণ করবে। অতএব একথা সহজেই বোঝা যায় যে সর্ববিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরখাকে ব্যাপকভাবে স্থান না দিলে আজ বালক ও প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়।

ব্যাপারটি গ্রহণ করতে অসুবিধা হবার কথা নয়। একথা স্পষ্ট যে আমাদের সকলকে এমন একটি কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে যাতে যথাসম্ভব শীঘ্র স্বরাজ অর্জিত হয়। এই কাজটি হল চরখায় সূতা কাটা। এই হল একমাত্র কাজ, কারণ এর দ্বারা এই বছরের

মধ্যেই বিদেশী বস্ত্র সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে সক্ষম হব। আর সাফল্য সহকারে বিদেশী বর্জন করতে পারলে স্বরাজ ত্বরান্বিত হবে। ইংরাজী ভাষার জ্ঞান বৃদ্ধি হলে স্বরাজ বা স্বাধীনতা পাবার ব্যাপারে কোন সহায়তা মিলবে না। এর জন্য আমরা তাই সুবিধামত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি। অনুরূপভাবে খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ বা বিজ্ঞানী হলে স্বরাজ পাওয়া সুখকর হবে না। আর কাগজ বা আলপিন উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করেও আমরা স্বরাজের নিকটবর্তী হব না। এসবও তাই মুলতুবী রাখা যেতে পারে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মহাবিদ্যালয় (কলেজ), বিনয়মন্দির (উচ্চ বিদ্যালয়), কুমারমন্দির (প্রাথমিক বিদ্যালয়), অধ্যাপনামন্দির (শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংস্থা) সমূহে বর্তমানে কেবল একটি কাজেরই অবকাশ রয়েছে এবং তা হল সূতা কাটা। সাহিত্য-শিক্ষাকে অপরিহার্য মনে হলেও সময় জুটলে মনকে একটু বিরাম দেবার জন্য এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমি এমন একজন ইংরেজ পণ্ডিতের কথা জানি যিনি কেবল নিজ কর্ম-পরিবর্তন দ্বারাই বিশ্রাম নিতেন। পার্লামেণ্টের কাজের পর শ্রান্ত হয়ে যখন তিনি বাইরে বেরোতেন তখন নিজ কাজের ধারা পরিবর্তন করে পিপীলিকা ও মৌমাছিদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করতেন। এইভাবে ওদের দেখে তিনি বিশ্রাম ও নির্দোষ প্রমোদ—দুই-ই লাভ করতেন। আমাদের ছাত্রসমাজের ভিতরও ঐ জাতীয় অভ্যাস প্রবর্তন করা যাবে না কেন ? চরখা কেটে যখন তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়বেন তখন হিন্দি পড়া শুরু করতে পারেন এবং তাতে শ্রান্তি এলে আবার চরখা ধরবেন। আর মন এ না চাইলে হিন্দি পড়ার পর তাঁরা সঙ্গীত ব্যায়াম ইত্যাদির পিছনে খানিকটা সময় দিয়ে তারপর আবার চরখায় হাত দিতে পারেন। এইভাবে ক্রমশঃ তাঁরা এই মূল্যবান অভ্যাস আয়ত্ত করতে সমর্থ হবেন। আজ যদি জনসাধারণের কোন একটি বাসনার পরিপুষ্টি সাধন করার দরকার হয়ে থাকে তাহলে তা হল চরখা

চালান। মদ্যপানে আসক্তদেরও আমি চরখার অব্যর্থ নিদান দেব। চরখার প্রতি আসক্তি মদ্যাসক্তির চেয়ে কম প্রবল নয়। এ দুয়ের পার্থক্য কেবল এই যে একটি সঞ্জীবনী শক্তিবিশিষ্ট আর অপরটি মৃত্যুর বাহন।

নবজীবন, ৮-৫-১৯২১

১১
শ্রমের মর্যাদা

"প্রত্যহ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্নাতক এমন বহু যুবকের সঙ্গে দেখা হয় যারা নিজেদের ডিগ্রীর বেসাতি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা এমন সব মানুষদের কাছ থেকে সুপারিশ-পত্র চান যিনি শিক্ষিত না হলেও বিত্তশালী এবং দশের মধ্যে নয়টি ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কাছে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই সব ডিগ্রীর চেয়ে ধনী ব্যক্তির সুপারিশের মূল্য বেশী হয়ে থাকে। এর দ্বারা কি প্রমাণ হয়? এর অর্থ হল এই যে বৌদ্ধিক সংস্কৃতির চেয়ে অর্থের মূল্য বেশী; মস্তিষ্কের মর্যাদা কম। এরকম হবার কারণ কি? কারণ মস্তিষ্ক অর্থোপার্জনে বিফল হয়েছে। আর এই বিফলতার মূলে রয়েছে বৌদ্ধিক জ্ঞান-নির্ভর পেশার অপ্রতুলতা। বাজার না থাকার ফলে মানব-সমাজের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও শক্তিশালী উপাদান মস্তিষ্ক আজ আবর্জনায় পরিণত হয়েছে।

কৃষকের সম্পদ হল তাঁর হাত দুটি। জমিদারের সম্পদ তাঁর ভূ-সম্পত্তি। আর ভূমির অনুশীলন হল কৃষি, হাতের অনুশীলনের নাম শিল্প।...দেশের শতকরা ৯৮ জনেরও বেশী কৃষিক্ষেত্রে কাজ করেন। কিন্তু জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাতের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। যে জমির টুকরাটি থেকে ত্রিশ বৎসর পূর্বে পাঁচ জনের একটি পরিবারের চলত, তার থেকে আজ বার থেকে পনের জনের সংসার প্রতি-পালন করতে হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশে গিয়ে অতিরিক্ত জন-সংখ্যার একটা অংশ জীবিকা অর্জন করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জীবনমানের অধোগতিকে অপরিহার্য ভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।"

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটি শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস কর্তৃক বিহার ইয়ং মেনস ইনসটিটিউট-এ প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে নেওয়া হয়েছে।…বক্তা কোন নূতন কথা বলেন নি। তবে তাঁর বক্তব্যের সবিশেষ মূল্যের কারণ হল এই যে স্বয়ং প্রখ্যাত আইনব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে হাতের শ্রমকে শ্রদ্ধা করেন তাই নয়, নিজে মধ্যবয়সে প্রত্যক্ষভাবে হাতের কাজ করা শিখেছেন। আর নিছক শখ হিসাবে তিনি এই হাতের কাজ শেখেন নি, যুবসম্প্রদায়কে শ্রমের মর্যাদা শিক্ষা দেবার জন্য এবং তাঁদের দৃষ্টি ভারতবর্ষের শিল্পের প্রতি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে তিনি এইভাবে নিজে হাতে কাজ করা শিখেছেন। শ্রীযুক্ত দাসের উদ্যোগে কটকে একটি চামড়া পাকা করার কারখানা স্থাপিত হয়েছে, যেখানে বহু যুবককে কুশলী শ্রমিক হবার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তবে লক্ষ লক্ষ হাতের শক্তি যে শিল্পে লাগা উচিত তা হল নিঃসন্দেহে সূতা কাটা। দেশের অগণিত কৃষকদের এমন একটা বুদ্ধিপূর্ণ পেশার সন্ধান দিতে হবে যার দ্বারা তাঁদের মস্তিষ্ক ও হাত দুই-এরই প্রশিক্ষণ হবে। চরখা চালান হচ্ছে এর অনুকূল শ্রেষ্ঠতম ও সর্বাপেক্ষা সুলভ শিক্ষাব্যবস্থা। সর্বাপেক্ষা সুলভ এই জন্য যে এর দ্বারা অবিলম্বে কিছু না কিছু রোজগার করা যায়। আর ভারতবর্ষে যদি আমরা সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাই, তাহলে প্রাথমিক শিক্ষাকে কেবল লিখতে পড়তে ও কিছুটা অঙ্ক শেখানর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। সূতা কাটা ও তৎসংশ্লিষ্ট সব রকম হাতের কাজকে এর অঙ্গীভূত করতে হবে। সূতা কাটা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজের মাধ্যমে যখন চোখ আর হাত যথোচিতভাবে প্রশিক্ষিত হবে তখন ছেলেমেয়েরা লিখতে পড়তে ও গণিত শেখার জন্য তৈরি হবে। আমি জানি অনেকে এই প্রস্তাবকে একেবারে অসম্ভব এবং অনেকে আবার অবাস্তব মনে করবেন। তবে যাঁরা এমন মনে করেন তাঁরা কোটি কোটি দেশবাসীর অবস্থা জানেন না। ভারতের কোটি কোটি কৃষক-সন্তানকে শিক্ষা দেবার অর্থ কি তাও

তাঁরা জানেন না। আর দেশের রাজনৈতিক জাগরণের বনিয়াদ শিক্ষিত সমাজ যতক্ষণ না শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করছেন এবং যত দিন না দেশের প্রতিটি যুবক সূতা কাটা শিক্ষা করা ও গ্রামে গ্রামে একে পুনঃপ্রবর্তন করা নিজের একান্ত কর্তব্যস্বরূপ বিবেচনা করছেন ততদিন এই অতীব প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর হবে না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-৯-১৯২৬

১২

স্বাবলম্বনই আত্মমর্যাদা

একাধিকবার আমি এই কথা বলেছি যে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক বা অন্ততঃ শিক্ষলাভে ইচ্ছুক বালক-বালিকাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে আমাদের বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলি পূর্ণমাত্রাতে না হলেও অন্ততঃ যেন প্রায় স্বাবলম্বী হয়। চাঁদা সরকারী সহায়তা অথবা ছাত্রদের কাছে বেতন বাবদ আদায় করা অর্থে স্বাবলম্বী হবার কথা বলা হচ্ছে না, ছাত্ররা নিজেদের হাতে উৎপাদনমূলক কাজ করে তার আয়ে বিদ্যালয়কে স্বাবলম্বী করবে। এটা সম্ভবপর কেবল তখনই যখন শিল্প-শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়। সাহিত্যমূলক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের শিল্প-শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যহ উত্তরোত্তর অনুভূত হচ্ছে। এছাড়া শিক্ষাকে প্রত্যক্ষভাবে স্বাবলম্বী করার জন্যও এদেশে শিল্প-শিক্ষার প্রয়োজন। আমাদের ছাত্ররা যখন শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করতে শিখবেন এবং যখন দৈহিক শ্রম করতে না জানাকে অপমানকর বিবেচনা করার প্রথা প্রবর্তিত হবে তখনই এটা সম্ভবপর হবে। আমেরিকা পৃথিবীর সমৃদ্ধতম দেশ এবং তাই সেদেশে শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করার প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে কম। তবুও সেদেশে ছাত্রদের নিজ শিক্ষার ব্যয় পূর্ণতঃ বা আংশিকভাবে রোজগার করা সাধারণ প্রথা। আমেরিকার হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশনের সরকারী মুখপাত্র—"হিন্দুস্থানী স্টুডেণ্ট" এসম্বন্ধে জানাচ্ছে ঃ

"আমেরিকার ছাত্রদের প্রায় শতকরা ৫০ জন গ্রীষ্মের ছুটি এবং বৎসরের বাদ বাকী সময়ের একাংশ অর্থোপার্জনের জন্য নিয়োগ করেন। কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বুলেটিন থেকে জানা যায় যে 'স্বাবলম্বী ছাত্ররা সম্মান পেয়ে থাকেন।' গড়পড়তা মনোযোগী ছাত্র কলেজ খোলা থাকার সময় সপ্তাহে বার থেকে পঁচিশ ঘণ্টা সময় এই জাতীয় বাইরের কাজের জন্য দিতে পারেন এবং এর জন্য তাঁর পড়াশুনার কোনো ক্ষতি হয় না···। ছাত্রদের পক্ষে নিম্নলিখিত শিল্পগুলি সম্বন্ধে কিছুটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন: সূত্রধরের কাজ, জরিপ ও নকশা তৈরীর কাজ, ইট গড়া, পলস্তারা করা, মোটরগাড়ী চালান, ফটো তোলা, যন্ত্রপাতি মেরামতের বিদ্যা, রঙাই, কৃষিকার্য, যন্ত্র-সঙ্গীত ইত্যাদি ইত্যাদি। হোটেল রেস্তোরাঁয় দিনে দুই ঘণ্টা খাবার সরবরাহ করার মত সহজ কাজ ইত্যাদি কলেজ খোলা থাকার সময় পাওয়া যায় এবং এর দ্বারা ছাত্ররা থাকা খাওয়ার খরচের একাংশ উপার্জন করে নেন। গ্রীষ্মাবকাশে কাজ করে অংশতঃ স্বাবলম্বী ছাত্র দেড়শ' থেকে দুই শত ডলার সঞ্চয় করতে পারেন। কানসান, নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়, পিটসবার্গ, ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়, এন্টিওক কলেজ ইত্যাদিতে ছাত্রদের যন্ত্রবিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে যার ফলে ছাত্ররা কলকারখানায় কাজ করে সারা বছরের শিক্ষা-বেতন রোজগার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেও সমৃদ্ধতর করেন।"···

আমেরিকা যদি তার বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলিকে এমনভাবে চালায় যাতে ছাত্ররা তাঁদের শিক্ষার ব্যয়ের একাংশ উপার্জন করতে সক্ষম হন, তাহলে আমাদের দেশের পক্ষে এটা আরও কত প্রয়োজনীয়। দরিদ্র ছেলেদের শিক্ষার বেতন মাপ করে তাঁদের হতমান করার চেয়ে তাঁদের জন্য কাজের সংস্থান করে দেওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয় নয় কি? জীবিকা অর্জন অথবা শিক্ষার ব্যয়নির্বাহের জন্য গায়েগতরে কাজ করা ভদ্রলোকের কাজ নয়—ভারতবর্ষের যুবকদের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে আমরা যে দেশের কী পরিমাণ ক্ষতি করছি তা বলে বুঝান যাবে না। এর ফলে আমাদের নৈতিক এবং ভৌতিক উভয় প্রকারের ক্ষতি হচ্ছে। প্রত্যুত ভৌতিক ক্ষতির তুলনায়

নৈতিক ক্ষতির পরিমাণ বেশী। বিবেকশীল বালকের কাছে বিনা বেতনে পড়াটা সারা জীবন বোঝার মত হয়ে থাকে এবং থাকা উচিতও। উত্তরকালে কেউ এটা শুনতে চান না যে শিক্ষালাভের জন্য তাঁকে দয়ার দানের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। পক্ষান্তরে এমন কে আছেন যিনি গৌরবসহকারে নিজের শৈশবের কথা মনে করবেন না যখন নিজের মন দেহ ও আত্মার শিক্ষার জন্য তিনি কোন ছুতারের কারখানা বা অনুরূপ জায়গায় কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন ?

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৮-১৯২৮

১৩

যৌন-বিকার

কয়েক বৎসর পূর্বে বিহার সরকারের শিক্ষাবিভাগ বিদ্যালয়ের অস্বাভাবিক পাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য একটি তদন্ত সমিতি গঠন করেন এবং সেই সমিতি দেখতে পান যে এমন কি শিক্ষকদের মধ্যেও এ জাতীয় পাপের অস্তিত্ব রয়েছে ও শিক্ষকেরা ছাত্রদের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধের সুযোগ নিয়ে নিজেদের অস্বাভাবিক লালসা তৃপ্ত করছেন। এই নির্দেশনামা জারী হবার পর কি ফললাভ হয়েছে তা জানতে স্বভাবতঃ কৌতূহল হয়।

অন্যান্য প্রদেশ থেকেও আমার কাছে এই ব্যাপার সংক্রান্ত কাগজপত্র পাঠিয়ে আমার দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করা হয়েছে যে ভারতের সর্বত্র সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরনের বিদ্যালয়েই এ পাপ বাড়তির পথে। ছাত্রদের কাছ থেকে যেসব ব্যক্তিগত পত্র পাই তাতেও পূর্বোক্ত অভিযোগের পরিপুষ্টি হয়।

এ পাপ অস্বাভাবিক হলেও বহু দিন ধরে এটা চলে আসছে। যে কোন গোপন পাপের প্রতিকার খুঁজে বার করা খুব কঠিন ব্যাপার। আর শিক্ষকের মত ছাত্রদের অভিভাবকেরা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলে

ব্যাপারটা আরও দুরূহ হয়ে পড়ে। "লবণ যদি তার লবণত্ব হারিয়ে ফেলে তাহলে কি দিয়ে আর লবণাক্ত করা হবে?" আমার মতে যেসব ক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় সেখানে শাস্তিদান সমর্থনযোগ্য হলেও এর দ্বারা সমস্যার সমাধান হবার সম্ভাবনা কম। একমাত্র জনমত জাগ্রত হলেই এর প্রতিবিধান হওয়া সম্ভবপর। তবে এই দেশে অধিকাংশ ব্যাপারেই সক্রিয় জনমত বলে কোন কিছু দেখা যায় না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অসহায় মনোবৃত্তি পরিদৃশ্যমান, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়েছে। সুতরাং আমাদের সম্মুখে অনুষ্ঠিত বহুবিধ অন্যায় আমরা বরদাস্ত করি।

সাহিত্যভিত্তিক জ্ঞানের উপর যে শিক্ষাব্যবস্থা মাত্রাতিরিক্ত জোর দেয়, তা যে কেবল এই পাপের নিরাকরণের পক্ষে অযোগ্য তা-নয়, প্রকৃতপ্রস্তাবে এই শিক্ষাব্যবস্থা এ পাপকে প্রোৎসাহিত করে। সরকারী বিদ্যালয়ে যাবার পূর্বে যেসব ছাত্র নিষ্কলুষ ছিলেন, শিক্ষাকালের অবসানে দেখা যায় যে তাঁরা কালিমা-কলঙ্কিত, নারী-স্বভাবের ও পৌরুষবিহীন হয়ে পড়েছেন। বিহারের তদন্ত সমিতি "ছাত্রদের মনে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব" জাগাবার সুপারিশ করেছেন। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? একমাত্র শিক্ষকরাই ছাত্রদের মনে ধর্মের প্রতি এই শ্রদ্ধাভাব জাগাতে পারেন। কিন্তু সে শ্রদ্ধার ভাব তাঁদেরই নেই। সুতরাং সমস্যাটা হল ভাল শিক্ষক বাছাই-এর। কিন্তু ভাল শিক্ষক বাছাই-এর অর্থ হল হয় আজকের চেয়ে অনেক বেশী হারে বেতন দেওয়া নচেৎ জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে নয়, সেবার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে ব্রত হিসাবে শিক্ষকতা করা। আজও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে এই প্রথা বিদ্যমান। প্রথমোক্ত বিকল্প আমাদের এই দরিদ্র দেশে ঘটা সম্ভবপর নয়। আমার কাছে দ্বিতীয় বিকল্পটিই একমাত্র বাস্তব পন্থা বলে মনে হয়।......

এই পাপের প্রতিবিধান করার সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে

এইজন্য যে ছাত্রদের অভিভাবকেরা সাধারণতঃ তাঁদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখান না। বিদ্যালয়ে পাঠিয়েই তাঁদের কর্তব্য শেষ হয়ে গেল বলে তাঁরা মনে করেন। এইজন্য আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ভরসা কেবল একটি কারণে। সকল পাপের প্রতিবিধানই এক এবং তা হল সাধারণ শুদ্ধিকরণ। পাপের পরিমাণ দেখে অভিভূত না হয়ে আমাদের প্রত্যেককে নিজের অন্তরঙ্গ পরিবেশকে দিয়ে যথাসাধ্য প্রয়াসে শুদ্ধিকরণের কাজ আরম্ভ করতে হবে। প্রত্যেকে নিজেকে প্রথম আক্রমণ-স্থল করে তুলবেন। নিজেদের যেন আমরা এই বলে প্রবোধ দেবার চেষ্টা না করি যে আমরা অপর সকলের থেকে পৃথক। অস্বাভাবিক পাপ কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। এ একই ব্যাধির এক ভীষণ উপসর্গ। আমাদের ভিতর যদি অপবিত্রতা থাকে, আমরা যদি দুশ্চরিত্র হই, তাহলে আমাদের প্রতিবেশীদের সংস্কার সাধন করার প্রয়াসে ব্রতী হবার পূর্বে নিজেদের সংশোধন করতে হবে। আমাদের দেশে নিজের রাশ একেবারে আলগা করে দিয়ে অপরের সম্বন্ধে বিচার করার প্রবণতা বিদ্যমান। এর পরিণামে এক দুষ্ট-চক্রের সৃষ্টি হয়। যাঁরা এ সত্য উপলব্ধি করেন তাঁদের এর বাইরে বেরোতে হবে এবং তাহলেই তাঁরা দেখতে পাবেন যে প্রগতি সহজসাধ্য না হলেও ক্রমশঃ সম্ভাব্যতার পর্যায়ে এসে পড়ছে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-৬-১৯২৭

১৪

যৌন-বিকার প্রসঙ্গে

লাহোরের সনাতন ধর্ম কলেজের অধ্যক্ষ লিখছেন ঃ

"...বালকদের কুপথগামী করার পাপ নিঃসন্দেহেই ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রবল।

আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে হরিজন বা অপর কোন পত্রিকায়

কোন পত্র বা প্রবন্ধ লিখে আপনি দেশবাসীর দৃষ্টি এই দুষ্টক্ষতের প্রতি আকর্ষণ করুন।”

এ পাপ নূতন নয়। আর এ বহুব্যাপকও বটে। আর একে গোপন রাখা হয় বলে সহজে এর খোঁজও পাওয়া যায় না। সহজ জীবনযাত্রার সঙ্গে এর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। অধ্যক্ষ মহোদয় যে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন সেখানে শিক্ষকেরা তাঁদের অভিভাবকত্বের অধীন ছাত্রদের ভ্রষ্ট করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। “লবণ যদি তার লবণত্ব হারিয়ে ফেলে তবে কি দিয়ে আর লবণাক্ত করা হবে ?”

ব্যাপারটি এমন যে কোন কমিশন বা সরকারের পক্ষে এর প্রতিবিধান করা সম্ভবপর নয়। এ কাজ হল নৈতিক সংস্কারকদের। ছেলেদের মা-বাবাকেও তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হতে হবে। ছাত্রদের নিষ্কলুষ জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আনতে হবে। নীতিশাস্ত্র ও কলুষহীন জীবনই যে যথার্থ শিক্ষার বনিয়াদ—এই ধারণার প্রচার যথোচিত গুরুত্ব সহকারে করতে হবে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অছিদের শিক্ষক নির্বাচনের ব্যাপারে খুবই সতর্ক হতে হবে। এই ভাবে নির্বাচিত শিক্ষকরা যাতে আদর্শ মানদণ্ড অনুযায়ী চলেন তার প্রতিও তাঁদের দৃষ্টি রাখতে হবে। এই সব পন্থা অবলম্বন করলে এই পাপকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা সম্ভবপর না হলেও অন্ততঃ নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে।

হরিজন, ২৭-৪-১৯৩৫

১৫

শিক্ষক ও ছাত্রী

কোন শিক্ষকের যদি নিজ ছাত্রীর সঙ্গে গোপন সম্বন্ধ থাকে এবং পরে আর যখন সে সম্বন্ধকে গোপন রাখা সম্ভবপর হয় না তখন তাকে বৈধ করার জন্য যদি শিক্ষকটি তাঁর ছাত্রীকে বিবাহ করেন তাহলেও একথা বলা যায় না যে এর দ্বারা সেই সম্বন্ধকে শুদ্ধ করে

দৃঢ়নিশ্চয়। নির্বিষ বৃশ্চিকের মত শেষ পর্যন্ত এ শূন্যগর্ভ বলে প্রমাণিত হবে। তবে তার অর্থ এই নয় যে ইত্যবসরে আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব। এর পরাভবের নিশ্চয়তা যেন আমাদের অলীক নিরাপত্তার সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন করতে না পারে। কোন পুরুষ বা রমণীর অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিপ্রকাশ হচ্ছে কামনা-বাসনার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করা। বাসনাজয়ী না হওয়া পর্যন্ত মানুষ নিজের উপর রাজত্ব করার আশা পোষণ করতে পারে না। আর আত্মশাসন বিনা স্বরাজ বা রামরাজত্বের ভরসা নেই। আত্মশাসন ব্যতিরেকে সর্বসাধারণকে শাসন করতে যাওয়া আত্মপ্রতারণার নামান্তর মাত্র। এ যেন সুন্দর রঙ করা মাটির আম। বাইরে থেকে দেখতে মনোহর ; কিন্তু আসলে অন্তঃসারশূন্য। যে কর্মী নিজ কামনা বাসনা সংযত করতে শেখেন নি, তিনি হরিজন সেবা, সাম্প্রদায়িক ঐক্য, খাদি, গোরক্ষা বা গ্রামোন্নয়ন আদি কোন ক্ষেত্রেই সত্যকার সেবা করতে পারেন না। এই জাতীয় মহান্ কার্য শুধু বৌদ্ধিক সম্পদ্ দ্বারা সাধিত হতে পারে না। এর জন্য নৈতিক ও আত্মিক শক্তি প্রয়োজন। আত্মার শক্তি আসে ঈশ্বর-কৃপায় এবং যিনি বাসনার দাস, সে কখনও ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করতে পারেন না।

সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে এই—আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে যৌনবিজ্ঞানের স্থান কি হবে বা আদৌ এর কোন স্থান থাকবে কিনা ? যৌনবিজ্ঞান দুই প্রকারের। একরকম যৌন-আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও নিবৃত্তি শেখায় ও অপরটি যৌন উত্তেজনা বাড়ায় ও এর খোরাক সংগ্রহে প্রবুদ্ধ করে। প্রথমোক্ত শিক্ষা ছেলেমেয়েদের জন্য যতটা প্রয়োজন, দ্বিতীয় ধরনের শিক্ষা ঠিক ততটাই ক্ষতিকারক ও বিপজ্জনক বলে একান্ত বর্জনীয়। কামকে মানুষের পয়লা নম্বরের শত্রু আখ্যা দিয়ে সকল ধর্ম ঠিকই করেছে। ক্রোধ বা বিদ্বেষকে সকলে দ্বিতীয় স্থান দিয়েছে। গীতার মতে কাম থেকেই ক্রোধের উৎপত্তি। গীতায় অবশ্য কাম কথাটি ব্যাপকার্থে প্রযুক্ত হয়েছে। তবে যে সংকুচিত

অর্থে শব্দটি এখানে প্রয়োগ করা হল, গীতার উপদেশ সে অর্থেও সমান কার্যকরী।

অবশ্য তবুও মূল প্রশ্নের জবাব দেওয়া বাকি থেকে যায়। কথা হচ্ছে এই যে সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীদের প্রজনন-যন্ত্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া কাম্য কিনা? আমার মনে হয় তাঁদের এ সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জ্ঞান দান করা উচিত। বর্তমানে তাঁদের যে কোন উপায়ে এতদ্‌সম্বন্ধীয় জ্ঞানার্জনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় ও ফলে তাঁরা পথভ্রান্ত হয়ে নানারকম কুক্রিয়ার কবলে পড়েন। যৌন-কামনা সম্বন্ধে জোর করে চোখ বুজে আমরা যথোচিত ভাবে এর নিয়ন্ত্রণ বা দমন করতে পারব না। সুতরাং আমি তরুণবয়স্ক বালক-বালিকাদের নিজ প্রজনন-যন্ত্রের তাৎপর্য ও যথাযথ উপযোগিতা শিক্ষা দেবার ঐকান্তিক সমর্থক এবং আমার উপর যেসব ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ভার পড়েছিল, তাঁদের আমি আমার স্বকীয় পদ্ধতিতে এ সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু আমি যে ধরনের যৌন-শিক্ষা চাই, তার লক্ষ্য হবে যৌন-আকাঙ্ক্ষাকে জয় করে এর থেকে নিবৃত্ত হওয়া। এ শিক্ষা স্বতঃই ছাত্রদের মানুষ ও পশুর পার্থক্য বুঝিয়ে দেবে, তাঁদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করবে যে মস্তিষ্ক ও হৃদয়—এই উভয়বিধ বৃত্তির আধার হবার একমাত্র সৌভাগ্য হয়েছে শুধু মানুষেরই। তাঁদের জানতে হবে যে, মনুষ্য কথাটির শব্দ-রূপার্থের যথাযথ পরিচয় তাঁদের মাঝে আছে, অর্থাৎ তাঁরা প্রবৃত্তিতাড়িত হলেও বিচারশীল জীব বটেন। অতএব অন্ধপ্রবৃত্তির কাছে বিচারক্ষমতার সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেওয়া মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দেবার সমতুল। মানুষের ভিতর বিচারশক্তি ক্রমাভিব্যক্ত হয় ও প্রবৃত্তি যুক্তির দ্বারা চালিত হয়; কিন্তু পশুর ভিতর আত্মা চিরকালই সুপ্তিমগ্ন। হৃদয়কে সজাগ করার অর্থ নিদ্রামগ্ন আত্মাকে জাগরিত করা, যুক্তিবোধের ঘুম ভাঙ্গানো এবং সু ও কু-র ভিতর পার্থক্য করার শক্তির স্ফুরণ ঘটানো।

সত্যকার এই যৌন-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেবেন কে? নিঃসন্দেহে যিনি ইন্দ্রিয় দমন করেছেন তিনিই। জ্যোতিষশাস্ত্র বা তৎসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য আমাদের এমন সব শিক্ষক প্রয়োজন হয়, যাঁরা এসব বিষয় ভালভাবে জানেন ও এ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেছেন। এই ভাবে যৌন-বিজ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দমন-বিজ্ঞান শেখাবার জন্য আমাদের এমন সব শিক্ষক প্রয়োজন, যাঁরা এ সম্বন্ধে চর্চা করেছেন ও আত্মজয় করেছেন। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত না হলে সুমহান্ ভাবোদ্যোতক বাক্যও নিষ্প্রাণ ও জড়বৎ প্রতীয়মান হয় এবং জনমানসে প্রবেশ করা ও হৃদয় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা এর থাকে না। অথচ আত্মোপলব্ধি ও সত্যকার অভিজ্ঞতার ফলে উৎসারিত বাক্যাবলী সর্বদা ফলপ্রসূ হয়।

আজকাল আমাদের সমগ্র পরিবেশ—পঠন পাঠন চিন্তা সামাজিক আচারব্যবহার ইত্যাদি সবকিছুকেই একাধার থেকে কামোদ্দীপক আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এর হাত এড়ানো অতি কঠিন ব্যাপার। তবে নিঃসন্দেহে এ লেগে পড়ে থাকার মত কা আত্মসংযমকে মানুষের সর্বোচ্চ কর্তব্য বিবেচনাকারী জনকয়েক মাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষাগুরুও যদি থাকেন এবং তাঁরা যদি সত্যকার জ্বলন্ত বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হন ও তাঁরা যদি সদাজাগ্রত ও নিয়ত ক্রিয়াশীল থাকেন, তাহলে তাঁদের প্রযত্নের ফলে গুজরাতের সন্তান-সন্ততিদের চলার পথ আলোকোদ্ভাসিত হবে, অজ্ঞ জন কামুকতার পঙ্কে নিপতিত হবার হাত থেকে ত্রাণ পাবেন এবং যাঁরা ইতিপূর্বে এর কবলিত হয়েছেন, তাঁদেরও পরিত্রাণের পথ পাওয়া যাবে।

হরিজন, ২১-১১-১৯৩৬

১৭

শিক্ষা ও সঙ্গীত

....আমাদের উপর এর (সঙ্গীতের) প্রভাব গভীর। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটির প্রতি আমরা এখনও যথোচিত দৃষ্টি দিই নি,

দিলে এতদিনে আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গীত শেখানর ব্যবস্থা আমরা করতাম। বৈদিক মন্ত্রসমূহ সঙ্গীতের ভিত্তিতে রচিত। নিখুঁত সঙ্গীত আত্মার আর্তিকে শান্ত করার ক্ষমতা রাখে। বহু সময় যে বড় বড় জনসমাবেশে অত্যন্ত চাঞ্চল্য দেখা যায়, সকলে মিলে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া শুরু করলে একে শান্ত করা যায়। বহু সংখ্যক ব্যক্তি এক সুর ও তাল সহযোগে গান গাইলে তা খুবই অনুপ্রেরণা-দায়ক ও চিত্তকে ঊর্ধ্বগামীকারক মনে হয়। শত শত বালক সাহসিকতা ও বীররস মণ্ডিত কোন কবিতা সুর করে পড়ছে—এ এক আকর্ষণীয় দৃশ্য। এ তো হরহমেশাই চোখে পড়ে। এর ফলে তাদের পরিশ্রম সহজতর হয়ে থাকে। এ হল সঙ্গীতের শক্তির উদাহরণ। আমার ইংরেজ বন্ধুদের আমি শীত ভুলে থাকার জন্য গান গাইতে দেখেছি। আমাদের ছেলেরা সহজেই প্রচলিত পালা ও নাটকের গানগুলি গাইতে শেখে এবং হারমোনিয়ামের মত এক স্থূল বাদ্যযন্ত্রও বাজাতে শেখে। এর ফলে ভাল সঙ্গীতের অনুশীলনী করার ক্ষমতা ব্যাহত হয়। এর বদলে তাদের যদি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে আজ তাদের যেসময় জনপ্রিয় অথচ অর্থহীন গান গাইবার পিছনে নষ্ট হয় তাকে সৎ কাজে লাগান যেত। সুশিক্ষিত গায়ক যেমন বেসুরা অথবা অসময়ে গান করেন না তেমনি সঙ্গীত শিক্ষার্থীও নোংরা গান গাইবেন না। আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনায় সঙ্গীতকে স্থান দিতে হবে এবং জনসাধারণের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ বিধানে এর ভূমিকাকেও স্বীকার করে নিতে হবে। এবিষয়ে ডঃ আনন্দ কুমারস্বামীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিমত গুরুত্বসহকারে চিন্তনীয়।

বিচার সৃষ্টি, ১৯১৭

১৮

বিদ্যালয়ে সঙ্গীত

গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের পণ্ডিত খারে ছেলেমেয়েদের মধ্যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রচারের জন্য নিজজীবন উৎসর্গ করেছেন এবং বিশেষ করে আহমেদাবাদে ও সাধারণতঃ গুজরাতে এর যে অগ্রগতি হয়েছে তার বিবরণ জানিয়েছেন। তবে তাঁর মনে এই বিষয়ে ক্ষোভ রয়েছে যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষেরা পাঠ্যক্রমে সঙ্গীতকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে আদৌ কোন উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। পণ্ডিতজীর অভিমত ব্যাপক অভিজ্ঞতাভিত্তিক এবং তিনি মনে করেন যে সঙ্গীত প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অঙ্গ হওয়া উচিত। আমি পণ্ডিতজীর অভিমতকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। গলাসাধা হাতকে কর্মকুশল করার চেষ্টার মতই প্রয়োজনীয়। ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর বিকাশ ও শিক্ষার প্রতি তাদের যথার্থ আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কুচকাওয়াজ হাতের কাজ চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীতশিক্ষা সবই একসঙ্গে চালাতে হবে।

এর ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় যে বিপ্লব সাধন করতে হবে—সেকথা স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের যদি নিজ-জীবনের কর্মের নিশ্চিত ভিত্তি স্থাপন করতে হয় তাহলে পূর্বোক্ত চারটি বিষয়ই প্রয়োজনীয়। যে কোন প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেখতে গেলেই এলোমেলো ও অপরিচ্ছন্ন পোশাক বিশৃঙ্খলতা ও এলোমেলো কথাবার্তার প্রকট দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যাবে। আমার মনে তাই এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে (কংগ্রেসশাসিত) কয়েকটি প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীরা যখন শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন করে তাকে দেশের প্রয়োজনীয়তার উপযোগী করবেন, তখন যে অপরিহার্য বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি সেগুলি নিশ্চয় বাদ পড়বে না।...

অবশ্য নূতন পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদানে সমর্থ শিক্ষকের অভাব আছে।...কিন্তু প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ কোন যুবকের পক্ষে প্রাথমিক সঙ্গীত চিত্রাঙ্কনবিদ্যা কুচকাওয়াজ ও হাতের কাজ শিখতে তিন

মাসের বেশী সময় লাগা উচিত নয়। আর বিষয়গুলি সম্বন্ধে কাজচলাগোছের জ্ঞান থাকলে পড়াতে পড়াতে তিনি এসব সম্বন্ধে আরও শিখে নিতে পারেন। অবশ্য এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে নিজেদের জাতি পুনর্গঠনকার্যে উত্তরোত্তর যোগ্য করে নেবার মত আগ্রহ ও উত্তম শিক্ষকদের মনে আছে।

হরিজন, ১১-৯-১৯৩৭

১৯

গ্রন্থাগার সম্বন্ধে

গ্রন্থাগার কেমন হবে এবং সেখানে কি করা হবে—সে সম্বন্ধে আমার কয়েকটি ধারণা আছে।...প্রথমতঃ গ্রন্থাগারটির বাড়ীর নকশা এইভাবে তৈরি করতে হবে যাতে গ্রন্থাগারটির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর আয়তনও বৃদ্ধি করা যায় অথচ তার ফলে যেন বাড়ীটির সৌন্দর্য নষ্ট না হয়। বাড়ীটির পরবর্তী পরিবর্ধন যেন দৃষ্টিকটু না ঠেকে। গ্রন্থাগারে মাঝে মাঝে বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা থাকবে এবং ছাত্র ও গবেষকরা যেন সেখানকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গ্রন্থসমূহের সদ্ব্যবহার করতে পারেন।...আমাদের এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে গ্রন্থাগার দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। খুব ভাল হয় যদি দুই একজন-এর পিছনে তাঁদের অধিকাংশ সময় দেন। গ্রন্থাগারিকের পদে এমন কোন অর্থপ্রাণ ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির লোককে রাখবেন না যাঁর কাজ কেবল বইগুলিকে নিরাপদ ও অক্ষত রাখা। এমন একজনকে নির্বাচন করতে হবে যিনি বিভিন্ন পুস্তকের আপেক্ষিক গুণাগুণ বুঝে বই বাছাই করতে পারেন। যদি বিনা বেতনে কেউ কাজ করতে রাজী না থাকেন তাহলে ভাল মাইনে দিয়ে যোগ্য লোক রাখার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। হরিজনদের বিনা চাঁদায় বই পড়ার সুযোগ দিতে হবে এবং তাঁরা যদি বই নষ্ট বা এমন কি চুরিও করেন তাহলে গ্রন্থাগারকে সেই লোকসানের দায়িত্ব নিতে হবে। হরিজনরা সমাজের

দীনতম অংশ এবং তাই তাঁদের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করা উচিত। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটির গৌরব বৃদ্ধি পাবে।

গ্রন্থাগারের পরিচালন-সমিতির সদস্য পড়াশুনায় আগ্রহশীল ব্যক্তিদের ভিতর থেকে বিচার বিবেচনা করে বাছাই করতে হবে যাতে প্রতিষ্ঠানটি জীবিত থাকে এবং এর উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটে। একথা ভাববেন না যে গ্রন্থাগারের পরিচালন-সমিতি কেবল বাস্তব বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত। কারণ গ্রন্থাগার কেমন হবে এবং কি করে এর উন্নতি সাধন করা যায় সে সম্বন্ধে পড়ুয়া ব্যক্তিরা ভালভাবেই জানেন।

হরিজনবন্ধু, ১-১০-১৯৩৩

২০

পিতামাতার কর্তব্য

বিদ্যালয় বা আশ্রমে যেসব পিতামাতা তাঁদের ছেলেমেয়েদের পাঠান তাঁদের কয়েকটি কর্তব্য পালন করতে হবে। এ কর্তব্য পালিত না হলে ছেলেমেয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং পিতামাতা—সবারই ক্ষতি। পিতামাতাকে সর্বাগ্রে তাঁরা যে প্রতিষ্ঠানে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের পাঠাচ্ছেন তার নিয়মকানুন জানতে হবে। নিজের ছেলেমেয়েদের অভ্যাস ও প্রয়োজনীয়তা তাঁদের বুঝে নিতে হবে এবং তারপর তাঁরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তার হেরফের করবেন না। সাধারণতঃ কোন প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করার পর সেখানকার শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত শিশুদের সেখান থেকে সরিয়ে আনা উচিত নয়। সময় সময় অভিভাবকেরা ছেলেদের জন্য কোন চাকরির জোগাড় করতে পারলেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের নাম কাটানর ব্যবস্থা করেন। এরকম হওয়া উচিত নয়। আর বিবাহ বা সমজাতীয় কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সুযোগ করে দেবার জন্য তাদের ছুটি নিতে বলাও সঙ্গত নয়। পিতামাতা যেমন তাঁদের অধিকাংশ অপরাপর কাজে ছেলেমেয়েদের টানেন না, তেমনি

বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানেও তাদের টানা উচিত নয়। ছেলেমেয়েদের মনোযোগ পূর্ণমাত্রায় পড়াশুনার উপর দেবার সুযোগ করে দিতে হবে। এছাড়া ছেলেদের শিক্ষাকালে আদর্শ ব্রহ্মচারী হবার শিক্ষা দিতে হবে। বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক আচার অনুষ্ঠান দেখার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা যদি তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় তাহলে মন দিয়ে পড়াশুনা করা ও ব্রহ্মচর্য পালনের পক্ষে তা বাধক বিবেচিত হবে। সুতরাং এসব থেকে তাদের দূরে রাখা উচিত।...বিবাহ সম্বন্ধে এখানে যা বলা হয়েছে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা সমভাবে প্রযোজ্য। যেসব অভিভাবক নিজেদের শিশুদের ভালভাবে ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে মানুষ করতে চান তাঁরা দেখতে পাবেন যে একাধিক ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ না বোঝার কারণেই তাঁরা তাঁদের সন্তানসন্ততিদের বিকাশে সাহায্য করার পরিবর্তে তাঁদের বিকাশের প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক হয়েছেন।

নবজীবন, ১৫-১২-১৯২১

২১

অভিভাবকদের দায়িত্ব

কি লিখছেন সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন জনৈক মহিলা লিখছেন:

"যতদিন না আমাদের ছেলেরা নিজেদের অতি প্রয়োজনীয় বল-বীর্য সংরক্ষণ করতে শিখছে ততদিন ভারতবর্ষ যে ধরনের মানুষ চাইছে তা পাবে না। গত সতের বছর ধরে আমি ভারতবর্ষে ছেলেদের বিদ্যালয় পরিচালন করার দায়িত্বে নিযুক্ত আছি। হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান নির্বিশেষে যে বিপুলসংখ্যক ছাত্র উৎসাহ উদ্যম ও আশা নিয়ে বিদ্যালয়-জীবন শুরু করে অথচ শেষ করে শরীরের সর্বনাশ করে—তা দেখে সত্যসত্যই দুঃখ হয়। যথার্থই শত শত ক্ষেত্রে খোঁজ নিয়ে আমি দেখেছি যে এর মূলে রয়েছে পাণিমেহন, অবৈধ পুরুষ-সংসর্গ বা বাল্যবিবাহ। আমার কাছে আজ অবৈধ পুরুষ-সংসর্গের অপরাধে অপরাধী ৪২টি বালকের নামের তালিকা রয়েছে এবং এদের মধ্যে একটি বালকেরও বয়স তের বছরের বেশী নয়। শিক্ষক ও অভিভাবকেরা এ অবস্থার

কথা অস্বীকার করবেন। কিন্তু সঠিক পন্থা অবলম্বন করলে এ পাপের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হবে এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ছেলেরা নিজেদের দোষ স্বীকার করবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছেলেরা স্বীকার করে যে এ পাপের হাতেখড়ি হয়েছে কোন পুরুষের কাছে—প্রায়শঃ নিজেদের কোন আত্মীয়ের কাছে।"

এ কোন কাল্পনিক ছবি নয়। এ সত্যের কথা বহু শিক্ষকরাই জানেন কিন্তু তাঁরা একে চেপে রাখেন। পূর্বেও আমি এর কথা শুনেছি। প্রায় আট বৎসর পূর্বে দিল্লীর বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক সর্বপ্রথম এর কথা আমাকে বলেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে আমি এ সম্বন্ধে নীরব থেকে ব্যক্তিগতভাবে কারও সঙ্গে এর প্রতিকারের পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এ পাপ কেবল ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নয়। তবে বাল্যবিবাহের প্রথা থাকার জন্য ভারতের উপর এই পাপের বোঝা অনেক বেশী মারাত্মকভাবে পড়েছে। বর্তমানে এই অতীব দুরূহ ও জটিল বিষয়ের প্রকাশ্য আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কারণ আজ সম্ভ্রান্ত সংবাদপত্রসমূহেও কামবৃত্তি সম্বন্ধে এমন অবাধ আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় কয়েক বৎসর পূর্বেও যা অকল্পনীয় ছিল।

যৌনক্রিয়াকে স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় নৈতিক এবং দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল বিবেচনা করার ফ্যাশন এই পাপকে আরও বাড়িয়েছে। সংস্কৃতিসম্পন্ন নরনারীরা যেভাবে অবাধে গর্ভ-নিরোধক দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করা সম্বন্ধে আলোচনা করছেন তাতে অবৈধ যৌনসংসর্গের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা হচ্ছে। যুবক-যুবতীদের কোমল ও গ্রহণশীল মন এর ফলে চট করে এই জাতীয় অবৈধ ও ক্ষতিকারক বাসনার সমর্থনে অজুহাত আবিষ্কার করে এবং শিক্ষক ও অভিভাবকেরা এই ভয়াবহ পাপ সম্বন্ধে এক দুঃখজনক এবং প্রায় মারাত্মক ঔদাসীন্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেন। আমার মতে সামাজিক বাতাবরণের সম্পূর্ণ শুদ্ধি ব্যতিরেকে অপর কিছুই

এই পাপ বন্ধ করতে পারবে না। যৌনভাবে ওতপ্রোত এক পরিবেশের প্রচ্ছন্ন প্রভাব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপর না পড়ে থাকতে পারে না। শহর-জীবনের পরিবেশ সাহিত্য নাটক চলচ্চিত্র ঘরের অবস্থা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি মাত্র একটি বিষয়ের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে এবং তা হল যৌন অনুভূতির উদ্দীপন। যেসব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ইতিপূর্বে ভিতরের এই পশুটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, তাদের পক্ষে পূর্বোক্ত বিষয়বস্তুর প্রভাব প্রতিরোধ করা অসম্ভব। মৃদু ঔষধে কাজ হবে না। বয়ঃজ্যেষ্ঠরা যদি তরুণদের প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালন করতে চান তাহলে সর্বপ্রথম সংস্কারকার্য তাঁদের মধ্যেই শুরু করতে হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-৯-১৯২৬

২২

একজন শিক্ষকের বক্তব্য

জনৈক শিক্ষক লিখেছেন ঃ

"আমাদের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত দুর্নীতি সম্বন্ধে আপনি লিখেছেন। তবে আমার মনে হয় যে, এর জন্য ছেলেমেয়েদের মা-বাবারাই দায়ী। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের পিতামাতারও যদি সন্তান-সন্ততি হতেই থাকে তাহলে এর চেয়ে ভাল আর কি আশা করা যায়? এ জাতীয় বিবাহিত জীবনকে ব্যভিচার আখ্যা দেওয়া সঙ্গত নয় কি? একটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ মায়ের মৃত্যুর পর একটি ছেলে তার বাবার সঙ্গে শুত। বাবা পুনর্বিবাহ করে অন্য একটি কামরায় দরজা বন্ধ করে শোওয়া আরম্ভ করলেন। এর ফলে বালকটি কৌতূহলী হয়ে ভাবতে লাগল যে বাবা কেন আর তার সঙ্গে শোন না। মনে মনে সে ভাবল যে মা যখন বেঁচেছিলেন তখন তারা তিনজনেই তো একসঙ্গে শুত; তাহলে নূতন-মা আসার পর কেন তাকে তাঁর ও বাবার সঙ্গে শুতে দেওয়া হবে না? বালকটির কৌতূহল বৃদ্ধি পেতে লাগল। দরজার ফাঁক দিয়ে সে ভিতরে উঁকি মারা স্থির করল। উঁকি মেরে সে যে দৃশ্য

আমাদের সমাজে মানুষ মেষপালের মত একে অপরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং একেই প্রগতি ভাবে। তবে এই হতাশাব্যঞ্জক অবস্থাতেও ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পক্ষে সঠিক পন্থা অনুসরণ করা সহজ। যাঁরা একথা জানেন তাঁদের কর্তব্য হল নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নৈতিকতার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা ও একে পরিব্যাপ্ত করা। তবে এর গোড়াপত্তন করতে হবে নিজেকে সংশোধন করে। অপরের দোষ-ত্রুটি দেখার সময় মনে হয় যে আমরা বুঝি এসবের উর্ধ্বে। কিন্তু নিজেদের দিকে নজর দিলে দেখব যে আমরা স্বয়ং দোষে পূর্ণ। অপরের বিচার করতে বসার চেয়ে নিজের বিচার করা অনেক ভাল। এ ছাড়া এ দৃষ্টান্ত থেকে অপরেও নিজ নিজ সংশোধন করতে প্রবৃত্ত হন। এইজন্যই বলা হয়ে থাকে যে "আপনি ভাল তো জগৎ ভাল।" তুলসীদাস সাধুসজ্জনদের পরশমণির সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর অভিমত অতীব যথার্থ। আমাদের সকলকেই ভাল হবার চেষ্টা করতে হবে। সৎ হওয়া একমাত্র আমাদের মধ্যে অসাধারণ ব্যক্তির পক্ষে প্রাপ্তব্য কোন খামখেয়ালী বিধাতার আশীর্বাদ নয়। এ আমাদের সকলের অপরিহার্য কর্তব্য। প্রত্যুত এ-ই হল মানুষের জীবনের তাৎপর্য।

নবজীবন, ২৬-৯-১৯২৬

২৩

শিক্ষা ও গৃহপরিবেশ

...কর্মীর ছেলেপুলেদের যদি আধুনিক শিক্ষা দেবার পরিকল্পনা থাকে, তাহলে আমি কোন কার্যকরী পরামর্শ দিতে অপারগ। তবে কর্মীর সন্তানদের সুস্থ সবল সৎ ও বুদ্ধিমান গ্রামবাসীরূপে গড়ে তোলা যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয় এবং তাদের পিতা যে গ্রামকে নূতন বাসস্থলরূপে গ্রহণ করেছেন সেখানে তাদের জীবিকা নির্বাহের উপযোগী ক্ষমতাসম্পন্ন করে তোলা যদি এই শিক্ষার মানদণ্ড হয়

তাহলে নিজের বাড়ীতে নিজের মা-বাবার কাছেই তারা এ শিক্ষা পেতে পারে। এছাড়া এই শিক্ষার কল্যাণে যেদিন থেকে তাদের বোধশক্তি জাগবে এবং নিজেদের হাত-পাকে বিধিবদ্ধভাবে কাজে লাগাতে পারবে, সেই দিন থেকে তারা পরিবারের আংশিক উপার্জনশীল সদস্য হতে পারবে। সুন্দর গৃহের মত ভাল বিদ্যালয় আর নেই আর সৎ ও চরিত্রবান পিতামাতার চেয়ে ভাল শিক্ষকও আর হয় না।

হরিজন, ২৩-১১-১৯৩৫

২৪
শাস্তিদান প্রসঙ্গে

প্রশ্ন ঃ আমি একজন শিক্ষক। আমার ছাত্র ও সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে আচরণের সময় আমি অহিংস নীতি অনুসরণের চেষ্টা করি। একটি কলহপরায়ণ ছাত্র ছাড়া বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রের ক্ষেত্রেই আমার এ প্রয়াস সফল হয়েছে। সেই ছেলেটিকে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কাছে পাঠাতে হয়। কিন্তু নিজের ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে সময় সময় আমার তাদের মারতে ইচ্ছা হয়, যদিও আমি সাফল্য সহকারে এ ইচ্ছার প্রতিরোধ করেছি। কিন্তু আমি দেখেছি যে তারা আমার কাকার খুবই বাধ্য যিনি প্রাচীনকালের সেই আপ্তবাক্য "দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ"—এর নীতিতে বিশ্বাসী। আমার ছেলেদের ক্ষেত্রে আমি কি করব? আর ঝগড়াটে ছেলেদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকমহাশয়ই বা কেমন আচরণ করবেন?

উত্তর ঃ আমার মনে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আপনার ছেলেমেয়ে অথবা ছাত্রদের মারধর বা অপর কোন রকম শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। ইচ্ছা হলে আপনি নিজেকে শাস্তি দিতে পারেন এবং নিজের ছাত্র অথবা সন্তানদের হৃদয় দ্রবীভূত করার জন্য নিজেকে এ শাস্তি দেবার অধিকারও আপনার আছে। অনেক মা

এইভাবে নিজের সন্তানদের সংশোধন করেছেন বলে জানা যায়। আমিও অনেকবার এই প্রক্রিয়া প্রয়োগে ফল পেয়েছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাকে মুসলমান খ্রীস্টান হিন্দু ও পার্শী সকল সম্প্রদায়ের দুরন্ত ছেলেদের সামলাতে হত। এদের মধ্যে একজন ছাড়া আর কাউকে আমি শাস্তি দিয়েছি বলে মনে পড়ে না। নিঃসন্দেহে অহিংস পদ্ধতি সফল হয়। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে একটা হৃদ্যতার সম্বন্ধ স্থাপিত হলে ছাত্ররা স্বভাবতই তাদের কারণ শিক্ষক কর্তৃক নিগ্রহ বরণের কাছে নতি স্বীকার করবে। আপনার সেই কলহপরায়ণ ছাত্রটির মনে যদি আপনার প্রতি কোন শ্রদ্ধা না থাকে, তাহলে আপনি তাকে আপনাদের বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে অসহযোগিতা করতে পারেন। বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা যে ছাত্র মানে না অহিংসা আপনাকে তাকে বিদ্যালয়ে রাখতে বাধ্য করে না।

হরিজন, ১৩-৭-১৯

২৫

সামাজিক শিক্ষা

সামাজিক শিক্ষা অর্থাৎ জনগণের জন্য শিক্ষার সমস্যা প্রাথমিক শিক্ষার চেয়েও দুরূহ। শিশুদের শিক্ষার জন্য অন্ততঃ এযাবৎ কেমন ভাবে এ চলেছে তার একটা উদাহরণ আছে। কিন্তু আমাদের জনগণের শিক্ষার ব্যাপারে এটুকু পথনির্দেশও পাবার উপায় নেই। এ ব্যাপারে বিদেশ থেকেও আমরা যৎসামান্য শেখার মত উপদেশ পাব। ভারতবর্ষের পরিস্থিতি অপরাপর দেশের থেকে পৃথক।

বর্তমানে ধর্ম ও সেই ধর্মানুযায়ী জীবনযাপন করা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুবই দুর্বল। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মমতের জন্য আমাদের দেশে পারস্পরিক বিবাদবিসম্বাদ লেগেই আছে। হিন্দু মুসলমান পার্শী খ্রীস্টান ইত্যাদি সকলের জন্য তাই একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায় না।

উদাহরণস্বরূপ গোরক্ষার সপক্ষে হিন্দু ও মুসলমানের কাছে একই যুক্তি উপস্থাপিত করা যায় না। তবুও উভয় সম্প্রদায়কে পরস্পরের সঙ্গে হানাহানি করার কুফল সম্বন্ধে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

সমাজ-সংস্কারের কাজ বহু ব্যাপক ও দুরূহ ব্যাপার। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট চারিত্রধর্ম আছে। বহু উপ-সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের জন্য প্রত্যেকটিই আবার দুর্বল। কেউ যেন একথা মনে না করেন যে মুসলমান ও খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের ভিতর উপবিভাগ নেই। হিন্দুরা এই পাপ দ্বারা সব সম্প্রদায়কেই প্রভাবিত করেছেন।

রোগ-প্রতিষেধ স্বাস্থ্যরক্ষা ও রাজনীতি—একমাত্র এই তিনটি বিষয়ের শিক্ষা সকলকে সমানভাবে দেওয়া সম্ভব। রাজনীতির ভিতর আমি অর্থশাস্ত্রের জ্ঞানকেও ধরেছি।

বিচিত্র মনে হলেও আমাদের দেশ ভারতবর্ষে রাজনীতি ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানও রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বিভিন্ন ধর্মের সবাই রাজনীতি একই দৃষ্টিতে দেখেন না। এছাড়া রোগ-প্রতিষেধের ব্যাপারে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা প্রমুখ স্থান গ্রহণ করে। জনশিক্ষায় নিরত কর্মিদের পক্ষে সকল ধর্মের মানুষকে অসুস্থতার পর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য "বিফ-টি" পান করার পরামর্শ দেওয়া সম্ভবপর নয়। মুসলমানদের মনে জল পান করার ব্যাপারে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়মকানুন মেনে চলার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশ্বাস জাগানও তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না।

এমতাবস্থায় সামাজিক শিক্ষার সূত্রপাত করতে হবে কোথা থেকে এবং এর পরিকল্পনার সীমারেখাই বা হবে কতখানি? সামাজিক শিক্ষার অর্থ সমগ্র জাতিকে শিক্ষিত করার কম নয়। সুতরাং কেবল কয়েকটি নৈশ বিদ্যালয় খুলে শ্রান্ত ক্লান্ত শ্রমিকদের অক্ষর-জ্ঞান দেবার চেষ্টা করলে একাজ হবে না।

তাহলে সামাজিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মরত শিক্ষক কি করবেন? বর্তমান অবস্থায় আমার মনে হয় তাঁর সামনে দুটি পথ খোলা

আছে। প্রথমতঃ তিনি কোন গ্রামে বসতি স্থাপন করে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাঁদের তিনি সেবা করবেন। তিনি যে পরিমাণে তাঁদের সেবা করবেন সেই পরিমাণে তাঁদের শিক্ষিতও করে তুলবেন। দ্বিতীয় কর্মসূচী হল এই যে জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার উপযুক্ত সহজ সরল বই লিখে তা অল্প মূল্যে প্রকাশ করবেন এবং তারপর জনসাধারণের মধ্যে তার বহুল প্রচারের জন্য এক আন্দোলন শুরু করবেন। জনশিক্ষার কাজে আগ্রহশীল ব্যক্তিরা একদল অশিক্ষিত জনসাধারণের সামনে এইসব বই পড়বেন এবং ক্রমশঃ এ একটা স্থায়ী প্রথা হয়ে দাঁড়াবে।

জনশিক্ষা সম্বন্ধে এই ধারণা যদি যথার্থ হয় তাহলে প্রথমে যা করতে হবে তা হল ঠিক ধরনের শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করে তোলা। সামাজিক শিক্ষা বলতে যে ঠিক কি বোঝায় এ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে এখনও সঠিক ধারণা জন্মে নি। এক্ষেত্রে কংগ্রেস কিছুটা কাজ করেছে, যদিও পরোক্ষভাবে। কিন্তু শিক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে একাজ করা হয় নি, যাঁর লক্ষ্য হবে চরিত্রগঠন। রাজনৈতিক কর্মী প্রধানতঃ রাজনৈতিক শিক্ষা—স্বরাজের ব্যাপারে আগ্রহশীল। তিনি মনে করেন যে স্বরাজ অর্জিত হবার পর জনগণের সাধারণ শিক্ষা স্বতঃই হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে শিক্ষক মনে করেন যে চরিত্র গঠিত হলেই কেবল দেশবাসী স্বরাজ পাবেন। বর্তমানে আমাদের সম্মুখে কেবল শিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণ রয়েছে। চরিত্রবল না থাকলেও রাজনৈতিক কর্মীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে কিন্তু চরিত্রশক্তি ছাড়া জনশিক্ষকের চলবে না। চরিত্রবলের অভাব হলে তিনি লবণাক্ত ভাববিহীন লবণের মত হয়ে পড়বেন।

বিনিময় (দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা) থেকে

২৬

জনশিক্ষা ও সংবাদপত্র

আমার মতে সংবাদপত্রকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। সংসারে এমন কিছু কিছু কাজ আছে যার সঙ্গে জনকল্যাণের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রয়েছে। সেই সব কাজকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। কারণ এই জাতীয় কাজ গ্রহণ করার লক্ষ্য হিসাবে যে আদর্শ সম্মুখে রাখা উচিত একে জীবিকার মাধ্যম মনে করলে সেই আদর্শ ম্লান এবং এমন কি ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা আছে। আর সংবাদপত্রকে যখন কেবল জীবিকা নয় মুনাফা অর্জনের মাধ্যম হিসাবেও জ্ঞান করা হয় তখন তো একাধিক দোষ এসে যায়। আজকে যে সংবাদপত্র-জগতে সেই সব দোষ বা পাপ প্রভূত পরিমাণে রয়েছে, একথা এ মহলের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখে না।

সংবাদপত্রের প্রাথমিক কার্য হল জনশিক্ষার প্রসার এবং জনসাধারণকে পৃথিবীর সমসাময়িক ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখা। এ এক দায়িত্বপূর্ণ কাজ। তবু আমরা দেখতে পাই যে জনসাধারণের পক্ষে সর্বদা সংবাদপত্রসমূহ-পরিবেশিত খবরে আস্থা রাখা সম্ভবপর নয়। অনেক সময়েই দেখা যায় যে সংবাদপত্রের খবর থেকে সত্য ঘটনা একেবারে ভিন্ন। সংবাদপত্রের সম্পাদক ও অপরাপর কর্মিরা যদি এই কথা উপলব্ধি করেন যে জনসাধারণের ভিতর শিক্ষার প্রচারই হল তাঁদের কর্তব্য, তাহলে প্রকাশযোগ্য সংবাদের সত্যতা ভালভাবে পরীক্ষা করে তবে তাঁরা তা ছাপাবেন। একথা সত্য যে তাঁদের অনেক অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়। যেসব গাদা গাদা সংবাদ তাঁরা পান তাকে বাছাই করে হাতে যেটুকু সময় আছে তাড়াহুড়া করে তারই মধ্যে সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁদের একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

তবুও আমার মনে হয় যে কোন সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে যতক্ষণ না নিঃসংশয় হওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ তা প্রকাশ না করাই ভাল।

ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে মান্যগণ্য ব্যক্তিদের বক্তৃতার যেসব বিবরণ বেরোয় তা প্রায়শঃ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে। বক্তৃতা শুনতে শুনতে বা পরে স্মৃতির সাহায্যে সেই বক্তৃতার হুবহু অনুলিপি লেখার ক্ষমতা অল্প কয়েকজন লোকেরই আছে। এর ফলে বক্তব্যের বহু বিকৃতি ও অনুচিত পরিবর্তন ঘটে থাকে। সেরা ব্যবস্থা হচ্ছে সাংবাদিকের কাছ থেকে প্রাপ্ত বক্তৃতার প্রুফ বক্তার কাছে সংশোধনের জন্য পাঠান। বক্তা যদি একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই প্রুফ সংশোধন করে না পাঠান তাহলে সংবাদপত্র-কর্তৃপক্ষ নিজেদের সাংবাদিকের লেখা অনুলিপি প্রকাশ করতে পারেন।

অনেক সময় দেখা যায় যে সংবাদের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব বিচার না করে কেবল জায়গা ভর্তি করার জন্য যা তা ছাপা হয়। এ অভ্যাস প্রায় সর্বব্যাপক। পাশ্চাত্য দেশেও এ রকম ঘটে। এর কারণ হল এই যে অধিকাংশ সংবাদপত্রেরই মুনাফার দিকে দৃষ্টি থাকে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সংবাদপত্রসমূহ জাতির প্রভূত সেবা করছে এবং তাই এই সব দোষ ত্রুটি লোকে উপেক্ষা করেন। কিন্তু আমার মতে সংবাদপত্র দেশের সমপরিমাণ ক্ষতিও করছে। পাশ্চাত্য দেশে ছাই পাঁশ লেখায় ভর্তি এমন সব সংবাদপত্র আছে যা পড়াও পাপ। অনেক সংবাদপত্র তার নিজের পূর্ব সংস্কারের কারণ জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ায়। বহুক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবার ও সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা ও বিবাদের কারণ ঘটায় সংবাদপত্র। তাই সংবাদপত্র কেবল জনস্বার্থের সেবা করে বলেই নিন্দা-সমালোচনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। সর্বসাকুল্যে দেখা যাবে যে সংবাদপত্রের লাভ ও লোকসান দুই-ই প্রায় সমান সমান।

গ্রাহকদের চাঁদা নয়, বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রধানতঃ আয় করা

বর্তমানে সংবাদপত্র-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা। এর ফল হয় শোচনীয়। যে সংবাদপত্র তার সম্পাদকীয় রচনায় পানাসক্তির বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লেখে, সেই সংবাদপত্রেই আবার মদ্যপানের সুফল বর্ণনাকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। একই সংবাদপত্রে আমরা ধূম্রপানের অপকারিতা এবং কোথায় ভাল তামাক পাওয়া যাবে তার হদিস ও কোন্ কোম্পানীর সিগারেট খেতে হবে—সেই খবর পড়ি। এমনও হয় যে, খবরের কাগজের এক দিকে কোন নাটকের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লেখা হল অথচ সেই কাগজেরই আর এক দিকে সেই নাটকের সপ্রশংস দীর্ঘ বিজ্ঞাপন বেরোল। সংবাদ-পত্রসমূহে সবচেয়ে বেশী অর্থাগম হয় ঔষধের বিজ্ঞাপন থেকে যার কারণ দেশবাসীর বহু ক্ষতি হয়ে থাকে। এই সব কারণে সংবাদপত্রের অপরাপর উপকারের মূল্য প্রায় নস্যাৎ হয়ে যায়। এইসব বিজ্ঞাপনে কী ক্ষতি হয় আমি তা দেখেছি। বিজ্ঞাপনের চটকে প্রবঞ্চিত হয়ে অনেকে এই সব তথাকথিত পুরুষত্ব বর্ধনকারী ও দৌর্বল্যের নিরাকরণকারী ঔষধপত্র কিনে থাকেন। এইসব ঔষধের অনেকগুলি দুর্নীতির পরিপোষক। বিস্ময়ের কথা এই যে ধর্মসংক্রান্ত পত্র-পত্রিকাতেও এজাতীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। পশ্চিম থেকে আমরা এই প্রথা শিখেছি। যত পরিশ্রমই করতে হক না কেন আমাদের হয় এই অবাঞ্ছিত প্রথা বন্ধ করতে হবে, নচেৎ অন্ততঃ এর সংস্কার সাধন করতে হবে। বিজ্ঞাপন গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রত্যেক সংবাদপত্রেরই সতর্ক হওয়া কর্তব্য।

সর্বশেষে বললেও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল: যেদেশে "রাজদ্রোহমূলক রচনা আইন" ও "ভারতরক্ষা আইন" প্রমুখ স্বাধীনতার কণ্ঠরোধকারী আইনের অস্তিত্ব বিদ্যমান সেদেশের সংবাদপত্রের কর্তব্য কি? এই বাধাকে এড়াবার জন্য আমাদের সংবাদপত্রগুলি লেখার এমন একটি ধরন আবিষ্কার করেছে যাতে ঐসব আইনের আওতায় পড়ার সম্ভাবনাযুক্ত কোন রচনাকে

দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। অনেকে তো এই উভয় অর্থবাচক লেখার কলাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করে ফেলেছেন। কিন্তু আমার মতে এতে দেশের ক্ষতি হয়। এর পরিণামে দেশবাসী দ্ব্যর্থবোধক কথা বলতে শেখে এবং সত্য বলার সৎসাহস তারা হারিয়ে ফেলে। এর ফলে ভাষার রূপ পাল্টে যায় এবং ভাষা ভাব প্রকাশের মাধ্যম না হয়ে সত্য ভাব গোপন করার মুখোশে পর্যবসিত হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে জনশিক্ষার পথ এ নয়। জনসাধারণ ও ব্যক্তি—সকলেরই মনের কথা খুলে বলার অভ্যাস করা দরকার। সংবাদপত্র তাঁদের এই শিক্ষা দিতে সক্ষম। সঠিক এবং শেষ অবধি আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কল্যাণজনক পন্থা হল এই যে যাঁরা ঐসব আইনের ভয়ে ভীত ও যাঁরা ওর আওতায় পড়তে চান না তাঁরা যেন সংবাদপত্র প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন, নচেৎ তাঁরা খোলাখুলি ভাবে নিজেদের যথার্থ অভিমত ব্যক্ত করবেন এবং তার জন্য যে পরিণামের সম্মুখীন হতে হয় হবেন। বিচারপতি স্টিভেন কোন এক স্থলে বলেছেন যে যার অন্তরে বিদ্বেষ নেই তাঁর বচনেও বিদ্বেষ থাকতে পারে না। আর অন্তরে যদি বিদ্বেষ থেকে থাকে তাহলে তাকে খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করা উচিত। কারও যদি এইভাবে আচরণ করার সাহস না থাকে তাহলে তিনি সংবাদপত্র প্রকাশ করা বন্ধ করবেন। এতেই আমাদের এবং আমাদের স্বদেশবাসীর মঙ্গল।

গুজরাতী বিচারসৃষ্টি থেকে

২৭

শিক্ষা ও সাম্প্রদায়িকতা

প্রশ্ন: ক্রিকেট খেলায় সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবের বিরুদ্ধে আপনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহও কি নিন্দনীয় নয়? যেসব কলেজ ও ছাত্রাবাসে সব সম্প্রদায়ের

ছাত্রদের পড়ার বা থাকার সুযোগ আছে সেখানে ছাত্রদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বভাব গড়ে ওঠে এবং ভিন্ন ধর্মের প্রতি সহনশীলতার ভাব সেখানে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়। বিভিন্ন সংস্কৃতির পরিপুষ্টি সাধনের জন্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন "চেয়ার" থাকাই কি যথেষ্ট নয়?

উত্তর: আপনি ঠিক বলেছেন। সাম্প্রদায়িক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব না থাকলে আমাদের কল্যাণ হবে। তবে যতটা দ্ব্যর্থবিহীন ভাবে আমি বলতে পারি যে ক্রিকেট খেলার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভিত্তি থাকা অনুচিত, মুসলীম বা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থাকা উচিত নয়—একথা অতটা জোরের সঙ্গে আমি বলতে পারছি না। সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সৃষ্টির মূলে যদি কলঙ্ক বা কালিমা না থাকে তাহলে সেগুলি সঙ্গতভাবেই জাতীয় আদর্শের পোষক হতে পারে। এইভাবে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পীঠস্থান হতে পারে এবং হওয়া উচিতও। কিন্তু সাম্প্রদায়িক খেলাধূলা শব্দটিই স্ববিরোধী। আমি আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সহমত যে বহুক্ষেত্রে আজ যেমন রয়েছে তেমনি অসাম্প্রদায়িক কলেজ ও ছাত্রাবাস থাকা উচিত। দুর্ভাগ্যক্রমে সাম্প্রদায়িকতার বীজাণু এইসব ক্ষেত্রেও অনুপ্রবেশ করেছে। আমরা আশা করব যে বর্তমান অবস্থা যেন ক্ষণকাল স্থায়ী হয়।

হরিজন, ১৯-৪-১৯৪২

২৮

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে

জনৈক ছাত্র প্রশ্ন করলেন, "হিন্দু-মুসলীম ঐক্যের জন্য ছাত্ররা কি করতে পারেন?"

প্রশ্নটি ছিল গান্ধীজীর মনোমত। তিনি উত্তর দিলেন, "এর পথ খুবই সহজ। প্রতিটি হিন্দুও যদি গুণ্ডাভাবাপন্ন হয়ে পড়েন এবং

আপনাদের গালাগালি দেন তবু আপনারা তাঁদের রক্ত-সম্বন্ধের ভাই ছাড়া আর কিছু মনে করবেন না। হিন্দু ছাত্রদেরও মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে অনুরূপ মনোভাব হবে। এরকম ঘটা কি অসম্ভব? না, বরং এর বিপরীত ঘটাই অসম্ভব। আর ব্যক্তির পক্ষে যা সম্ভব জনসমুদয়ের পক্ষেও তা সম্ভবপর।

আজ সমগ্র পরিবেশই বিষাক্ত। সংবাদপত্রগুলি সব রকমের ভিত্তিহীন গুজব ছড়াচ্ছে এবং জনসাধারণও তা বিশ্বাস করছেন। এর ফলে চতুর্দিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে এবং হিন্দু ও মুসলমানেরা মানবতার শিক্ষা ভুলে গিয়ে পরস্পরের প্রতি বন্য পশুর মত আচরণ করছেন। অপর পক্ষ কি করল বা না করল বিবেচনা না করে পরস্পরের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হল মানুষের ধর্ম। সদ্ব্যবহারের পরিবর্তে যদি সদ্ব্যবহার করা যায় তবে বড় বেশী হলে তা দোকানদারী। এমন কি চোর ডাকাতরাও এটা করে থাকে। এতে কোন বাহাদুরি নেই। মানবতা লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখে না। মানবতা মানুষকে নিজের তরফ থেকে সদ্ব্যবহার করার শিক্ষা দেয়। সব হিন্দু বা বিকল্প হিসাবে সব মুসলমান যদি আমার পরামর্শ শোনেন তবে ভারতবর্ষে এমন দৃঢ়মূল শান্তি স্থাপিত হবে ছোরা-ছুরি অথবা লাঠি-সোটা যাকে বিপর্যস্ত করতে পারবে না। প্রতিশোধ-বৃত্তি অথবা পাল্টা প্ররোচনা না থাকলে শীঘ্রই দুষ্কৃতিকারী তার ছুরিমারা-রূপী কুকর্মে ক্লান্তি বোধ করবে। এক অদৃশ্য শক্তি তার ঊর্ধ্বে উত্থিত হস্তের গতিরোধ করবে এবং সেই হাত তার দুষ্ট ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। আপনারা সূর্যের গায়ে ধূলা দেবার চেষ্টা করতে পারেন; কিন্তু তাতে তার ঔজ্জ্বল্যের হানি হবে না। এখনকার প্রয়োজন হল বিশ্বাস ও ধৈর্যে বুক বাঁধা। ঈশ্বর কল্যাণময় এবং দুষ্টামীকে তিনি একটা সীমার বাইরে বাড়তে দেন না।

হরিজন, ২৮-৪-১৯৪৬

২৯

শিক্ষাদর্শের সংক্ষিপ্তসার

শিক্ষা-সম্বন্ধে আমার সম্ভবতঃ কিছু বিচিত্র ধারণা আছে যা আমার সহকর্মিরাও পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করেন নি। সংক্ষেপে এ নিম্নরূপ ঃ

১. আট বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে পড়বে।

২. তাদের শিক্ষা হবে প্রধানতঃ শরীরশ্রমমূলক। কোন শিক্ষাবিদ্-এর তত্ত্বাবধানে এই শিক্ষা দিতে হবে।

৩. ছেলেমেয়েরা কোন্ কাজ করবে তা স্থির করার জন্য প্রত্যেকের বিশেষ প্রবণতাকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

৪. কোন কাজের বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেখানর সময় সেই প্রক্রিয়ার সব কারণ তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে।

৫. একটু বোধশক্তি হলেই শিশুদের সাধারণ জ্ঞান দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। লিখতে পড়তে শেখা পরে এলে চলবে।

৬. শিশুকে প্রথমে সহজ জ্যামিতিক রেখা-চিত্র আঁকতে শেখান হবে এবং এসব যখন সে সহজে আঁকতে শিখবে তখন তাকে অক্ষর লিখতে শেখান হবে। এরকম করলে প্রথম থেকেই তার হাতের লেখা ভাল হবে।

৭. লেখার পূর্বে পড়তে শেখান হবে। অক্ষরকে প্রথমে ছবির মত চেনাতে হবে, তার পর শিশু তার নকল করবে।

৮. এইভাবে শিক্ষা পেলে আট বছর বয়স হতে না হতে শিশু তার শক্তি অনুযায়ী যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করবে।

৯. জোর করে শিশুকে কোন কিছু শেখান হবে না।

১০. শিশুকে যা কিছু শেখান হচ্ছে তার সম্বন্ধে তার মনে যেন আগ্রহ জন্মে।

১১. শিক্ষা শিশুর কাছে খেলার মত মনে হবে। আর খেলাও শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ।

১২. মাতৃভাষার মাধ্যমে সব শিক্ষা দেওয়া হবে।

১৩. অক্ষর জ্ঞানের পূর্বে শিশুর সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা হিন্দি-উর্দুর পরিচয় ঘটাতে হবে।

১৪. ধর্মীয় শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষকের আচার ব্যবহার দেখে এবং এ সম্বন্ধে শিক্ষকের কথাবার্তা শুনে শিশু এ সম্বন্ধে শিখবে।

১৫. শিশুদের শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায় হল নয় থেকে ষোল বছর বয়স।

১৬. এই দ্বিতীয় পর্যায়েও ছেলেমেয়েরা যথাসম্ভব সহশিক্ষা পাক —এটা বাঞ্ছনীয়।

১৭. এই পর্যায়ে হিন্দু ছাত্রদের সংস্কৃত এবং মুসলমান ছাত্রদের আরবী শেখান হবে।

১৮. দ্বিতীয় পর্যায়েও শরীরশ্রম চলবে। প্রয়োজন মত সাহিত্যভিত্তিক শিক্ষার জন্য এবার বেশী করে সময় বরাদ্দ করতে হবে।

১৯. এই পর্যায়ে ছেলেদের তাদের বংশগত পেশা এমন ভাবে শেখাতে হবে যে স্বেচ্ছায় তারা যেন সেই পেশা গ্রহণ করে তার দ্বারা নিজ জীবিকা উপার্জন করতে পারে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।

২০. এই পর্যায়ে ছেলেমেয়েরা পৃথিবীর ইতিহাস ভূগোল উদ্ভিদ্‌-বিদ্যা জ্যোতিষ গণিত বীজগণিত ও জ্যামিতি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করবে।

২১. প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে এই সময় সেলাই ও রান্না করতে শিখবে।

২২. ষোল থেকে পঁচিশ হল তৃতীয় পর্যায় যখন প্রত্যেকটি তরুণ-তরুণী নিজের ইচ্ছা ও পরিস্থিতি অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

২৩. দ্বিতীয় পর্যায়ে (৯-১৬) শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে। অর্থাৎ শিক্ষাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশু কোন না কোন শিল্পে কাজ করছে

এবং সেই শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের আয় থেকে বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে।

২৪. উৎপাদন-কার্য একেবারে গোড়ার পর্যায় থেকেই আরম্ভ হয়। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে এর দ্বারা শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান হয় না।

২৫. শিক্ষকদের খুব উচ্চ বেতন দেওয়া চলবে না, নেহাত যতটুকু না হলে নয় তা-ই তাঁরা পাবেন। তাঁরা সেবা-ভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে যে-কোন আজেবাজে লোককে নেওয়া ঘৃণ্য ব্যাপার। প্রত্যেকটি শিক্ষক সচ্চরিত্র হবেন।

২৬. শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য বৃহৎ ও ব্যয়বহুল অট্টালিকার প্রয়োজন নেই।

২৭. ইংরাজী শেখান হবে অনেকগুলি ভাষার মধ্যে একটি হিসাবে। হিন্দী যেমন রাষ্ট্রভাষা ইংরাজীরও তেমনি ব্যবহার হবে ভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য।

২৮. নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে আমি জোর করে বলতে পারি না যে পুরুষদের শিক্ষা থেকে তা পৃথক্ হবে কিনা এবং হলে কখন তার সূত্রপাত হবে। তবে আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, নারীদের পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা তো পাওয়াই উচিত, এমন কি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষ সুবিধা পাবেন।

২৯. অশিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নৈশবিদ্যালয় থাকবে। তবে আমার মনে হয় না যে প্রাপ্তবয়স্কদের লিখতে পড়তে ও গণিত শেখানর প্রয়োজনীয়তা আছে। বক্তৃতা ইত্যাদি দ্বারা তাঁদের সাধারণ জ্ঞান প্রাপ্তিতে সাহায্য করা হবে এবং তাঁরা যদি চান তাহলে আমরা তাঁদের লিখতে পড়তে ও অঙ্ক কষতে শেখাব।

“আশ্রম অবজারভেশনস্ ইন্ অ্যাক্শান” থেকে

৩০

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা

…এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাছাড়া আমাদের স্বদেশবাসীর উপর কোন কিছু বাধ্যতামূলক ভাবে চাপানর প্রস্তাব আমার মনে সাড়া জাগাতে পারে না।…বর্তমান অবস্থায় শিক্ষাকে ঐচ্ছিক রেখে অবৈতনিক করলেই চলবে। এই প্রস্তাব নিয়ে প্রথমে আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখি। বর্তমানে আমাদের দেশে কর্তৃপক্ষের আদেশের কাছে কৃতদাসের মত আত্মসমর্পণ করার যে মনোবৃত্তি পরিদৃশ্যমান, তা না বদলান পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে যে বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে—এ আমি কল্পনায় দেখতে পাই। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বরোদা সরকারের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সহায়ক হবে। এবিষয় সম্বন্ধে আমার ধ্যান-ধারণা এই ক্ষেত্রে জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়ার নীতি-বিরোধী।

বিচারসৃষ্টি, ১৯১৭

৩১

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

জনৈক পত্রলেখক প্রশ্ন করেছেন ঃ

"আপনি কি ভারতবর্ষে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সপক্ষে? শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা কি অন্যায় বা অপ্রয়োজনীয়? দেশের বর্তমান অবস্থায় আমরা যদি স্বরাজ পাই তাহলে আপনি কি সমগ্র দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবেন?"

আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে আমাকে প্রধান প্রশ্নটির নেতিবাচক উত্তর দিতে হবে। বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের কোন কালেই বিরোধিতা করব না—একথা আমি জোর করে বলতে পারছি না।

সবরকমের বাধ্যবাধকতা আমার কাছে ন্যক্কারজনক। যেমন আমি চাই না যে দেশবাসী বাধ্যতামূলকভাবে ধীর স্থির ও শান্ত হন তেমনি এই জাতীয় সংশয়জনক পদ্ধতিতে দেশবাসী শিক্ষিত হন—এও আমার কাম্য নয়। তবে নূতন মদের দোকান না খুলে এবং চালু দোকানগুলিকে বন্ধ করে আমি যেমন পানাসক্তিকে হতোৎসাহিত করতে চাই তেমনি নিরক্ষরতার বিরোধিতা করার জন্য আমি অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলে এবং সেগুলিকে জনসাধারণের প্রয়োজনীয়তা-পরিপূর্তির জন্য সচেতন করে এপথের বাধা দূর করতে ইচ্ছুক। এযাবৎ অবশ্য আমরা ব্যাপকভাবে অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তনের উপযুক্ত কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি নি। অভিভাবকরা প্রোৎসাহিত হতে পারেন, এমন কিছু আমরা করি নি। এমনি অক্ষরজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা এখনও যথেষ্ট বা আদৌ প্রচার করি নি। একাজের উপযুক্ত শিক্ষাও আমাদের নেই। আমার মতে তাই বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বর্তমানে অপরিণত চিন্তা। যেখানে যেখানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে সেই সব জায়গায় এ সমান সাফল্য অর্জন করেছে কিনা একথা আমি নিশ্চিতভাবে জানি না। দেশের অধিকাংশ লোক যদি শিক্ষিত হতে চান তাহলে বাধ্যতামূলক শিক্ষা একান্তভাবে অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আর তা না চাইলে বাধ্যতামূলক শিক্ষা অতীব ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। একমাত্র স্বৈরাচারী সরকারই অধিকাংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও কোন আইন প্রণয়ন করেন। সরকার কি অধিকাংশ নাগরিকের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা দেবার পূর্ণ সুযোগ করে দিয়েছেন? গত একশত বছর বা তারও বেশী হল বাধ্যবাধকতা আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। আমাদের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকেই রাষ্ট্র আমাদের জীবনের শাখা-প্রশাখায় পর্যন্ত প্রভুত্ব করে। জাতি সাময়িকভাবে নিবেদন-আবেদন ও পরামর্শের প্রতি কর্ণপাত না করলেও জাতিকে

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্যপদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার সময় এসে গেছে। অতীতে জাতি অনুরোধ উপরোধে খুব একটা সাড়া দেয় নি। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রচেষ্টায় কোন সংস্কার সাধিত হতে পারে না—সমাজের যথার্থ বিকাশের পক্ষে এ জাতীয় স্থায়ী বিশ্বাসের মত ক্ষতিকর আর কিছু হতে পারে না। এভাবে অভ্যস্ত জনসাধারণ স্বরাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

পূর্বে আমি যা বলেছি তার থেকে এই কথা স্পষ্ট হয় যে আজকেই যদি আমরা স্বরাজ পাই, তবুও যত দিন না স্বেচ্ছামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সর্বপ্রকার সৎপ্রচেষ্টা করে আমরা ব্যর্থকাম হচ্ছি ততদিন বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রবর্তনের আমি বিরোধিতা করব। পাঠক যেন একথা বিস্মৃত না হন যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের তুলনায় বর্তমানে নিরক্ষরতা যে বেশী তার কারণ শিক্ষাদানে অভিভাবকদের অনিচ্ছা নয়, এর কারণ হল এই যে এক বিদেশী ও এদেশের পক্ষে অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্ট হওয়ায় শিক্ষা পাবার পূর্বতন সুযোগ অদৃশ্য হয়ে গেছে।....

....একথা ধরে নেওয়া যুক্তিযুক্ত নয় যে অধিকাংশ অভিভাবকই এমন মূর্খ ও হৃদয়হীন যে নিজের দুয়ারের গোড়ায় অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও তাঁরা নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে অবহেলা করবেন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৪-৮-১৯২৪

৩২

বাধ্যতামূলক শিক্ষা

প্রশ্ন : ভরোচ-এ অনুষ্ঠিত শিক্ষা-সম্মেলনের অভিভাষণে আপনি বলেছেন যে বিনাব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলেও একে বাধ্যতামূলক করা যায় না বা করা উচিতও নয়। যে

জনসাধারণ ইতিপূর্বেই অবদমিত অবস্থায় রয়েছেন তাঁদের উপর নূতন করে এমন কি কোন ভাল জিনিসও চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। ধরুন আজ যদি আমাদের স্বদেশবাসীকে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পণ করা হয়, তাহলে আপনি কি আপনার শিক্ষা-পরিকল্পনাকে (যাতে নির্বিচারে সবাইকে খাদি ও অপরাপর জাতীয় শিল্প শিক্ষা দেবার প্রস্তাব আছে) বাধ্যতামূলক করবেন কি না ?

উত্তর ঃ এমন কি আমার শিক্ষা-পরিকল্পনাকেও বাধ্যতামূলক করার সাহস এখনও আমার হয় নি। আমি বিশ্বাস করি যে আগামী বেশ কিছু বছর আমাদের দেশে এরকম করার প্রয়োজন পড়বে না। কারণ প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা যদি উচিতও হয়, তবু বাস্তবক্ষেত্রে এ কাজ করার পূর্বে আমাদের আরও অনেক প্রস্তুতি করতে হবে। আমার ধারণা হল এই যে, দেশবাসীর কাছে তাঁদের পছন্দসই ও তাঁদের বলবীর্য বর্ধনে সহায়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেই এখনকার মত যথেষ্ট হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে এইটুকু করতে পারলে তাঁদের বাধ্য না করা সত্ত্বেও তাঁরা একে স্বাগত জানাবেন।

নবজীবন, ৩-৬-১৯২৮ থেকে ১-৭-১৯২৮

৩৩

স্বাধ্যায়

শুধু স্কুল-কলেজে গেলেই জ্ঞানার্জন হয়—একথা মনে করা প্রচণ্ড কুসংস্কার। স্কুল-কলেজ সৃষ্টির পূর্বে এই পৃথিবীতে অলোকসামান্য মেধাসম্পন্ন ছাত্রের অপ্রতুলতা ছিল না। স্বাধ্যায়ের মত মহান্ ও স্থায়ী জিনিস আর কিছু নেই। স্কুল আর কলেজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের শুধু জ্ঞানের বাহ্যাড়ম্বরটুকুর মাননীয় অধিকারীর মর্যাদা

দেয়। শাঁস ছেড়ে আমরা খোসা নিয়ে তৃপ্ত হই। অযথা আমি স্কুল-কলেজের নিন্দা করতে চাই না। ক্ষেত্রবিশেষে তাদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা কিন্তু এ নিয়ে বড় বেশী রকম বাড়াবাড়ি করছি। এগুলি জ্ঞানার্জনের বহুবিধ মাধ্যমের একটি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইয়ং-ইণ্ডিয়া, ২৫-৬-৩১

সমাপ্ত

BIBLIOGRAPHY OF ENGLISH BOOKS

A. WORKS BY GANDHIJI

Our Language Problem. Karachi, A. T. Hingorani.
Basic Education, Navajivan.
The Problem of Education, Navajivan
Towards New Education, Navajivan.
True Education, Navajivan.

B. WORKS BY OTHER AUTHORS

Abbott, A. & Wood, S. H.: Report on the Vocational Education in India. Delhi, Manager Govt. Publications.
Adams, Sir John: The Evolution of Educational Theory. London, Macmillan.
Modern Developments in Educational Practice. University of London Press.
Agarwal, S. N.: Constructive Programme for Students. Bombay, Padma Publications.
The Gandhian Plan. Bombay, Padma Publications.
Altekar, A. S.: Education in Ancient India. Nand Kishore & Bros.
Basu, A. N.: Education in Modern India. Calcutta, Orient Book Co.
Multipurpose School & Other Educational Essays.
Primary Education in India: Its Future. Calcutta.
Bhatia, H. R.: Craft in Education, Pilani, H. R. Bhatia.
Board of Education: Hand-book of Suggestions for Teachers. London, His Majesty's Stationery Office.
The Primary School. H. M.'s Stationery Office.
The Education of the Adolescent. H. M.'s Stationery Office.
Spens Report. H. M.'s Stationery Office.
Bode, B. H.; Modern Educational Theories. New York, Macmillan.
Brockway, A. Fenner: Non-Co-operation in Other Lands. Madras, Tagore & Co.
Bryant: Moral and Religious Education.
Chatterji, Suniti Kumar: Languages and Linguistic Problem. London, Oxford University Press.
Chaudhuri, H. N.: News Menace to Education Our Language Problem.
Commission on the Reorganization of Secondary Education in America: Cardinal Principles of Secondary Education. Washington, Government Printing Office.
Cox, J. W.: Manual Skill. Cambridge, Cambridge University.
Cubberley, E. P.: Public Education in United States.
Dewey, John: Schools of To-morrow. London, Dent & Sons,
The School and Society. The University of Chicago Press.
Democracy and Education. New York, Macmillan.
Government of India: The Report of the University Education Commission. Delhi, Manager of Publications.
Government of India: Report of the Second Wardha Educational Committee of the Central Advisory Board of Education. Delhi, Manager of Publications.
Government of India: Post-War Educational Development in India. Delhi, Manager of Publications.
Gupta, Babulal: An Intelligent Man's Guide to the Wardha Scheme of Education. Aligarh, The National Literature Publishing Society.
Hampton, H. V.: Saiyidain K. G. and Others: The Educational System. London, Oxford University Press.

Hindustani Talimi Sangh : Educational Reconstruction (2nd Ed.). Sevagram (Wardha).
Basic National Education.
One Step Forward.
Two Years' Work.
The Third Annual Report, 1940-41.
Samagra Nai Talim (Hindi).
Sixth Annual Report of the H. T. Sangh, 1938-44.
Shikshamen Ahimsak Kranti (Hindi).
Das Salka Kam (Hindi).
Report of the Fifth All-India Basic Education Conference—1949.
Husain, Zakir : Post-War Education. New York, Institute of Pacific Relations.
Kabir, Humayun : Student Unrest Causes & Cure.
Kher, B. G. : Basic Education. Bombay, The Directorate of Publicity, Government of Bombay.
Kripalani, J. B. : The Latest Fad. Sevagram, Hindustani Talimi Sangh.
The New Education. Sevagram. Hindustani Talimi Sangh.
Kumarappa, J. C. : Education for Life. Rajahmundry, Hindustan Publishing Co.
Limaye, P. M. : Education in India Today. Poona, D. D. Karve.
Menon, T. K. N. : A Symposium on Post-War Education in India. Baroda, Padmaja Publication.
Mukerji, S. N. : Education in India—Today and Tomorrow. Baroda, Acharya Book Depot.
Nag, D. G. : Medium of Education : A Symposium. Bombay, National Information and Publications Ltd.
National Planning Committee : General Education and Technical Education and Developmental Research. Bombay, Vora & Co.
Nivedita, Sister : Hints on National Education in India. Calcutta, Udbodhan Office.
Nunn, Sir T. Percy : Education : Its Data and First Principles. London, Edward Arnold.
Nurullah, S. & Naik, J. P. : History of Education in India. Macmillan.
Paranjpye, M. R. : A Source Book of Modern Indian Education. Macmillan.
Pramanik, P. K. : Recommendations of the Education Commission in India.
Premchand Lal : Reconstruction and Education in Rural India. London, George Allen.
Radhakrishnan, S. : Education, Politics and War. Poona, International Book Service.
Rangha, N. G. : Adult Education Movement. Kovur, The Andhradesh Adult Education Committee.
Russell, Bertrand : Education and Social Order. George Allen.
Roy, N : Never Too late. Orient Book Co.
Saiyidain, K. G. : Introducing the Basic Curriculum. Government of Bombay.
Education for International Understanding. Hind Kitabs.
Shrimali, K. L. : The Wardha Scheme. Udaipur, Vidya Bhawan Society.
Siqueira, T. N. : The Education of India. London, Oxford.
Thomas, F. W. & Lang, A. : Principles of Modern Education. Boston, Houghton Mifflin.
Thomson. G. H. : A Modern Philosophy of Education. London, George Allen.
Ulich, Robert : Three Thousand Years of Educational Wisdom. Harvard University Press.
Vakil, K. S. : Education in India (1540-1940). Kolhapur, K. S. Vakil.
Varkey, C. J. : The Wardha Scheme of Education. London, Oxford.

অনাথনাথ বসু

প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ

অমরনাথ রায়

ফেলবার নয়

অনিলমোহন গুপ্ত

বুনিয়াদী শিক্ষার কথা, ১ম খণ্ড
বুনিয়াদী শিক্ষার কথা, ২য় খণ্ড
বুনিয়াদী শিক্ষায় সংগঠন
বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি

অশোক ঘোষ

আমরাও হতে পারি—মুদ্রণ-বিশারদ

কমলেশ রায়

আমরাও হতে পারি—বীক্ষণ-বিশারদ

চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

শিক্ষা দর্শন

জ্যোতির্ময় রায়

আমরাও হতে পারি—রেডিও-বিশারদ

দেবীদাস মজুমদার

আমরাও হতে পারি—বিদ্যুৎ-বিশারদ

ধীরেন্দ্র মজুমদার

নঈ-তালিম

ননীগোপাল চক্রবর্তী

কাঠের কাজ
কাঠের কাজ, ১ম ভাগ
কাঠের কাজ, ২য় ভাগ
কাঠের কাজ, ৩য় ভাগ
তৈরী করা কঠিন নয়
লোহার কাজ
রং বার্নিশ পালিশের কাজ

নিখিলরঞ্জন রায়

সমাজ-শিক্ষা
সমাজ-শিক্ষার ভূমিকা
জনশিক্ষার কথা
শিক্ষা-বিচিত্রা

প্রতিভা গুপ্ত

সমাজ ও শিশু-শিক্ষা

প্রতিভা গুপ্ত

সমাজ ও শিশু-সমীক্ষা
শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ

প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

বর্তমান ভারতের শিক্ষা
নূতন-শিক্ষা
প্রাথমিক শিক্ষাদান-পদ্ধতি
শিক্ষা-প্রসঙ্গ
শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ
শিক্ষাব্রতী [মাসিক]
সমাজ-জীবন
সামাজিক ও নাগরিক জ্ঞান, ১ম ভাগ
সামাজিক ও নাগরিক জ্ঞান, ২য় ভাগ

ফণিভূষণ বিশ্বাস

নয়া-শিক্ষা

বিজয়কুমার ভট্টাচার্য

বুনিয়াদী শিক্ষা
বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি

বিমল দাসগুপ্ত

শিক্ষক-শিক্ষণ-প্রবেশিকা

মহাত্মা গান্ধী

শিক্ষা

শিশিরকুমার চক্রবর্তী

প্রাথমিক চিকিৎসা

শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী

শিক্ষক-শিক্ষণ-পদ্ধতি

সমীরণ চট্টোপাধ্যায়

শিশু-পরিবেশ

সুধীরচন্দ্র কর

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা
সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা

সুনির্মল বসু

ছন্দের গোপন কথা
ছোটদের কবিতা শেখা

হুমায়ুন কবীর

নয়া ভারতের শিক্ষা

নির্ঘণ্ট

প্রান্তীয় ভাষাওঁ কে স্থানমেঁ
নহীঁ, বল্কি উনকে সিবায়
অন্তরপ্রান্তীয় বিনিময়কে
লিয়ে এক রাষ্ট্রভাষা
অবশ্য ভারতকে লিয়ে
জরুরী হৈ বহ ভাষা কেবল
হিন্দী হিন্দুস্তানী হো সকতী হৈ
মো. ক. গাংধী

প্রাদেশিক ভাষার স্থানে নয়, উপরন্তু বিভিন্ন প্রদেশের ভাব বিনিময়ের জন্য একটি রাষ্ট্রভাষার একান্ত প্রয়োজন, একমাত্র হিন্দুস্থানীই সেই রাষ্ট্রভাষা হতে পারে। মো. ক. গান্ধী

মা. If this is not quite correct you must show me the correct form আমা. আম.
মামা আম আনো.
ওমা, আম নাও,
দাদা নাম দাও.
দধ ন ণ প ফ
ভ ঞ ট ঠ ড ঢ থ দ
য য় শ ষ স
তিন আনা। ৩

তিনটা তিন তিন আনা।
বাপুর আশীর্বাদ
তোমার নাম কি
অ আ ই ঈ উ ঊ
মো. ক. গান্ধী